হারুকি মুরাকামি

নরওয়েজিয়ান উড

অনুবাদ : কৌশিক জামান

ষাটের দশকের শেষদিকে টোকিও। বিষন্ন আর গম্ভির প্রকৃতির তরু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলার ছাত্র ক্যাম্পাস জীবনের নিঃসঙ্গ একাকিত্বের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টায় ব্যস্ত। তার জীবনে এলো দু-জন বিপরীতধর্মি নারী। একজন তার মৃতবন্ধুর প্রেমিকা। সুন্দরি কিন্তু মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত। অন্যজন বন্ধুত্বপূর্ণ, প্রাণোচ্ছল আর স্বাধীনচেত।

কাকে বেছে নেবে সে?

প্রেম, সম্পর্কের জটিলতা, যৌনতা, বয়োঃসন্ধি, একাকিত্ব, প্রিয়জন হারানোর ব্যথা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বর্তমান সময়ের অন্যতম বিশ্বসেরা লেখক হারুকি মুরাকামি।

'*নরওয়েজিয়ান* উড শিল্প সৌকর্যের এক অনন্য উপন্যাস, যার পাতায় পাতায় মুরাকামির দক্ষ লেখনির ছোঁয়া বিদ্যমান।'

—দ্য নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স বুক রিভিউ

'মুরাকামি তার প্রজন্মের স্পন্দন দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা পাঠককে পুরোপুরি টেনে নিয়ে যায়।'

—দ্য বাল্টিমোর সান

'মুরাকামির লেখা মৌলিকতায় ভরপুর...নিঃসন্দেহে এটি তার লেখা উপন্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যৌনাবেদনময়ি।'

—লস অ্যাঞ্জেলেস টাইম্‌স বুক রিভিউ

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984872941-0
9 789848 729410

বিশ্ববিখ্যাত জাপানি লেখক হারুকি মুরাকামি সারা পৃথিবী জুড়েই তুমুল জনপ্রিয়। ৫০টিরও বেশি ভষায় অনুদিত হয়েছে তার লেখা।
সমালোচকদের প্রশংসার পাশাপাশি অসংখ্য পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। এরমধ্যে ২০০৬ সালে ওয়ার্ল্ড ফ্যান্টাসি অ্যাওয়ার্ড, ফ্রাঙ্ক ও'কনর আন্তর্জাতিক ছোটগল্প পুরস্কার, ফ্রানৎজ কাফকা পুরস্কার এবং ২০০৯ সালে জেরুজালেম পুরস্কার অন্যতম।
তার মৌলিক রচনার মধ্যে *নরওয়েজিয়ান উড* বেশ বিখ্যাত ও পাঠকপ্রিয়। এছাড়া *অ্যা ওয়াইল্ড শিপ চেইজ, দ্য উইন্ড-আপ বার্ড ক্রনিকলস, কাফকা অন দি শোর* এবং *ওয়ান-কিউ-এইট-ফোর* পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের বেশ কিছু বই জাপানি ভাষায় অনুবাদও করেছেন তিনি। ক্ল্যাসিক্যাল আর জ্যাজ সঙ্গিতের প্রতি মুরাকামির রয়েছে বিশেষ আগ্রহ। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিসহ বেশ কয়েকটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে। ২০১৫ সালে 'টাইম ম্যাগাজিন' তাকে এ বিশ্বের ১০০জন প্রভাবশালি ব্যক্তি হিসেবে তালিকাভূক্ত করে।

হারুকি মুরাকামি

নরওয়েজিয়ান উড

অনুবাদ : কৌশিক জামান

বাতিঘর প্রকাশনী

নরওয়েজিয়ান উড

মূল : হারুকি মুরাকামি

অনুবাদ : কৌশিক জামান

Norwegian Wood

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ: অনুবাদক

মূল্য : তিনশত বিশ টাকা মাত্র

অনুবাদকের কথা

আমি কোন পেশাদার অনুবাদক নই। বই পড়তে যতটা ভালো লাগে, লিখতে ততটা নয়। কলেজ জীবনে কিছুদিন টুকটাক লেখালেখি আর পত্রবন্ধুদেরকে লেখা কয়েকশ' চিঠির কথা বাদ দিলে বলার মত কাজ একমাত্র এটাই। আমার ধৈর্য বরাবরই কম (আর বেশ খানিকটা অলসও!), তাই ভবিষ্যতে আর কোন অনুবাদ আমাকে দিয়ে হবে কিনা বলা মুশকিল। এক *নরওয়েজিয়ান* উড অনুবাদ করতে গিয়ে আমার আয়ু ভালোমতই কমেছে মনে হয়। অন্তত কিছু চুল দাঁড়ি যে পেকেছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি! আর যারা নিয়মিত অনুবাদ করেন, তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কয়েকগুন বেড়ে গেছে এই দু-মাসে।

এই বইটা কেন অনুবাদ করতে গেলাম সে বিষয়ে কিছু কথা বলার আছে। আমি মূলত থৃলার কিংবা সায়েন্স-ফিকশনের পাঠক। *নরওয়েজিয়ান* উড শ্রেণির বই সাধারনত কেউ না বললে পড়ি না। রোমান্টিক ধরনের কোন কিছু তো পড়ার প্রশ্নই আসে না। হারুকি মুরাকামির নাম আগেই শুনেছিলাম। এ সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখকদের একজন। অথচ তিনি কখনো চিন্তা করেননি লেখক হবেন। একদিন স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে গিয়ে তার মাথায় একটা গল্প আসল, বাসায় ফিরে গিয়ে লেখা শুরু করলেন। এই *নরওয়েজিয়ান* উড তাকে তুমুল জনপ্রিয়তা এনে দিল। যেখানে যেতেন লোকজন পিছু নিত, দেশ ছাড়তে বাধ্য হন তখন। আগে তার কিছু ছোটগল্পের বাংলা অনুবাদ পড়লেও *নরওয়েজিয়ান* উডই আমার পড়া মুরাকামির প্রথম উপন্যাস। জাপানে নাকি এমন কেউ নেই যে এই উপন্যাসটি পড়েনি। সাড়া পৃথিবীতেই তুমুল জনপ্রিয় এই উপন্যাসটি ঠিকমত অনুবাদ করতে পেরেছি কিনা তা নিয়ে আমি সন্দিহান। সুতরাং অনুবাদ ভালো না লাগলে তার দায়ভার পুরোপুরি আমার। আর ভালো লাগলে তার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে মুরাকামির।

বইটা পড়ার পরেও আমি ভাবিনি কখনো অনুবাদ করবো। একদিন অফিসে কাজ নিয়ে ঝামেলা হওয়ায় হুট করে চাকরি ছেড়ে দিলাম। বাসায় ফিরে কোন কিছু না ভেবেই ঠিক করলাম *নরওয়েজিয়ান* উড অনুবাদ করবো। প্ল্যান করে আমাকে দিয়ে কখনো কিছু হয়নি, যা হয় হুটহাট করেই হয়। তাই যা ভাবা তাই কাজ, শুরু করে দিলাম অনুবাদ। শুরুতে বই বের করার কোন চিন্তা মাথায় ছিল না। পরে প্রকাশকের সাথে কথা হওয়ায় সিরিয়াসলি অনুবাদ শুরু করি।

প্রথম দিকে বেশ ভালোভাবে এগুলেও মাঝামাঝি গিয়ে কাজ আর এগুচ্ছিল না। ওদিকে প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব সবাই মোটামুটি জেনে গেছে বইয়ের কথা, দেখা হলেই "কাজ কতদুর," "বই কবে পাবো," ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে, ফেসবুক-ওয়াটসঅ্যাপে নক করে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য খোঁচাতে থাকে। এই মানুষগুলো না থাকলে এই কাজ কখনোই সম্ভব হত না। সেঁজুতিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ কারন সে না বললে হয়তো কখনো *নরওয়েজিয়ান* উড ধরেই দেখতাম না! তিনি এমন কি একসময় আমাকে বইটা পড়তেও মানা করেছিলেন কারন আমি নাকি আরো বিষন্ন হয়ে যেতে পারি!! নোভা অনুবাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে মোটিভেট করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। অনুবাদ শেষ হলে অনন্যাআপু আমাকে একটা সাদা শার্ট গিফট করার কথা! শেরিফা আর নিলয় তাদের 'গুপ্ত প্রতিভা' দিয়ে 'বিশেষ' সাহায্য করেছে! আদিবাও নানানভাবে সাহায্য করেছে আমায়। আনিন্দিতা ত্রিশাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছি, উল্টো সে আমার বইয়ের খোঁজ নিয়েছে!

আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই–মানিশা, নাজিয়া, ফারহানা তানি, আনিকা, প্রিয়াম (একই সময়ে সে-ও একটা উপন্যাস লিখছিল), প্রেমাআপু (একই সময়ে তিনিও একটা উপন্যাস লিখে আমেরিকার এক লেখার প্রতিযোগিতায় জিতে গেছেন!), তুষার, মাইসা, সজীব, অনি, নাইম শাওন, বাপ্পি, জিকোভাই, সেতুভাইকে (অনুবাদের প্রথম পাঠক আর কড়া সমালোচক)–সর্বদা অনুপ্রেরণা আর বিভিন্নভাবে সাহায্যের জন্য। 'সিবি' গ্রুপের বাকি সবাই ফারিয়াআপু, তারেকভাই, যুবায়ের, জাহিন, ফারনাজ, নিয়ামাহ, সেযামিকে ধন্যবাদ।

বাসার সবাইকে (আব্বু, আম্মু, মাহিন, তান্নি) ধন্যবাদ। আমার সৌভাগ্য যে আমার পরিবার বইপ্রেমি। বাকি যাদের নাম লিখতে ভুলে গেছি তারা পারলে মাফ করে দেবেন।

পরিশেষে প্রকাশককে অসংখ্য ধন্যবাদ পাগলামিকে প্রশ্রয় দেয়ার জন্য।

বই সম্পর্কে মতামত, অভিযোগ কিংবা প্রশ্ন থাকলে জানাতে পারেন আমাকে।

কৌশিক জামান,

ফেব্রুয়ারি ২০১৭, ঢাকা

ইমেইল : mir.kousik@gmail.com

ফেসবুক : facebook.com/kousik.zaman

And when I awoke
I was alone
This bird had flown

So I lit a fire
Isn't it good
Norwegian wood

অধ্যায় ১

ভারি মেঘের ভেতর দিয়ে বিশাল সেভেন থ্রি সেভেন প্লেনটা হামবুর্গ এয়ারপোর্টের দিকে এগুচ্ছিল। আমি তখন ভেতরে সিটবেল্ট বাঁধা অবস্থায় বসে আছি। নভেম্বরের শীতল বৃষ্টিতে চারপাশ ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে, সবকিছু কেমন যেন বিষন্ন। এয়ারপোর্টের বিল্ডিঙে উড়তে থাকা পতাকা, রেইনকোট পরা গ্রাউন্ড ক্রু, বিএমডাব্লিউ'র বিলবোর্ড। আবার সেই জার্মানিতে। আমার বয়স তখন সাঁইত্রিশ।

প্লেন যখন পুরোপুরি মাটিতে নেমে গেল, সিলিঙের স্পিকারগুলো থেকে মিষ্টি একটা সুর ভেসে আসলো। বিটল্‌স-এর *নরওয়েজিয়ান* উড-এর একটি অর্কেস্ট্রা কাভার। এই মিউজিকটা আমি যতবারই শুনি প্রতিবার কেঁপে উঠি। এবার যেন একটু বেশিই ধাক্কা খেলাম।

মাথার ভেতরটা মনে হচ্ছিল যেন দু-ভাগ হয়ে যাচ্ছে। সিটটাকে পেছনে বাঁকিয়ে তাই হাতের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। একজন জার্মান স্টুয়ার্ডেস এসে জানতে চাইলো আমার শরীর খারাপ লাগছে কিনা।

"নাহ," আমি উত্তর দিলাম, "একটু মাথাটা ধরেছে।"

"আর ইউ শিউর?"

"ইয়েস, আই অ্যাম শিউর। থ্যাংকস।"

সে হেসে চলে গেল। মিউজিক বদলে গেল বিলি জোয়েলের গানে। আমি সোজা হয়ে বসে প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। উত্তর-সাগরের উপর মেঘগুলো ঘন হয়ে ভেসে যাচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম এই জীবনে কত কি হারিয়েছি। কত সময় বয়ে গেছে। কত বন্ধু মারা গেছে কিংবা হারিয়ে গেছে। কত অনুভূতিই বা হারিয়ে গেছে যা হয়তো আর কখনও ফিরে পাওয়া যাবে না।

প্লেন গেটের কাছে পৌঁছালে যাত্রিরা সিটবেল্ট খুলে যার যার ব্যাগ নামাতে শুরু করল। আর আমি তখন মনে মনে ফিরে গিয়েছি সেই বিস্তীর্ণ ঘাসের মাঠে। ঘাসের অদ্ভুত গন্ধ, মুখে বাতাসের ঝাপটা, পাখির কলরব। ১৯৬৯-এর হেমন্ত। আমার বয়স তখন বিশ হতে যাচ্ছে।

সেই স্টুয়ার্ডেস আবার দেখতে আসল। পাশের সিটে বসে জিজ্ঞেস করল সব ঠিক আছে কিনা।

“আমি ঠিকই আছি, থ্যাংকস,” একটু হেসে বললাম তাকে। “শুধু একটু মাথাব্যথা।”

“বুঝতে পারছি কি অবস্থা,” সে বলল। “এরকম আমারও মাঝে মধ্যেই হয়।”

তারপর দাঁড়িয়ে মিষ্টি হেসে বলল, “ঠিক আছে তাহলে, আপনার যাত্রা শুভ হোক, গুডবাই।”

“গুডবাই।”

আঠারো বছর কোন দিক দিয়ে চলে গেছে। তারপরও সেই দিনের সেই ঘাসভূমির সবকিছু আমি এখনও স্পষ্ট মনে করতে পারি। বৃষ্টিতে গ্রীষ্মের ধুলোবালি ধুয়ে যাওয়ার পর পর্বতগুলো তখন গাঢ় সবুজে ঢেকে ছিল। মাথা সমান লম্বা ঘাসগুলো দুলছিল অক্টোবরের মৃদু বাতাসে। মেঘহীন নীল আকাশে হঠাৎ হঠাৎ একটা করে বড় মেঘ এসে হাজির হত। মাঝে মাঝে ঝাপটা বাতাস এসে ঘাসগুলোকে শুইয়ে দিত। তারপর ওর চুলের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে চুপটি করে দূরের বনে লুকিয়ে পড়তো। বনের ভেতরে ডালপালার ঘষাঘষি আর দূর থেকে ভেসে আসা কুকুরের ডাক একসাথে মিশে মনে হত যেন অন্য কোন দুনিয়া থেকে ভেসে আসা শব্দ। এছাড়া আর কোন শব্দ আমাদের কানে আসেনি। আর কাউকে আমরা দেখতে পাইনি। শুধু দেখেছিলাম দুটি লাল রঙের পাখিকে ঘাসভূমি থেকে উড়ে বনের দিকে যেতে। আমরা আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম। আর নাওকো আমাকে তার কূয়োর কাহিনী বলছিল।

স্মৃতি খুবই আজব জিনিস। যখন ওই জায়গায় ছিলাম, তখন বলতে গেলে কোন কিছুতেই মনোযোগই দেইনি। আমি ভাবতেও পারিনি অনেকদিন পর্যন্ত স্মৃতিতে রয়ে যাওয়ার মত কিছু হবে। অন্তত এটা তো ভাবিইনি যে আঠারো বছর পরেও সবকিছু এত পরিস্কারভাবে আমার মনে থাকবে। ঐদিন চারপাশের দৃশ্য নিয়ে একদমই পাত্তা দেইনি। আমি ভাবছিলাম নিজেকে নিয়ে। আর ভাবছিলাম যে সুন্দরি মেয়েটা আমার পাশে হাঁটছে তাকে নিয়ে। ভাবছিলাম আমাদের দু-জনকে নিয়ে। সেইসময় জীবনের প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি অনুভূতি, বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছিল আমার মনে। বাজে ব্যাপার হল, আমি প্রেমে পড়েছিলাম। বিশাল সমস্যাযুক্ত প্রেম। চারপাশের দৃশ্য নিয়ে ভাবার সময় তখন আমার ছিল না।

আর সেই জায়গায় কিনা এখন আমার স্মৃতিতে ভাসছে সেই বিস্তীর্ণ ঘাসভূমি। ঘাসের গন্ধ, ঠাণ্ডা বাতাস, দূরের পর্বত শৃঙ্গ, কুকুরের ডাক। একদম স্পষ্ট। এত স্পষ্ট যেন হাত দিয়ে ছুঁতে পারবো। সবকিছু স্পষ্ট অথচ কোন মানুষ

সেখানে নেই। নাওকো সেখানে নেই, আমিও সেখানে নেই। কেউ নেই। কিভাবে সম্ভব? তখন যেসব ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল, নাওকো, আমি, আমার পৃথিবী, কোথায় হারিয়ে গেল সব? সত্যি কথা হল, নাওকোর চেহারাও আমি মনে করতে পারছি না। অন্তত পরিস্কার নয়। আমার স্মৃতিতে স্পষ্ট শুধু সেদিনের প্রকৃতি, চারদিকের দৃশ্য।

যদি সময় দেই, তাহলে হয়ত নাওকোর চেহারা মনে করতে পারবো। আলাদা আলাদাভাবে ওর দেহের সব অংশ জোড়া দিয়ে নিতে হবে। ওর ছোট ছোট ঠাণ্ডা হাত। ঘন কালো মসৃণ চুল। গোলাকার নরম কান, নিচের দিকে ছোট্ট একটা তিল। শীতের জন্য উটের লোম দিয়ে তৈরি একটা কোট পরেছিল সে। প্রশ্ন করার সময় সোজা চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করত। গলার স্বর একটু কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল। যেন ঠান্ডা লাগছিল বা পাহাড়ের উপর থেকে কথা বলছিল। আর তখনই তার চেহারাটা পুরোপুরি মনে পড়তো। আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম বলে প্রথমে অন্যসব মনে পড়তো। সে আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে, হেসে, মাথা নাড়িয়ে কথা বলছিল। আর এমনভাবে তাকাতো যেন সরাসরি চোখের ভেতর কোথাও হারিয়ে গেছে।

একটু সময় নিলেই মনে করতে পারি। আর এত বছর পর সময় লাগার পরিমাণটাও ধীরে ধীরে বেড়ে গেছে। আগে যেখানে পাঁচ সেকেন্ডে মনে করতে পারতাম, সেখানে দশ সেকেন্ড, ত্রিশ সেকেন্ড থেকে এখন পুরো একটা মিনিট লেগে যায়। অনেকটা সূর্যাস্তের সময় ছায়া বাড়ার মত। কোনদিন হয়ত ছায়া বাড়তে বাড়তে পুরোটা ঢেকে ফেলবে। এর থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। স্মৃতি যেন আমি আর নাওকো যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছে। এমনকি তখন আমার অবস্থান যেখানে ছিল সেখান থেকে আরও বেশি দূরে সরে গেছে। এখন আছে শুধুই চারপাশের দৃশ্য। অক্টোবরে ঘাসভূমির দৃশ্যই খালি সিনেমার মত বার বার ফিরে আসে। যখনই ফিরে আসে তখনই যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলে, "জাগো," বলে, "জাগো, আমি এখনো আছি, আমার কথা ভাবো। ভাবো, কেন আমি এখনও আছি," আমি কোন ব্যথা টের পাই না, শুধু মাথার ভেতর ভোঁতা একটা শব্দ। সেটাও হয়ত কোন একদিন হারিয়ে যাবে। যদিও হামবুর্গ এয়ারপোর্টে ধাক্কার পরিমাণটা একটু বেশি ছিল। সেজন্যই এই বইটা লিখতে বসেছি। চিন্তা করার জন্য। বোঝার জন্য। কিছু ভালোভাবে বুঝতে হলে আমাকে লিখতে হয়। আমার অভ্যেস এভাবে চিন্তা করা।

নাওকো সেদিন কি নিয়ে কথা বলছিল তা দিয়ে শুরু করা যাক।

ঘাসের মাঠের মধ্যে একটা কূয়ো। এরকম কোন কূয়ো থাকতে পারে আমার কোন ধারনা ছিল না। এটা ছিল সম্ভবত নাওকোর কোন কল্পনা, যা কিনা খালি ওর মনেই থাকা সম্ভব। সেসব খারাপ দিনগুলোতে এরকম অনেক ব্যাপার-স্যাপার ওর মাথায় ঘুরত। সে আমাকে কূয়োর বর্ণনা দিয়েছিল। তারপর থেকে আমি কূয়ো ছাড়া ঘাসভূমির দৃশ্য মন থেকে বের করতে পারিনি। যে কূয়ো আমি কখনও চোখে দেখিনি সেইদিন থেকে তা আমার দেখা ঘাসভূমির একটা অংশ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি এক মিনিট ধরে স্রেফ সেই কূয়োর বর্ণনাই দিতে পারবো। কূয়োর অবস্থান হল ঘাসভূমির একদম শেষে, যেখান থেকে বন শুরু হয়েছে। ঘাসের ভেতর অদৃশ্য হয়ে থাকা একটা অন্ধকার গভীর গর্ত। বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই, কোন বেড়া বা কিছু দিয়ে চিহ্নিত করা নেই। হা করে থাকা একটা গর্ত। কূয়োর বাঁধানো পাথরগুলো বয়সের ভারে ধূসর হয়ে ফেঁটে গেছে। ফাঁটলগুলোতে সবুজ গিরগিটি বাস করে। চাইলে নিচু হয়ে কূয়োয় উঁকি দিতে পারেন কিন্তু কিছু দেখতে পাবেন না। কূয়োটা ভীষণ রকমের গভীর। এই গভীরতা গণনার অতীত। আর পৃথিবীর সব অন্ধকার একসাথে গিয়ে এর ভেতর জমেছে।

"এই কূয়োটা সত্যি অনেক গভীর, অনেক অনেক গভীর।" সাবধানে একটা একটা করে শব্দ বাছাই করছিল নাওকো। সে মাঝেমধ্যে এভাবে কথা বলে, ধীরেসুস্থে একটা একটা করে সঠিক শব্দ বাছাই করে। "কিন্তু কেউ জানে না কূয়োটা কোথায়। আমি শুধু নিশ্চিতভাবে জানি কূয়োটা এখানেই কোথাও আছে।"

টুইড জ্যাকেটের পকেটে নিজের হাত ঢুকিয়ে ও হেসে বলল, "সত্যি বলছি কিন্তু!"

"তাহলে তো খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার," আমি বললাম। "গভীর একটা কূয়ো, কিন্তু কেউ জানে না সেটা কোথায়। যে কোন সময় তুমি সেটায় পড়ে যেতে পারো। ব্যাস, জীবন খতম।"

"একদম শেষ। ফুউউ...ধপাত! খেল খতম।"

"এরকম ঘটনা কিন্তু আসলেই হয়।"

"হয়তো। মাঝে মধ্যেই হয়। ধরো প্রতি দুই-তিন বছরে একবার হয়? কেউ একজন হঠাৎ উধাও হয়ে যায় আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন সবাই বলে, 'তাহলে নিশ্চয়ই মাঠের ওই কূয়োটায় পড়ে গেছে।' "

"মরার জন্য ঠিক সুখকর নয় ব্যাপারটা," আমি বললাম।

"অবশ্যই না। এরকম মৃত্যু খুবই ভয়াবহ মৃত্যু," নাওকো বলল, জ্যাকেট থেকে ঘাসের বীজ ঝাড়তে ঝাড়তে। "পড়ে ঘাড় ভেঙে গেলে সবচেয়ে ভালো।

কিন্তু যদি পা ভাঙে কিচ্ছু করার নেই। যত জোরেই চিৎকার করো না কেন, কেউ শুনতে পাবে না। আর তুমি আশাও করতে পারছো না, কেউ তোমাকে খুঁজে পাবে। সেই সাথে যাবতিয় পোকামাকড় তোমার গায়ে কিলবিল করবে। তোমার আগে যারা সেখানে মারা গেছিল তাদের হাড্ডি-গুড্ডি আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। চারপাশে কঠিন অন্ধকার আর ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ। এরকম একটা জায়গায় তুমি আস্তে আস্তে একটু একটু করে মারা যাবে।"

"ইয়াক! চিন্তা করেই আমার গা গুলিয়ে উঠছে," আমি বললাম। "কারো একজনের উচিত কূয়োটা খুঁজে বের করে চারপাশে দেয়াল তুলে দেয়া।"

"কিন্তু কেউ কূয়োটা খুঁজে পেলে তো। তাই সাবধান থেকো, আর ভুলেও রাস্তা থেকে সরে যেও না।"

"ঠিক আছে, চিন্তা কোরো না।"

নাওকো জ্যাকেটের পকেট থেকে তার বাম হাত বের করে আমার হাত ধরলো, "চিন্তা কোরো না, তোমার কিচ্ছু হবে না। তুমি মাঝরাতে এখানে দৌড়াদৌড়ি করতে পার, কূয়োয় পড়বে না। আর যতক্ষণ আমি তোমার সাথে আছি, আমিও পড়বো না।"

"সত্যি পড়বো না তো?"

"কখনো না।"

"কিন্তু আমরা নিশ্চিত হবো কী করে?"

"আমি জানি," কিছুক্ষন চুপ থেকে হাতটা আরও শক্ত করে ধরে বলল সে। "আমি এইসব ব্যাপারে নিশ্চিত জানি। যুক্তি দিয়ে বোঝানো মুশকিল, কিন্তু আমি মনে মনে টের পাই। যেমন ধরো, আমি যখন এরকম তোমার কাছাকাছি থাকি তখন একটুও ভয় পাই না। তখন কোন অশুভ কিছু আমাকে স্পর্শ করতে পারে না।"

"তাহলে তো হলই," আমি বললাম "তোমাকে যা করতে হবে সেটা হল সবসময় আমার সাথে থাকা।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

নাওকো থামল, ওর দেখাদেখি আমিও। সে তার দুই হাত আমার কাঁধে রাখল, আমার চোখে রাখল চোখ। ওর চোখের গভীরে এক অদ্ভুত গাঢ় ঘূর্ণিপাক। সুন্দর সেই চোখগুলো যেন অনেকক্ষণ আমার ভেতরটা দেখল। তারপর সোজা হয়ে আমার গালের সাথে গাল রাখল। চমৎকার উষ্ণ একটি অনুভূতি, আমার হৃদস্পন্দন কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন থেমে গেল।

"থ্যাংক ইউ," বলল সে।

"মাই প্লেজার," বললাম তাকে।

"তোমার কথা শুনে খুব খুশি হলাম। **কিন্তু এটা আসলে সম্ভব না," মলিন** হাসির সাথে সে বলল।

"সম্ভব না মানে? কেন সম্ভব না?"

"কারন ব্যাপারটা ঠিক হবে না, খুব বাজে হবে। আর..."

কথা শেষ না করে নাওকো আবার হাঁটতে শুরু করল। আমি বুঝতে পারছিলাম যাবতিয় নানারকমের চিন্তা ওর মাথায় ঘুরছে। তাই কথা না বাড়িয়ে ওর সাথে সাথে হাঁটতে থাকলাম।

"ব্যাপারটা একদম ঠিক হবে না, তোমার জন্যও না, আমার জন্যও না," অনেকক্ষণ পর ও বলল।

"ঠিক হবে না কিভাবে বুঝলে?" আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"কেন বুঝতে পারছো না? একজন মানুষের পক্ষে আরেকজন মানুষকে সারাক্ষণ দেখে রাখা সম্ভব না। ধরো আমরা বিয়ে করলাম, তোমাকে দিনের বেলা কাজে যেতে হবে, তুমি তখন না থাকলে আমার দেখাশুনা কে করবে? তারপর ধরো, তুমি বিজনেস ট্রিপে বাইরে গেলে তখন আমার দেখাশুনা কে করবে? আমি তো সারাজীবন আঠার মত তোমার সাথে লেগে থাকতে পারবো না, তাই না? কিরকম সম্পর্ক হবে সেটা? আজকে হোক কালকে হোক তুমি আমার উপর বিরক্ত হয়ে যাবে। মনে হবে কি করছি এই জীবনে? সারাক্ষন এই মেয়ের দেখাশুনা করা লাগছে। আমি তা গ্রহন করতে পারবো না। এভাবে আমার সমস্যার কোন সমাধান হবে না।"

"কিন্তু তোমার সমস্যা তো সারাজীবন থাকবে না," ওর পিঠে হাত রেখে বললাম। "একদিন না একদিন তো সমস্যার শেষ হবেই। আর যখন শেষ হবে তখন না হয় আমরা ভাবব কি করা যায়। বলা যায় না হয়ত তুমিই উলটো আমাকে সাহায্য করলে। আমরা তো আর হিসেব করে জীবন চালাচ্ছি না। আমাকে যদি তোমার প্রয়োজন হয়, আমাকে ব্যবহার করো। এত কঠোর হচ্ছো কেন? রিলাক্স। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বেশি চিন্তা করো, আর খালি খারাপ ব্যাপার স্যাপার চিন্তা করো। হাল্কাভাবে নাও সব হালকা লাগবে।"

"তুমি এটা কিভাবে বলতে পারলে?" ওর গলার স্বর অন্যরকম শোনাল।

আমি বুঝতে পারলাম সম্ভবত এমন কিছু বলে ফেলেছি যা বলা ঠিক হয়নি।

“বলো! কী করে এসব বললে আমাকে?” মাটির দিকে চোখ রেখে নাওকো জিজ্ঞেস করল। “তুমি এমন কিছু বলোনি যা আমি নিজে জানি না। ‘রিলাক্স। হাল্কাভাবে নাও সব হালকা লাগবে’ এসব আমাকে বলার কী মানে? আমি যদি এখন সব ছেড়ে দেই আমি ভেঙে পড়বো। আমি সব সময় এভাবেই পারো করে এসেছি। এইটাই জীবনের একমাত্র পথ যেটা আমি জানি। যদি এক মুহূর্তের জন্যও রিলাক্স করি, আমি আর আগের পথ ফিরে পাবো না। একদম ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবো। এই সহজ ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছো না অথচ আমার দেখাশোনা করতে চাইছো কি মনে করে?”

আমি কোন কথা বললাম না।

“আমি দিশেহারা হয়ে গিয়েছি। সত্যি অনেক দিশেহারা আমি। তুমি যা ভাবছো, আমার সমস্যা তারচেয়ে অনেক গভীর। গভীর এবং অন্ধকার। আচ্ছা আমাকে বল, তুমি কিভাবে সেদিন আমার সাথে বিছানায় গিয়েছিলে? কী করে পারলে এরকম করতে? কেন একা ছেড়ে দিলে না আমাকে?”

পাইন বনের মধ্যে দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছিলাম। ভীতিকর রকমের নিস্তব্ধতা। পথের উপর পড়ে ছিল গ্রীষ্মের শেষে মরে শুকনো হয়ে যাওয়া পোকামাকড়, সেগুলো আমাদের জুতোর নিচে পড়ে মচমচ শব্দ করছিল। যেন কিছু একটা খুঁজছি এরকম একটা ভাব নিয়ে আমি আর নাওকো বনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকলাম।

“আমি দুঃখিত,” আমার হাত জড়িয়ে ধরে নাওকো বলল, “তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি। আমি কি বলেছি তা নিয়ে কষ্ট পেয়ো না। সত্যি আমি দুঃখিত। আমি আসলে নিজের উপরে রেগে গিয়েছিলাম।”

“আমার মনে হয় আমি তোমাকে এখনও বুঝে উঠতে পারিনি,” বললাম তাকে। “আমি এত স্মার্ট নই। কোন কিছু বুঝতে আমার কিছুটা সময় লাগে। কিন্তু যদি যথেষ্ট সময় পাই, তোমাকে আমি ঠিকই বুঝতে পারবো। দুনিয়ার যে কারো থেকে ভালোভাবে বুঝতে পারবো।”

আমরা থেমে গিয়ে স্তব্ধ বনের ভেতর কান পাতলাম। পাইনের ফল আর পোকামাকড়ের মৃত দেহাবশেষ পায়ের নিচে পিষে ফেলে উপরের দিকে তাকালাম। পাইনের ডালপালার ভেতর দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা ভাবছিল নাওকো। তার দৃষ্টিতে ছিল শূন্যতা।

“আমাকে বলো তো তরু,” সে বলল। “তুমি কি আমাকে ভালোবাস?”

“তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি,” বললাম তাকে।

“তুমি আমার দুটো কথা রাখবে?”

“তিনটেও রাখতে পারবো, ম্যাডাম।”

নাওকো হেসে মাথা নাড়ল। “নাহ, দুটোই যথেষ্ট। একটা হল তোমার জন্য। তুমি জানো তুমি আমাকে দেখতে এসেছো সেজন্য আমি কতটা কৃতজ্ঞ। প্রচন্ড খুশি হয়েছি। আমি জানি এই ব্যাপারটা আমাকে আরও কিছুদিন রক্ষা করবে। হয়ত উপরে প্রকাশ করছি না কিন্তু সত্যি।”

“আমি তোমাকে আবার দেখতে আসবো,” আমি বললাম। “অন্য কথাটা কি?”

“আমি চাই তুমি আমাকে সারাজীবন মনে রাখবে। তোমার কি মনে থাকবে, আমি একসময় ছিলাম, তোমার পাশে একদিন এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম?”

“সবসময়,” আমি বললাম, “সারাজীবন মনে থাকবে আমার।”

আর কিছু না বলে এগিয়ে গেল সে। ডালপালার ফাঁক দিয়ে আসা হেমন্তের আলো তার জ্যাকেটের উপর খেলতে লাগল। কোথাও একটা কুকুর ডাকল। আগের চেয়ে অনেক কাছে এখন কুকুরটা। নাওকো একটা ছোট টিলার উপরে উঠে পাইনের ডাল এড়িয়ে ঢাল দিয়ে নেমে গেল। আমি তখন তিন-চার কদম পেছনে।

“তাড়াতাড়ি ফিরে আসো,” পেছন থেকে ডাকলাম তাকে। “কূয়োটা এদিকে কোথাও থাকতে পারে।”

নাওকো এসে হাসিমুখে আমার হাত জড়িয়ে ধরলো। বাকি পথ আমরা পাশাপাশি হেঁটে গেলাম। “তুমি সত্যি কথা দিচ্ছো তো আমাকে কখনো ভুলবে না?” ফিসফিস করে বলল সে।

“আমি তোমাকে কখনও ভুলবো না। কখনও ভুলতে পারবো না।”

তারপরও আমার স্মৃতি এখন অনেক ঝাপসা হয়ে গেছে, অনেক কিছুই হয়তো একদম ভুলে গেছি। স্মৃতি থেকে লিখতে গিয়ে ভয়ে ভয়ে লিখছি। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কি ছিল যা একদম ভুলে গেছি? নাকি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিগুলো ধীরে ধীরে বদলে গিয়ে আমার ভেতরে একতাল কাদায় পরিণত হচ্ছে?

যাহোক না কেন, এভাবেই আমাকে কাজ করে যেতে হবে। দূর্বল, মলিন, হারিয়ে যেতে বসা স্মৃতিগুলো বুক বের করে করে কোনভাবে লিখে ফেলতে হবে। রাখতে হবে নাওকোর কাছে দেয়া প্রতিজ্ঞা।

আগে যখন স্মৃতি পরিস্কার ছিল, অনেকবার ভেবেছি নাওকোকে নিয়ে লিখবো। কিন্তু একটা লাইনও বের করতে পারিনি। আমি বুঝতে পারছিলাম যদি একটা লাইন কোনভাবে লিখে ফেলতে পারি, তাহলে বাকি পুরোটাই ঝরঝর করে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সম্ভব হয়নি। সবকিছু এত স্পষ্ট ছিল যে, আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না কিভাবে শুরু করবো। যেই মানচিত্র সব কিছু বেশি বেশি দেখায় সেটা কখনও কখনও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এখন মনে হচ্ছে আসলে এত নিখুঁত করে কোন কিছু শুরু করার কোন দরকার নেই। নাওকোর স্মৃতি আমার ভেতর যতই অস্পষ্ট হয়ে আসছে ততই যেন আমি ওকে ভালোভাবে বুঝতে পারছিলাম। বুঝতে পারছি কেন সে তাকে ভুলে না যেতে বলেছিল। নাওকো নিজেও জানত কারণটা। সে জানত, তার স্মৃতি একদিন ঠিকই মলিন হয়ে যাবে। সেজন্যেই চেয়েছিল আমি যেন তাকে ভুলে না যাই।

কিন্তু যে উপলব্ধিটা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে সেটা হল সে কখনো আমাকে ভালোবাসেনি।

অধ্যায় ২

কোন এক অতীতে। অনেক অনেক বছর আগে। সঠিকভাবে বললে বছর বিশেক আগের কথা, আমি তখন ডরমেটরিতে থাকতাম। আমার বয়স তখন আঠারো। মাত্র ভার্সিটিতে ঢুকেছি। জীবনে প্রথমবারের মত এসেছি টোকিও'তে। একা বসবাস করার অভিজ্ঞতাও জীবনে সেই প্রথম। সাধারণত ডরমগুলোতে ছাত্ররা একা এক রুমে থাকে। আমার উদ্বিগ্ন বাবা-মা তাই আমার জন্য একটা প্রাইভেট ডরম খুঁজে বের করলেন। এমন একটা ডরম যেটা ছাত্রদের খাবার আর অন্যান্য সুবিধা দিয়ে থাকে। যা তাদের ভিনগ্রহ থেকে আসতো আঠারো বছর বয়স্ক সন্তানের জীবন রক্ষা করবে।

অবশ্য খরচও একটা বিষয় ছিল। ডরমের খরচ প্রাইভেট রুমের চেয়ে অনেক কম। মোটামুটি একটা বিছানা আর একটা পড়ার ল্যাম্প থাকলেই আমার আর কোন আসবাবপত্রের তেমন দরকার ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে আমি হয়ত খুশি হতাম অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে থাকতে পারলে, কিন্তু আমার মেট্রিকুলেশন আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির টিউশন ফি'র পেছনে বাবা-মায়ের যে খরচ হয়েছে তারপর আর উচ্চবাচ্য করিনি। তাছাড়া কোথায় থাকছি তা নিয়ে আমার খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না।

ডরমেটরিটা ছিল শহরের মাঝখানে একটা পাহাড়ের উপর। চারকোনা একটা জায়গা, কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে চারদিক ঘেরা। মেইন গেইটের ঠিক ভেতরেই একটা বিশাল জেলকোভা গাছ। লোকজন বলতো গাছটার বয়স কমপক্ষে দেড়শ বছর। পাতা এত ঘন ছিল যে নিচ থেকে তাকালে উপরে আকাশ দেখা যেত না। মেইন গেইট থেকে বাঁধানো রাস্তা এসে গাছটাকে পাশ কাটিয়ে সোজা চলে গেছিল। সামনে এগিয়ে রাস্তার দু-পাশে মুখোমুখি দুটো তিন তালা কংক্রিটের বিল্ডিং ছিল। প্রচুর জানালাওয়ালা এই বিশাল বাড়িগুলো দেখলে মনে হত কোন জেলখানাকে বদলে অ্যাপার্টমেন্ট বানানো হয়েছে। অথবা হয়তো কোন অ্যাপার্টমেন্টকে জেলখানা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যদিও কোন নোংরা কিংবা খারাপ কিছু ছিল না। জানালাগুলো দিয়ে রেডিওর শব্দ ভেসে আসতো। সবগুলো জানালাতেই একইরকম ক্রিম রঙের পর্দা ছিল যাতে রোদে রঙ চটে না যায়।

ডরমেটরি বিল্ডিং দুটোর পর রাস্তাটা গিয়ে শেষ হয়েছিল একটা দোতলা কমন বিল্ডিঙে। একতলায় ছিল ডাইনিং হল আর গোসলখানা। দোতলায় ছিল অডিটোরিয়াম, মিটিং হল আর গেস্টরুম, যেটার কোন ব্যবহার আমি কোনদিন দেখিনি। কমন বিল্ডিঙের পাশে তৃতীয় আরেকটা ডরম, একইরকম তিনতলা বিল্ডিং। বিশাল সবুজ উঠোনগুলোতে স্পিঙ্কলারগুলো যখন পানি ছিটাত তখন মনে হত সূর্যের আলো আটকা পড়ছে। কমন বিল্ডিঙের পেছনে ফুটবল আর বেসবল খেলার মাঠ ছিল। সেই সাথে ছিল ছয়টা টেনিস কোর্ট। সোজা ভাষায় যা যা দরকার সবই ছিল ডরমেটরিতে।

ডরমের একমাত্র সমস্যা ছিল রাজনীতি। ডরমেটরিটা চালাত সন্দেহজনক একটা ফাউন্ডেশন, যার মধ্যমণি ছিলেন চরম ডানপন্থি এক ব্যক্তি। যেভাবে তারা ডরমেটরি চালাত তাতে আমার মনে হত কোথাও বিশাল কোন ঘাপলা আছে। ডরমের নিয়ম-কানুন দেখলে বা ছাত্রদের মধ্যে বিলানো লিফলেট দেখলে এসব পরিস্কার বোঝা যেত। তাদের দাবি অনুযায়ি ডরমেটরি স্থাপনের 'মূল লক্ষ্য' ছিল 'শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রতিপালন করে দেশের প্রয়োজনে গড়ে তোলা।' আর যেসব উদ্যোক্তা এই 'মূল লক্ষ্য' বিশ্বাস করেন তারা এই ডরমেটরি গড়ে তুলতে ফান্ড দিয়েছিলেন। পুরোটাই ছিল লোক দেখানো ধাপ্পাবাজি। আসল কারন অবশ্য কেউই জানতো না। কেউ বলতো ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার ধান্দা, কেউ বলতো মানুষের সামনে উদ্যোক্তাদের দেশদরদী সাজার ধান্দা, আবার কেউ বলতো শহরের মধ্যে এরকম একটা চমৎকার সরকারি জায়গা দখল করার মতলব। কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট ছিল, এই ডরমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসতো অভিজাত শ্রেণির ছাত্রদের একটা সুবিধাভোগি গ্রুপ ছিল। তারা 'স্টাডি গ্রুপ'-এর নামে প্রতি মাসেই কিছু মিটিং-ফিটিং করত যেখানে ডরমেটরির উদ্যোক্তাদেরও দেখা যেত। স্টাডি গ্রুপের সদস্যদের পাশ করার সাথে সাথেই ভালো চাকরি হয়ে যেত। আমার কোন ধারনা ছিল না এইসব কাহিনীর কোনটা কতটুকু সত্যি, কিন্তু সবাই অন্তত এইটুকু নিশ্চিত ছিল যে ডরমেটরিতে সন্দেহজনক কিছু একটা অবশ্যই আছে।

যাহোক, আমি সেই সন্দেহজনক ডরমেটরিতে দুই বছর ছিলাম। ১৯৬৮-এর বসন্ত থেকে ১৯৭০-এর বসন্ত পর্যন্ত। এতকিছু বলার পরেও ডরমেটরি আসলে ডানপন্থি ছিল নাকি বামপন্থি ছিল নাকি অন্যকিছু ছিল তাতে আমার দৈনন্দিন জীবনে আসলে কিছু এসে যেত না।

লাল সূর্যওয়ালা পতাকা উত্তোলন দিয়ে প্রতিদিন সব শুরু হত। আর সাথে অবশ্যই জাতীয় সঙ্গিত। একটা ছাড়া আরেকটা সম্ভব নয় সবাই জানে। পতাকা দন্ডটা ডরমেটরি কমপ্লেক্সের একদম মাঝে ছিল। তিনটা বিল্ডিং থেকেই সেটা

পরিস্কার দেখা যেত।

উত্তর ডরমেটরির (আমার ডরমেটরি বিল্ডিং যেটা) যিনি প্রধান, তার উপর দায়িত্ব ছিল পতাকার। তিনি ছিলেন বেশ লম্বা, বয়স হবে পঞ্চাশের শেষ অথবা ষাটের প্রথম দিকে। আর ছিল ঈগলের মত চোখ। এবড়ো খেবড়ো ধূসর চুল, রোদে পুড়ে যাওয়া ঘাড়ে লম্বা একটা ক্ষত চিহ্ন। সবাই বলাবলি করত তিনি নাকি যুদ্ধকালীন 'নাকানো স্পাই স্কুল'-এর গ্র্যাজুয়েট ছিলেন, যদিও কেউ নিশ্চিত ছিল না। তার পাশে তার অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে দাঁড়ানো থাকতো এখানের এক ছাত্র । ছেলেটা সবসময় নেভি ব্লু ইউনিফর্ম পড়তো, আর তার চুল ছিল কারো দেখা দুনিয়ার সবচেয়ে ছোট ক্রুকাট। আমি ছেলেটার নাম জানতাম না, কোন রুমে থাকতো সেটাও জানতামনা। তাকে কখনও ডাইনিং হল বা গোসলখানায়ও দেখিনি। এমনকি সে আসলেও ছাত্র কিনা সেটাও বলা মুশকিল। তার সবসময়ের পোশাকের কারনে সবাই তার ডাকনাম দিল 'ইউনিফর্ম।' স্যর নাকানোর তুলনায় তার অ্যাসিস্টেন্ট তেলতেলা মুখ ওয়ালা ছোটখাট গাট্টা-গোট্টা টাইপের ছিল। এই অদ্ভুত মানিকজোড় প্রতিদিন ভোর ছয়টায় একসাথে পতাকা উত্তোলন করত।

ডরমে আসার পর প্রথম প্রথম ভোরে উঠে পতাকা উত্তোলন দেখতাম। রেডিওতে ছয়টা বাজার সাথে সাথেই মানিকজোড় হাজির হত। পরনে থাকতো তার ইউনিফর্ম আর চামড়ার কালো জুতো। নাকানো পরত খাটো জ্যাকেট আর সাদা ট্রেইনিং সু। ইউনিফর্মের হাতে থাকতো পলনিয়া উডের একটা বাক্স, অন্যদিকে নাকানো বহন করত একটা সনি ক্যাসেট প্লেয়ার। পতাকা দন্ডের কাছে গিয়ে ইউনিফর্ম বাক্স খুলে সুন্দর করে ভাঁজ করা পতাকাটা বের করে নাকানোর হাতে তুলে দিত। নাকানো পতাকা দন্ডের দড়িতে সাদা মাঠে লাল উদীয়মান সূর্যওয়ালা পতাকা বেঁধে দেবার পর পর ইউনিফর্ম ক্যাসেট প্লেয়ারে জাতীয় সঙ্গিত চালিয়ে দিত।

"আমাদের রাজার জয় হোক..."

আর পতাকা উপরে উঠতে থাকতো।

"যতক্ষণ না নুড়িগুলো শক্ত পাথরে পরিণত হয়..."

পতাকা ততক্ষনে দন্ডের অর্ধেক পৌঁছে গেছে।

"আর শ্যাওলায় ঢেকে যাক..."

পতাকা একদম চুড়ায় পৌঁছে গেলে তারা দু-জন সটান দাঁড়িয়ে পতাকার দিকে তাকিয়ে থাকতো। পরিস্কার আবহাওয়ার দিনগুলোতে এটা মোটামুটি কমন দৃশ্য ছিল।

সন্ধ্যায় পতাকা নামানো একই রকমের আনুষ্ঠানিকতায় সম্পন্ন হত, খালি বিপরীত দিকে। পতাকা নামানোর পর ভাঁজ করে বাক্সে রাখা হত। রাতের বেলা পতাকা উড়ত না।

আমি বুঝতে পারতাম না রাতে পতাকা উড়লে সমস্যাটা কোথায়। পুরো দেশ তো রাতে ঠিকই কাজ করে যাচ্ছে। অনেকেই সারারাত ধরে কাজ করে– রাস্তা তৈরির শ্রমিক, ট্যাক্সি ড্রাইভার, বার হোস্টেসরা, দমকল বাহিনী, কিংবা চৌকিদাররা। আমার কাছে এটা অন্যায্য মনে হত, এই সব মানুষেরা পতাকার বাইরে। হয়তো এর কোন মানেই ছিল না, স্রেফ করার জন্য করা। হয়ত কেউ ব্যাপারটাকে পাত্তাই দিত না, আমি ছাড়া। অবশ্য আমিও যে পাত্তা দিতাম তাও না, স্রেফ মাথায় আসতো প্রশ্নটা, এই আর কি।

রুম বন্টনের নিয়ম ছিল এমন–প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা এক রুমে দু-জন করে থাকবে। আর শেষ বর্ষের বা সিনিয়র ছাত্ররা সিঙ্গেল রুম পাবে। ডাবল রুমগুলো একটু লম্বাটে ছিল, নয় ফুট বাই বার ফুটের। সাথে দরজার বিপরীতে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের একটা জানালা আর জানালার সাথে পাশাপাশি দুটো পড়ার টেবিল। দরজার বামদিকে একটা স্টিলের দোতলা খাট। ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র খুবই সাধারণ। এক জোড়া লকার, একটা ছোট কফি টেবিল আর দেয়ালের সাথে লাগানো শেল্‌ফ। সবচেয়ে পরিপাটি পর্যবেক্ষকের কাছেও এই অবস্থাকে কোনভাবে কাব্যিক বলা মুশকিল। বেশিরভাগ রুমগুলোতে শেল্‌ফে তাকালে পাওয়া যেত ট্রাঞ্জিস্টার রেডিও, হেয়ার ড্রাইয়ার, পানির ইলেকট্রিক জার, চুলা, ইনস্ট্যান্ট কফি, টি-ব্যাগ, চিনি, ইনস্ট্যান্ট রামেন নুডুলস তৈরির পাত্র। দেয়ালগুলো বিভিন্ন ম্যাগাজিন আর পর্নো সিনেমার পোস্টারে ঢাকা। একজন তার দেয়ালে এমন একটা ছবি লাগিয়েছিল, যেখানে একটা আলু আর একটা শূকর সঙ্গম করছে। ওটা বাদে মোটামুটি সব দেয়ালে নগ্ন নারীদেহ আর পপ গায়িকা কিংবা নায়িকাদের ছবিতে ঢাকা ছিল। টেবিলের বুক শেল্‌ফে থাকতো পড়ার বই, ডিকশনারি আর গল্পের বই।

এই সব পুরুষভর্তি রুমগুলো থেকে যে গন্ধ আসতো তা ছিল ভয়াবহ। ময়লার ঝুড়িতে পচতে থাকা কমলার খোসায় বোঝাই হয়ে আছে। খালি ক্যানগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ছাইদানি হিসেবে, সিগারেটের অবশিষ্ট দিয়ে ভর্তি। এসবের সাথে কফি বা বিয়ারের অবশিষ্ট মিশে টক টক একটা দুর্গন্ধ বের হত। তাকের উপর থেকে ঝুল কালি ঝুলে ঝুলে বাসন কোসনে পড়তো, মেঝেগুলোতে রামেন নুডুলসের খালি প্যাকেট আর বিয়ারের খালি ক্যান পড়ে থাকতো। কারো মাথায় কখনও আসেনি, এগুলোকে ঝাড়ু দিয়ে নিয়ে ময়লার ঝুড়িতে ফেলা উচিত। আর জোরে বাতাস বইলে তো ঘর ধুলোর মেঘে ডুবে

যেত। প্রত্যেক রুমের নিজস্ব দুর্গন্ধ ছিল, কিন্তু দুর্গন্ধের উপাদান মোটামুটি সবার একই ছিল। ঘামের গন্ধ আর ময়লা আবর্জনা। নোংরা জামাকাপড়গুলো বিছানার নিচে স্তূপ করে রাখা হত। ম্যাট্রেসগুলো মাঝে মধ্যে যে ঝাড়া দেয়া প্রয়োজন সেটাও কেউ কোনদিন চিন্তা করেনি। তার উপর ম্যাট্রেসগুলো থেকে যে ঘামের গন্ধ বের হত তা বলার বাইরে। এই আস্তাকুড়গুলো থেকে কখনো কোন মহামারি কেন যে শুরু হয়নি সেটাই বরং গবেষণার বিষয়।

অন্যদিকে আমার রুম ছিল হাসপাতালের মর্গের মত পরিস্কার। মেঝে বা জানালায় কোন ময়লা নেই। ম্যাট্রেসগুলো প্রতি সপ্তাহে একবার রোদে দেয়া হয়। পেন্সিলগুলো সব কলমদানিতে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা। এমনকি পর্দা পর্যন্ত মাসে একবার ধোঁয়া হত। কারন আর কিছুই না, আমার রুমমেটের শুচিবায়ু ছিল। ডরমের অন্যদেরকে যখন আমি পর্দা ধোঁয়ার কথা বলেছি কেউ বিশ্বাসই করেনি। তারা ভাবতেই পারেনি যে পর্দা কখনো ধোঁয়া উচিত অথবা ধোঁয়া সম্ভব। তারা প্রায় সবাই বিশ্বাস করত যে পর্দা জানালার অবিচ্ছেদ্দ একটা অংশ। "এই ছেলের কোন সমস্যা আছে।" তারা বলতো। তারা তাকে নাৎসি কিংবা স্টর্ম ট্রুপার নাম দিয়েছিল।

আমাদের দেয়ালে কোন ছবি ছিল না, তাই আমরা আমস্টারডাম ক্যানালে একটা ছবি ঝুলিয়েছিলাম। আমি তাও একবার একটা নগ্ন নারীর ছবি লাগিয়েছিলাম কিন্তু স্টর্ম ট্রুপার সেটা নামিয়ে ফেলে। সে বলেছিল, "এই সব ছবি নিয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই ওয়াতানাবে।" সুতরাং আমরা শুধু আমস্টারডাম ক্যানালের ছবিতেই রয়ে গেলাম। নগ্ন নারীর ছবি নিয়ে আমার নিজেরও তেমন কোন মাথাব্যথা ছিল না তাই ঝামেলা করিনি।

যখন কেউ কোন কাজে আমাদের রুমে আসতো আর আমস্টারডাম ক্যানালের ছবিটা দেখত, "এইটা আবার কী?!" ছিল মোটামুটি সবার কমন প্রশ্ন।

"ও, ঐটা? স্টর্ম ট্রুপার ঐটা দেখে মাস্টারবেট করে," আমি বলতাম।

ফাজলামি করে বলতাম, কিন্তু সবাই ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলেছিল। পরে একসময় আমি নিজেও বিশ্বাস করা শুরু করেছিলাম।

স্টর্ম ট্রুপার আমার রুমমেট জানার পর সবাই আমাকে সহানুভূতির সাথে দেখত, কিন্তু আমি আসলে মোটেও দুঃখিত ছিলাম না। সে আমাকে বিরক্ত করত না যদি আমি নিজের জিনিসপত্র পরিস্কার রাখতাম। বরং ওকে রুমমেট পাওয়ায় অনেক কিছু অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। সে নিজের সব পরিস্কার করত, ম্যাট্রেস রোদে দিত, ময়লা ফেলে দিয়ে আসতো। মাঝে মধ্যে ব্যস্ততার জন্য গোসল করতে ভুলে গেলে সে নিজ দায়িত্বে আমাকে গোসলের কথা মনে করিয়ে

দিত। সে এমন কি আমাকে মনে করিয়ে দিত, আমার নাপিতের কাছে গিয়ে নাকের লোম ছেঁটে আসার সময় হয়েছে। যে জিনিসটা আমার বিরক্ত লাগত সেটা হল, ঘরের মধ্যে যদি সে একটা পোকাও দেখত স্প্রে করে ভাসিয়ে ফেলত। আমাকে বাধ্য হয়ে অন্যদের আস্তাকুরে ঘুমাতে যেতে হত।

একটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টর্ম ট্রুপার ভূগোলে পড়াশুনা করছিল।

প্রথম যেদিন আমাদের দেখা হয় আমাকে বলেছিল, " আমি মা-মা-মানচিত্র নিয়ে পড়ছি।"

"তোমার মানচিত্র পছন্দ?" জিজ্ঞেস করেছিলাম তাকে।

"হ্যাঁ, যখন পাশ করে বের হবো তখন আমি ভূমি জরিপ অধিদপ্তরে চাকরি নিব আর মা-মা–মানচিত্র নিয়ে কাজ করবো।"

মানুষের জীবনে কত রকম স্বপ্ন থাকতে পারে ভেবে আমি অবাক হয়েছিলাম। টোকিওতে প্রথম প্রথম এসে এসব শুনে অবাক হতাম। আমার মাথায় কাজ করল, সমাজে কিছু এমন মানুষের দরকার আছে যাদের স্বপ্ন হল মানচিত্র বানানো। তার ওপর তাদের মধ্যে একজন আবার এমন যে ভূমি জরিপ অধিদপ্তরে কাজ করতে চায় কিন্তু মানচিত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রতিবার তোতলায়। স্টর্ম ট্রুপার সব সময় তোতলাতো না, কিন্তু মানচিত্র উচ্চারণ করতে গেলে শতভাগ নিশ্চয়তা ছিল যে সে তোতলাবেই।

"তু-তুমি কি পড়ছো?" আমাকে জিজ্ঞেস করল সে।

"নাটক," বললাম তাকে।

"নাটক করো?"

"নাহ, পাণ্ডুলিপি পড়ি আর গবেষণা করি। রেসিন, ইয়ুনেস্কো, শেক্সপিয়ার, এসব আরকি।"

সে জানালো, শেইক্সপিয়ারের নাম শুনলেও বাকিদের নাম শোনেনি। আমি নিজেও বাকিদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানতাম না, লেকচার শিটে নাম দেখেছি শুধু।

"তুমি নাটক পছন্দ করো?" জিজ্ঞেস করল সে।

"তেমন একটা না," বললাম আমি।

আমার উত্তর শুনে বিভ্রান্ত হয়ে গেল সে, সেই সাথে তোতলামি আরও বেড়ে গেল। আমার দুঃখ হতে লাগল এজন্যে।

"আমি যে কোন কিছু নিয়েই পড়াশোনা করতে পারতাম," বললাম তাকে। "জাতিতত্ত্ব, এশিয়ার ইতিহাস। নেয়ার জন্য নেয়া তাই নাটক নিয়ে ফেললাম, এই আর কি।" এর চেয়ে ভালো কোন অজুহাত তখন মাথায় আসছিল না।

"বুঝলাম না," সে বলল, তার চেহারা দেখেও বোঝা যাচ্ছিল সে বোঝেনি। "আমার মা-মা-মানচিত্র পছন্দ, তাই আমি টোকিও'তে এসেছি আর বাবা-মায়ের পা-পাঠানো টাকা দিয়ে মা-মা-মানচিত্র নিয়ে পড়ছি। কিন্তু তুমি?"

তার প্রশ্নর মধ্যে যুক্তি আছে। আমি উত্তর দেয়ার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিলাম। ম্যাচ দিয়ে আমরা লটারি করলাম কে কোন বাঙ্কে শুবে। ও পেল উপরের খাট, আমি নিচেরটা।

স্টর্ম ট্রুপার ছিল লম্বা, ক্রুকাট চুল, উঁচু চাপার হাড়ওয়ালা। সে সবসময় একই জামা কাপড় পরত সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট, কালো জুতো, নেভি ব্লু সোয়েটার। ক্লাসে যাওয়ার সময় এরসাথে আরও যুক্ত হত ইউনিফর্ম জ্যাকেট আর কালো ব্রিফকেস। একজন সাধারণ ডানপন্থি ছাত্রের বেশভূষা। সেকারনেই সবাই তাকে স্টর্ম ট্রুপার ডাকত। যদিও সে রাজনীতি থেকে একশ হাত দূরে থাকতো। ইউনিফর্ম পরত কারন তাহলে কবে কি জামাকাপড় পরবে সেই ঝামেলা পোহাতে হত না। তার যাবতিয় আগ্রহ ছিল উপকূলের ভৌগলিক পরিবর্তন কিংবা নতুন রেললাইন বসানোর উপর। আর কোন কিছু তাকে টানত না। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এসব নিয়ে অনর্গল কথা বলে যেতে পারত, যতক্ষণ না শ্রোতা কোথাও পালিয়ে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে।

সে প্রতিদিন ভোর ছয়টায় 'আমাদের রাজার জয় হোক-'এর সাথে ঘুম থেকে উঠত। তার জন্য অন্তত পতাকা উত্তোলন কর্মসূচি কারো কাজে লাগত। জামাকাপড় পরে, বাথরুম সেরে, ঘন্টাখানেক ধরে মুখ ধৌতকরণ চলত। আমার মাঝে মধ্যে মনে হত সে হয়ত প্রতিটা দাঁত একটা একটা করে বের করে পরিস্কার করত। রুমে ফিরে গামছা রেডিয়েটররের উপর শুকাতে দিয়ে, ব্রাশ আর সাবান শেলফে গুছিয়ে রাখত। তারপর শুরু হত রেডিও চালিয়ে বিখ্যাত ব্যায়াম করা।

আমি পড়াশোনা করে রাতে দেরিতে ঘুমাতে যেতাম, তাই সকালে আটটার আগে উঠতে পারতাম না। সে যখন ব্যায়াম শুরু করত আমি তখন বেহুঁশ। অন্তত যতক্ষণ না লাফালাফি শুরু হত। সে তার লাফালাফি অনেক সিরিয়াসলি নিয়েছিল, আর এমন সব লাফ দিত যে, খাট পর্যন্ত কেঁপে উঠত। আমি তিনদিন পর্যন্ত কোনরকম সহ্য করলাম, কারন একজনের সাথে বসবাস করলে অন্তত তিনদিনের সম্পর্ক না হলে তাকে ঝাড়ি দেয়া মুশকিল। চতুর্থ দিন আর হজম করতে পারলাম না।

"ওই মিয়া, তুমি কি এই লাফালাফি ছাদে বা অন্য কোথাও গিয়ে করতে পারো না?" বললাম তাকে। "আমি ঘুমাতে পারছি না।"

"কিন্তু এখন তো সাড়ে ছয়টা বেজে গেছে!" হাঁ করে বলল সে।

"হু, আমি জানি এখন সাড়ে ছয়টা বাজে। সেজন্যই আমার আরো ঘুমানো দরকার। জানি না কিভাবে বোঝাবো কিন্তু আমার ব্যাপারটা এরকমই।"

"কিন্তু আমি ছাদে লাফালাফি করতে পারবো না তো, তিনতলা থেকে কমপ্লেইন দিবে। এখানে আমাদের নিচে স্টোর রুম তাই সুবিধা।"

"তাহলে বাইরে যাও, মাঠে গিয়ে লাফাও।'

"সেটাও সম্ভব না, আমার ট্রাঞ্জিস্টর রেডিও নেই। ইলেক্ট্রিসিটি লাগে চালাতে। আর রেডিও ছাড়া ব্যায়াম করা যায় না।"

আসলেই তার রেডিওটা ছিল আদ্দিকালের মডেল, ব্যাটারি ছাড়া। আমারটা পোর্টেবল রেডিও ছিল, শুধু এফএম চলত ওটায়।

"ঠিক আছে, আসো সমঝতা করি। ব্যায়াম করো সমস্যা নাই, লাফালাফির অংশটা বাদ দাও। ঐটা অনেক শব্দ করে। ঠিক আছে?"

"লা-লাফালাফি মানে?"

"লাফালাফি মানে লাফালাফি। উপরে নিচে লাফালাফি।"

"কই, কোন লাফালাফি তো করছি না।"

আমার ততক্ষণে মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেছে। কথা বাড়াতে চাচ্ছিলাম না আর কিন্তু কথা শেষ করা দরকার। আমি খাট থেকে নেমে গিয়ে লাফালাফি করে দেখালাম। "এই যে, এটা হল লাফালাফি," বললাম তাকে।

"ও আচ্ছা, এটা। তুমি ঠিকই বলেছো। আমি খেয়াল করিনি কখনও।"

"এখন খেয়াল করেছো তো?" আমি বিছানায় বসতে বসতে বললাম। "ওই অংশটা বাদ দাও। বাকিটা থাকলে সমস্যা নাই। লাফালাফি বন্ধ করো, আমাকে ঘুমাতে দাও।"

"কিন্তু সেটা তো অসম্ভব," সিরিয়াস মুখ করে বলল সে। "আমি এখন চাইলেও কিছু বাদ দিতে পারবো না। এই পুরো ব্যাপারটা করছি গত দশ বছর ধরে। একবার শুরু করলে কোন কিছু চিন্তা না করে পুরোটা শেষ করি। এখন যদি আমি কিছু বাদ দেই তাহলে কিছুই করতে পারবো না।"

আমার আর বলার মত কিছু ছিল না। আর কীই বা বলতে পারতাম আমি? সবচেয়ে সহজ উপায় যেটা ছিল সেটা হল তার বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা তারপর রেডিওটা তুলে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়া। কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল না। দুনিয়া ভেঙে পড়তো। স্টর্ম ট্রুপার তার সব জিনিস যক্ষের মত আগলে রাখত। আমি কথা হারিয়ে যখন বিছানায় হাঁ করে বসে আছি তখন তার মনে হয় একটু দয়া হল। সে হেসে বলল, "আরে, ওয়াতানাবে, উঠে পড়ো না কেন? আসো একসাথে ব্যায়াম করি?"

ব্যায়াম শেষে সে গেল নাস্তা করতে। আমি নাওকোকে স্টর্ম ট্রুপার আর তার রেডিওর সাথে ব্যায়ামের কাহিনী শোনাতেই সে খুব হাসল। ওকে খুশি করার জন্য কাহিনী বলতে যাইনি কিন্তু আমি নিজেই হাসি থামাতে পারছিলাম না। যদিও ওর হাসি অল্পক্ষণেই শেষ, কিন্তু অনেকদিন পর হাসতে দেখে ভালো লাগল।

আমরা ইয়তসুয়াতে ট্রেন ছেড়ে দিয়ে স্টেশনের পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম। সেদিন ছিল মে মাসের মাঝামাঝি এক রবিবারের বিকেল। সকাল থেকে থেকে অল্প সল্প বৃষ্টি হয়েছিল, দুপুরের পরে আর হয়নি। সেই সাথে দখিনা বাতাস নিচু মেঘগুলোকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। চেরি গাছের চকচকে সবুজ পাতাগুলো হালকা বাতাসে নড়ছিল আর সূর্যালোক পাতায় পড়ে চতুর্দিকে ছিটকে যাচ্ছিল। গ্রীষ্মের শুরু। আমরা যেসব লোকজনকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলাম, তারা তাদের সোয়েটার কিংবা জ্যাকেট কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল অথবা হাতে করে হাঁটছিল। রবিবারের উষ্ণ বিকেলে সবাইকে খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। টেনিস কোর্টে যেসব যুবক খেলছিল তারা সবাই শর্ট প্যান্ট পরা। শুধুমাত্র দু-জন নান তখনও তাদের শীতের পোশাক পরে ছায়ার মধ্যে বেঞ্চে বসে গল্প করছিল। তাদেরকেও সুখি দেখাচ্ছিল।

মিনিট পনের হেঁটেই ঘেমে গিয়েছিলাম তাই মোটা সুতির শার্টটা খুলে শুধু টিশার্ট পরে ছিলাম। নাওকো ওর হালকা ছাই রঙা সোয়েট শার্টটা কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নিল। শার্টটা সুন্দর কিন্তু অনেকবার লন্ড্রি করার কারনে রঙ খানিকটা ফিকে হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছিল ওকে এই শার্টে আগেও দেখেছি। স্রেফ একটা অনুভূতি, পরিস্কার কোন স্মৃতি নয়। নাওকোকে নিয়ে তখন আমার তেমন কোন স্মৃতি ছিল না।

"ডরমে থাকতে কেমন লাগছে তোমার?" জিজ্ঞেস করল সে। "এতগুলো মানুষের সাথে একসাথে থাকতে অনেক মজা না অনেক?"

"এখনও জানি না। মাত্র তো একমাস হল। খারাপ না। মনে হয় চালিয়ে নিতে পারবো।"

একটা বেসিনের কাছে দাঁড়িয়ে এক চুমুক পানি খেল সে। মুখে একটু পানি ছিটিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে নিল। তারপর একটু বেঁকে শক্ত করে বাঁধল জুতার ফিতে।

"তোমার কি মনে হয় আমি থাকতে পারতাম?"

"কি? ডরমেটরিতে?"

"হুম।"

"আমার মনে হয় এটা নির্ভর করে তুমি কিভাবে দেখছো। তুমি চাইলে অনেক কিছুতেই বিরক্ত হতে পারো। ডরমের নিয়ম, বজ্জাত পোলাপান যারা নিজেদেরকে অনেক চাল্লু ভাবে, রুমমেট যে ভোরবেলায় উঠে ব্যায়াম করে। কিন্তু যদি তুমি চিন্তা করো, সবজায়গাই কম বেশি এরকম, তাহলে কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।"

"আমারও তাই মনে হয়," মাথা ঝাঁকিয়ে ও বলল। ওকে দেখে মনে হল কিছু একটা নিয়ে ভাবছে। আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন অদ্ভুত কিছু একটা দেখছে। ওর চোখ এত গভীর আর স্পষ্ট যে তাকাতে দেখে আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। আগে কখনও ওর চোখের দিকে এভাবে খেয়াল করিনি। সেবারই প্রথম আমরা একসাথে এরকম হাঁটতে বের হয়েছি বা এত কথা বলেছি।

"তুমি কি ডরমে ভর্তি হওয়ার কথা ভাবছো নাকি?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"নাহ," বলল সে। "আমি খালি কল্পনা করছিলাম ডরমের জীবন কেমন হতে পারে। আর..." মনে হল সঠিক শব্দটা খুঁজে পাচ্ছে না। "জানি না। থাকো, বাদ দাও।"

কথাবার্তার সেখানেই ইতি। উত্তর দিকে হাঁটতে থাকল সে। আমি তার পেছন পেছন যেতে থাকলাম।

সেদিনের পর প্রায় একবছর হয়ে গেছে নাওকোর সাথে দেখা হয়নি। আর এই এক বছরে সে এত ওজন হারিয়েছিল যে মনে হচ্ছিল অন্য কোন মানুষ। তার ফোলা গাল পুরোপুরি অদৃশ্য। কাঁধ শুকিয়ে সোজা হয়ে গেছিল। এমন না যে তাকে অসুস্থ বা হাড়গিলে টাইপ লাগছিল। এই শুকোনোর পর একদম স্বাভাবিক মানুষ লাগছিল। আর আগের চেয়ে অনেক সুন্দরও। সেটা আমি তাকে বলতেও চেয়েছিলাম কিন্তু উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাইনি।

আমাদের দেখা করার কোন প্ল্যান ছিল না। সুও কম্যুটার লাইনে হঠাৎ করেই দেখা হয়ে গেল। সে একা একা একটা মুভি দেখতে যাচ্ছিল, আর আমি কান্ডাতে একটা বইয়ের দোকানে যাচ্ছিলাম। কারোরটাই জরুরি কিছু ছিল না। সে বুদ্ধি দিল, নেমে পড়ার জন্য। ইউটসুয়াতে আমরা যেমন করেছিলাম। যা ভাবা তাই কাজ। পুরনো দূর্গের পাশের রাস্তা দিয়ে আমরা একাকি হাঁটতে লাগলাম। আমি বুঝতে পারলাম না কেন নাওকো ট্রেন থেকে নেমে যেতে চাইলো, কারন আমাদের কথা বলার মত কিছু ছিল না। রাস্তায় উঠেই নাওকো জোরে জোরে হাঁটতে লাগলো। একটু দূরত্ব রেখে তার পিছে পিছে যেতে লাগলাম আমি। একসাথে হাঁটতে পারতাম কিন্তু মনের ভেতর কিছু একটা আমাকে বিরত রেখেছিল। আমি পেছন থেকে ওর কাঁধ আর লম্বা কালো চুলের উপর নজর

রাখছিলাম। সে একটা বড় বাদামি ব্যারেট পরেছিল আর যখন মাথা ঘোরাচ্ছিল তখন ওর ছোট্ট সাদা কান দেখতে পাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে সে ঘুরে কিছু একটা বলছিল। কখনও উত্তর দিচ্ছিলাম, কখনও বা উত্তর দেয়ার মত কিছু পাচ্ছিলাম না। বাকি সময় শুনতেই পাইনি সে কী বলল। তাতে অবশ্য তার কিছু আসে যাচ্ছিল না মনে হয়। যখনই বলা শেষ অমনি সামনে ঘুরে হাঁটছিল। আমি নিজেকেই নিজে শোনালাম, "বাহ! হাঁটাহাঁটি করার জন্য কি চমৎকার একটা দিন।"

কিন্তু নাওকোর হাঁটা দেখে মনে হচ্ছিল না, এটা কোন সাধারণ হাঁটাহাঁটি। সে ইয়াদাবাসি থেকে ডানে মোড় নিয়ে মোট এ উঠল, জিনবুসো'র ক্রসিং পার হল, অসানোমিযুতে পাহাড়ে উঠল, হঙ্গো'তে গিয়ে নামল। তারপর ট্রলির লাইন ধরে কমাগোমে'তে গিয়ে পৌছল। আমরা যখন কমাগোমেতে পৌছলাম তখন সূর্য প্রায় ডুবে গেছে। আকাশ জুড়ে নেমেছে বসন্তের নরম সন্ধ্যা।

"কোথায় আমরা?" তখন যেন নাওকোর খেয়াল হল চারপাশ নিয়ে।

"কমাগোমে," বললাম তাকে। "খেয়াল করোনি? আমরা বিশাল এক চক্কর দিয়ে ফেলেছি।"

"আমরা এখানে কেন আসলাম?"

"তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছো। আমি শুধু তোমার পিছু পিছু এসেছি।"

স্টেশনের এক দোকানে আমরা গিয়ে বসলাম নুডুলস খেতে। এমন পিপাসা পেয়েছিল, আমি একা এক মগ বিয়ার ঢকঢক করে গলায় ঢাললাম। খাবারের অর্ডার থেকে শুরু করে খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউ কোন কথা বলিনি। আমি হাঁটতে হাঁটতে হাঁপিয়ে গেছিলাম। আর ও টেবিলের উপর হাত রেখে আবারও কিছু নিয়ে চিন্তিত ছিল। টিভিতে বলছিল ঘোরাফেরার সব জায়গাগুলোতে ভিড় কেমন বেড়েছে। আর আমরা কিনা ইয়ুতসুয়া থেকে কমাগোমেতে হেঁটে হেঁটে চলে এলাম, মনে মনে ভাবছিলাম আমি।

"তোমার স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়েছে," নুডুলস শেষ করে বললাম তাকে।

"অবাক হয়েছো?"

"একদম।"

"তুমি বোধহয় জানো না, জুনিওর হাই-স্কুলে থাকতে আমি লং ডিস্টেন্স রানার ছিলাম। দশ-পনের কিলোমিটার দৌড়াতাম। আর বাবা রবিবার দিন আমাকে মাউন্টেইন ক্লাইম্বিঙ্গে নিয়ে যেতেন। তুমি তো আমাদের বাড়ি চিনতে, পাশেই পাহাড়-পর্বত। আমার পা তাই বেশ মজবুত।"

"দেখে কিন্তু মনে হয় না," বললাম তাকে।

"জানি," উত্তর দিল সে। "সবাই মনে করে আমি ছোট্ট, নরম ধরণের একটা মেয়ে। কিন্তু বইয়ের মোড়ক দেখে কি কখনো বইয়ের ভেতরটা কি রকম হবে বোঝা যায়?" একটু হেসে বলল।

"আমারও একই কথা। শেষ আমি।"

"ওহ্, সরি। আমি তোমাকে সারাদিন হাঁটিয়ে মারলাম।"

"নাহ্, আমি খুশি যে, আমাদের কথা বলার একটা সুযোগ অন্তত হল। আগে তো আমরা কখনও এমন করিনি। মানে, শুধু আমরা দু-জন।" আগে কবে কি কথা হয়েছে মনে করতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম।

সে টেবিলের অ্যাস্ট্রেটা নিয়ে খেলছিল। "আমি ভাবছিলাম..." বলল এবার, "তোমার যদি কোন সমস্যা না থাকে...মানে, যদি কোন সমস্যা মনে না হয়...আমরা কি আবার দেখা করতে পারি? আমি জানি তোমাকে এরকম অনুরোধ করার অধিকার আমার নেই।"

"অধিকার? মানে?"

সে আরক্তিম হয়ে গেল। আমার প্রতিক্রিয়াটা বোধ হয় একটু বেশি কঠিন হয়ে গেছে।

"আমি জানি না...আমি আসলে বোঝাতে পারছি না।" শার্টের হাতা আবার কঁনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়ে সে বলল। দোকানের আলোতে ওর হাতগুলো সোনালি দেখাচ্ছিল। "আমি আসলে সেভাবে বলতে চাইনি।"

টেবিলের উপর কঁনুই রেখে সে দেয়ালের ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাল যেন ক্যালেন্ডার তার হয়ে সব বুঝিয়ে বলে দেবে। উত্তর খুঁজে না পেয়ে সে চোখ বন্ধ করে মাথার ব্যারেট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করল।

"ঠিক আছে, ব্যাপার না," আমি বললাম। "মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চেয়েছো। আমি নিজেও সম্ভবত কথায় বোঝাতে পারবো না।"

"আমি যা বলতে চাই কখনো ঠিকমত বলতে পারি না," নাওকো বলল। "অনেকদিন থেকেই এরকম। একটা কথা বলার চেষ্টা করি, অথচ এমন কিছু বলে ফেলি যার মানে গিয়ে দাঁড়ায় পুরোই অন্য কিছু। আবার যদি সেটা ঠিক করতে যাই আরো খারাপ কিছু একটা হয়ে যায়। কী দিয়ে কি শুরু করেছিলাম আমি সব গুলিয়ে ফেলি। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যেন দু-জন 'আমি' ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছে। অন্য আমিটার কাছে সঠিক শব্দগুলো আছে কিন্তু আমি তাকে ছুঁতে পারছি না।" নাওকো মুখ তুলে সরাসরি আমার চোখে তাকাল। "কিছু বুঝতে পারলে?"

"সবারই কমবেশি এরকম মনে হয়," বললাম তাকে। "তারা নিজেদের প্রকাশ করার চেষ্টা করে কিন্তু সঠিক শব্দটা খুঁজে পায় না বলে বিরক্ত হয়।"

নাওকো মনে হল আমার কথা শুনে নিরাশ হয়েছে। "না না, আমি তা বলছি না।" কিন্তু সে আর কিছুই বলল না।

"যাহোক, তোমার সাথে আবার দেখা হয়ে ভালো লাগলো," জানালাম তাকে। "আমি রবিবার সবসময় ফ্রি থাকি। এরকম হাঁটাহাঁটি করলে আমার জন্য ভালোই হবে।"

আমরা ইয়ামানতে'র ট্রেনে চড়লাম তারপর নাওকো চুয়ো লাইন ধরে সিঞ্জুকু চলে গেল। সেখানে কোকুবুঞ্জি'র পশ্চিম শহরতলীতে একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে থাকে সে।

"আচ্ছা বলো তো," যাওয়ার আগে বলল সে, "আমার কথা বলার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখতে পেয়েছো?"

"মনে তো হয়," বললাম তাকে, "আমি ঠিক শিওর না। সত্যি কথা বলতে কি, আগে তোমার সাথে যখন অনেক দেখা হত তখন আসলে তোমাকে তেমন একটা কথা বলতে দেখিনি।"

"হুম, তা সত্যি। যাহোক, তাহলে আমি তোমাকে রবিবার ফোন করবো।"

"আচ্ছা, আমি অপেক্ষায় থাকবো।"

আমি যখন হাই-স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষে তখন নাওকোর সাথে আমার প্রথম দেখা হয়। সেও তখন দ্বিতীয় বর্ষে পড়তো, কিন্তু অন্য আরেকটা স্কুলে। মেয়েদের একটা মার্জিত স্কুল যেটা খ্রিস্টান মিশনারিরা চালাত। এতটাই মার্জিত যে, বেশি পড়াশোনাকে সেখানে অমার্জিত হিসেবে দেখা হত। নাওকো ছিল আমার বেস্ট ফ্রেন্ড (এবং একমাত্র ফ্রেন্ড) কিজুকির গার্লফ্রেন্ড। তারা দু-জন প্রায় জন্ম থেকে একজন আরেকজনের সাথে। তাদের বাড়ির দূরত্বও খুব বেশি নয়।

ছোটবেলা থেকে যাদের প্রেম থাকে তাদের মধ্যে সম্পর্ক একটু অন্যরকম হয়। অন্য প্রেমিক-প্রেমিকাদের মত তারা একা একা ঘুরতে পছন্দ করে না। সব সময় একজন আরেকজনের বাসায় যাচ্ছে-খাচ্ছে, পরিবারের সাথে বসে মাহজং খেলছে। আমি ওদের সাথে কয়েকবার ডাবল-ডেটে গিয়েছিলাম। নাওকো আমার জন্য একেক সময় তার একেকজন ক্লাসমেটকে নিয়ে আসতো আর আমরা চারজন একসাথে কখনো হয়ত চিড়িয়াখানায় যেতাম, কখনো পুল খেলতাম কিংবা হয়তো সিনেমা দেখতাম। সে যেসব মেয়েদেরকে বাছাই করত তারা সবাই সুন্দরি ছিল কিন্তু আমার জন্য তারা ছিল একটু বেশি মার্জিত ধরনের। আমি আমার স্কুলের একটু অভদ্র ধরণের মেয়েদের সাথেই বেশি ভালোভাবে মিশতে পারতাম। নাওকো যাদেরকে নিয়ে আসতো তাদের মাথায় কি ঘুরছে আমি কিছুই ধরতে পারতাম না। তারাও হয়ত আমার কথা কিছুই বুঝতো না।

বাধ্য হয়ে একসময় কিজুকি আমার জন্য বান্ধবি খোঁজায় ক্ষান্ত দিল। তখন থেকে আমরা তিনজন একসাথে ঘুরতে যেতাম। কিজুকি, নাওকো এবং আমি। অস্বাভাবিক শোনালেও আমরা অস্বস্তি বোধ করতাম না। বরং চতুর্থ আরেকজন থাকলেই ঝামেলা মনে হত। অনেকটা টিভি শো'র মত ছিল আমাদের অবস্থা। কিজুকি ছিল মেধাবি উপস্থাপক, নাওকো তার সহকারি। কিজুকি যে কোন কিছুর মধ্যমণি হওয়ার যোগ্য ছিল। ওর টিটকিরি মার্কা কথাবার্তা লোকজন কখনো কখনো অভদ্রতা হিসেবে ধরে নিত, কিন্তু আসলে সে খোলা মনের অধিকারি ছিল। সে আমার আর নাওকোর সাথে কৌতুক বা কথাবার্তা সমান ভাগে বলতো যাতে আমরা কেউ নিজেদের বঞ্চিত মনে না করি। যদি আমাদের কেউ একটু বেশি চুপচাপ থাকতাম তাহলে সে তার পুরো মনোযোগ দিয়ে তাকে দিয়ে কথা বলিয়েই ছাড়তো। যতটা না মনে হচ্ছে তার চেয়ে আসলে ব্যাপারটা অনেক কঠিন। সে প্রতি সেকেন্ডে সবদিকে খেয়াল রাখত। আর পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নিত। ওর মধ্যে আরেকটা ব্যাপার ছিল। ও কিভাবে জানি কারো সাধারণ কথার মধ্যেও কিছু একটা মজার ব্যাপার বের করে ফেলতে পারতো। ওর সাথে কথা হলে আপনার মনে হবে আপনি আসলে খুবই ইন্টারেস্টিং একজন মানুষ, সেটা এতদিন টের পাননি।

এতকিছুর পরেও কিজুকি আসলে এক ফোঁটাও সামাজিক ছিল না। আমি ছিলাম স্কুলে তার একমাত্র এবং আসল বন্ধু। আমার কখনো মাথায় ঢোকেনি যে, ওর মত এরকম চটপটে ছেলে কেন অন্য লোকজনের সাথে না মিশে শুধু আমাদের তিনজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এটাও বুঝতে পারিনি সে কেন আমাকে বন্ধু হিসেবে নিয়েছিল। আমি খুবই সাধারণ একটা ছেলে। গান শুনি, বই পড়ি। কিজুকির মনোযোগ পাওয়ার মত কিছু আমার মধ্যে ছিল না। যাহোক, তবু আমরা খুব ভালোই মিলেছিলাম।

ওর বাবা ছিলেন নামকরা ডেন্টিস্ট। তার দক্ষতা আর পারিশ্রমিক দুটোই অনেক উঁচু ছিল।

"আগামি রবিবার ডাবল ডেট করতে চাও?" আমাদের পরিচয় হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সে বলল। "আমার গার্লফ্রেন্ড গার্লস স্কুলে পড়ে। ও তোমার জন্য কিউট একটা মেয়ে নিয়ে আসতে পারবে।"

"শিওর," আমি বললাম, আর সেভাবেই প্রথম আমার নাওকোর সাথে দেখা হল।

আমরা তিনজন একসাথে অনেক সময় কাটিয়েছি। কিন্তু কখনো যখন কিজুকি রুম থেকে কোন কারনে বাইরে গেছে, আমি আর নাওকো অস্বস্তিতে পড়ে যেতাম, কথা খুঁজে পেতাম না। কি নিয়ে কথা বলা যায় তা আমাদের

মাথায় আসতো না। আমরা হয়ত পানি খেতাম নয়ত খেলনা নাড়াচাড়া করতাম। আর অপেক্ষা করতাম কখন কিজুকি ফিরে এসে আমাদের এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করবে। নাওকো এমনিতেও বেশি কথা বলতো না। আর আমি কথা বলার চেয়ে শুনতে বেশি পছন্দ করি। তাই আমরা দু-জন একসাথে হলে অস্বস্তি হওয়া স্বাভাবিক। এমন না যে, আমরা মিশতে পারছি না, আমরা খালি কথা বলার কিছু পাই না।

কিজুকির মৃত্যুর পর নাওকোর সাথে আমার শুধুমাত্র একবার দেখা হয়েছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দুই সপ্তাহ পর আমরা একটা কফি-শপে দেখা করি। কিছু ছোট খাট ব্যাপার ছিল যেগুলো নিয়ে বলার মত কথা অল্প সময়েই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি চেষ্টা করেছিলাম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলার কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। আর নাওকো যখন কিছু বলছিল ওর স্বর অন্যরকম লাগছিল, যেন রেগে আছে। আমার কোন ধারনা ছিল না ও কেন আমার উপর রেগে থাকবে। এরপর প্রায় একবছর ওর সাথে আমার আর দেখা হয়নি, ঐদিন টোকিওর চুয়ো লাইনে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত।

নাওকো আমার সাথে রাগ হয়ে থাকতে পারে কারন সর্বশেষ যে ব্যক্তিটি কিজুকিকে জীবিত দেখেছে সে হল আমি, সে নয়। এটা হয়ত সেরকম কিছু না কিন্তু কম বেশি আমি বুঝতে পারছিলাম ওর মনের অবস্থা। ওর সাথে আমি অবস্থান বদলাতে পারলে অবশ্যই করতাম কিন্তু যা হয়ে গেছে তা তো হয়েই গেছে, এখন তো আর কিছু করার নেই।

সময়টা ছিল মে মাসের একটা চমৎকার দুপুর। দুপুরের খাওয়ার পর কিজুকি বুদ্ধি দিল ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পুল খেলতে যাওয়ার অথবা অন্য কিছু করার। আমার ক্লাস করার তেমন কোন ইচ্ছে ছিল না তাই আমরা দু-জনেই স্কুল পালালাম। পাহাড় বেয়ে নেমে হারবারের কাছে একটা বিলিয়ার্ড পার্লারে আমরা চার দান খেললাম। প্রথম দান সহজ ছিল, আমি জিতেছিলাম। এরপর ও সিরিয়াস হয়ে গেল আর বাকি তিনটা জিতল। আমাদের নিজেদের নিয়ম অনুযায়ি আমাকে পুরো খরচ দিতে হল। কিজুকি খেলায় একটাও ভুল করল না, যেটা খুবই অস্বাভাবিক ছিল। খেলার পর আমরা ধূমপান করলাম।

"এত সিরিয়াস কেন আজকে?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"আমি আজকে হারতে চাচ্ছিলাম না," তৃপ্তির হাসি দিয়ে কিজুকি বলেছিল।

সেই রাতে কিজুকি তার গ্যারেজে আত্মহত্যা করল। তার এন-৩৬০ গাড়ির একজস্ট পাইপের সাথে রাবারের পাইপ লাগিয়ে জানালা দিয়ে ঢুকিয়ে ইঞ্জিন চালিয়ে দিল। আমার কোন ধারনা নেই ওর মারা যেতে কতক্ষন লেগেছিল। ওর বাবা-মা বাইরে যাচ্ছিলেন অসুস্থ এক আত্মীয়কে দেখতে। গাড়ি বের করার জন্য

গ্যারেজ খুলে দেখলেন কিজুকি মৃত। গাড়ির রেডিও চলছিল। গ্যাস স্টেশনের একটা রিসিপ্ট ওয়াইপারের সাথে লাগান।

কিজুকি কোন সুইসাইড নোট রেখে যায়নি। আত্মহত্যা করার কোন কারণও কেউ ভেবে বের করতে পারেনি। যেহেতু আমি শেষ তাকে জীবিত দেখেছিলাম পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। আমি বলেছিলাম, কিজুকি আত্মহত্যা করতে পারে এরকম কোন ইঙ্গিত আমি পাইনি, সে বরাবর যেরকম ব্যবহার করে সেরকমই ছিল সেদিনও। আমার আর কিজুকির ব্যাপারে পুলিশের বাজে একটা ধারনা হয়েছিল। তাদের ভাবটা এমন ছিল যেন স্কুল ফাঁকি দিয়ে যারা পুল খেলতে যায় তাদের এভাবেই মরা উচিত। পত্রিকায় ছোট একটা খবর হল তারপর চাপা পড়ে গেল বিষয়টা। কিজুকির বাবা-মা তার লাল এন-৩৬০টা সরিয়ে ফেলল। কিছুদিন ওর স্কুলের ডেস্কের উপর রাখা ছিল সাদা ফুল।

আমার গ্র্যাজুয়েশন এবং কিজুকির আত্মহত্যার মধ্যের দশ মাস আমি কোথাও নিজেকে মেলাতে পারছিলাম না। স্কুলের এক মেয়ের সাথে শুতে শুরু করেছিলাম কিন্তু সেটা ছয় মাসের বেশি গড়ায়নি। তার কোন কিছুতেই আমার আগ্রহ জাগাতো না। টোকিওর এমন এক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করলাম যেখানে ভর্তি পরীক্ষায় আমাকে বিশেষ কষ্ট করতে হবে না আর তাই হল। মেয়েটা আমাকে টোকিও যেতে না করেছিল। "টোকিও এখান থেকে পাঁচশ মাইল দূরে!" মিনতি করেছিল সে। কিন্তু আমাকে তখন যে করেই হোক কোবে থেকে বের হতে হবে। আমি তখন এমন কোথাও একটা নতুন জীবন শুরু করতে চাইছিলাম যেখানে সবাই অচেনা।

"তুমি আমার থেকে সব পেয়ে গেছো তাই এখন আমাকে নিয়ে আর একটুও ভাবছো না," কাঁদতে কাঁদতে বলল সে।

"এটা সত্যি না," আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম। "আমি শুধু এই শহর থেকে পালাতে চাই।।" কিন্তু সে আমাকে বোঝার মত মেয়ে ছিল না। সুতরাং আমরা আলাদা হয়ে গেলাম। অন্যসব মেয়েদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল সে, আমি তার সাথে কি খারাপটা করলাম, ভাবতে ভাবতে টোকিওর বুলেট ট্রেনে উঠে বসলাম। খারাপ লাগছিল কিন্তু ফিরে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না। বরং চেষ্টা করছিলাম ওকে ভুলে যাওয়ার।

ডরমে নতুন জীবন শুরু করার সময় একটা জিনিসই করার ছিল আমার। তা হল সব কিছু সিরিয়াসলি নেয়া বন্ধ করা। নিজের এবং বাকি সব কিছুর মধ্যে একটা দূরত্ব বজায় রাখা। সবুজ পুল টেবিল, লাল এন-৩৬০, স্কুলের ডেস্কের সাদা ফুল, শ্মশান থেকে ওঠা সাদা ধোঁয়া আর পুলিশ স্টেশনের টেবিলের বড় পেপারওয়েটগুলো মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। প্রথম প্রথম মনে হচ্ছিল

সম্ভব কিন্তু যতই ভুলে যেতে চাই না কেন, ভেতরে কোথাও না কোথাও সেগুলো হালকা বাতাসের মত রয়েই যায়। যত সময় যেতে থাকল সেগুলো হালকা থেকে গাঢ় হতে লাগল। সেগুলো যেন কথায় রুপান্তরিত হতে শুরু করল। অনেকটা এরকম :

"মৃত্যুর অস্তিত্ব আছে, কিন্তু জীবনের বিপরীত হিসেবে নয় বরং জীবনের অংশ হিসেবে।"

কথায় গতানুগতিক শোনালেও আমি যা উপলব্ধি করতাম তার কোন শব্দ ছিল না, বরং ছিল আমার ভেতর অদৃশ্য কোন গিঁট। মৃত্যুর অস্তিত্ব আছে–পেপারওয়েটের মধ্যে, বিলিয়ার্ড টেবিলের চারটা লাল আর সাদা বলের মধ্যে। আর আমরা প্রতিনিয়ত এর মধ্যে নিঃশ্বাস নেই। ফুসফুসে পাতলা ধুলো যেভাবে ঢোকে সেরকম।

এর আগ পর্যন্ত, আমি ভাবতাম মৃত্যু জীবন থেকে পুরোপুরি আলাদা কোন কিছু। কোন এক কালো থাবার মত এসে আমাদের একা করে ফেলে। তখন মনে হত এটাই সত্যি। জীবন এখানে, এই পাড়ে আর মৃত্যু অন্য পাড়ে। আমি এখানে, ওই পাড়ে নই।

যে রাতে কিজুকি আত্মহত্যা করল, তখন থেকে আমি মৃত্যুকে (এবং জীবনকে) সহজভাবে নেয়ার শক্তি হারিয়ে ফেললাম। মৃত্যু জীবনের বিপরীত কিছু নয়। মৃত্যু আমার মধ্যেই আছে, সবসময়ই ছিল। যত চেষ্টাই করি না কেন এ সত্য এড়ানো অসম্ভব। মে মাসের সেই রাতে মৃত্যু যখন সতের বছরের কিজুকিকে তুলে নিয়েছিল, একই সাথে আমাকেও তুলে নিয়েছিল।

পরের বছর বসন্তে আমার বয়স যখন আঠারো হল, বুকের ভেতরে সেই দমবন্ধ অবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমি সবরকম চেষ্টা করে গেলাম কোনকিছুতে সিরিয়াস না হওয়ার জন্য। সিরিয়াস না হওয়া আর সত্য একই কথা নয়। বরং মৃত্যু হল সত্য, বাস্তব সত্য, আপনি যতই ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেন না কেন লাভ নেই। এরকম একটা দমবন্ধ পরিস্থিতির মধ্যে আমি ঘুরপাক খাচ্ছিলাম। এখন যখন সেদিনগুলোর কথা ভাবি, মনে হয় সেগুলো ছিল খুবই অস্বাভাবিক। জীবনের সব কিছুই মৃত্যুর চারপাশে ঘুরপাক খায়।

অধ্যায় ৩

পরের শনিবার নাওকো আমাকে ফোন করলে আমরা রবিবার দিন ডেটে গেলাম। আমার মনে হয় একে ডেট বলা যেতে পারে। ডেট ছাড়া আর কোন শব্দ মাথায় আসছে না।

গতবারের মতই আমরা রাস্তায় রাস্তায় হাঁটলাম। মাঝে কখনো থামলাম কফির জন্য, তারপর আবারও হাঁটলাম। সন্ধ্যায় ডিনার করলাম তারপর বিদায় নিলাম। আবারো সে তার টুকরো টুকরো কথায় সীমাবদ্ধ থাকল। যেহেতু তাকে বিব্রত লাগল না, আমিও তেমন একটা কথা বাড়ালাম না। যখন যা মাথায় আস্‌ল তা নিয়েই আমরা কথা বললাম–প্রতিদিনের রুটিন, ক্যাম্পাস, তবে কোন কথাই বেশিদূর গেল না। আর আমরা আমাদের অতীত নিয়ে কোন কথাই বললাম না। খালি হাঁটলাম আর হাঁটলাম। সৌভাগ্যজনকভাবে টোকিও শহর অনেক বড়, আমরা কখনই হেঁটে পুরোটা শেষ করতে পারিনি।

এরকম প্রায় প্রতি রবিবার আমরা হাঁটতে লাগলাম। সে সামনে থাকত, আমি পেছন পেছন। নাওকোর অনেক রকমের ব্যারেট ছিল, সে সব সময় সেগুলো ডান কান খোলা রেখে পরত। পেছন থেকে তার এই দৃশ্যই এখনো আমার চোখে ভাসে। বিব্রত বোধ করলে সে মাথার ব্যারেট বা অন্যকিছু নাড়াচাড়া করত, রুমাল দিয়ে মুখ মুছত। যতবারই ও কিছু বলতে চাইতো এরকম করত। যতই আমি ওর এই অভ্যেসগুলো খেয়াল করতে লাগলাম ততই ওকে পছন্দ করতে শুরু করলাম।

নাওকো টোকিওর পশ্চিমে গ্রামের দিকে একটা গার্লস কলেজে পড়ত যেটা ইংরেজি শিক্ষার জন্য নামকরা ছিল। কলেজের কাছে একটা খাল কৃষিকাজে ব্যবহার করা হত, পানি ছিল খুবই পরিস্কার। আমি আর নাওকো প্রায়ই খালের পাড় ধরে হাঁটতাম। কখনো কখনো সে আমাকে তার অ্যাপার্টমেন্টে দাওয়াত দিত আর আমার জন্য রান্না করত। আমরা দু-জন যে একা কাছাকাছি বসে আছি সেটা তাকে আর আগের মত বিব্রত করত না। রুমটা অনেক ছোট কিন্তু পরিস্কার ছিল, শুকানোর জন্য ঝোলানো কাপড়গুলো ছাড়া অন্য কোন কিছু দেখে বোঝা মুশকিল ছিল যে, এখানে একটা মেয়ে বাস করে। তার জীবনধারা ছিল খুবই সাধারণ আর তার কোন বন্ধুও ছিল না। স্কুলে তাকে যারা চিনত এখনকার

নাওকোকে তারা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। স্কুলের সময়ে নাওকো সুন্দর জামাকাপড় পরত আর তার কয়েক হাজার বন্ধু ছিল। ওর রুম দেখে আমি বুঝতে পারলাম আমার মত সে-ও দূরের কোথাও পড়তে যেতে চেয়েছে যেখানে কেউ তাকে চেনে না।

"তুমি জানো কেন আমি এই কলেজে এসেছি?" সে হেসে বলল। "কারন আমাদের স্কুল থেকে কেউ এরকম জায়গায় পড়তে আসবে না। সবাই আরও চাকচিক্য খুঁজবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কি বলছি।"

আস্তে আস্তে সে আমার সাথে অভ্যস্ত হতে শুরু করেছিল, আমিও। আমাদের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছিল। গ্রীষ্মের ছুটির পর যখন নতুন টার্ম শুরু হল, নাওকো আমার পাশাপাশি হাঁটা শুরু করল। যেন এটা দুনিয়ার সবচেয়ে সাধারণ ব্যাপার। আমার মনে হল সে আমাকে বন্ধু হিসেবে দেখতে শুরু করেছিল, আর এরকম সুন্দরি এক মেয়ের পাশে হাঁটা আমার জন্য মোটেই বিরক্তিকর ছিল না। আমরা সারা টোকিও হেঁটে বেড়াতে লাগলাম কোন নির্দিষ্ট দিক ছাড়াই। পাহাড়ে চড়লাম, নদী পার হলাম, রেল ক্রস করলাম। কোনদিক চিন্তা না করেই যেদিক দুচোখ যায় খালি হাঁটতে থাকলাম। হাঁটতে থাকলাম যেন এটা কোন ধর্মীয় ব্যাপার যা আমাদের আত্মার ক্ষতকে সারিয়ে তুলবে। বৃষ্টি হলে আমরা ছাতা ব্যবহার করলাম কিন্তু হাঁটা কোন অবস্থাতেই বন্ধ থাকল না।

তারপর হেমন্ত আসল। ডরমের উঠোন ঢেকে গেল জেলকোভার পাতায়। নতুন ঋতুর গন্ধ পাওয়া গেল যখন আমি প্রথম সোয়েটার পরলাম। ছাগলের চামড়া দিয়ে বানানো নতুন জুতাও পরলাম।

মনে পড়ছে না আমরা তখন কি নিয়ে কথা বলতাম। গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না কথা বলার মত। আমরা আমাদের অতীত নিয়ে একদমই কথা বলতাম না, আর বললেও খুব কমই কিজুকির কথা উঠত। আমরা কোন কথা না বলে শুধু কফির কাপ হাতে নিয়ে সামনা সামনি বসে থাকতে পারতাম।

নাওকো স্টর্ম ট্রুপারের কাহিনী শুনতে পছন্দ করত। স্টর্ম ট্রুপার একবার তার এক বান্ধবির সাথে ডেটে গেছিল (সেও যে ভূগোলের ছাত্রি ছিল বলাবাহুল্য) কিন্তু সন্ধ্যায়েই মন খারাপ করে ফেরত আসল। "বলো তো ওয়া-ওয়া-ওয়াতানাবে, মেয়েদের সাথে তুমি কি নিয়ে ক-ক-কথা বলো?" আমার মনে নেই আমি কি উত্তর দিয়েছিলাম। ভুল লোককে সে প্রশ্ন করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জুলাই মাসে একজন ছাত্র এসে স্টর্ম ট্রুপারের আমস্টারডাম ক্যানালের ছবি বদলে গোল্ডেন গেট ব্রিজের ছবি লাগিয়ে গেল। আমাকে বলে গেল জানাতে যে স্টর্ম ট্রুপার এই ছবি দেখে মাস্টারবেট করে কিনা। "সে খুবই পছন্দ

করেছে," আমি পরে ছেলেটাকে বলেছিলাম। এরপর আরেকজন এসে গোল্ডেন গেট বদলে আইসবার্গের ছবি লাগিয়ে দিল। স্টর্ম ট্রুপারের অনুপস্থিতিতে প্রতিবার কেন ছবি বদল হয় এটা তাকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলল।

"কে-কে-কে এইসব করছে?" সে জিজ্ঞেস করল।

"কি জানি," আমি বললাম। "কিন্তু কি আসে যায়? সবগুলোই তো সুন্দর ছবি। তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

"তা ঠিক কিন্তু ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত।"

স্টর্ম ট্রুপারকে নিয়ে বলা আমার গল্প সবসময় নাওকোকে হাসাতো। আর তেমন কিছু ছিল না যা ওকে হাসাতে পারতো। তাই আমি প্রায়ই ওকে স্টর্ম ট্রুপারের কাহিনী বলতাম। যদিও স্টর্ম ট্রুপারকে এভাবে নিজের জন্য ব্যবহার করতে আমার খানিকটা খারাপ লাগছিল। সে ছিল মোটামুটি অবস্থাপন্ন ঘরের সবচেয়ে ছোট ছেলে। নিজের জন্য বলতে গেলে কখনোই কিছু করেনি। মানচিত্র বানানোই তার ছোট্ট জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। তাকে নিয়ে এরকম মজা নেয়া আসলে ঠিক হচ্ছিল না।

কিন্তু ততদিনে 'স্টর্ম ট্রুপার কৌতুক' আমার ডরম জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছিল আর সেখান থেকে ফেরত আসার কোন উপায় ছিল না। তার উপর নাওকোর হাসি দেখতেও আমার ভালো লাগত। আমি সবাইকে নিয়ে গল্প শোনানো শুরু করলাম।

নাওকো খালি একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমি কখনো কোন মেয়েকে পছন্দ করতাম কিনা। তাকে আমি কোবেতে ছেড়ে আসা মেয়েটার কথা বলেছিলাম। "মেয়েটা ভালো ছিল। ওর সঙ্গ ভালোই লাগত। আমি তাকে প্রায়ই মিস করি। কিন্তু সে আমাকে নাড়াতে পারেনি। আমি জানি না, কখনো মনে হয় আমার ভেতর একটা শক্ত খোলস আছে যেটা ভেদ করে কেউ ঢুকতে পারে না। আমার মনে হয় না আমি কখনো কাউকে ভালোবাসতে পারবো।"

"তুমি কখনো ভালোবেসেছিলে?" নাওকো জানতে চাইলো।

"কখনো না," বললাম তাকে।

এর বেশি সে আর কোন কিছু জানতে চায়নি।

হেমন্ত শেষে যখন শহর জুড়ে কাঁপানো ঠান্ডা বাতাস শুরু হল, নাওকো আমার গা ঘেঁসে হাঁটা শুরু করল। আমি ওর ডাফল কোটের মোটা কাপড়ের ভেতর দিয়েও শ্বাস প্রশ্বাস টের পেতাম। সে আমার হাতের ভেতর দিয়ে তার হাত ঢুকিয়ে হাঁটত, কিংবা আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিত। যখন খুব ঠান্ডা লাগত তখন আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কাঁপত। এসবের কোন বিশেষ অর্থ

ছিল না। আমি স্রেফ পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে থাকতাম। আমাদের রাবার সোলের জুতোগুলো রাস্তায় খুব কমই শব্দ করত যদি না কোন শুকনো পাতা পায়ের নিচে পড়তো। নাওকোর জন্য আমার খারাপ লাগত। আমার হাত নয়, তার দরকার ছিল অন্য একজনের হাত। আমার উষ্ণতা নয়, তার দরকার ছিল অন্য একজনের উষ্ণতা। নিজের কাছেই নিজেকে আমার কেন জানি দোষি মনে হত।

শীত যত বাড়তে লাগল, নাওকোর চোখের স্বচ্ছতাও সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল। এমন স্বচ্ছতা যার কোথাও স্থির অবস্থান নেই। কখনো কখনো নাওকোর দৃষ্টি কোন কারন ছাড়াই আমার উপর আটকে থাকতো। এরকম একটা অনুভূতি যে সে কিছু একটা খুঁজছে, যা আমার ভেতর অসহায় অদ্ভুত এক একাকিত্বের জন্ম দিত।

মাঝে মাঝে মনে হত সে কি আমাকে কিছু বলতে চাইছে? যেটার জন্য উপযুক্ত শব্দ সে হয়ত খুঁজে পাচ্ছে না? এমন কিছু যেটা প্রকাশ করা শব্দের ক্ষমতার বাইরে? না পেরে সে ব্যারেট নাড়াচাড়া করছে কিংবা রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে আর আমার চোখে অর্থহীন দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে থাকছে? যখন সে এমন করত আমার ইচ্ছে করত তাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু সংকোচের জন্য কখনো পারিনি, পিছিয়ে এসেছি। আমি ভয় পেতাম তাকে হয়ত আঘাত দিয়ে বসবো। যে কারনে আমরা সারা টোকিও খালি হেঁটেই বেড়াতে লাগলাম। আর নাওকো তার শব্দগুলো খালি খুঁজেই যেতে থাকল।

নাওকোর থেকে ফোন আসলেই কিংবা রবিবার সকালে বের হলেই ডরমের ছেলেপেলে আমাকে খোঁচাত। খুবই স্বাভাবিক, তারা ভাবত আমার একজন গার্ল ফ্রেন্ড হয়েছে। তাদেরকে সত্যি বলার কোন উপায় ছিল না, দরকারও ছিল না, যা খুশি ভাবে ভাবুক। আমাকে সন্ধ্যায় কিছু আজেবাজে প্রশ্ন শুনতে হত–আমরা কোন পজিসনে সেক্স করি? তার ঐখানটা কেমন? সেদিন কি রঙের আন্ডারওয়্যার পরেছে? ইত্যাদি। তারা যা যা শুনতে চাইত আমি বানিয়ে বানিয়ে উত্তর দিতাম।

তারপর আমার বয়স আঠারো থেকে উনিশে গড়াল। প্রতিদিন সূর্য উঠল আর ডুবল, পতাকা উঠল আর নামল। প্রতি রবিবার আমি আমার মৃত বন্ধুর গার্ল ফ্রেন্ডের সাথে ডেটে যেতে থাকলাম। আমার কোন ধারনা ছিল না আমি কি করছি বা কী করবো। ক্লাসে কোন বন্ধু ছিল না আর ডরমেও খুব কম ছেলেপেলেকে চিনতাম। ডরমের সবাই মনে করত আমি একজন লেখক হতে চাই কারন আমার সাথে সবসময় বই থাকতো আর আমার কোন উচ্চাকাঙ্খা নেই। আসলে আমি কিছুই হতে চাইতাম না।

এসব নিয়ে নাওকোর সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল সে হয়ত আমার অবস্থাটা কিছু মাত্রায় বুঝতে পারবে। কিন্তু আমিও নিজেকে প্রকাশ করার জন্য কোন শব্দ খুঁজে পাইনি। আজব ব্যাপার যে, ওর সাথে থেকে থেকে আমার নিজেরও শব্দ খুঁজে না পাওয়া রোগে ধরেছিল।

প্রতি শনিবার রাতে আমি লবিতে বসে থাকতাম নাওকোর ফোনের অপেক্ষায়। শনিবার রাতে মোটামুটি সবাই বাইরে থাকতো তাই লবি সাধারনত সুনসান থাকতো। আমি দূরে তাকিয়ে থেকে নিজের ভেতরে কি হচ্ছে দেখার চেষ্টা করতাম। কি চাই আমি? কি চায় আমার থেকে অন্যরা? কিন্তু কখনোই উত্তর খুঁজে পাইনি। কখনো কখনো হাত দিয়ে আলো ধরার চেষ্টা করতাম কিন্তু কিছুই ধরা পড়ত না।

আমি প্রচুর পড়তাম। তাই বলে সব রকমের বই না। প্রিয় বইগুলোই বার বার পড়তে আমার ভালো লাগত। তখন পড়তাম ট্রুম্যান ক্যাপোটি, জন আপডাইক, স্কট ফিটজেরাল্ড, রেমন্ড সান্ডলারের লেখা। কিন্তু আমার ক্লাসের কিংবা ডরমের কাউকে সেসব পড়তে দেখতাম না। তারা পছন্দ করত কাজুমি তাকাহাসি, কেঞ্জাবুরো ওয়ে, ইয়োকিও মিশিমা অথবা সমসাময়িক ফরাসি লেখকদের বই। সেজন্য আমার অন্যদের গল্প করার টপিকও কিছু ছিল না। আমি আমার বই নিয়ে আমার মত থাকতাম। পরিচিত একটা বইয়ের থেকে আসা গন্ধ চোখ বন্ধ করে আমাকে সুখি করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আঠারো বছর বয়সে আমার প্রিয় বই ছিল জন আপডাইকের *দি সেন্টর*, তারপর যখন সেটা অনেকবার পড়া হয়ে গেল আর আগের আবেদন হারিয়ে ফেলল, তখন প্রথম স্থানে চলে এল *দ্য গ্রেট গ্যাটসবি*। তারপর *গ্যাটসবি* অনেকদিন সেরা প্রিয় বই ছিল। যখন মুড আসতো বইটা শেলফ থেকে নামিয়ে যেকোনো জায়গা থেকে পড়া শুরু করতাম। কখনো খারাপ লাগেনি। পুরো বইয়ে একটাও বোরিং পাতা ছিল না। আমার ইচ্ছে করত সবাইকে জানাতে, কি চমৎকার একটা বই এটা। কিন্তু আমার আশেপাশে কেউ বইটা পড়েনি, ভবিষ্যতেও পড়ার সম্ভাবনা কম ছিল। বিপ্লব ঘটার মত কিছু না হলে ১৯৬৮-তে কাউকে এফ স্কট ফিটজেরাল্ডের বই পড়তে বলা সম্ভব ছিল না।

শেষ পর্যন্ত আমার দুনিয়ায় একজনকে পেলাম যে *গ্যাটসবি* পড়েছে এবং শুধু এই কারনে সে আর আমি বন্ধু হয়ে গেলাম। তার নাম ছিল নাগাসাওয়া। সে ছিল আমার দু-বছরের বড়। আর সে যেহেতু আইন নিয়ে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নামকরা জায়গায় পড়ছিল, তার সুযোগ ছিল সরাসরি জাতীয় নেতৃত্বতে ঢুকে যাওয়ার। আমরা একই ডরমে থাকলেও শুধু চেহারায় একজন

আরেকজনকে চিনতাম। একদিন আমি ডাইনিং হলের যেখানে সূর্যের আলো পড়ে সেরকম একটা জায়গায় বসে *গ্যাটসবি* পড়ছিলাম। সে এসে আমার পাশে বসে জানতে চাইলো আমি কি পড়ছি। আমি জানালাম। সে জিজ্ঞেস করল বইটা আমার ভালো লাগছে কিনা। "তৃতীয় বারের মত পড়ছি," আমি উত্তর দিলাম। "গতবারের চেয়ে ভালো লাগছে এবার পড়তে, প্রতিবার যেন আমি নতুন কিছু পাই।"

"এই লোক দাবি করছে সে *গ্যাটসবি* তিনবার পড়েছে," আপন মনে বিড় বিড় করে বলল সে। "যাহাক, যে লোক *গ্যাটসবি*'র বন্ধু সে আমারও বন্ধু।"

সুতরাং আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। অক্টোবরের ঘটনা এটা।

নাগাসাওয়াকে জানতে লাগলাম, ততই তাকে অদ্ভুত মনে হতে লাগল। আমার জীবনে অনেক অদ্ভুত মানুষ দেখেছি কিন্তু তাদের কেউ নাগাসাওয়ার ধারে কাছে ছিল না। বই পড়ার ব্যাপারে আমার তুলনায় সে ছিল রীতিমত খাদক। কিন্তু তার একটা নিয়ম ছিল। সে এমন কোন লেখকের বই পড়ত না যার মৃত্যুর অন্তত ৩০ বছর পার হয়নি। "শুধুমাত্র এইধরনের বইয়ের প্রতিই আমার আস্থা আছে," সে বলেছিল। "এমন না যে, এখনকার লেখায় আমার কোন আস্থা নেই কিন্তু আমি এমন বই পড়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না যেগুলো সময় উত্তীর্ণ নয়। জীবনে সময় অনেক কম।"

"কি ধরনের লেখকদের তুমি পছন্দ করো?" শ্রদ্ধার সুরে আমি জানতে চেয়েছিলাম।

"বালজাক, দান্তে, জোসেফ কনরাড, ডিকেন্স," ইতস্তত না করেই উত্তর দিয়েছিল সে।

"ঠিক হালফ্যাশনের নয়। একটু পুরনো এরা।"

"সেজন্যই আমি এদের লেখা পড়ি। তুমি যদি শুধু অন্যেরা যা পড়ছে তাই পড়ো, তাহলে তোমার চিন্তা-ভাবনা হবে অন্যেরা যেভাবে চিন্তা করছে ঠিক সেরকম। আর সেটা হল ফালতু লোকের দুনিয়া। সত্যিকারের মানুষদের এজন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। খেয়াল করোনি, ওয়াতানাবে? তুমি আর আমিই খালি সত্যিকারের মানুষ এখানে, বাকি সবাই ফালতু।"

আমি একটু আহত বোধ করলাম এ কথায়। "এটা তুমি কি মনে করে বললে?"

"কারন এটা সত্যি। আমি জানি। আমি দেখতে পাই। বলা যায় অনেকটা আমাদের কপালে সিল দেয়ার মত। আর তাছাড়া দেখো, আমার দু-জনই শুধু *দ্য গ্রেট গ্যাটসবি* পড়েছি।"

আমি তাড়াতাড়ি হিসেব করে বললাম, “কিন্তু ফিটজেরাল্ড মারা গেছেন মাত্র আটাশ বছর আগে।”

“তাতে কি? মাত্র দুই বছরই তো কম। ফিটজেরাল্ড তার সময়ের তুলনায় এগিয়ে ছিলেন।”

ডরমের আর কেউ জানত না, নাগাসাওয়া ক্লাসিক বইয়ের গোপন পাঠক ছিল। জানলেও কিছু হত না। সবাই নাগাসাওয়াকে চিনতো কারন সে ছিল স্মার্ট। সে সহজেই টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েছো, তার গ্রেডও ভালো। সে সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে ঢুকে পরে কূটনীতিক হয়ে যাবে। সে এসেছেও সেরকম বড় পরিবার থেকে। নাগয়াতে তার বাবার বিশাল হাসপাতাল আছে। তার ভাইও টোকিও থেকে পাশ করে মেডিকেলে পড়াশুনা করছে। সেখান থেকে পাশ করে বাপের হাসপাতালের দায়িত্ব নেবে। নাগাসাওয়ার সবসময় পকেটভর্তি টাকা থাকতো। সব সময় সম্মান নিয়ে চলত। এমনকি ডরমের প্রধানও তার সাথে সম্মান করে কথা বলতো। যদি সে কাউকে কিছু করতে বলতো, তবে সেই লোক কোন কথা ছাড়াই তা করে দিতো।

নাগাসাওয়ার কিছু সহজাত গুণাবলী ছিল যা লোকজনকে আকর্ষণ করত এবং তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য করতো। সে জানতো কি করে কোন পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব নিয়ে নিতে হয়। সে এমনভাবে পরিস্থিতির ভার নিত এবং কৌশলের সাথে নির্দেশ দিত যে, সবাই মেনে নিত। তার মাথার উপর থেকে যেন স্বর্গীয় দূতের মত আলো ছটা বের হত, লোকজন তাকে উচ্চতর কেউ হিসেবে মেনে নিত। সুতরাং সবাই ধাক্কা খেল জেনে যে, নাগাসাওয়া আমাকে তার বন্ধু হিসেবে নিয়েছে। এমন একজনকে নিয়েছে যার বন্ধু হওয়ার মত কোন যোগ্যতাই নেই। আমাকে বন্ধু করার কারন ছিল নাগাসাওয়ার। আমি খুবই সাধারণ আর ওকে কখনো তেল দিয়ে কথা বলিনি যা সে অন্যদের থেকে পেতে অভ্যস্ত। অন্যরা আমার এই গুনের জন্য আমাকে কোন সম্মান দেবে কিনা সন্দেহ। আমার নিজের অবশ্যই নাগাসাওয়ার অদ্ভুত এবং জটিল চরিত্রের প্রতি আগ্রহ ছিল কিন্তু তার গ্রেড, তার স্বর্গীয় আলো, তার চেহারা আমার আগ্রহের বিষয় ছিল না। আর এই ব্যাপারটা ছিল তার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা।

নাগাসাওয়ার ব্যক্তিত্বতে কিছু মাত্রাতিরিক্ত দ্বন্দ্বও ছিল। যদিও আমি তার দয়াদাক্ষিন্যের প্রতি মুগ্ধ ছিলাম, কিন্তু সে কখনো কখনো খুবই নিষ্ঠুর হতে পারতো। সে দূরদর্শী একজন নেতার মত সামনে এগিয়ে যেতে পারত ঠিকই কিন্তু তার হৃদয় হয়ত তখন একাকিত্বের ডোবায় ডুবে পড়ে আছে। আমি প্রথম থেকেই তার মধ্যে এরকম আপাতবিরোধী ব্যাপার-স্যাপার দেখে আসছি।

অন্যরা কেউ কেন সেটা কখনো খেয়াল করেনি বুঝতে পারিনি। সে তার নিজের তৈরি বিশেষ ধরণের নরকের মধ্যে বসবাস করতো।

তারপরেও আমি মনে করি আমি তাকে সবচেয়ে ভালোভাবেই গ্রহন করেছিলাম। তার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তার সততা। শুধু যে সে মিথ্যা বলতো না তা নয়, সে সবসময় তার অক্ষমতাকে স্বীকার করত। সে কখনো এমন কিছু লুকানোর চেষ্টা করত না যা তাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে পারে। আর যেটা আমার চোখে বেশি পড়তো, সে ছিল খুবই দয়ালু আর বন্ধুবৎসল। সে ডরমে না থাকলে আমার জীবন যে আরও বিরক্তিকর হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারপরেও আমি কখনো নাগাসাওয়ার কাছে নিজের মনের কথা বলিনি। সিজুকি আর নাগাসাওয়ার সাথে আমার সম্পর্কের মধ্যে সেটাই ছিল পার্থক্য। প্রথমবার যখন আমি নাগাসাওয়াকে দেখলাম মাতাল হয়ে এক মেয়েকে নির্যাতন করছে, আমি নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যাহোক না কেন আমি কখনোই তাকে আমার মনের কথা বলবো না।

নাগাসাওয়াকে নিয়ে ডরমে বেশ কিছু কিংবদন্তি চালু ছিল। একটা ছিল যে, সে একবার তিনটা জ্যান্ত শামুক খেয়েছিল। তার লিঙ্গও নাকি বিশাল। আরেকটা ছিল, সে একশোরও বেশি মেয়ের সাথে শুয়েছে।

শামুকের কাহিনীটা সত্যি। সে নিজেই আমার কাছে স্বীকার করেছিল এটা।

"তিনটা বিশাল শামুক, গপ করে গিলে ফেলেছিলাম," বলেছিল সে।

"এরকম মাথা খারাপ কেন হয়েছিল?"

"প্রথম বর্ষের ঘটনা, যখন আমি এখানে আসি," সে বলেছিল আমাকে। "তখন প্রথম বর্ষের ছাত্রদের সাথে উচ্চ শ্রেণির সুবিধাভোগি ছাত্রদের কিছু গ্যাঞ্জাম ছিল। আমি প্রথম বর্ষের পক্ষ থেকে গেলাম উচ্চশ্রেণিদের সাথে আপোষ করতে। তারা ছিল ডানপন্থি কুত্তারবাচ্চা। তারা কাঠের কেন্ডো তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘুরত। আপোষ করার কোন ইচ্ছে তাদের ছিল না। তো আমি তাদের বললাম, "ঠিক আছে। পুরো ব্যাপারটার সমাপ্তি টানা যাক। আমাকে নিয়ে তোমরা যা ইচ্ছে করতে পারো, এর বদলে অন্যদেরকে ছেড়ে দাও।" তারা আমাকে বলল, "ঠিক আছে তুমি তাহলে কিছু জ্যান্ত শামুক খেয়ে দেখাও।" "চমৎকার প্রস্তাব, নিয়ে আসো," আমি বললাম। কুত্তারবাচ্চারা বাইরে গিয়ে খোলস ছাড়া জ্যান্ত তিনটা বিশাল শামুক নিয়ে আসল, আর আমি ওগুলো গপ করে গিলে ফেললাম।"

"কেমন লেগেছিল খেতে?"

"কেমন লেগেছিল তোমার নিজের সেটা গিলে খেয়ে বুঝতে হবে। যেভাবে

এটা তোমার গলা বেয়ে পাকস্থলিতে পৌছায়...আর গলায় ঠান্ডা, বিচ্ছিরি একটা স্বাদ রেখে যায়...ইয়াক, ভাবলেই জঘন্য লাগে। বমি এসে গেছিল যখন গিলছিলাম, কিন্তু জোর করে চেপে থেকেছি। বমি করলেও আমাকে আবার খেতে হত। যতবার করতাম ততবার খেতে হত। তাই একসাথে খেয়ে ফেলেছি তিনটাই।"

"তারপর কি হল?"

"রুমে ফিরে গেলাম আর এক বালতি লবন পানি খেলাম। এছাড়া আর কি করতে পারতাম, বলো?"

"হুম, তা ঠিক।"

"যাহোক, তারপর থেকে আমাকে আর ওরা ঘাটায়নি। উচ্চ শ্রেণির অন্য লোকজনরাও আর ঝামেলা করেনি। এই জায়গায় আমি একমাত্র লোক যে তিনটা জ্যান্ত শামুক গিলতে পারে।"

"কোন সন্দেহ নেই তাতে।"

পুরুষাঙ্গের সাইজ জানা সহজ ছিল। আমি তার সাথে ডরমের কমন গোসলখানায় গিয়েছিলাম। সাইজ ভালোই বড়। কিন্তু একশো মেয়ের সাথে শোওয়ার ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি ছিল। "খুব বেশি হলে পঁচাত্তর হবে," সে বলেছিল। "সবার কথা আমার মনে নেই। তবে মোটামুটি নিশ্চিত অন্তত সত্তুর হবেই," আমি যখন তাকে বললাম আমি মাত্র একজনের সাথে শুয়েছি, সে বলল, "এটা কোন ব্যাপারই না। আমি ব্যবস্থা করবো। সহজ ব্যাপার। আমার সাথে বাইরে যে-ও। তোমার জন্য মেয়ে জোগাড় করা কোন সমস্যাই হবে না।"

আমি ওর কথা তখন বিশ্বাস করিনি কিন্তু সে সত্যিই বলেছিল। একদম সহজ ব্যাপার ছিল। পানসে বিয়ারের উত্তেজনা সবকিছু একদমই সোজা করে দিয়েছিল। আমরা সিবুয়া কিংবা সিঞ্জুকুতে (তার প্রিয়) একটা বারে গিয়েছিলাম। সেখানে এক জোড়া ললনাকে পেলাম (জোড়া ললনাতে পৃথিবী ভর্তি)। তাদের সাথে কথা বললাম, একসাথে পান করলাম, হোটেলে নিয়ে গেলাম, তারপর সেক্স। নাগাসাওয়া কথা বলে মেয়ে পটানোয় বিশেষ পারদর্শী ছিল। এমন না যে সে দারুন কিছু বলছে কিন্তু মেয়েরা গায়ে পড়ে ওর কথা শুনত। একইসাথে প্রচুর মদ গিলত, এবং সবশেষে তার সাথে বিছানায় যেত। আমার মনে হয় তারা বোধহয় এরকম চমৎকার সুদর্শন, চালাক লোকের সাথে সময় কাটাতে উপভোগ করত। আর সবচেয়ে আজব ব্যাপার হল আমি যেহেতু ওর সাথে যেতাম, আমাকেও তারা সমান আকর্ষণীয় মনে করত। এটা ছিল ওর জাদু, ওর ছিল সত্যিকারের প্রতিভা যা আমাকে প্রভাবিত করত। নাগাসাওয়ার সাথে তুলনা

করলে কিজুকির কথা বলার ক্ষমতা ছিল বাচ্চাদের খেলা। আমি পুরোপুরি নাগাসাওয়ার শক্তিতে ডুবে গিয়েছিলাম যদিও কিজুকির অভাব অনুভব করতাম ঠিকই। কিজুকির আন্তরিকতার প্রতি নতুন করে ভালো লাগা কাজ করত। তার যা প্রতিভা ছিল সে পুরোটা আমার আর নাওকোর সাথে জন্য ব্যয় করত। আর নাগাসাওয়া তার প্রতিভা তার আশেপাশের সবার জন্য ব্যয় করত। এমন না যে সে মেয়েদের সাথে শোওয়ার জন্য মারা যাচ্ছিল, পুরোটাই ছিল তার কাছে খেলার মতন।

আমিও যে অচেনা মেয়েদের সাথে সেক্সের জন্য পাগল ছিলাম তা নয়। আমার জন্য ব্যাপারটা ছিল যৌনতাড়না প্রশমনের একটি সোজা উপায়। তাছাড়া আমি অবশ্যই তাদেরকে স্পর্শ করতে পছন্দ করতাম, খালি সকালে উঠে আর সহ্য হত না। ঘুম ভাঙলে দেখতাম একটা আজব ধরণের মেয়ে আমার পাশে ঘুমাচ্ছে। ঘর ভর্তি মদের গন্ধ। বিছানা আর পর্দায় সেই স্পেশাল 'লাভ হোটেল' ঝকমারি। আর মাথাবাবাজি হ্যাঙ্গওভারে ভারি হয়ে আছে। তারপর সেই মেয়ে ঘুম থেকে উঠবে আর মেঝেতে তার আন্ডারওয়্যার খুঁজবে। আর জামা পরতে পরতে কিছু একটা বলবে যেমন, "আশা করি তুমি কনডম ব্যবহার করেছিলে। এই মাসের সবচেয়ে জঘন্য দিন ছিল এটা আমার জন্য।" তারপর আয়নার সামনে বসে তার মাথাব্যথা নিয়ে গজগজ করবে আর লিপস্টিক, নকল আইল্যাশ লাগাবে। আমি এদের সাথে পুরো রাত কাটাতে চাইতাম না কিন্তু রাতে কারফিউ থাকে বলে উপায় থাকতো না। মেয়ে পটাতে চাইলে ডরম থেকে সারারাতের জন্য পাশ নিয়ে বের হতে হত। পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে ডরমে যখন ফেরত যেতাম তখন নিজের উপর ঘেন্না চলে আসতো। সূর্যের আলোয় মনে হত চোখ পুড়ে যাচ্ছে, গলার ভেতর সাহারা মরুভূমি, আর মাথা মনে হত নিজের কাছে আর নেই।

এভাবে তিন-চার মেয়ের সাথে শোওয়ার পর একদিন জিজ্ঞেস করলাম নাগাসাওয়াকে, "আচ্ছা, সত্তুরজন মেয়ের সাথে সেক্স করার পর তোমার কি মনে হয় না, পুরো ব্যাপারটা অর্থহীন?"

"এই কথা প্রমান করে, তুমি একজন ভদ্রলোক," বলল সে। "কংগ্র্যাচুলেসন্স। অচেনা মেয়েদের সাথে সেক্স করে একদম কিছু পাওয়ার নেই। একসময় তুমি স্রেফ বিরক্ত হয়ে যাবে আর নিজেকে ঘৃণা করতে থাকবে। আমার জন্যও ব্যাপারটা একই।"

"তাহলে করছো কেন?"

"বলা কঠিন। আচ্ছা, তুমি কি জানো জুয়া নিয়ে দস্তয়ভস্কি কি লিখেছেন?

যখন তোমার চারপাশে অসীম সম্ভাবনা, সবচেয়ে কঠিন হল সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া। বোঝাতে পারলাম?"

"খানিকটা।"

"আচ্ছা দেখো, সূর্য অস্ত যায়। মেয়েরা বের হয় পান করতে। তারা চারদিকে ঘুরে, কিছু একটা খোঁজে। আমি তাদেরকে সেই কিছু একটা দিতে পারি। সোজা কাজ, বোতল খুলে পানি খাওয়ার মত। বোঝার আগেই আমি তাদেরকে বিছানায় শুইয়ে ফেলবো। এটাই তারা চায়। সম্ভাবনা দিয়ে আমি সেটাই বোঝাতে চেয়েছি। তোমার চারপাশে ঘুরছে। এড়াবে কি করে? তোমার একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে আর ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগও আছে। সেখানে চুপ করে বসে তুমি সুযোগ পার হয়েছে যেতে দেখবে, কিন্তু কিছু করবে না?"

"জানি না, আমি কখনো এরকম অবস্থায় পড়িনি," হেসে বললাম। "এরকম কিছু আমার কল্পনায়ও আসে না।"

"নিজের সৌভাগ্য নিয়ে চিন্তা করো।"

বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও নাগাসাওয়ার ডরমে থাকার এটাই কারন, নারীর প্রতি লালসা। ওর বাবা ভয় পাচ্ছিলেন যদি নাগাসাওয়া টোকিওতে একা থাকে তাহলে সবকিছু বাদ দিয়ে এসব মেয়ে নিয়েই পড়ে থাকবে। তাই ওকে বাধ্য করলেন চার বছরের জন্য ডরমেটরিতে থাকতে। যদিও নাগাসাওয়ার তাতে কিছু এসে যেত না। এসব ফালতু নিয়ম নিয়ে মাথা ঘামাত না সে। যখন ইচ্ছে হত ডরম থেকে সারারাতের অনুমতি নিয়ে নারী শিকারে বের হত অথবা গার্লফ্রেন্ডের ফ্লাটে সারারাত কাটিয়ে দিত। অনুমতি পাওয়া এমনিতে সহজ কাজ ছিল না কিন্তু ওর নিজের জন্য কোন ব্যাপার ছিল না এটা। আমার জন্যও না, কারন আমার অনুমতিও সে-ই নিয়ে দিত।

নাগাসাওয়ার একজন নিয়মিত গার্লফ্রেন্ড ছিল যার সাথে সে প্রথম বর্ষ থেকে ডেট করছিল। ওর নাম ছিল হাটসুমি, নাগাসাওয়ার সমবয়সি ছিল ও। আমার সাথে কয়েকবার দেখা হয়েছে, খুবই চমৎকার একটা মেয়ে। তার মধ্যে চটকদার কোন ভাব ছিল না, সত্যি বলতে সে ছিল খুবই সাধারণ। যখন প্রথমবার আমার সাথে দেখা হল, আমি ভাবছিলাম কেন নাগাসাওয়া আরও সুন্দরি কাউকে পছন্দ করেনি। কিন্তু যে কেউ ওর সাথে কিছুক্ষণ কথা বললে পছন্দ করতে বাধ্য। শে ছিল চুপচাপ, বুদ্ধিমতি, রসিক আর মমতাময়ী। সবসময় সুন্দর রুচিশীল জামাকাপড় পরতো। আমি হাটসুমিকে খুবই পছন্দ করতাম। হাটসুমির মত কোন গার্লফ্রেন্ড আমার থাকলে কখনই এইসব সস্তা মেয়ের সাথে ঘুমাতে যেতাম না। সে-ও আমাকে পছন্দ করত, তার কলেজের প্রথম বর্ষের এক মেয়ের সাথে

আমাকে জুড়ে দেয়ার চেষ্টাও করেছিল যাতে আমরা ডাবল ডেটে যেতে পারি। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমি তা এড়িয়ে গিয়েছিলাম। হাটসুমি দেশের সবচেয়ে নামকরা গার্লস কলেজে পড়তো, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না ওখানকার বড়লোক রাজকন্যাদের কারো সাথে ডেট করার।

হাটসুমি ভালো করেই জানত নাগাসাওয়ার নারীঘটিত ব্যাপার-স্যাপার, কিন্তু এই নিয়ে তার কোন অভিযোগ ছিল না। সে নাগাসাওয়াকে ভালোবাসত কিন্তু আলাদা কোন দাবি ছিল না।

"আমি হাটসুমির মত মেয়ের উপযুক্ত নই," নাগাসাওয়া আমার কাছে স্বীকার করেছিল একদিন। আমিও ওর সাথে একমত হয়েছিলাম।

*

সেবারের শীতকালে আমি একটা পার্টটাইম চাকরি শুরু করলাম। সিঞ্জুকুর একটা ছোট রেকর্ড শপে। বেতন তেমন ছিল না, কিন্তু কাজও সহজ ছিল। সপ্তাহে তিন রাত দোকানে সময় দেয়া আর কি। আর তারা আমাকে সস্তায় রেকর্ড কিনতে দিত। বড়দিনের উপহার হিসেবে নাওকোর জন্য কিনেছিলাম হেনরি মানচিনির একটা রেকর্ড। নাওকোর প্রিয় গান 'ডিয়ার হার্ট' ছিল রেকর্ডটায়। সুন্দর করে কাগজ আর লাল ফিতা দিয়ে মুড়ে গিফট দিয়েছিলাম। নাওকো আমাকে দিয়েছিল তার নিজের বোনা উলের দস্তানা। বুড়ো আঙুল একটু ছোট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হাত ভালোই গরম রাখত দস্তানা জোড়া।

"ওহ্, আমি সরি," আরক্তিম হয়ে বলেছিল সে। "আনাড়ি হাতের কাজ!"

"আরে ধুর, ঠিকই আছে," দস্তানা পরে হাত তুলে দেখালাম।

"আর যাহোক, তোমাকে এখন ঠান্ডায় পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘুরতে হবে না।"

নাওকো সেবার শীতের ছুটিতে কোবেতে গেল না। আমিও চাকরির জন্য টোকিওতে আটকে গেলাম। তাছাড়া কোবেতে আমার কিছু করার নেই, কারো সাথে দেখাও করতে চাইছিলাম না। ডরমের ডাইনিং ছুটিতে বন্ধ থাকায় আমি নাওকোর অ্যাপার্টমেন্টে খেতে যেতাম। নববর্ষের দিন আমরা বাকি সবার মত রাইস কেক আর সুপ খেলাম।

১৯৬৯। সে বছরের জানুয়ারির শেষ এবং ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনেক কাহিনী হল।

জানুয়ারির শেষে প্রচন্ড জ্বরে পড়ল স্টর্ম ট্রুপার, বাধ্য হয়ে আমি সেদিন

নাওকোর সাথে দেখা হওয়া বাদ দিলাম। অনেক ঝামেলা করে কনসার্টের কিছু ফ্রি টিকেট জোগাড় করেছিলাম। নাওকো বিশেষ করে খুবই আগ্রহি ছিল কারন অর্কেস্ট্রাটি ওর প্রিয় ব্রামের 'ফোর্থ সিম্ফনি' পারফর্ম করছিল। কিন্তু স্টর্ম ট্রুপার বেচারার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, আর দেখে রাখবে এমন কাউকে পাইনি। এরকম অবস্থায় ওকে একা ফেলে যাওয়া একদম ঠিক হত না। আমি ভিনাইল ব্যাগে কিছু বরফ ভরে ওর কপালে রাখলাম, ঠান্ডা তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে দিলাম, প্রতি ঘন্টায় তাপমাত্রা পরীক্ষা করলাম, এমনকি ওর অন্তর্বাসও বদলে দিলাম। একটা পুরো দিন তার ভয়াবহ জ্বর থাকল, কিন্তু দ্বিতীয় দিন সকালে সে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ব্যায়াম শুরু করল যেন কিছুই হয়নি। ওর তাপমাত্রাও একদম নরমাল। বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে সে একজন মানুষ।

"অদ্ভুত," স্টর্ম ট্রুপার বলল। "আমার জীবনে কখনো জ্বর হয়নি।" এমনভাবে বলল যেন সব আমার দোষ।

আমার মেজাজ গেল খারাপ হয়ে। "কিন্তু তোমার জ্বর ছিল," আমি বরবাদ হওয়া টিকেট দুটো দেখিয়ে বললাম।

"ভাগ্যিস ওগুলো ফ্রি টিকেট ছিল," বলল সে।

আমার ইচ্ছে করছিল রেডিওটা তুলে বাইরে ফেলে দেই, কিন্তু তার বদলে মাথাব্যথা নিয়ে বিছানায় গেলাম।

সেবার ফেব্রুয়ারিতে অনেকবার তুষারপাত হল।

মাসের শেষদিকে আমি আমার ফ্লোরের একজন উচ্চশ্রেণির সাথে বোকার মত মারপিটে জড়িয়ে পড়লাম। তাকে ঘুষি মারলাম। কংক্রিটের ওয়ালে তার মাথা ঠুকে গেল যদিও সেরকম আহত হয়নি। নাগাসাওয়া ব্যাপারটার মীমাংসা করল। তারপরেও ডরমের প্রধান আমাকে তার অফিসে ডেকে সতর্ক করলেন। এরপর ডরমে বাস করা আমার জন্য অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল।

শিক্ষাবর্ষ শেষ হল মার্চে কিন্তু আমার কিছু ক্রেডিট কম ছিল। রেজাল্ট ছিল মাঝারি মানের–বেশিরভাগই সি আর ডি, অল্প কিছু বি। ওদিকে দ্বিতীয় বর্ষের নতুন টার্ম শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ক্রেডিট নাওকোর ছিল। আমরা একটা পুরো ঋতু চক্র পূর্ণ করলাম।

এপ্রিলের মাঝামাঝি গিয়ে নাওকোর বয়স বিশ হল। ও আমার চেয়ে সাত মাসের বড় ছিল। আমার জন্ম নভেম্বরে। নাওকোর বিশ হওয়ার মধ্যে অদ্ভুত কিছু একটা ছিল। আমার কাছে মনে হত, নাওকোর হোক আর আমার হোক, আমাদের বয়স আঠারো এবং উনিশের মধ্যেই ঘোরাফেরা করা উচিত। আঠারোর পর উনিশ, উনিশের পর আবার আঠারো। কিন্তু তা না হয়ে তার বয়স

হয়ে গেল বিশ। হেমন্তে আমারও তাই হবে। শুধুমাত্র মৃত মানুষ সবসময় সতের থেকে যায়।

ওর জন্মদিনের দিন বৃষ্টি ছিল। ক্লাসের পর আমি একটা কেক কিনে স্ট্রিট কারে চড়ে ওর অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হলাম। "আমাদের অবশ্যই উদযাপন করা উচিত," বললাম তাকে। আমার জায়গায় ও হলেও একই জিনিস চাইতাম আমি। একা বিশতম জন্মদিন পার করা আমার মতে খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। স্ট্রিট কার ছিল লোকজনে ভরা আর ড্রাইভার মাতালের মত চালাচ্ছিল। নাওকোর বাসায় যখন পৌঁছলাম তখন কেকের চেহারা ভর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে রোমান কলোসিয়ামের মত। তারপরেও বিশটি মোমবাতি জালালাম কেকের উপর, পর্দা দিয়ে জানালা ঢাকলাম, বাতি নেভালাম, যতটা সম্ভব বার্থডে পার্টির মত করা যায় করলাম। নাওকো ওয়াইনের বোতল খুলল। আমরা পান করলাম, কেক খেলাম, খুবই সাধারণ একটা ডিনার করলাম।

"বুঝতে পারছি না, বয়স বিশ হয়ে যাওয়ায় নিজেকে বোকা বোকা লাগছে," সে বলল। "আমি ঠিক প্রস্তুত নই। কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছে কেউ পেছন থেকে ঠেলছে।""আমার হাতে আরও সাত মাস আছে প্রস্তুত হওয়ার," হাসতে হাসতে বললাম আমি।

"তুমি কত ভাগ্যবান! এখনো উনিশ!" স হিংসার সুরে বলেছিল সে।

খেতে খেতে আমি তাকে স্টর্ম ট্রুপারের নতুন সোয়েটারের কাহিনী বললাম। এতদিন বেচারার একটাই সোয়েটার ছিল। স্কুলের নেভি ব্লু সোয়েটার। এখন দুটো সোয়েটার মানে তার জন্য বিশাল ব্যাপার। নতুনটা সুন্দর ছিল, লাল কালো রঙের, উপরে হরিণের মোটিফ করা। কিন্তু সে পরে বের হলেই সবাই হাসাহাসি করত। সে বুঝে উঠতে পারছিল না সমস্যাটা কোথায়।

"সবাই আমাকে দেখে এ-এত হাসছে কেন, ওয়াতানাবে?" সে ডাইনিং হলে আমার পাশে বসতে বসতে জানতে চাইলো। "আমার মাথায় কি কিছু লেগে আছে নাকি?"

"মোটেই না," হাসি চেপে বললাম আমি। "হাসির কিছু নেই। সোয়েটারটা সুন্দর হয়েছে।"

"থ্যাঙ্কস," খুশি হয়ে বলল সে।

নাওকোর খুব পছন্দ হল গল্পটা। "আমার উচিত ওর সাথে দেখা করা," সে বলল, "মাত্র একবার।"

"কখনো না। তুমি ওর মুখের উপর হেসে ফেলবে।"

"তোমার তাই মনে হয়?"

"বাজি ধরে বলতে পারি। আমি ওকে প্রতিদিন দেখি কিন্তু তারপরেও মাঝে মাঝে হাসি থামাতে কষ্ট হয়।"

আমরা টেবিল পরিস্কার করে মেঝেতে বসে গান শুনতে শুনতে বাকি ওয়াইনটুকু শেষ করলাম। আমি এক গ্লাস শেষ করার আগেই ও দুই গ্লাস শেষ করে ফেলল।

অন্যদিনের চেয়ে সে রাতে নাওকো অনেক বেশি কথা বলছিল। সে তার ছোটবেলার কথা বলল, তার স্কুলের কথা, তার পরিবারের কথা। প্রতিটি পর্ব ছিল দীর্ঘ। একদম খুঁটিনাটি বলেছিল। আমি ওর স্মৃতিশক্তিতে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা ঠিক নেই। অদ্ভুত কিছু একটা, কোথায় যেন কেমন ওলট পালট। প্রত্যেক গল্পের একটা নিজস্ব ধারা ছিল, কিন্তু একটা অংশ থেকে আরেকটা অংশের সংযোগ ঠিক ছিল না। কিছু বোঝার আগেই গল্প ১ বদলে গল্প ২-তে ঢুকে গেল সাথে গল্প ১-ও চলছে, আবার গল্প ২-এর থেকে কোথাও থেকে গল্প ৩ বের হল কিন্তু শেষ হল না। আমি প্রথম প্রথম কিছু মন্তব্য করেছিলাম, পরে বাদ দিলাম। একটা রেকর্ড চালিয়ে দিলাম, গান যখন সব শেষ হয়ে গেল, পিন তুলে আরেকটা চালালাম। যখন সব রেকর্ড শেষ হয়ে গেল আবার প্রথম থেকে শুরু করলাম। ওর কাছে সব মিলিয়ে মাত্র ছয়টা রেকর্ড ছিল। শুরু হল 'সার্জেন্ট পিপারস লোনলি হার্ট ব্যান্ড' দিয়ে, শেষ হল বিল ইভান্সের 'ওয়াল্টজ ফর ডেবি' দিয়ে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। সময় যেন নড়ছিল না। আর নাওকো তার কথা বলেই চলছিল।

আমি অবশ্য পরে টের পেলাম সমস্যাটা কোথায়। নাওকো তার গল্প বলায় কিছু ব্যাপার এড়িয়ে যাচ্ছিল, যেমন কিজুকি। কিন্তু কিজুকি ছাড়াও আরো কিছু ব্যাপার ছিল, সেগুলো বাদ দিয়ে সে অনেক মামুলি ব্যাপার-স্যাপার অনেক যত্নের সাথে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলছিল। আমি এর আগে তাকে এভাবে কথা বলতে দেখিনি, তাই তাকে বাধাও দেইনি। বলতে চায় বলতে থাকুক।

কিন্তু ঘড়ির কাঁটা যখন এগারোটা ছুঁল, আমি নার্ভাস হতে শুরু করলাম। সে তখনও কোন বিরতি না দিয়ে প্রায় চার ঘন্টা ধরে বকেই চলেছে। আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম, কারন কারফিউ আছে আর আমাকে শেষ ট্রেন ধরতে হবে। তখন হঠাৎ এক জায়গায় কথা বলার সুযোগ পেলাম।

"বাসায় ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। শেষ ট্রেন এল বলে।"

আমার কথা সে কিছু শুনতে পেয়েছে মনে হল না, বা শুনলেও কিছু মাথায় ঢোকেনি হয়ত। সে এক মুহূর্তের জন্য বিরতি দিয়ে আবার গল্প বলায় ফিরে গেল। আমি ট্রেনের আশা ছেড়ে দিয়ে আরাম করে বসলাম। দ্বিতীয় বোতলে

তখনও কিছু ওয়াইন বাকি ছিল। আমার মনে হল ওকে মন খুলে কথা বলতে দেয়া উচিত। কারফিউ আর ট্রেন জাহান্নামে যাক।

এরপর ও অবশ্য আর বেশিক্ষণ কথা বলেনি। হঠাৎ করে কিছু বোঝার আগেই গল্প থামিয়ে দিল। তার শেষ শব্দ মনে হল বাতাসে ভাসতে ভাসতে খসে পড়ল। সে এমনকি যা বলছিল তা শেষও করেনি। তার কথাগুলো স্রেফ হারিয়ে গেল। চেষ্টা করল কিন্তু আর কিছু বের হল না। কিছু একটা যেন বদলে গেছে আর সম্ভবত আমি সেজন্য দায়ি। আমার কথাগুলো হয়ত এতক্ষনে তার কাছে পৌঁছেছে, বুঝতে যে সময় লেগেছে তাতে গল্প বলার চালক শক্তিটা নষ্ট হয়ে গেছে। ঠোঁট দুটো হালকা খোলা, সে চোখ অর্ধেক ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল কোন মেশিন, যেটা কিছু করার মাঝখানে প্লাগ খুলে ফেলা হয়েছে। তার চোখদুটো ঘোলাটে।

"বাধা দেয়ার জন্য দুঃখিত," আমি বললাম "কিন্তু ফেরার জন্য দেরি হয়ে যাচ্ছে আর..."

তার চোখ থেকে বড় এক ফোঁটা অশ্রু বেরিয়ে এল, গাল বেয়ে নেমে একটা রেকর্ডের কাভারে পড়ে ছিটকে গেল সেটা। প্রথম অশ্রুর অপেক্ষায় ছিল যেন, এরপর অঝোর ধারায় বাকি অশ্রুও বেরিয়ে আসল। নাওকো যেখানে বসেছিল সেখানে মাদুরে দুহাত রেখে কাঁদতে থাকল। আমার জীবনে আমি কখনো এত গভীরভাবে কাঁদতে দেখিনি কাউকে। কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত রাখলাম, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি থেকে তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলাম আমি। সে কোন শব্দ ছাড়া কাঁদছিল আর তার শরীর কেঁপে উঠছিল। আমার শার্ট ভিজে গেল। একসময় ওর হাত আমার পিঠে এমনভাবে ঘুরছিল যেন সেখানে কিছু খুঁজছে। ওকে বাম হাত দিয়ে ধরেছিলাম আমি, ডান হাত দিয়ে ওর সোজা চুলগুলোর ভেতর হাত বুলালাম। আর অপেক্ষায় থাকলাম কখন কান্না থামে। কিন্তু নাওকোর কান্না বন্ধ হল না।

সে রাতে নাওকোর সাথে বিছানায় গিয়েছিলাম। এমনকি এখনও, এই বিশ বছর পরেও আমি সত্যি জানি না আর কোন উপায় ছিল কিনা। মনে হয় না ভবিষ্যতেও আর কখনো জানতে পারবো। কিন্তু তখন সেই রাতে আমার আর কোন উপায় ছিল না।

তার দুশ্চিন্তা আর অধৈর্য আচরণ আমার কাছ থেকে সে কি চাচ্ছিল সে বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছিল।

আমি তখন আলো নিভিয়ে দিলাম আর তার দেহ থেকে আলতো স্পর্শে কাপড়গুলো সরিয়ে তাকে অনাবৃত করে ফেললাম। তার সাথে নিজের

কাপড়গুলোও খুলে নিলাম। এপ্রিলের সেই বৃষ্টিস্নাত রাত আমাদের জন্য ক্রমশই উষ্ণ হয়ে উঠলো। একজন আরেক জনের নগ্ন দেহকে আমরা এমনভাবে জড়িয়ে রেখেছিলাম যে, আমাদের শরীরের উষ্ণতায় পরিবেশের শীতলতা আর আমাদের স্পর্শ করলো না। অন্ধকারের মাঝে আমরা একে অপরের দেহের বিভিন্ন অংশ নগ্ন স্পর্শের মাধ্যমে খুঁজে নিচ্ছিলাম। আলোর কোন প্রয়োজন ছিল না। তার ছোট কোমল স্তন দুটোকে আমার হাতের মুঠোয় নিয়ে চুমু খেয়েছিলাম। আর সে আমার লিঙ্গ চেপে ধরে রেখেছিল। এক উষ্ণ-সিক্ত আহ্বানে নাওকো জানিয়ে দিয়েছিল তার ভেতরে আমাকে পাবার আকাঙ্খা।

কিন্তু যখন তার দেহের ভেতরে প্রবেশ করালাম ব্যথায় তার শরীর কেঁপে উঠলো। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম এটিই তার প্রথম ছিল কিনা। সে সম্মতি-সূচক মাথা ঝাকালো। অথচ ভেবেছিলাম সে আর কিজুকি একসাথে শুয়ে অভ্যস্ত। তারপর আমি অনেকটুকু সময় তাকে জড়িয়ে ধরে স্থির পড়ে থাকলাম। একসময় সে শান্ত হয়ে আসলো আর আমি আবার ধীরে ধীরে নড়তে লাগলাম। অবশেষে সে নিরবতা ভেঙে আমাকে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদে ফেঁটে পড়লো যা ছিল আমার শোনা করুণতম অর্গাজমের আর্তনাদ।

সবকিছু পর আমি নাওকোকে জিজ্ঞেস করলাম কেন সে কিজুকির সাথে কিছু করেনি। প্রশ্নটা করা ছিল বিশাল ভুল। সাথে সাথে সে ঘুরে শুল, নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল আবার। আমি ক্লজিট থেকে বিছানা বের করে বিছিয়ে তাতে নাওকোকে শুইয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম তার শরীর। তারপর সিগারেট ধরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের বৃষ্টি দেখতে থাকলাম। এপ্রিলের অবিরাম বৃষ্টি।

সকাল হলে বৃষ্টি থামল। নাওকো আমার দিকে উলটো ফিরে ঘুমাচ্ছিল। কিংবা সে হয়ত একদমই ঘুমায়নি। জেগে থাকুক আর ঘুমিয়ে থাকুক, তার ঠোঁটে কোন কথা ছিল না। সে একদম অনড় পড়েছিল। আমি কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা চালালাম, কিন্তু সে কোন উত্তরও দেয়নি, নড়াচড়াও করেনি। অনেকক্ষণ ওর নগ্ন কাঁধের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে সব আশা বাদ দিয়ে উঠে পড়লাম।

আগের দিনের আধ-খাওয়া কেক টেবিলে পড়ে ছিল। সিগারেটের ছাইদানি, রেকর্ডের প্লাস্টিক জ্যাকেট, গ্লাস আর ওয়াইনের বোতলে মেঝে নোংরা হয়ে ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল সময় যেন এখানে থমকে গেছে। আমি মেঝে থেকে জিনিসপত্র তুলে পরিস্কার করে সিঙ্ক থেকে দু গ্লাস পানি খেলাম। নাওকোর ডেস্কে ছিল একটা ডিকশনারি আর ফ্রেঞ্চ ক্রিয়াপদের চার্ট। দেয়ালে একটা ছবি ছাড়া ক্যালেন্ডার ঝুলানো, খালি সংখ্যা আর দিন-মাসের নাম লেখা।

মেঝে থেকে তুলে আমি আমার কাপড় পরলাম। শার্টের সামনের দিক

তখনো ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে। নাওকোর গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছিল সেখানে। আমি ডেস্কে গিয়ে নোটপ্যাডে লিখলাম, 'যখন তুমি শান্ত হবে তোমার সাথে অনেক কিছু নিয়ে কথা বলতে চাই। আমাকে ফোন কোরো। শুভ জন্মদিন।' নাওকোর নগ্ন কাঁধের দিকে আরেকবার তাকিয়ে আস্তে করে দরজা লাগিয়ে বেরিয়ে গেলাম আমি।

সপ্তাহ পার হয়েছে গেল, কোন ফোন আসল না। নাওকোর অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করে ডেকে আনানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরের রবিবার সকালে আমি কোকুবুঞ্জির ট্রেনে চেপে বসলাম। সে বাসায় ছিল না, দরজা থেকে তার নাম সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। জানালা বন্ধ আর পর্দা নামানো। ম্যানেজার বলল নাওকো তিনদিন আগে তার সবকিছু এখান থেকে নিয়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে তার জানা নেই।

ডরমে ফিরে এসে আমি নাওকোর কোবের বাসার ঠিকানায় লম্বা একটা চিঠি লিখলাম। সে যেখানেই গিয়ে থাকুক তার বাসার লোকজন নিশ্চয়ই সেখানে চিঠি পাঠিয়ে দেবে।

আমি চিঠিতে তাকে আমার মনে থাকা সত্যি কথা সব খুলে বললাম। বললাম, আমি অনেক কিছু নিয়ে নিশ্চিত নই, এখনো বোঝার চেষ্টা করে যাচ্ছি, হয়ত কিছু সময় লাগবে বুঝতে। একসময় আমার অবস্থান যেখানে ছিল তা এখন আর নেই। সেজন্য আমার পক্ষে বলা মুশকিল, কোন প্রতিজ্ঞা করা বা দাবি করা মুশকিল। কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক যে, আমরা দু-জন দু-জনকে অনেক কম জানি। সে যদি আমাকে সময় দেয়, আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো তাকে বোঝার। যাহোক না কেন, আমি চাই আমাদের আবার দেখা হোক, আর আমরা আগের মত একটা লম্বা হাঁটায় যেতে চাই। যখন আমি কিজুকিকে হারিয়েছিলাম, হারিয়েছিলাম এমন একজনকে যার সাথে মন খুলে সত্যি কথা বলতে পারতাম। নিজের অনুভূতি পুরোপুরি জানাতে পারতাম। আমার মনে হচ্ছিল নাওকোর সাথেও সেটা সম্ভব। আমাদের যা দরকার ছিল তা আমার আর ওর মধ্যে আছে আর সেজন্যই আমাদের সম্পর্ক এরকম একটা বাঁক নিয়েছে। "আমি যা করেছি তা করা হয়ত ঠিক হয়নি, যদিও আমি বিশ্বাস করি সে সময় আর কিছু আমার করার ছিল না। তোমার জন্য যে আবেগ আমি তখন অনুভব করেছি তা এর আগে আমার কখনো কারো জন্য হয়নি। আমি তোমার উত্তর চাই। উত্তর যাহোক না কেন আমাকে তা জানতে হবে।"

কোন উত্তর এলো না।

আমার ভেতর থেকে কিছু একটা হারিয়ে গেল যেন। যেন গুহা থেকে বের

হয়ে গেছে কিছু একটা, আর ফিরে আসেনি। অস্বাভাবিক হালকা লাগত নিজেকে। শব্দ যেন ভেতরে ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলতো। আমি আগের চেয়ে ভালোভাবে ক্লাস করা শুরু করলাম। লেকচার খুবই ফালতু হত, আমি কারো সাথে কথাও বলতাম না, কিন্তু আর কিছু করারও ছিল না। লেকচার হলের সামনে সারিতে আমি একা বসে থাকতাম, কোন কথা বলতাম না, একা একা খেতাম। ধূমপান ছেড়ে দিয়েছিলাম।

মে মাসের শেষে শিক্ষার্থীদের ধর্মঘট শুরু হল। 'বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দাও,' তারা চিৎকার করে বলল। যাও যাও করো গিয়ে–আমি মনে মনে বললাম। অচল করে দাও। ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলো। আমার কিছু আসে যায় না। আমি বুক খুলে শ্বাস নিতে চাই। আমি সব কিছুর জন্য তৈরি। আমার সাহায্য লাগলে আমি আছি। এগিয়ে যাও, যা যা খুশি করো।

ক্যাম্পাস বন্ধ, ক্লাস বন্ধ। আমি একটা পরিবহন কোম্পানিতে চাকরি শুরু করলাম। শটগান নিয়ে বসে থাকা, ট্রাকে মালামাল ওঠাতে আর নামাতে হাত লাগানো, এই সব কাজ আরকি। আমার ধারনার চেয়ে কাজটা বেশ কঠিন ছিল। সকালে বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে ব্যথায় খবর হয়ে যেত। অবশ্য টাকা-পয়সা ভালো দিত। যতক্ষণ আমার শরীর চলত ততক্ষন ভেতরের শূন্যতা ভুলে থাকতে পারতাম। আমি সেখানে সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ করতাম, আর তিন রাত কাজ করতাম রেকর্ড শপে। যে রাতে কাজ থাকতো না আমি বই আর হুইস্কি নিয়ে পড়ে থাকতাম। স্টর্ম ট্রুপার হুইস্কি খেত না, গন্ধও সহ্য করতে পারত না। আমি বিছানায় শুয়ে সরাসরি বোতলে মুখ লাগিয়ে পান করতাম আর সে অভিযোগ করত গন্ধে পড়াশুনা করতে পারছে না। বাইরে গিয়ে খেতে বলতো।

"জাহান্নামে যাও তুমি," আমি চিৎকার করে বলতাম তাকে।

"কিন্তু তুমি তো জানো, ডরমে মদ খাওয়া নি-নিয়মে নেই।"

"আমার কিচ্ছু আসে যায় না, তুমি বেরিয়ে যাও।"

সে আর কথা বলতো না কিন্তু আমি বিরক্ত হয়ে ছাদে চলে যেতাম আর একা একা পান করতাম।

জুন মাসে আমি নাওকোর কোবের বাসার ঠিকানায় আরেকটি বড় চিঠি পাঠালাম। চিঠির বক্তব্য প্রায় প্রথমটার মতই ছিল, খালি শেষে যোগ করলাম, "তোমার উত্তরের অপেক্ষা করার চেয়ে কষ্ট আমি জীবনে আর কিছুতে পাইনি। অন্তত এটা জানাও, আমি তোমাকে কোনভাবে আঘাত করেছি কিনা।" চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে আমার মনে হল আমার ভেতরের গুহাটা যেন আরো বড় হয়ে গেছে।

জুনে আমি দু-বার নাগাসাওয়ার সাথে বাইরে গেলাম মেয়েদের সাথে রাত কাটাতে। দুবারই ব্যাপারটা সহজ ছিল। প্রথম মেয়েটা ধস্তাধস্তি লাগিয়ে দিয়েছিল যখন আমি হোটেলের বিছানায় তার কাপড় খুলতে গেলাম। বিরক্ত হয়ে বাদ দিয়ে আমি যখন বই পড়তে লাগলাম তখন সে আবার এসে ঘষাঘষি শুরু করল। আর দ্বিতীয় মেয়েটা সেক্সের পর শুরু করল যাবতিয় ব্যক্তিগত প্রশ্ন–কতজন মেয়ের সাথে শুয়েছি, কোত্থেকে এসেছি, আমার স্কুল কি ছিল, কি ধরনের গান আমার পছন্দ, অসামা দাজাই'র লেখা পড়েছি কিনা, দেশের বাইরে আমি কোথায় ঘুরতে যেতে চাই? আমার কি মনে হয় তার নিপল অনেক বড়? আমি বানিয়ে বানিয়ে কিছু উত্তর দিয়ে ঘুমাতে গেলাম, কিন্তু পরদিন সকালে সে জানাল সে আমার সাথে নাস্তা করতে চায়। নাস্তায় ডিম, টোস্ট আর কফি খেতে খেতে আবার সে প্রশ্নের ঝুড়ি খুলে বসল। আমার বাবা কি কাজ করত? স্কুলে আমার গ্রেড কেমন ছিল? আমার জন্মদিন কবে? আমি কখনো ব্যাঙ খেয়েছি কিনা? আমার রীতিমত মাথা ধরে গিয়েছিল। নাস্তা শেষ হওয়ামাত্র আমি বললাম আমাকে কাজে যেতে হবে।

"আবার কি আমাদের দেখা হবে?" সে করুণ মুখ করে বলল।

"আমি নিশ্চিত, আবার কোথাও না কোথাও দেখা হবে।" বললাম আমি তারপর বেরিয়ে গেলাম। একা হতেই নিজের উপর ঘেন্না চলে আসল আমার। এসব কি করছি আমি? অথচ আর কি কিছু করার ছিল। আমার শরীর নারীদেহের জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে ছিল। যখন ঐ মেয়েদের সাথে রাত কাটাচ্ছিলাম, আমি আসলে ভাবতাম নাওকোর কথা। অন্ধকারে তার সাদা নগ্ন দেহের কথা। তার দম ফেলার শব্দ, বাইরে বৃষ্টির শব্দ। যতই এসব আমার মাথায় আসছিল ততই আমার শরীর ক্ষুধার্ত হয়ে উঠছিল। আমি হুইস্কির বোতল নিয়ে ছাদে গেলাম, নিজেকে প্রশ্ন করলাম কোথায় এগুচ্ছি আমি।

অবশেষে জুলাই'র প্রথমে, নাওকোর কাছ থেকে উত্তর এল। ছোট একটা চিঠি।

'আমাকে ক্ষমা কোরো সাথে সাথে উত্তর দিতে পারিনি বলে। কিন্তু বোঝার চেষ্টা করো, কিছু লেখার অবস্থায় আসতে আমার অনেক সময় লেগেছে। আমি এই নিয়ে অন্তত দশবার লেখার চেষ্টা করেছি। কিছু লেখা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর।

আমার শেষ দিয়ে লেখা শুরু করি। আমি স্কুল থেকে এক বছরের জন্য ছুটি নিয়েছি। অফিসিয়ালি এটা ছুটি, কিন্তু আমার ধারনা আমি আর কখনো ফিরে যাব না। তুমি হয়ত অবাক হবে এটা জেনে কিন্তু আমি

অনেকদিন থেকে এরকম কিছু করার কথা ভাবছিলাম। তোমাকে অনেকবার বলতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি। আমি এমনকি শব্দ উচ্চারণ করতেও ভয় পাই।

যা হয়েছে তা নিয়ে ভেবো না। যা হয়েছে বা হয়নি, ফলাফল সবসময়ই একই। এভাবে বলা হয়ত ঠিক হচ্ছে না, আমি দুঃখিত যদি তুমি দুঃখ পেয়ে থাকো। আমি যা বলার চেষ্টা করছি তা হল আমার যা হয়েছে তার জন্য তুমি নিজেকে দায়ি কোরো না। এর দায়িত্ব পুরোপুরিই আমার। আমি এক বছরের বেশি সময় ধরে এভাবে চলছি আর তাই শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা তোমার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বেশি আর কিছু সম্ভব নয়।

আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আমি কোবেতে আমার বাবা-মায়ের কাছে ফিরে এসেছিলাম। একজন ডাক্তার আমাকে কিছুদিন চিকিৎসা করেছেন। তিনি বলেছেন কিয়োটোর বাইরে পাহাড়ের ভেতর একটা জায়গা আছে, আমার জন্য ভালো হবে। আমি ভাবছি সেখানে কিছুদিন থাকবো। জায়গাটা ঠিক হসপিটালের মত নয়, একটু অন্য পদ্ধতিতে চিকিৎসা হয় সেখানে। আমি পরে আরেক চিঠিতে বিস্তারিত জানাবো তোমাকে। এখন আমার দরকার এই দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্নায়ুগুলোকে বিশ্রাম দেয়া।

আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ গত এক বছর তুমি আমাকে যে সময় দিয়েছো তার জন্য। তুমি যদি আমার আর কোন কথা বিশ্বাসও না করো, দয়া করে এটা কোরো। তুমি আমাকে কোন কষ্ট দাওনি। আমি নিজেই নিজেকে কষ্ট দিয়েছি। আমি সেটা অনুভব করতে পারছি।

যাইহোক, এই মুহূর্তে আমি তোমার সাথে দেখা করার জন্য প্রস্তুত নই। এমন না যে, আমি তোমাকে দেখতে চাই না, আমি স্রেফ তৈরি নই। যখন মনে হবে আমি তৈরি, তোমাকে লিখে জানাবো। আসলেই হয়ত আমরা দু-জন দু-জনকে ভালোভাবে বুঝতে পারবো। তোমার কথামত, আমাদের হয়ত তাই করা উচিত–একজন আরেকজনকে ভালোভাবে জানা।

গুডবাই।'

আমি ওর চিঠি বার বার পড়লাম। প্রতিবার পড়ার সাথে অন্যরকম কষ্ট অনুভব করলাম। নাওকো আমার চোখে তাকালে যেরকম লাগত। এই কষ্ট কিভাবে কি করবো বুঝতে পারছিলাম না, না পারছিলাম বইতে না পারছিলাম

কোথাও লুকাতে। যেন শরীরের উপর দিয়ে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে অথচ এর কোন সত্তা নেই, কোন ওজন নেই, আবার নিজেকে ঢাকতেও পারছি না। আশেপাশের সবকিছু আমাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তাদের শব্দ আমার কান পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল না।

শনিবার রাত লবিতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কোন ফোন আসবে এমন আশা ছিল না, কিন্তু আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম না ঐ সময়ে কি করবো। কখনও হয়ত টিভি চালিয়ে বেইজবল দেখার ভান করতাম। কিন্তু তারপর টিভি আর আমার মধ্যের দূরত্বকে মনে মনে দুই ভাগ করতাম। তার পর প্রতি ভাগকে আরো ভাগ করতাম, তারপর আরো, যতক্ষণ না আমার হাতের সমান হত।

দশটা বাজলে টিভি বন্ধ করে আমার রুমে ফিরে যেতাম ঘুমাতে।

সেই মাসের শেষে স্টর্ম ট্রুপার আমাকে একটা জোনাকি দিল। একটা কফি জারের মধ্যে জোনাকি ভরে সাথে কিছু ঘাস আর অল্প পানি রাখা। জারে বাতাসের জন্য ছোট ছিদ্র করা। আলোর মধ্যে জোনাকি দেখতে সাধারণ একটা পোকার মত, ডোবার আশেপাশে যেমন দেখা যায়। কিন্তু স্টর্ম ট্রুপার জোর করে বলল এটা আসল জোনাকি। "আমি আসল জোনাকি দেখলেই চিনতে পারি," সে বলল আর আমি দ্বিমত করার কোন কারন দেখলাম না।

"আচ্ছা ঠিক আছে," আমি বললাম, "এটা আসল জোনাকি।" জোনাকিটা মনে হচ্ছিল ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে আছে, কাঁচের পিচ্ছিল দেয়াল বেয়ে উঠে আবার পড়ে যাচ্ছিল।

"মাঠ থেকে ধরেছি," সে বলল।

"এখানে? ডরমের মাঠ থেকে?"

"হ্যাঁ। তুমি রাস্তা দিয়ে নেমে গেলে যে হোটেলটা পড়ে দেখছো? তারা তাদের বাগানে জোনাকি ছাড়ে অতিথিদের আকর্ষণ করতে। ওগুলোর একটা বোধহয় ভুলে এখানে চলে এসেছে।"

কথা বলার পাশাপাশি স্টর্ম ট্রুপার তার কালো বোস্টন ব্যাগে জামাকাপড় আর নোটবুক ভরতে ব্যস্ত ছিল।

গ্রীষ্মের ছুটির কয়েক সপ্তাহ খালি, আমি, স্টর্ম ট্রুপার আর দু-চারজন ডরমেটরিতে রয়ে গিয়েছিলাম। আমি কোবে যাওয়ার বদলে আমার চাকরি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, আর সে রয়ে গেছিল তার প্র্যাক্টিকাল ট্রেইনিংয়ের জন্য। ট্রেইনিং এখন শেষ তাই সে ইয়ামানাসির পর্বতে যাচ্ছে।

"তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডকে জোনাকিটা দিও," সে বলল, "আমি নিশ্চিত সে খুশি হবে।"

"থ্যাঙ্কস," আমি বললাম।

সন্ধ্যার পর ডরম যেন কোন পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষের মত নিরব হয়ে পড়তো। পতাকা নামানো হত। ডাইনিং হলের আলো জ্বালানো থাকতো। অল্প কিছু ছাত্র থাকতো বলে বেশিরভাগ আলোই বন্ধ থাকতো। রান্নাঘর থেকে নাকে এসে লাগত ক্রিম স্টু রান্নার সুবাস।

আমি আমার জোনাকির কৌটা নিয়ে ছাদে উঠে গিয়েছিলাম। কেউ ছিল না সেখানে। দড়িতে একটা সাদা আন্ডার-শার্ট ঝুলছিল। কেউ বোধহয় ভুলে গেছিল নিতে। সন্ধ্যার বাতাসে সেটাকে সাদা পোকার মত দেখাচ্ছিল। আমি ছাদের উপর মই বেয়ে পানির ট্যাঙ্কিতে উঠে গেলাম। সারাদিনের সূর্যের তাপে ট্যাঙ্কি তখনও গরম হয়ে ছিল। ট্যাঙ্কির সরু জায়গায় চাঁদের দিকে মুখ করে বসলাম। পূর্ণিমা হতে আর অল্প কদিন বাকি। ডানদিক থেকে সিঞ্জুকোর বাড়িগুলোতে আলো জ্বলে উঠল। আইকেবুকোরোর দিকেরগুলো জ্বলল বাম থেকে। গাড়ির হেডলাইটের আলো দূর থেকে এসে পড়ছিল, সেই সাথে ভোঁতা শব্দ যেন মেঘের মত ঝুলে ছিল শহরে উপর।

জারের ভেতর জোনাকি হালকা মিটমিট করছিল, আলো অনেক দূর্বল। আমি অনেক বছর জোনাকি দেখিনি কিন্তু স্মৃতিতে স্পষ্ট রয়ে গেছে গ্রীষ্মের সময় জ্বল জ্বল করে জোনাকি উড়ে বেরাচ্ছে।

হয়ত এই জোনাকিটার মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে। জার ধরে কয়েকবার ঝাকি দিলাম। জোনাকি কাঁচের দেয়ালে কয়েকবার বাড়ি খেয়ে ওড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু আলো আর উজ্জ্বল হল না।

আমি মনে করার চেষ্টা করলাম শেষ কবে জোনাকি দেখেছি, কোথায় দেখেছি। দৃশ্যটা মনে করতে পারছি কিন্তু স্থান-কাল মনে পড়ছে না। অন্ধকারে পানির শব্দ পাচ্ছি, পুরাতন ধরনের ইটের তৈরি জলাধারে। একটা হাতল ছিল যেটা দিয়ে মুখ খোলা বা বন্ধ করা যেত। ঘাসের ভেতর লুকানো খাল দিয়ে এর পানি বেয়ে যেত। রাতের আঁধারে আমি পা কোথায় ফেলছিলাম দেখা যাচ্ছিল না। ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে রেখেছিলাম। শত শত জোনাকি পানির উপর উড়ছিল। তাদের জ্বলজ্বলে আলো পানির উপর পড়ে মনে হচ্ছিল যেন আলোর ফোয়ারা।

আমি চোখ বন্ধ করে সেই সময়ের অন্ধকার অনুভব করতে চাইলাম। বাতাসের শব্দ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। অন্ধকারে ঝরো বাতাস আমাকে পাশ কাটিয়ে গেল। চোখ খুলে মনে হল গ্রীষ্মের অন্ধকার আরো গভীর হয়েছে আগের থেকে।

জারের মুখ খুলে জোনাকিটা বের করে ট্যাঙ্কির কোনায় রাখলাম। নতুন

জায়গা মনে হয় ওটা বুঝে উঠতে পারছিল না। ট্যাঙ্কির হাতলের ঘিরে চক্কর খাচ্ছিল। ডানে গিয়ে ধাক্কা খেল তারপর আবার ঘুরে বামে গেল। অবশেষে কোনরকমে হাতলের উপর গিয়ে বসল। নড়াচড়া বন্ধ যেন দম শেষ।

রেলিঙের সাথে ঠেস দিয়ে বসে আমি জোনাকিটাকে পরীক্ষা করলাম। অনেকক্ষণ হয়ে গেল নড়াচড়া করেনি। আমাদের দু-জনের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যেতে থাকল। অন্ধকারে জেস্কভা গাছের অসংখ্য পাতা বাতাসে শব্দ করছে। আমি অনন্তকাল ধরে বসে থাকলাম।

অনেকক্ষণ পর জোনাকিটা বাতাসে উড়ল। যেন হঠাৎ কোন চিন্তা মাথায় এসেছে। ডানা উড়িয়ে রেলিঙের উপর দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে পানির ট্যাঙ্কির উপর ঘুরল তারপর কয়েক সেকেন্ড ভেসে থেকে আলোর একটা বাঁক তুলে শেষ পর্যন্ত উড়ে গেল পুবে।

জোনাকি হারিয়ে যাওয়ার অনেক পর পর্যন্ত এর আলোর রেশ রয়ে গেল আমার কাছে। এর মরা আলো গাঢ় অন্ধকারের ভেতর যেন ঘুরতে লাগল হারিয়ে যাওয়া আত্মার মত।

বার দুয়েক অন্ধকারে হাত বাড়ালাম। আঙুলে কিছুরই ছোঁয়া লাগল না। হালকা মরা আলো রয়ে গেছে কিন্তু সকল ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

অধ্যায় ৪

গ্রীষ্মের ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দাঙ্গা পুলিশ ডাকল। পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে ঢুকে ছাত্রদের গ্রেফতার করল। বেশি কিছু হল না। তখন সবজায়গাতেই এমন হচ্ছিল। একটা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া চাট্টিখানি কথা না। কতরকমের বিনিয়োগ থাকে এর পেছনে। কয়েকজন ছাত্র পাগল হয়ে গেলেই তো আর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া যায় না। এমনকি যারা বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে রেখেছিল তারাও চাইতো না বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাক। তারা স্রেফ চাচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতায় কিছু অদল-বদল করতে, যা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা ছিল না। সুতরাং যখন ধর্মঘট শেষ হলো আমার বিশেষ কোন অনুভূতি হল না।

সেপ্টেম্বরে ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময় আমি ভাবছিলাম এখানে সেখানে হয় ইট-পাথর পড়ে থাকতে দেখবো। কিন্তু জায়গাটা পুরোপুরি অক্ষত ছিল। লাইব্রেরির বইগুলো ঠিকঠাক আছে, প্রফেসরদের অফিসে ভাংচুর হয়নি, স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের অফিসে আগুন দেয়া হয়নি। বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলাম গাধাগুলো তাহলে ব্যারিকেড দিয়ে এতদিন কি কচু করল?

ধর্মঘট ভাঙার পর পুলিশের নজরদারিতে যখন লেকচার আবার শুরু হল, প্রথম ক্লাসে ঢুকল ঐ গাধাগুলো যারা ধর্মঘট ডেকেছিল। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন কিছুই হয়নি। তারা ক্লাসে বসে রোল কলের উত্তর দিচ্ছিল আর লেকচার নোট নিচ্ছিল। আমার মজা লাগছিল দেখে। কারণ আন্দোলনের সমাধান তখনো হয়নি। তারা তখনও আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা দেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ডেকেছিল, পুলিশ এসে ব্যারিকেড ভেঙে দিয়েছিল কিন্তু আন্দোলন তো নিজে নিজে চলার কথা। যেসব গাধার বাচ্চাগুলো আন্দোলন আন্দোলন চিৎকার করে মারা যাচ্ছিল তখন, আর যেসব ছাত্ররা আন্দোলনের পক্ষে ছিল না (কিংবা সন্দেহ প্রকাশ করেছিল) বলে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা নিচ্ছিল, তাদের নেতাদের আমি খুঁজে খুঁজে জিজ্ঞেস করলাম কেন তারা ক্লাস করছে এখন। তারা কেউ আমাকে স্পষ্ট কোন উত্তর দিল না। তারা আর কি বলবে? যে তারা অনুপস্থিত থাকলে ক্রেডিট কমে যাবে সেই ভয়ে ছিল? এই সাহস নিয়ে তারা নাকি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে চেয়েছিল। কী হাস্যকর

ব্যাপার। বাতাস অন্যদিকে ঘুরতেই তাদের কান্না ফিসফিসে বদলে গেল।

বন্ধু কিজুকি, আমার মনে হয় না তুমি এই দুনিয়ার কিছু মিস করছো। এই দুনিয়া নোংরা আবর্জনায় ভর্তি। এই গাধাগুলো পড়াশুনা শেষ করে তাদের নোংরা চরিত্রের মতই একটা নোংরা সমাজ তৈরি করবে।

আমি কিছুদিন ক্লাস করলাম কিন্তু রোল ডাকলে উত্তর দিতাম না। জানতাম এর কোন অর্থ নেই। আমার খারাপ লাগত কিন্তু কিছু করার ছিল না। আমি শুধু আমার ক্লাসমেটদের থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করতাম। যখন আমার নাম ডাকা হত অথচ উত্তর দিতাম না সবাই তখন অসস্থিতে পড়তো। তাদের কেউ আমার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেনি, আমিও নিজে থেকে কোন কথা বলিনি।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মেনে নিলাম, কলেজে পড়ার আর কোন মানে নেই। শুধু একঘেয়েমি কাটানোর জন্য যেতাম। আমি সমাজে এমন কোন কিছু অর্জনের আশা করতাম না যার জন্য পড়াশুনা ছাড়তে হবে, তাই প্রতিদিন ক্লাসে যেতাম, লেকচার নোট নিতাম। ক্লাস না থাকলে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়তাম অথবা ঘুরাঘুরি করতাম।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ এসে গেলেও স্টর্ম ট্রুপারের ফেরার কোন চিহ্ন নেই। পুরোই অস্বাভাবিক ব্যাপার, দুনিয়া কাঁপানোর মত ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয় খুলে গেছে অথচ স্টর্ম ট্রুপার ক্লাসে নেই এটা হতেই পারে না। তার ডেস্ক আর রেডিওর উপর ধুলোর হালকা আস্তর পড়েছিল। তার প্লাস্টিকের কাপ, টুথব্রাশ, চায়ের কৌটা, কীটনাশক স্প্রে সব সুন্দর করে শেলফে এক সারিতে সাজানো।

তার অবর্তমানে আমি রুম পরিস্কার করে রাখলাম। গত দেড় বছরের শিক্ষা অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। দিনে একবার ঘর ঝাড়ু দিলাম, প্রতি তিন দিনে একবার জানালা মুছলাম, সপ্তাহে একবার ম্যাট্রেসগুলো রোদে দিলাম। অপেক্ষায় থাকলাম কখন সে ফিরে এসে বলবে কত ভালো কাজ করেছি।

কিন্তু সে আর ফিরেই এল না, একদিন ক্লাস থেকে ফিরে দেখি তার সব জিনিস উধাও আর দরজা থেকেও নাম সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ডরম প্রধানের অফিসে গেলাম জানতে ব্যাপারটা কি।

"সে আর ডরমে থাকছে না," বলল সে, "কিছুদিন তোমাকে রুমে একাই থাকতে হবে।"

তার কাছ থেকে বের করতে পারলাম না স্টর্ম ট্রুপারের হয়েছেটা কি। এই লোকের বিশাল সমস্যা আছে, লোকজনের উপর ছড়ি ঘুরিয়ে আর অন্ধকার রেখে মজা পায়।

স্টর্ম ট্রুপারের আইসবার্গ পোস্টার আরও অনেকদিন ছিল, তারপর আমি সেটা সরিয়ে জিম মরিসন আর মাইলস ডেভিসের পোস্টার লাগিয়েছিলাম। এরপর রুমটা একটু নিজের মত লাগছিল। আমার সঞ্চয় থেকে কিছু টাকা দিয়ে একটা ছোট স্টেরিও কিনলাম। রাতে যখন একা একা মদ খেতাম তখন স্টেরিওতে গান শুনতাম। স্টর্ম ট্রুপারের কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ত কিন্তু একা থাকতেও আমার ভালোই লাগছিল।

এক সোমবার সাড়ে এগারোটায়, নাটকের ইতিহাস ক্লাসে ইউরিপিডেসের উপর লেকচারের পর মিনিট দশেক হেঁটে একটা ছোট রেস্টুরেন্টে গেলাম অমলেট আর সালাদ দিয়ে লাঞ্চ করতে। জায়গাটা পেছনের রাস্তায় হওয়ায় গোলমাল কম। ডাইনিঙের চেয়ে খাবারের দাম একটু বেশি হলেও আরাম করে খাওয়া যায় আর তারা জানে কি করে ভালো অমলেট তৈরি করতে হয়। রেস্টুরেন্টটা চালাত এক দম্পতি যারা নিজেদের মধ্যে কোনই কথা বলতো না বলতে গেলে। সাথে ছিল একজন পার্ট-টাইম অয়েট্রেস। আমি সেখানে জানালার পাশে বসে খাচ্ছিলাম, চারজন ছাত্রছাত্রির একটা গ্রুপ এল। দু-জন ছেলে দু-জন মেয়ে, সবাই ভদ্র কাপড়-চোপর পরা। তারা দরজার কাছের টেবিলটা নিল। কিছুক্ষন মেন্যু দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল কি খাবে, তারপর একজন সবার হয়ে অয়েট্রেসকে অর্ডারটা দিল।

কিছুক্ষণ পরেই আমি খেয়াল করলাম মেয়েদের একজন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চুল ছিল একদমই ছোট। চোখে ছিল গাঢ় সানগ্লাস আর পরনে সুতির সাদা মিনি ড্রেস। আমার কোন ধারনা ছিল না সে কে, তাই নিজের মত খেয়ে চললাম। কিন্তু একটু পরেই সে তার সিট থেকে উঠে আসল। আমার টেবিলে এক হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম ওয়াতানাবে, তাই না?"

আমি মাথা উঁচিয়ে তাকে ভালো করে খেয়াল করলাম, কিন্তু মনে করতে পারলাম না কখনো দেখেছি কিনা। সে ছিল সহজে চোখে পড়ে এমন ধরনের মেয়ে, আগে দেখা হয়ে থাকলে মনে পড়তে বাধ্য, আর ভার্সিটিতে খুব বেশি কেউ আমাকে নাম ধরে চেনে না।

"বসলে কিছু মনে করবে?" জিজ্ঞেস করল সে, "নাকি কারো জন্য অপেক্ষা করছো?"

মাথা নাড়লাম, তখনও দ্বিধাগ্রস্ত। "নাহ, কারো জন্য না, বসতে পারো।"

সে একটা চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি বসল। প্রথমে আমার দিকে চেয়ে খাবারের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখে ভালোই মনে হচ্ছে।"

"হুম, বেশ ভালো। মাশরুম অমলেট এবং মটরশুঁটির সালাদ।"

“এহ্ হে!” সে বলল, “আচ্ছা, আগামিবার এটা খাবো, আজকে অন্যকিছু অর্ডার করে ফেলেছি।”

“কি অর্ডার করেছো?”

“মাকারনি অ্যান্ড চিজ।”

“এদের মাকারনি অ্যান্ড চিজও খারাপ না,” বললাম তাকে। “যাহোক, তোমাকে কি আমি চিনি? কারন চিনে থাকলেও আমি মনে করতে পারছি না।”

“ইউরিপিডেস,” সে বলল, “ইলেক্ট্রা। ‘কোন দেবতা আমার অসহায় কান্না শুনতে পায় না’...জানোই তো। ক্লাস মাত্রই শেষ হল।”

ভালো করে তার দিকে তাকালাম। সে তার সানগ্লাস খুলে ফেললে অবশেষে আমি তাকে মনে করতে পারলাম–দেখেছি একে নাটকের ইতিহাস ক্লাসে। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। চুলের স্টাইলে বিশাল অদল বদলের কারনে চিনতে পারিনি প্রথমে।

“আচ্ছা,” আমার কাঁধের কয়েক ইঞ্চি নিচে দেখিয়ে বললাম “ছুটির আগে তোমার চুল এত লম্বা ছিল।”

“ঠিক ধরেছো,” সে বলল। “ছুটির সময়ে আমি চুল পারম করিয়েছিলাম, জঘন্য দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল নিজেকে মেরেই ফেলি। আমাকে দেখে মনে হচ্ছিল সৈকতে পড়ে থাকা কোন লাশ, মাথা ভর্তি সামুদ্রিক আগাছা। তাই ভাবলাম, মারাই যখন যাবো, এরচেয়ে বরং কেটেই ফেলা যাক। গরমে অন্তত আরাম লাগবে,” সে তার পিক্সি কাট চুলে হাত বুলাতে বুলাতে হাসল।

“ভালোই দেখাচ্ছে কিন্তু তোমাকে,” অমলেট খেতে খেতে আমি বললাম। “একপাশে ফিরো তো?”

সে পাশ ফিরে পোজ দিল কয়েক সেকেন্ড।

“হ্যাঁ, এই স্টাইল তোমাকে ভালোই মানিয়েছে। মাথার গঠন, অনাবৃত সুন্দর কান...সব মিলিয়েই।”

“তারমানে, আমি পুরোপুরি পাগল নই! আমার নিজেরও মনে হচ্ছিল চুল কাটার পর আমাকে ভালোই দেখাচ্ছে। একটা ছেলেও এখনো পছন্দ করেনি অবশ্য। তারা বলেছে আমাকে প্রথম শ্রেণিতে পড়া বাচ্চা কিংবা বন্দি শিবির থেকে বেঁচে যাওয়া কয়েদির মত দেখাচ্ছে। ছেলেদের সমস্যা কি? মেয়েদের লম্বা চুলে কি পায় তারা? সব শালা ফ্যাসিস্ট! ছেলেরা কেন মনে করে লম্বা চুলের মেয়েরা সবাই দারুন মিষ্টি আর খুব মেয়েলি? আমি অন্তত আড়াইশ ক্ষ্যাত মেয়েকে চিনি যাদের চুল লম্বা। সত্যি বলছি।”

“আমার মনে হয় তোমাকে এই চুলের স্টাইলে বরং আগের চেয়ে ভালো

দেখাচ্ছে," আমি মন থেকে কথাটা বললাম। যতদূর মনে পড়ে লম্বা চুলে তাকে দেখে শুধুই আরেকটা সুন্দর মেয়ে মনে হত। তার চেয়ে আমার সামনে যে মেয়ে বসে আছে তাকে অনেক সজীব দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে জীবনী শক্তিতে ভরপুর। মনে হচ্ছিল বসন্তের আগমনে মাটি থেকে বেরিয়ে এসেছে ছোট কোন জন্তু। তার চোখ যেন স্বাধীন জীবের আনন্দ, হাসি, রাগ, বিস্ময় কিংবা হতাশা অনুভব করে নিজে থেকে নড়ছে। আমি অনেকদিন কাউকে এমন প্রাণবন্ত, এমন বিচিত্র অভিব্যক্তিসহ দেখিনি, আমার খুব মজা লাগছিল ওকে এরকম নড়েচড়ে কথা বলতে দেখে।

"মন থেকে বলছো?" জানতে চাইলো সে।

মাথা ঝাঁকালাম আমি, তখনও সালাদ খাচ্ছি।

সে তার গাঢ় সানগ্লাস পরে আমার দিকে তাকাল। "তুমি মিথ্যা বলছো না তো, নাকি?"

"আমি নিজেকে সৎ ভাবতে পছন্দ করি," বললাম তাকে।

"অসাধারণ।"

"আচ্ছা বলো, তুমি এরকম গাঢ় সানগ্লাস কেন পরো?"

"হঠাৎ চুল ছোট করে ফেলার নিজেকে অরক্ষিত লাগছিল। যেন কেউ আমাকে উলঙ্গ করে ভিড়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।"

"হুম, বুঝলাম।" অমলেটের শেষ টুকরো মুখে দিয়ে বললাম। সে আগ্রহের সাথে আমার খাওয়া দেখছিল।

"তোমার কি বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে হবে না?" আমি তার তিন বন্ধুর দিকে ইশারা করে বললাম।

"নাহ, খাবার আসুক তখন যাবো, আমি কি তোমার খাওয়ার মধ্যে বিরক্ত করছি?"

"নাহ, বিরক্ত করার মত কিছু বাকি নেই," বললাম আমি। বিদায় হওয়ার কোন লক্ষণ নেই দেখে কফি অর্ডার দিলাম। মালিক দু-জনের মধ্যে বৌটা এসে টেবিল পরিস্কার করে দিয়ে ক্রিম আর চিনি দিয়ে গেল।

"এখন বলো আমাকে," সে বলল, "আজকে যখন তোমার রোল ডাকা হল তখন উত্তর দাওনি কেন? তোমার নামই তো ওয়াতানাবে, তাই না? তরু ওয়াতানাবে?"

"হুম, আমার নামই।"

"তাহলে উত্তর দাওনি কেন?"

"আজকে ইচ্ছে করছিল না।"

সে আবার সানগ্লাস খুলে টেবিলের উপর রেখে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন চিড়িয়াখানায় কোন দুর্লভ প্রাণী দেখছে। "'আজকে ইচ্ছে করছিল না।' হুমম, তোমার কথাবার্তা হামফ্রে বোগারটের মত। কঠিন।"

"হাস্যকর কথা বোলো না। আমি খুবই সাধারণ মানুষ। অন্য সবার মত।"

বৌটা এসে কফি দিয়ে গেল। আমি ক্রিম আর চিনি না মিশিয়েই চুমুক দিলাম।

"দেখো দেখো, তুমিও ব্ল্যাক কফি খাও।"

"হামফ্রে বোগার্টের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই," আমি ধৈর্যর সাথে বললাম, "মিষ্টি আমার পছন্দ না। তুমি আমাকে স্রেফ ভুলভাবে দেখছো।"

"তোমার রঙ এত পুড়ল কি করে?"

"আমি গত কয়েক সপ্তাহ পাহাড়ে ঘুরেছি। ব্যাকপ্যাক। স্লিপিং ব্যাগ।"

"কোথায় গিয়েছিলে?"

"কানাজায়া। নোটো পেনিন্সুলা। নিগাতা পর্যন্ত।"

"একা?"

"একা," বললাম তাকে, "যদিও মাঝে মধ্যে কিছু সঙ্গি পেয়েছিলাম।"

"রোমান্টিক সঙ্গি? অচেনা পথে অজানা নারী।"

"রোমান্টিক? আমি এখন নিশ্চিত তুমি আমাকে পুরোই ভুলভাবে দেখছো। স্লিপিং ব্যাগ পিঠে নিয়ে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি মোচওয়ালা একজন রাস্তায় কি করে রোমান্সের দেখা পাবে?"

"তুমি কি এরকম একা একা ভ্রমন করো?"

"হুম।"

"তোমার কি নিঃসঙ্গতা পছন্দ?" হাতের উপর মুখ রেখে সে জিজ্ঞেস করল। "একা ভ্রমণ করো, একা খাও, একা লেকচার হলে বসে থাকো..."

"কেউই এতটা নিঃসঙ্গতা পছন্দ করে না। আমি শুধু নিজে থেকে বন্ধুত্ব করতে যাই না, এই আর কি। নাহলে মনোভঙ্গ হয়।"

সানগ্লাসের ডাঁটি কামড়াতে কামড়াতে সে আনমনে বলল, 'কেউই নিঃসঙ্গতা পছন্দ করে না। নাহলে মনোভঙ্গ হয়।' তুমি কখনো নিজের জীবনী লিখলে এই লাইনটা ব্যবহার করতে পারো।"

"ধন্যবাদ," আমি বললাম।

"তোমার কি সবুজ রঙ পছন্দ?"

"কেন বলো তো?"

"কারন তুমি সবুজ রঙের পোলো শার্ট পরে আছো।"

"নাহ, সেরকম কিছু না, আমি সব কিছুই পরি।"

"'নাহ, সেরকম কিছু না, আমি সব কিছুই পরি'–তোমার কথা বলার ভঙ্গি আমার ভালো লেগেছে। যেন সমানভাবে প্লাস্টার লাগানো হচ্ছে। কেউ কি তোমাকে বলেছে এ কথা?"

"কেউ না," আমি বললাম।

"আমার নাম মিদোরি" সে বলল, "যার মানে সবুজ,' কিন্তু সবুজে আমাকে জঘন্য লাগে। অদ্ভুত না? অভিশপ্ত মনে হয় নিজেকে। তুমি কি বলো? আমার বোনের নাম মোমোকো : 'পিচ রঙের মেয়ে।' "

"তাকে গোলাপিতে সুন্দর দেখায়?"

"তাকে গোলাপিতে খুবই সুন্দর দেখায়, মনে হয় তার জন্মই হয়েছে গোলাপি পরার জন্য। খুবই অন্যায় এটা।"

মিদোরিদের খাবার চলে এসেছে, মাদ্রাস জ্যাকেট পরা এক ছেলে হাত নেড়ে ডাকল তাকে টেবিল থেকে, "এই মিদোরি চলে আসো খাবার এসে গেছে।"

মিদোরি এমনভাবে হাত নাড়ল যেন বোঝাতে চাইলো, "আমি জানি।" "আচ্ছা বলো," সে বলল, "তুমি কি লেকচারের নোট নাও? নাটকের ক্লাসে?"

"অবশ্যই।"

"জিজ্ঞেস করতে খারাপ লাগছে, কিন্তু তুমি কি আমাকে তোমার নোটগুলো ধার দিতে পারো? আমি দুটো ক্লাস মিস করেছি, আর কাউকে চিনি না যে, জিজ্ঞেস করবো।"

"সমস্যা নেই," আমি বললাম। ব্যাগ থেকে নোটবুক বের করে প্রথমে দেখলাম ভেতরে এমন কিছু লেখা আছে কিনা যেটা আমি ওকে দেখাতে চাই না, তারপর মিদোরিকে দিলাম।

"অনেক ধন্যবাদ। তুমি কি পরশু আসছো ক্যাম্পাসে?"

"অবশ্যই।"

"এখানে দুপুরে আমার সাথে দেখা কোরো। আমি তোমাকে নোটবুক ফেরত দেবো এবং লাঞ্চ করাবো। যদি এক[illegible] খেলে তোমার পেট খারাপ হয়, এরকম কোন ব্যাপার না থেকে থাকে আরকি।"

"এরকম কিছু নেই," আমি বললাম। "কিন্তু নোটবুক ধার দিয়েছি বলে আমাকে লাঞ্চ খাওয়াতে হবে এমন কোন কথা নেই।"

"আরে চিন্তা কোরো না," সে বলল। "আমার লোকজনকে খাওয়াতে ভালোই লাগে। তোমার মনে থাকবে? ভুলে যাবে না তো? নাকি কোথাও লিখে নেবে?"

"মনে থাকবে। পরশু ১২টায়। মিদোরি গ্রিন।"

ঐ টেবিল থেকে কেউ ডাক দিল, "মিদোরি তাড়াতাড়ি আসো খাবার ঠান্ডা হয়ে গেল তো।"

সে পাত্তা না দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি সবসময় এভাবে কথা বলো?"

"তাই তো মনে হয়," আমি বললাম "কখনো খেয়াল করিনি।" সত্যি বলতে কেউ কখনো আমাকে বলেনি যে আমি অস্বাভাবিকভাবে কথা বলি। সে মনে হল কিছুক্ষনের জন্য তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। তারপর উঠে হেসে তার টেবিলে ফেরত গেল। আমি যখন কয়েক মিনিট পরে বের হলাম সে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানাল। কিন্তু সাথের বাকি তিনজন আমাকে খেয়াল করল মনে হল না।

বুধবার দুপুরে আমি রেস্টুরেন্টে গেলাম কিন্তু মিদোরির কোন খবর নেই। প্রথমে ভাবলাম একটা বিয়ার নিয়ে অপেক্ষা করি। কিন্তু ভিড় বাড়তে লাগল, তাই খাবার অর্ডার করে একা একাই খেলাম। সাড়ে বারোটায় খাওয়া শেষ কিন্তু তখনও মিদোরির কোন খবর নেই। বিল দিয়ে বাইরে গেলাম। রাস্তার ওপারে মঠের পাথরের সিঁড়িতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। একটা বাজলে আমি আশা ছাড়ে দিয়ে লাইব্রেরিতে গেলাম পড়তে। দুইটায় গেলাম জার্মান ক্লাসে।

লেকচার শেষে স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার অফিসে গেলাম নাটকের ইতিহাস ক্লাসের নামের তালিকায় মিদোরিকে খুঁজতে। ক্লাসের একমাত্র মিদোরি যাকে পাওয়া গেল সে হল মিদোরি কোবায়াসি। এরপর স্টুডেন্ট ফাইলের কার্ডে খুঁজে মিদোরি কোবায়াসির ফোন নাম্বার আর ঠিকানা পেলাম যে ১৯৬৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। সে দক্ষিণপুবে তোসিমাতে তার পরিবারের সাথে থাকে। আমি ফোন বুথে গিয়ে ঐ নাম্বারে ফোন দিলাম।

এক লোক ফোন ধরল, "কোবায়াসি বুকস্টোর।"

বইয়ের দোকান? "বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত," বললাম তাকে। "আমি মিদোরি কে খুঁজছিলাম, সে কি আছে?"

"না, সে এখানে নেই," লোকটা বলল।

"আপনি কি বলতে পারেন সে ক্যাম্পাসে আছে কিনা?"

"উমম, না। মনে হয় সে এখন হাসপাতালে। কে বলছেন জানতে পারি?"

তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি ধন্যবাদ দিয়ে রেখে দিলাম। হাসপাতাল? সে কি অসুস্থ কিংবা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে নাকি? কিন্তু লোকটার কথায় কোন সঙ্কটের আভাস পাওয়া গেল না। এমনভাবে বলেছিল যেন 'সে মাছের দোকানে

গেছে।' আর কি কি হতে পারে ভাবলাম কিছুক্ষণ, তারপর বিরক্ত হয়ে ডরমে ফিরে গেলাম। বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে নাগাসাওয়া থেকে ধার আনা কনরাডের *লর্ড জিম* শেষ করতে লাগলাম। শেষ হয়ে গেলে নাগাসাওয়ার রুমে গেলাম ফেরত দিতে।

নাগাসাওয়া তখন ডাইনিঙের দিকে যাচ্ছিল, তাই আমিও সাথে গেলাম ডিনার করতে।

"পরীক্ষা কেমন হল?" জানতে চাইলাম আমি। পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের উচ্চ স্তরের দ্বিতীয় দফা পরীক্ষা হয়েছিল আগস্টে।

"যে রকম সব সময় হয়," এমনভাবে নাগাসাওয়া বলল যেন কিছুই না। "পরীক্ষা দেবে, পাশ করবে, গ্রুপ ডিসকাশন, সাক্ষাৎকার...মেয়ের পেছনে লাগার মত।"

"অন্যভাবে বললে, সহজ ছিল," আমি বললাম "তোমাকে তারা জানাবে কবে?"

"অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে। যদি পাশ করি, তোমাকে ডিনার খাওয়াবো।"

"দ্বিতীয় স্তরে কি ধরনের লোকজন পরীক্ষা দিতে যায়? সবাই তোমার মত সুপারস্টার?"

"বোকার মত কথা বোলো না। সব গাধার দল। গাধা কিংবা প্রতিবন্ধি। আমি বলবো যেসব লোক আমলা হতে চায় তাদের পচানব্বই ভাগই আবর্জনা। ফাজলামি করছি না। অনেকে পড়তেও জানে না।"

"তাহলে তুমি পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে ঢুকতে চাও কেন?"

"অনেক কারন আছে," নাগাসাওয়া বলল। "যেমন ধরো, বিদেশে কাজ করার ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে। আসলে আমি আমার ক্ষমতার পরীক্ষা করতে চাই। আমি আমাকে সবচেয়ে বড় খেলার মাঠে পরীক্ষা করতে চাই–সরকার ও জনগণ। আমি দেখতে চাই আমি কত উপরে উঠতে পারি, এই বিশাল আমলাতন্ত্রের মধ্যে কতদূর খেলতে পারি। বুঝতে পারছো আমার কথা?"

"খেলার মতই শোনাচ্ছে।"

"এটা অবশ্যই খেলা। সত্যি বলতে কি টাকা কিংবা ক্ষমতার প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। একদমই না। আমি হয়ত একজন স্বার্থপর হারামি, কিন্তু এই খেলায় আমি একজন ভালো খেলোয়াড়। আমি হয়ত একজন 'জেন সাধু' হতে পারতাম। আমার কৌতূহল অনেক। আমি দেখতে চাই এই বিশাল কঠিন দুনিয়াতে কতদুর কি করতে পারি।"

"আর তোমার কোন 'আদর্শ'র প্রয়োজন নেই মনে হয়।"

"না, নেই। জীবনে আদর্শের কোন প্রয়োজনই নেই। জীবনে প্রয়োজন কাজের মানদণ্ড।"

"কিন্তু জীবন যাপন করার আরো তো অনেক উপায় আছে, তাই না?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি যেভাবে জীবন যাপন করি, তা তো তুমি পছন্দ করো, নাকি?"

"সেটা অন্য বিষয়," বললাম তাকে, "আমি চাইলেই টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে পারতাম না, আমি চাইলেই আমার পছন্দমত মেয়ের সাথে যখন খুশি শুতে পারতাম না, আমি ভালো করে কথা বলতে পারি না, লোকজন আমাকে পাত্তা দেয় না। আমার কোন গার্লফ্রেন্ড নেই, দ্বিতীয় সারির প্রাইভেট একটা কলেজ থেকে সাহিত্যে বিএ পাশ করার পর আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই। এরপর তোমার জীবন যাপন আমি পছন্দ করি কিনা তাতে কি এসে যায়?"

"তুমি বলতে চাইছো তুমি আমার জীবনকে হিংসা করো?"

"না, একদমই না," আমি বললাম, "আমি যেরকম তাতে আমি অভ্যস্ত। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় নিয়ে আমার কিছু আসে যায় না। হ্যাঁ, যদি কোন কিছু নিয়ে আমি তোমাকে হিংসা করি সেটা হল তোমার হাটসুমির মত অসাধারন একজন গার্লফ্রেন্ড আছে।"

নাগাসাওয়া চুপ করে খেতে থাকল। যখন আমাদের খাওয়া শেষ হল, সে বলল, "জানো ওয়াতানাবে আমার কি মনে হয়? এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার দশ বা বিশ বছর পরে আবার হয়ত কোথাও আমাদের দেখা হবে। যেভাবেই হোক না কেন আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে মিল হবে।"

"ডিকেন্সের মত শোনাচ্ছে," আমি হেসে বললাম।

"হতে পারে," সে-ও হেসে বলল, "কিন্তু এসব ব্যাপারে আমার অনুমান সাধারনত ঠিক হয়।"

ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে একটা বারে গেলাম আমরা, রাত নয়টা পর্যন্ত সেখানে পান করলাম।

"আমাকে বলো, নাগাসাওয়া," জিজ্ঞেস করলাম তাকে, "তোমার জীবনে 'কাজের মানদণ্ড'-এর অর্থ কি?"

"আমি যদি বলি তুমি হাসবে..." সে বলল।

"না, হাসবো না," আমি বললাম।

"ঠিক আছে," সে বলল, "আমার জীবনে 'কাজের মানদণ্ড' হল একজন ভদ্রলোক হওয়া।।"

আমি হাসিনি কিন্তু চেয়ার থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম। "ভদ্রলোক হওয়া? একজন ভদ্রলোক!"

"ঠিকই শুনেছো।"

"ভদ্রলোক হওয়া মানে কি? তোমার কাছে ভদ্রলোকের সংজ্ঞা কি?"

"একজন ভদ্রলোক হচ্ছেন তিনি, যে মনে যা চায় তা করেন না, যা করা উচিত তাই করেন।"

"তুমি আমার দেখা সবচেয়ে অদ্ভুত লোক," বললাম তাকে।

"আর তুমি আমার দেখা সবচেয়ে সোজা কথার মানুষ," কথাটা বলেই আমাদের দু-জনের বিল দিয়ে দিল সে।

পরের সপ্তাহে আমি নাটকের ইতিহাস ক্লাসে গেলাম, কিন্তু মিদোরি কোবায়েসির কোন খবর নাই তখনও। রুমে একবার চোখ বুলিয়ে যখন নিশ্চিত হলাম সে নেই, প্রথম সারিতে আমার বরাবরের সিটে গিয়ে বসলাম। প্রফেসর আসার আগে নাওকোকে চিঠি লিখলাম। গ্রীষ্মের বন্ধে কোথায় কোথায় ঘুরলাম লিখলাম–যেসব রাস্তা দিয়ে গিয়েছি, যেসব শহর পার করেছি, যেসব মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছে।

"আমি তোমার কথা প্রতি রাতেই ভাবি। এখন যেহেতু তোমার সাথে আর দেখা হয় না, আমি বুঝতে পারছি তোমাকে আমার কত প্রয়োজন। স্কুল খুবই বিরক্তিকর, শুধু মনের জোরে ক্লাস আর অ্যাসাইনমেন্ট করে যাচ্ছি। তুমি চলে যাওয়ার পর সব কিছু অর্থহীন লাগে। তোমার সাথে ভালো করে কথা বলতে পারলে ভালো লাগত। যদি তোমার স্যানটোরিয়ামে সম্ভব হয় আমি কয়েক ঘণ্টার জন্য এসে দেখা করে যেতে চাই। আর আরও ভালো হয় যদি তুমি আমি আগের মত পাশাপাশি হাটাহাটি করতে পারি। চেষ্টা করো ছোট করে হলেও উত্তর দিতে।"

আমি চার পৃষ্ঠা লিখে ভাঁজ করে খামে ভরে উপরে নাওকোর পরিবারের ঠিকানা লিখে রাখলাম।

প্রফেসর ততক্ষনে চলে আসলেন, ভুরু থেকে ঘাম মুছতে মুছতে রোল ডাকছিলেন। তিনি ছিলেন ছোটখাট দুঃখি চেহারার একজন মানুষ, লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতেন। তার লেকচার মজার কিছু ছিল না কিন্তু যথেষ্ট দরকারি এবং যত্নের সাথে প্রস্তুত করা ছিল। 'এরকম গরমে আর পড়েনি' মন্তব্য করে তিনি সরাসরি ইউরিপিডেসের নাটকে 'সংকট মুহূর্তে দৈবের হস্তক্ষেপ' নিয়ে লেকচার শুরু করলেন। ইউরিপিডেসের নাটকে দেবতার ধারনা কি করে এস্কেলেস কিংবা সফোক্লিসের দেবতার থেকে আলাদা সে নিয়ে বিস্তারিত বললেন। তিনি পনের মিনিটের মত বলার পর ক্লাসরুমের দরজা খুলে মিদোরি ঢুকল। তার পরনে ছিল গাঢ় নীল স্পোর্টস শার্ট, ক্রিম রঙা সুতির পায়জামা আর সানগ্লাস। প্রফেসরের দিকে 'সরি একটু দেরি হয়ে গেল' ধরনের হাসি দিয়ে সে আমার পাশে বসে

পড়ল। তারপর ব্যাগ থেকে আমার নোটবুক বের করে এগিয়ে দিল। ভেতরে আমি একটা চিরকুট পেলাম : "বুধবারের জন্য দুঃখিত। রেগে আছো?"

লেকচার যখন অর্ধেক, প্রফেসর ব্ল্যাক বোর্ডে গ্রিক স্টেজ আঁকছিলেন, দরজা খুলে হেলমেট পরা দু-জন ছাত্র ঢুকল। তাদেরকে একসাথে দেখে কৌতুকাভিনেতা মনে হচ্ছিল। একজন ফর্সা, চিকন আর লম্বা। আরেকজন খাটো, শ্যামলা, গোলাকার গড়নের সাথে বেমানান লম্বা দাঁড়ি। লম্বুর হাতভর্তি রাজনৈতিক আন্দোলনসংক্রান্ত পুস্তিকা। বাটকুটা প্রফেসরের কাছে গিয়ে ভদ্র সুরে বলল সে তার ক্লাসের বাকি সময় রাজনৈতিক বিতর্কে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক, প্রফেসর যেন তাদেরকে সহযোগিতা করেন। সাথে যোগ করল, "দুনিয়া হাজার হাজার সমস্যায় ভর্তি যা এই মুহূর্তে গ্রিক ট্রাজেডির চেয়ে অনেক জরুরি।" তাদের অনুরোধ অবশ্য ঘোষণার মত শোনাল। প্রফেসর উত্তর দিলেন, "আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে দুনিয়ার সমস্যা আদৌ গ্রিক ট্র্যাজেডির চেয়ে জরুরি কিনা, কিন্তু আমি বললেই তো তোমরা শুনবে না, সুতরাং যা খুশি করো।" এই বলে তিনি তার লাঠি নিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লম্বু পুস্তিকা বিতরন শুরু করলে বাটকুটা তার লেকচার শুরু করল। লিফলেট যথারীতি সাধারণ স্লোগানে ভর্তি "লোক দেখানো বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বাতিল করতে হবে।" "ক্যাম্পাস ধর্মঘট সবাই এক হও।" "সাম্রাজ্যবাদি শিক্ষা-ব্যবসা-নীতি গুঁড়িয়ে দাও।" তারা যা বলছিল তা নিয়ে আমার কোন সমস্যা ছিল না, শুধু লেখাগুলো ফালতু ছিল। এগুলোর মধ্যে কোন আস্থা-বিশ্বাস কিংবা আবেগের ছিটে ফোঁটাও ছিল না। বাটকুর বক্তব্যও একই রকম ফালতু ছিল। একই সুর, শব্দগুলো খালি আলাদা। এই ছাগলগুলোর শত্রু সরকার ছিল না, ছিল তাদের সৃজনশীলতার অভাব।

"চল ভেগে যাই," মিদোরি বলল।

আমি সায় দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমরা দু-জন যখন দরজার দিকে এগুচ্ছিলাম, বাটকু আমার দিকে লক্ষ্য করে কি জানি বলল বুঝলাম না। মিদোরি তার দিকে হাত নেড়ে বলল, "পরে দেখা হবে।"

"আমরা কি বিপ্লব বিরোধীদের তালিকায় পড়ে গেলাম?" বেরিয়ে আসার পর সে বলল। "বিপ্লবীদের জয় হলে কি আমাদের টেলিফোনের খাম্বায় ঝুলিয়ে দেবে?"

"তাহলে আগে লাঞ্চ করে ফেলা যাক, যদি মরেই যাই।"

"ঠিক আছে চল, আমি তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে চাই, একটু দূর হবে, তোমার হাতে সময় আছে তো?"

"দুইটায় ক্লাস আছে, তার আগ পর্যন্ত কোন সমস্যা নেই।"

মিদোরি আমাকে ইয়ুতসুয়া নিয়ে গেল বাসে করে। সেখানে স্টেশনের পেছনে ছায়ায় একটা বক্স লাঞ্চ ধরনের ছোট ছিমছাম দোকান। আমরা বসার সাথে সাথেই সুপ দিয়ে গেল, আর লাল চারকোনা বক্সে সেদিনের স্পেশাল লাঞ্চ। বাস করে আসাটা উসুল হল।

"খুবই ভালো খাবার," আমি বললাম।

"দামও কম। আমি সেই স্কুলের সময় থেকে এখানে আসি। আমার পুরাতন স্কুল রাস্তার ওই পাড়েই। অনেক কড়াকড়ি ছিল তাই আমরা পালিয়ে এখানে আসতাম খেতে। বাইরে খেতে গিয়ে ধরা পড়লে স্কুল থেকে বের করে দিত।"

সানগ্লাস ছাড়া মিদোরির চোখগুলো ঘুম ঘুম দেখাচ্ছিল, আগেরবার সেরকম লাগেনি। সে হয় হাতের চিকন রুপার ব্রেসলেট নাড়াচ্ছিল নয়ত কড়ে আঙুলের নখ দিয়ে চোখের কোনা চুলকাচ্ছিল।

"ক্লান্ত?"

"খানিকটা, ঠিকমত ঘুম হচ্ছে না সেজন্য। আমি ঠিক আছি, চিন্তা কোরো না," সে বলল, "ঐদিনের জন্য দুঃখিত। একটা জরুরি কাজে আটকে গিয়েছিলাম। সকালে ভাবছিলাম রেস্টুরেন্টে ফোন করে তোমাকে জানাব, কিন্তু নাম মনে করতে পারছিলাম না, আর তোমার বাসার নাম্বারও আমার জানা নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছো?"

"ব্যাপার না, আমার হাতে অনেক সময়।"

"অনেক?"

"আমার যতটুকু দরকার তারচেয়ে বেশি। তোমার ঘুমের জন্য কিছু দিতে পারলে ভালো লাগত।"

মিদোরি তার হাতের উপর মুখ রেখে হাসল। "কি দারুন লোক তুমি।"

"দারুন না, স্রেফ নষ্ট করার সময় আছে আমার," বললাম তাকে, "যাহোক, আমি তোমার বাসায় ফোন করেছিলাম। কেউ একজন বলল তুমি হাসপাতালে। সব ঠিক আছে তো?"

"বাসায় ফোন করেছিলে?" ভুরু কুঁচকে বলল, "বাসার নাম্বার পেলে কোথায়?"

"স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্সের অফিস থেকে যে কেউ জোগাড় করতে পারে।"

সে মাথা ঝাঁকিয়ে আবার ব্রেসলেট নাড়াতে লাগল। "আমার মাথায় কখনো ব্যাপারটা আসেনি, তাহলে তোমার নাম্বার জোগাড় করে ফেলতে পারতাম। যাহোক, হাসপাতালের কাহিনী তোমাকে পরে বলবো। আজকে এ নিয়ে কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না, দুঃখিত।"

"না না, ঠিক আছে। আমি তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাইনি।"

"আরে, নাক না গলানোর মত কিছু না। আমি স্রেফ ক্লান্ত। বৃষ্টির দিনের বানরের মত।"

"তাহলে তুমি বাসায় গিয়ে ঘুম দিতে পারো, নাকি?"

"এখন না। চল, বের হই আগে।"

সে আমাকে তার পুরনো হাই-স্কুলে নিয়ে গেল। ইয়ুতসুয়া থেকে হাঁটা দূরত্বে।

স্টেশনটার সামনে দিয়ে যাবার সময় আমার মনে পড়ল নাওকো আর আমার অন্তহীন হাঁটার কথা। সব শুরু হয়েছিল এখান থেকেই। আমি উপলব্ধি করলাম সেদিন সেই মে মাসের রবিবারে যদি নাওকোর সাথে আমার দেখা না হত তবে আমার জীবন আজকের থেকে ভিন্ন হত। আমাদের সেদিন দেখা হয়েছিল কারন দেখা হওয়াই আমাদের নিয়তি ছিল। আমাদের যদি সেদিন সেখানে দেখা না হত, হয়ত অন্য কোথাও অন্য সময়ে ঠিকই দেখা হত। এরকম চিন্তার কোন অর্থ নেই কিন্তু আমি মন থেকে অনুভব করি এটা।

যে হাই-স্কুলে মিদোরি যেত তার দিকে মুখ করে পার্কের বেঞ্চে পাশাপাশি বসলাম আমরা। দেয়াল থেকে আইভি লতা ঝুলছে। এক ঝাঁক কবুতর বসে বসে তাদের ডানাগুলোকে বিশ্রাম দিচ্ছে। সুন্দর কিন্তু পুরনো একটা বিল্ডিং। বিশাল একটা ওক গাছ স্কুলের সামনের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশ দিয়ে কয়েক কলাম সাদা ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে। গ্রীষ্মের আলোর জন্য ধোঁয়াগুলোকে মেঘের মত দেখাচ্ছে।

"তুমি কি জানো কিসের ধোঁয়া ওগুলো?" মিদোরি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

"কোন ধারনা নেই," বললাম আমি।

"মেয়েদের স্যানিটারি ন্যাপকিন পোড়াচ্ছে।"

"যাহ, কী বলো!" আমি আর কিছু বলার মত পেলাম না।

"স্যানিটারি ন্যাপকিন, টাম্পুন, ওইসব জিনিস আর কি," মিদোরি হেসে বলল। "মেয়েদের স্কুল তো। বুড়ো দারোয়ান ময়লার পাত্র থেকে ওগুলো নিয়ে চুল্লিতে পোড়ায়। সেখান থেকে এই ধোঁয়া হয়।"

"বলো কি!"

"সেটাই। আমি যখন ক্লাস করতাম আর জানালা দিয়ে ধোঁয়া দেখতাম তখন এই নিয়ে ভাবতাম। একটা স্কুলে জুনিয়র সিনিয়র ক্লাস মিলে প্রায় এক হাজার ছাত্রি আছে। সুতরাং ধরে নিতে পারো, তাদের ভেতর নয়শ'র মত

মেয়ের পিরিয়ড শুরু হয়েছে, আর পাঁচ ভাগের এক ভাগের হয়ত একই সময়ে পিরিয়ড হচ্ছে। তারমানে, একশ আশি মেয়ের ন্যাপকিন প্রতিদিন পোড়ানো হচ্ছে।"

"ঠিক হয়ত। যদিও আমি সংখ্যার ব্যাপারে সন্দিহান।"

"সংখ্যা যাহোক, প্রায় একশ আশি মেয়ে। তোমার কি মনে হয়, ওগুলো জড়ো করে পোড়াতে কেমন লাগে?"

"কল্পনা করা মুশকিল," বললাম আমি। ওই বয়স্ক মানুষটা কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আসলেই কল্পনা করা মুশকিল।

আমি আর মিদোরি বসে বসে ধোঁয়া দেখতে লাগলাম।

"আমি কখনোই এই স্কুলে পড়তে চাইনি," মিদোরি তার স্বভাবসুলভ মাথা নাড়িয়ে বলল। "আমি একদম সাধারণ একটা পাবলিক স্কুলে পড়তে চেয়েছিলাম। এমন একটা স্কুল যেখানে আমি সাধারণ টিনেজারদের মত মজা করতে পারবো, রিলাক্স করতে পারবো। কিন্তু আমার বাবা-মা ভাবলেন এরকম নামি-দামি জায়গায় পড়ালে আমার জন্য ভালো হবে। তারাই আমাকে এই জায়গায় এনে বন্দি করলেন। তুমি তো জানোই মনে হয় ছোট ক্লাসে রেজাল্ট ভালো হলে কি হয়। শিক্ষক বাবা-মাকে বলল, 'এরকম গ্রেড পেলে তার ঐ রকম স্কুলে পড়া উচিত।' ফলে আমি এখানে এসে ভর্তি হলাম। ছয় বছর এখানে পড়েছি একটুও ভালো লাগেনি আমার। কখনো স্কুল ফাঁকি দেইনি বা দেরি করিনি যার জন্য আমি সার্টিফিকেট অব মেরিট পর্যন্ত পেয়েছি। বুঝতে পারছো কতটা ঘৃণা করতাম আমি স্কুলটাকে।"

"মানে? না, বুঝলাম নাতো।"

"আমি এই জায়গাটাকে খুবই ঘৃণা করতাম। আমি চাইনি এর কাছে হেরে যেতে। একবার একে সুযোগ দিলেই আমি শেষ হয়ে যেতাম। ভয়ে ভয়ে ছিলাম আমি পারবো না। একশ তিন জ্বর নিয়েও গড়িয়ে গড়িয়ে স্কুলে এসেছি। শিক্ষক জিজ্ঞেস করেছে আমি অসুস্থ কিনা? আমি বলেছি না, অসুস্থ না। গ্র্যাজুয়েশনের দিন তারা আমাকে পূর্ণ উপস্থিতি আর সময়নিষ্ঠার জন্য সার্টিফিকেট দিয়েছিল। আর দিয়েছিল একটা ফ্রেঞ্চ ডিকশনারি। তাই আমি এখন জার্মান পড়ছি। এই স্কুলের কাছে আমি কোন ঋণ রাখতে চাইনি। মজা করছি না, সত্যি।"

"তুমি তোমার স্কুলকে এত ঘৃণা করতে কেন?"

"তুমি তোমার স্কুল পছন্দ করতে?"

"না, কিন্তু ঘৃণা করতাম না। আমি সাধারণ পাবলিক হাই-স্কুলে পড়েছি কিন্তু এটা নিয়ে তেমন কোন চিন্তা কাজ করেনি মাথায়।"

"কিন্তু এই স্কুলে..." মিদোরি তার করে আঙুল দিয়ে চোখের কোণা চুলকাতে চুলকাতে বলল, "এই স্কুলে ধনী পরিবারের মেয়ে ছাড়া কিছু নেই– প্রায় এক হাজার মেয়ে সবার পরিবার ভালো, সবার রেজাল্ট ভালো। সবাই ধনী। ধনী না হলে তারা টিকবে না। উচ্চ বেতন, চাঁদার উপর চাঁদা, ব্যয়বহুল শিক্ষা সফর। যেমন ধরো, আমরা কিয়টো গিয়েছি, সবাইকে প্রথম শ্রেণির হোটেলে রাখা হয়েছিল। সেখানে বার্নিশ করা টেবিলে নাস্তা দেয়া হত। বছরে একবার টেবিল ম্যানার সেখানোর জন্য টোকিওর সবচেয়ে দামি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হত আমাদেরকে। মানে, এটা কোন সাধারণ স্কুল না। আমার ক্লাসের একশ ষাটজন মেয়ের মধ্যে আমি একমাত্র মেয়ে যে তোশিমার মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে। একবার স্কুল রেজিস্টার দেখেছিলাম, প্রত্যেকটা মেয়ের বাড়ি বড়লোক পাড়ায়। না, দাঁড়াও, আর একজন মেয়ে ছিল যে শিবার কৃষক পরিবার থেকে এসেছিল, তার সাথে আমার বন্ধুত্বের মতও হয়েছিল। বেশ ভালো ছিল মেয়েটা। সে তার বাড়িতে আমাকে দাওয়াত দিয়েছিল, আর মাফ চাইছিল অনেকখানি দূর আমাকে যেতে হবে বলে। আমি গিয়েছিলাম, জায়গাটা ছিল অসাধারন! বিশাল জায়গা, মিনিট পনের লাগে পুরোটা ঘুরতে। অসাধারন বাগান ছিল ওদের আর ছিল দুটো কুকুর, যাদেরকে মাংস খাওয়ানো হত। সে লজ্জিত ছিল শিবার মত জায়গায় তার বাড়ি নিয়ে। তাকে একজন শোফার মার্সিডিজ বেঞ্জে করে স্কুলে আনা নেয়া করত যেন দেরি না হয়ে যায়। গ্রিন হরনেট সিনেমার মত শোফার, হ্যাট পরা, সাদা গ্লাভস, সেইরকম ব্যাপার-স্যাপার। তারপরও কিনা সে হীনমন্যতায় ভুগত। ভাবতে পারো?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"পুরো স্কুলে আমিই কেবল কিটা-ওতসুকা তোশিমার মত জায়গায় বাস করতাম। আর 'অভিভাবকের পেশা'তে লেখা ছিল 'বইয়ের দোকানের মালিক।' আমার ক্লাসের সবাই এটাকে বড় কিছু ভাবত। 'তুমি তো অনেক ভাগ্যবতি, পছন্দমত যে কোন বই পড়তে পারো,' এই ধরনের কথাবার্তা বলতো। তারা ভাবত কিনোকুনিয়ার মত বড় কোন বইয়ের দোকান হয়ত। তাদের ধারনাই ছিল না কোবায়াসি বুকস্টোর কত ছোট একটা দোকান। দরজা দিয়ে ঢুকলে ম্যাগাজিন ছাড়া কিছু নেই। কাভারে লেটেস্ট সেক্সুওয়াল টেকনিক লেখা। মেয়েদের ম্যাগাজিন সবচেয়ে ভালো বিক্রি হয়। এলাকার তাবৎ গৃহিণীরা সেগুলো কেনে আর তাদের রান্নাঘরের টেবিলে বসে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পড়ে। আর ভাবে স্বামী বাসায় আসলে বিছানায় গিয়ে পরীক্ষা করে দেখবে। গৃহিনীদের মাথায় সারাক্ষন মনে হয় এইসবই ঘোরে। কমিকসও ভালো বিক্রি হয়। আর

সাপ্তাহিক পত্রিকা তো আছেই। এই হল 'বইয়ের দোকান'-এর অবস্থা। বিক্রি হয় ম্যাগাজিন। কিছু পেপারব্যাক বই আছে অবশ্য, রহস্য গল্প, গুন্ডামি, প্রেম এইসব নিয়ে। এগুলোই বিক্রি হয়। আর আছে কিছু 'কিভাবে নিজে করবেন,' 'কিভাবে কর্মস্থলে জিতবেন,' 'বনসাই করবেন,' 'বিয়ের বক্তৃতা দেবেন,' 'কিভাবে সেক্স করবেন,' 'ধূমপান ত্যাগ করবেন' ধরনের বই। সব কিছুর উপরেই আছে। আমরা এমনকি স্টেশনারি সাপ্লাইও বিক্রি করি–বলপয়েন্ট কলম, পেন্সিল, নোটবুক সব। কোন *ওয়ার অ্যান্ড পিস* না, কোন কেঞ্জাবুরো ওয়ে না, কোন *ক্যাচার ইন দ্য রাই* না। এই হল কোবায়েসি বুকস্টোর। সেইরকম ভাগ্যবতি আমি। তোমার কি মনে হচ্ছে আমি ভাগ্যবতি?"

"অবস্থাটা বুঝতে পারছি।"

"বুঝতে পারছি কি ভাবছো। পাড়ার সবাই এখানে আসে, কেউ কেউ বছরের পর বছর ধরে কিনছে। ব্যবসা খুবই ভালো। চারজনের সংসার চালানোর জন্য যথেষ্টর চেয়েও বেশি। কোন ঋণ নেই, দুই মেয়ে কলেজে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। জমা বলতে কিছু নেই। তাদের কখনোই উচিত ছিল না আমাকে এরকম একটা স্কুলে পড়ানো। বাসায় অশান্তি হওয়ার কারন ছিল সেটা। স্কুল থেকে যখন চাঁদা চাইত তারা মেজাজ খারাপ করত, আর আমি সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতাম, ক্লাসমেটদের সাথে দামি কোথাও খেতে গেলাম আর আমার টাকা শেষ হয়ে গেল। পুরোই অশান্তিময় জীবন। তোমার পরিবার কি বড়লোক?"

"আমার পরিবার? না, আমার বাবা-মা একদম সাধারণ কর্মজীবী মানুষ, বড়লোকও না গরিবও না। আমি জানি আমাকে টোকিওতে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো তাদের জন্য কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি একা, কোন ভাই বোন নেই, তাই সেরকম কোন চিন্তা নেই তাদের। আমার খরচের জন্য তারা কিছু দেন না, আমি পার্ট-টাইম চাকরি করি। আমরা ছোট বাগানওয়ালা সাধারণ বাড়িতে থাকি, টয়োটা করোলা চালাই।"

"কি চাকরি করো?"

"সিঞ্জুকুতে একটা রেকর্ড-শপে সপ্তাহে তিনরাত কাজ করি। সোজা কাজ। দোকানে বসে থাকতে হয় খালি।"

"বলো কি," মিদোরি বলল, "জানি না কেন জানি তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল টাকার জন্য কষ্ট করো না তুমি।"

"তা সত্যি, টাকার জন্য আমি কখনোই কষ্ট করিনি। তারমানে এই না যে, আমার টন টন টাকা আছে। বেশিরভাগ মানুষের যেরকম টাকা থাকে আমারও তাই থাকে।"

"আমার স্কুলের 'বেশিরভাগ মানুষ' বড়লোক ছিল," কোলের উপর হাত রেখে মিদোরি বলল। "সেটাই ছিল সমস্যা।"

"এখন তোমার অনেক সুযোগ আছে সেই সমস্যা ছাড়া দুনিয়া দেখার। যতটা না চাও তারচেয়ে বেশি বলে আমার মনে হয়।"

"আচ্ছা, তুমি কি জানো ধনী হওয়ার মধ্যে সবচেয়ে মজা কোথায়?"

"না, জানি না।"

"তোমার কাছে কোন টাকা নেই–এটা বলার মধ্যে। ধরো আমি আমার কোন ক্লাসমেটকে বললাম, চল আমরা এটা করি আর সে বলল 'দুঃখিত আমার কাছে টাকা নেই।' যা আমি কখনো বলতে পারিনি যখন পরিস্থিতি উলটো ছিল। যদি আমি বলতাম আমার কাছে টাকা নেই, তাহলে সত্যি আমার কাছে টাকা ছিল না। খুবই দুঃখজনক ছিল। যেমন ধরো একটা সুন্দরি মেয়ে যদি বলে, 'আমাকে দেখতে আজকে জঘন্য লাগছে, আজকে বাইরে বের হবো না,' কেউ মাথা ঘামাবে না। কিন্তু যদি একটা কুৎসিত মেয়ে একই কথা বলে সবাই হাসবে তাকে নিয়ে। আমার জন্য দুনিয়াটা তেমন ছিল। গতবছরের আগ পর্যন্ত পুরো ছয় বছর এমন ছিল।"

"এখন ঠিক হয়ে যাবে।"

"আশা করছি তাই। কলেজ আমার জন্য মুক্তি। সাধারণ মানুষে ভর্তি।"

ঠোঁট হালকা বাঁকিয়ে হেসে হাতের তালু দিয়ে চুল সোজা করতে লাগল সে।

"তুমি কোথাও কাজ করো?"

"হ্যাঁ, আমি ম্যাপ নোট লিখি। তুমি ঐ পুস্তিকাগুলো হয়ত দেখেছো, ম্যাপ নোটসহ? আশেপাশের বিবরণ থাকে, লোকসংখ্যা আর গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, হাইকিং করার রাস্তা দেয়া। এলাকার কিংবদন্তি কিংবা স্পেশাল ফুল পাখির বিবরন। আমি ওগুলো লিখি, সোজা কাজ, খুব বেশি সময় লাগে না। আমি লাইব্রেরি ঘেঁটে সারাদিনে এরকম একটা পুস্তিকা লিখে ফেলতে পারি। তোমার স্রেফ কিছু গোপন বিদ্য জানতে হবে তাহলেই এইরকম কাজ ভুরি ভুরি পাবে।"

"কি রকম গোপন বিদ্যা?"

"যেমন ধরো কারো সম্পর্কে লিখতে গেলে এমন কিছু একটা উল্লেখ করতে হবে যেটা আর কোথাও লেখা হয়নি, ম্যাপ কোম্পানির লোক ধরে নেবে তুমি একটা প্রতিভা আর তোমাকে আরও কাজ দিতে থাকবে। তারপর ধরো এরকম, তারা কোন উপত্যকায় একটা বাঁধ দিয়েছে, একটা গ্রাম পানিতে তলিয়ে গেছে, কিন্তু প্রতি বসন্তে দক্ষিণ থেকে পাখি আসে লেক থেকে দেখা তাদের উড়তে দেখা যায়। এরকম কিছু একটা অংশ লিখবে, লোকজন যখন পড়বে তাদের

চোখে দৃশ্য ভেসে উঠবে, আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বে। এসব লোকজন পছন্দ করে। সাধারণত পার্ট-টাইম যারা কাজ করে তারা এইসব নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিন্তু আমি এসব লিখে ভালোই কামাতে পারি।"

"হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে তো ঐ 'অংশ'গুলো খুঁজে বের করতে হবে।"

"তা ঠিক," মাথা কাত করে মিদোরি বলল। "কিন্তু তুমি যদি সেগুলো খুঁজতে থাকো, কিছু না কিছু পেয়েই যাবে। যদি না পারো তাহলে নিরীহ কিছু বানিয়ে লেখার সুযোগ তো থাকছেই।"

"ওহ্, আচ্ছা।"

"শান্তি," মিদোরি বলল।

সে আমার ডরমেটরির কথা শুনতে চাইলে আমি তাকে পতাকা উত্তোলন, আর স্টর্ম ট্রুপারের ব্যায়ামের কাহিনী শোনালাম। বিশেষ করে স্টর্ম ট্রুপারের কাহিনী শুনে মিদোরি অনেক হাসল। সবারই মনে হয় হাসি পায়। মিদোরির মনে হল ডরমে ঘুরে আসলে মজা হবে। আসলে ঐ জায়গায় কোন মজা নেই। বললাম তাকে, "কয়েকশ ছেলেপেলে নোংরা রুমে থাকছে, মদ খাচ্ছে, মাস্টারবেট করছে, এই আরকি।"

"তুমিও কি এর মধ্যে পড়ো?"

"এর মধ্যে দুনিয়ার সব পুরুষ পড়ে," আমি বোঝালাম, "মেয়েদের পিরিয়ড হয়, আর ছেলেরা মাস্টারবেট করে। সবাই করে।"

"যাদের গার্লফ্রেন্ড আছে তারাও? মানে, সেক্স পার্টনার আছে যাদের?"

"দুটোর মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। পাশের রুমে ছেলেটা আমাকে বলেছে প্রতি ডেটে যাওয়ার আগে সে মাস্টারবেট করে। তাতে নাকি তার হালকা লাগে নিজেকে।"

"আমি এই বিষয়ে তেমন কিছু জানি না, মেয়েদের স্কুলে বেশিরভাগ সময় কেটেছে তো।"

"আমার মনে হয় না মেয়েদের ম্যাগাজিনে এই বিষয়ে কিছু লেখে।"

"একদমই না," সে হাসতে হাসতে বলল, "যাহোক ওয়াতানাবে, তুমি কি এই রবিবারে আমাকে সময় দিতে পারবে? ফ্রি আছো?"

"আমি সব রবিবারে ফ্রি থাকি ছয়টা পর্যন্ত। এরপর কাজে যেতে হবে।"

"তাহলে আমার সাথে দেখা করতে চলে আসো? কোবায়েসি বুকস্টোরে। দোকান বন্ধ থাকবে, কিন্তু সারাদিন আমাকে সেখানে একা থাকতে হবে। জরুরি ফোন আসার কথা আছে। লাঞ্চ করো আমার সাথে? আমি রান্না করবো।"

"আমার কোন আপত্তি নেই," বললাম তাকে।

নোটবুক থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে তাতে তার বাসায় যাওয়ার ম্যাপ এঁকে দিল মিদোরি। লাল কালি দিয়ে তার বাসা যেখানে সেখানে বড় করে এক্স দিয়ে দিল।

"চিনতে না পারার কোন কারন নেই, 'কোবায়েসি বুকস্টোর' লেখা বড় সাইনবোর্ড লাগান আছে। দুপুরে চলে আসো, খাবার তৈরি থাকবে।"

আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ম্যাপটা পকেটে রাখলাম। "তাহলে এখন ক্যাম্পাসে ফিরে যাই," বললাম, "দুটো থেকে জার্মান ক্লাস আছে।"

মিদোরি জানাল সে অন্যদিকে যাবে তাই ইয়ুতসুয়া থেকে ট্রেন নিল।

*

রবিবার সকালে আমি নয়টায় ঘুম থেকে উঠলাম। শেভ করে, কাপড় চোপড় ধুয়ে ছাদে শুকোতে দিয়ে আসলাম। সুন্দর দিন ছিল, চারপাশে হেমন্তের আগমনের গন্ধ। লাল ফড়িং উড়ছিল আর বাচ্চারা জাল নিয়ে পেছন পেছন দৌড়াচ্ছিল ধরার জন্য। বাতাস ছিল না, পতাকা লেপ্টে ছিল দন্ডের সাথে। আমি ইস্ত্রি করা পরিস্কার শার্ট পরে ডরম থেকে হেঁটে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম স্ট্রিট কারের জন্য। এমনিতেই ছাত্রপাড়া তারপর আবার রবিবার সকাল। রাস্তা একদম খালি ছিল। জনহীন। দোকানপাট তখনো বন্ধ। কোথাও কোন শব্দ হলে প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। খড়ম পরা এক মেয়ে খট খট করে হেঁটে গেল, অন্যদিকে কিছু ছেলেপেলে কয়েকটা খালি টিনের কৌটায় ঢিল ছুঁড়ে লাগানোর চেষ্টা করছিল। একটা ফুলের দোকান খোলা, সেখান থেকে আমি কিছু ড্যাফোডিল কিনলাম। হেমন্তে ড্যাফোডিল খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আমার সবসময়ই এই ফুল বেশ পছন্দ।

রবিবার সকাল বলে স্ট্রিটকারে যাত্রি ছিল মাত্র তিনজন বুড়ি। তারা সবাই আমার আর ফুলের দিকে তাকাল। একজন আমার দিকে তাকিয়ে হাসিও দিল, আমিও পাল্টা হেসে পেছনের দিকে একদম শেষ সিটে বসলাম, জানালা দিয়ে পুরাতন বাড়িগুলো দেখতে দেখতে গেলাম। স্ট্রিটকার বাড়িগুলোর ঝুলে থেকে ছাউনি প্রায় ছুঁয়ে যাচ্ছিল। এক বাড়ির কাপড় শুকানোর জায়গায় টবে টমেটো গাছ লাগানো হয়েছে, একটা কালো বিড়াল সেখানে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। আরেক বাড়ির উঠোনে একটা বাচ্চা ফুঁ দিয়ে সাবানের ফেনা ওড়াচ্ছে। কোথাও আইয়ুমি ইসিদার গান বাজতে শুনলাম, কোথাও থেকে তরকারি রান্নার সুবাস ভেসে এল। এই গলিগুলোর ভেতর দিয়ে সাপের মত এগিয়ে চলল স্ট্রিটকার।

কিছু জায়গা থেকে আরো যাত্রি উঠল। গাদাগাদি করে বসে আলাপ করছিল সেই তিন বুড়ি।

আমি ওটসুকা স্টেশনের কাছাকাছি নেমে বড় রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করলাম। মিদোরির এঁকে দেয়া ম্যাপ তেমন একটা দেখলাম না। আশেপাশের কোন দোকানই মনে হয় ভালো চলছিল না। বেশিরভাগ দোকানই পুরাতন বাড়িতে, ধূসর আসবাবপত্র ভেতরে, সাইনবোর্ড ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বিল্ডিংগুলোর বয়স আর চেহারা দেখে মনে হল যুদ্ধের সময়ের, হয়ত কোনভাবে পুরো ব্লক বোমা থেকে বেঁচে গিয়েছিল। কিছু জায়গা নতুন করে বানানো হয়েছে, আর কিছু মেরামত করা হয়েছে। মেরামত করাগুলোকে পুরনোগুলোর চেয়ে বেশি জীর্ণ দেখাচ্ছিল।

পুরো জায়গাটার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মনে হচ্ছিল যারা এখানে বাস করত তারা সবাই এখানের বাজে বাতাস, উচ্চ ভাড়া, আর গাড়ির ভিড়ে বিরক্ত হয়ে শহরতলীতে সরে গেছে। রয়ে গেছে কিছু সস্তা অ্যাপার্টমেন্ট আর কোম্পানি ফ্ল্যাট, এমন কিছু দোকান যা সরানো অসম্ভব, আর কিছু ঘাড় তেড়া লোকজন যারা তাদের পারিবারিক সম্পত্তি ছেড়ে যেতে চায়নি। সব কিছু কেমন যেন ধূসর। মনে হচ্ছিল কোন গ্যাসে ঢেকে আছে।

দশ মিনিট আমি এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে কোনার গ্যাস-স্টেশন থেকে ডানে মোড় নিলাম। কয়েকটা দোকান পরেই মাঝামাঝি কোবায়েসি বুকস্টোরের সাইনবোর্ড দেখা গেল। আসলেই বড় কোন দোকান না। কিন্তু মিদোরির বর্ণনা থেকে যা মনে হয়েছিল তত ছোটও ছিল না।

দোকানের সামনের অংশ শাটার নামিয়ে বন্ধ করা ছিল। সেখানে ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপন লেখা ‘প্রতি বৃহস্পতিবার এখানে সাপ্তাহিক বুনসান পাওয়া যায়।’ আমার হাতে তখনও মিনিট পনের বাকি থাকলেও ড্যাফোডিল হাতে নিয়ে রাস্তায় ঘোরাফেরা করে সময় নষ্ট করতে চাইনি। তাই ডোরবেল বাজিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়ালাম। পনের সেকেন্ডের মত হয়ে গেল কোন উত্তর নেই, আরেকবার বেল চাপব কিনা ভাবছিলাম তখন মাথার উপর একটা জানালা খুলে গেল। মিদোরি হাত নেড়ে বলল, “শাটার তুলে ভেতরে চলে আসো।”

“আমি একটু আগে চলে এসেছি সমস্যা নেই তো?” বললাম তাকে।

“কোন সমস্যা নেই। দোতলায় চলে আসো। আমি রান্নাঘরে আছি,” সে জানালা বন্ধ করে দিল।

শাটার তুলতে গেলে ভয়াবহ শব্দ হল। আমি তিন ফুটের মত তুলে ঢুকে

আবার নামিয়ে দিলাম। ভেতরে গাঢ় অন্ধকার। কিছুক্ষণ হাতড়ে সিঁড়ি খুঁজে পেলাম। এক বান্ডেল মাগাজিনে উলটে পড়ছিলাম আরেকটু হলে। সেখানে জুতো খুলে রেখে লিভিং রুমে উঠে পড়লাম। ভেতরটা কেমন অন্ধকার আর মরা মরা। সিঁড়ির কাছে সোফা আর ইজি চেয়ার রাখা। একদম ছোট রুম, জানালা দিয়ে ডিম লাইটের আলো আসছিল। মনে হচ্ছিল পোলিশ মুভির কোন দৃশ্য। বাম দিকে স্টোর রুমে মত মনে হল আর একটা বাথরুম। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম, সেখানের উজ্জ্বল আলো দেখে মনে হল বাঁচলাম।

"আমি এখানে," মিদোরির গলা শোনা গেল। সিঁড়ি থেকে ডানে ডাইনিং রুমের মত, এরপর রান্নাঘর। বাড়িটা পুরনো কিন্তু রান্নাঘর মনে হল নতুন করা হয়েছে। নতুন কেবিনেট, চকচকে সিঙ্ক আর কল। সেখানে দেখলাম মিদোরি রান্না করছে। একটা পাত্রে কিছু ফুটছে, বাতাসে ভাজা মাছের গন্ধ।

"ফ্রিজে বিয়ার আছে," হাত উঁচিয়ে দেখাল মিদোরি। "একটু বসো আমি কাজ শেষ করি।"

আমি একটা ক্যান নিয়ে এসে কিচেনের টেবিলে বসলাম। বিয়ারটা অনেক ঠাণ্ডা, যেন কয়েক বছর ধরে ফ্রিজে রাখা ছিল। টেবিলের উপর একটা ছোট সাদা অ্যাশট্রে, একটা দৈনিক পত্রিকা আর সয়া সস রাখা। একটা নোটপ্যাড আর কলম ও রাখা ছিল। নোটে একটা ফোন নাম্বার আর কিছু সংখ্যা লেখা, দেখে মনে হল বাজারের হিসাব।

"আমার আর দশ মিনিটেই হয়ে যাবে," সে বলল, "অপেক্ষা করতে পারবে না?"

"অবশ্যই পারবো," আমি বললাম।

"তাহলে বসে থেকে ক্ষুধা বাড়াও, অনেক রান্না করেছি।"

আমি বিয়ার খেতে খেতে মিদোরিকে খেয়াল করতে লাগলাম। সে আমার দিকে পেছন ফিরে ছিল। তার নড়াচড়া দ্রুত, একসাথে অন্তত চারটা কাজ করছে। একদিকে মাছের স্বাদ পরীক্ষা করছে, সাথে সাথে কি জানি র‍্যাট র‍্যাট করে কাটছে বোর্ডে রেখে, তারপর ফ্রিজ থেকে কি জানি বের করে ডিশে রাখল, আবার একটা পাত্র ধুয়ে নিল। পেছন থেকে দেখে তার কাজ ইন্ডিয়ান বাদকদের মত লাগছিল, বেল বাজাল, ব্লকে বাড়ি দিল, ওয়াটার বাফেলো বোনে টোকা দিল, প্রত্যেক নড়াচড়ার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততোটুকুই। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখলাম।

"কিছু করার থাকলে আমাকে দিতে পার," বললাম তাকে।

"না না, লাগবে না," মিদোরি আমার দিকে হেসে বলল। কালকে অনেক

ব্যস্ত ছিলাম তাই ঠিকমত বাজার করতে পারিনি। ফ্রিজে যা ছিল তা দিয়েই করেছি। চিন্তা কোরো না, কোবায়েসি পরিবার তাদের অতিথিদের সবসময় ভালোভাবে আপ্যায়ন করে। জানি না কেন, কিন্তু আমরা আপ্যায়ন করতে খুব পছন্দ করি। জন্মগত ব্যাপার, ব্যাধির মত হয়ে গেছে। এমন না যে, আমরা মানুষের সাথে খুব ভালো, কিংবা লোকজন আমাদের খুব পছন্দ করে। কিন্তু কেউ বাসায় আসলে আমরা ভালো মেহমানদারি করি যাহোক না কেন। আমাদের পরিবারের সবার মধ্যে এই সমস্যাটা কম বেশি আছে। আমার বাবার কথাই ধরো, সে মদপান করেই না বলা যায়, কিন্তু আমাদের বাসা ভর্তি অ্যালকোহল। কেন? অতিথিদের জন্য। সুতরাং যত চাও গিলতে পারো।"

"থ্যাঙ্কস," বললাম আমি।

হঠাৎ মনে পড়ল আমার, ফুলগুলো নিচে রেখে এসেছি। জুতো খোলার সময় যে রেখেছিলাম আর মনে নেই। আমি আবার নিচে গেলাম। দশটা তাজা ড্যাফোডিল ম্লান আলোয় পড়ে আছে। মিদোরি কাপ বোর্ড থেকে একটা লম্বা গ্লাস বের করে তাতে ফুলগুলো সাজিয়ে রাখল।

"ড্যাফোডিল আমার পছন্দ," বলল মিদোরি। "আমি একবার স্কুলের এক ট্যালেন্ট শো'তে 'সেভেন ড্যাফোডিলস' গেয়েছিলাম। শুনেছো গানটা?"

"অবশ্যই শুনেছি।"

"আমাদের একটা ব্যান্ড ছিল, আমি গিটার বাজাতাম সেখানে।"

সে 'সেভেন ড্যাফোডিলস' গাইতে গাইতে প্লেটে খাবার বাড়তে লাগল।

যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক ভালো রান্না করে মিদোরি। ভাজা, সিদ্ধ থেকে শুরু করে টক, ডিমের তরকারি, মাকারেল মাছ, সালাদ, বেগুনের তরকারি, মাশরুম, মূলা আর তিল দিয়ে কিয়োটো স্টাইলে রান্না করা চমৎকার সব ডিশ।

"খুবই মজার হয়েছে সব খাবার।" খেতে খেতে বললাম।

"ঠিক আছে, এবার সত্যি কথাটা বলে ফেল," মিদোরি বলল। "আমার চেহারা দেখে তুমি নিশ্চয়ই আশা করোনি আমি ভালো রান্না করতে পারি।"

"সত্যি আশা করিনি," স্বীকার করলাম আমি।

"তুমি তো কান্সাই এর দিক থেকে এসেছো, তোমার তো এরকম স্বাদ পছন্দ হওয়ার কথা, তাই না?"

"বোলো না যে, শুধু আমার জন্য তুমি রান্নার স্টাইল বদলেছো?"

"মাথা খারাপ! আমি এত ঝামেলা করি না, আমরা সবসময়ই এভাবে খাই।"

“তোমার বাবা-মায়ের কেউ কি কান্সাই'র?”

“নাহ, আমার বাবার জন্ম টোকিওতে, আর মা এসেছে ফুকুসিমা থেকে। আমার পুরো গুষ্টির মধ্যে কেন কান্সাই থেকে নেই। আমরা সবাই হয় টোকিওর নয়ত উত্তর কান্টো থেকে।”

“বুঝলাম না,” আমি বললাম, “তাহলে তুমি কি করে এরকম একশ ভাগ কান্সাই স্টাইলে রান্না করলে? কেউ শিখিয়েছে তোমাকে?”

“সে এক বিশাল ইতিহাস,” ভাজা ডিম খেতে খেতে বলল সে। “আমার মা গৃহস্থালি কোন কাজ দেখতে পারত না, বলতে গেলে কোনদিনই সে রান্না করেনি। আমরা ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। তাই যা হত তা হল 'আজকে আমরা ব্যস্ত, খাবার অর্ডার করা যাক' কিংবা 'কসাইয়ের দোকান থেকে কিছু ক্রকুয়েট কিনে ফেলা যাক,' ইত্যাদি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন থেকেই আমার এসব জঘন্য লাগত, বিশাল ডেকচিতে রান্না করা এক তরকারি আমরা টানা তিনদিন ধরে খাচ্ছি। আমি যখন মিডল স্কুলের তৃতীয় বর্ষে পড়ি তখন একদিন ঠিক করলাম আমিই রান্না করবো বাসার জন্য এবং করলামও। সিঞ্জুকুর সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান কিনকুনিয়াতে গেলাম, সবচেয়ে বড় আর সুন্দর রান্নার বইটা কিনে ফেললাম। একদম এই মলাট থেকে ঐ মলাট পর্যন্ত যা ছিল সব আমি রপ্ত করে ফেলেছিলাম। কি করে কাটিং বোর্ড চিনতে হয়, ছুরি কিভাবে ধার দিতে হয়, মাছের কাঁটা কিভাবে আলাদা করতে হয়, আঁশ কিভাবে আলাদা করতে হয়, সব। বইয়ের লেখক ছিল কান্সাই'র তাই আমার সব রান্নাও কান্সাই স্টাইলের।”

“তারমানে, বলতে চাইছো এসব রান্না তুমি সব বই দেখে শিখেছো?”

“আমি টাকা জমিয়ে বাইরে এসব খাবার খেতে গিয়েছি, যাতে স্বাদ কি হবে বুঝতে পারি। আমার অনুমান বেশ ভালো। লজিকাল চিন্তার ব্যাপারে যাই হই না কেন।”

“এ তো দারুন ব্যাপার, তুমি নিজে নিজে বই থেকে রান্না শিখেছো, কেউ তোমাকে দেখিয়ে দেয়নি।”

“ব্যাপারটা সহজ ছিল না,” দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলল, “এমন একটা পরিবারে বড় হয়েছি যাদের খাবার কি হল কেমন হল তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না। আমি যদি তাদের বলতাম যে আমার কিছু রান্নার ভালো ছুরি কেনার জন্য টাকা দরকার, তাহলে তারা আমাকে কোন টাকা দিত না। 'যা আছে তাই যথেষ্ট' তারা বলতো। আমি বলতাম তোমাদের মাথা খারাপ, বাসায় যে ছুরি আছে তা দিয়ে মাছের কাঁটা আলাদা করা যায় না। তখন তারা বলতো 'কাঁটা

আলাদা করার দরকার কি?' তাদেরকে কিছু বোঝাতে যাওয়াই অসম্ভব ছিল। আমি আমার হাত খরচের টাকা জমিয়ে রান্নার ছুরি, ছাঁকনি, আর অন্যান্য যা যা দরকার তা কিনতাম। ভাবতে পারো ব্যাপারটা? একদিকে পনের বছরের এক মেয়ে একটু একটু করে টাকা জমিয়ে তা দিয়ে ছাঁকনি, শান পাথর, টেম্পুরা পট কিনছে। অন্যদিকে স্কুলের অন্য মেয়েরা তাদের হাতখরচের গাদাগাদা টাকা দিয়ে সুন্দর সুন্দর জামা আর জুতো কিনছে। খারাপ লাগছে না বল আমার জন্য?"

ফ্রেস জুসাই দেয়া ক্লিয়ার সুপ গিলতে গিলতে মাথা ঝাঁকালাম।

"আমি যখন স্কুলের প্রথম বর্ষে ছিলাম, আমার একটা ডিম ভাজার ফ্রাইয়ার কেনা দরকার ছিল। একটা লম্বা সরু প্যান যেটা দিয়ে দাসিমিকি স্টাইলে ডিম ভাজা যায়, যেমনটা আমরা এখন খাচ্ছি। নতুন ব্রা কেনার জন্য যে টাকা জমিয়েছিলাম সেটা দিয়ে আমি সেই ফ্রাইয়ার কিনলাম। পুরো তিনমাস আমি একটা ব্রা দিয়ে চলেছি। বিশ্বাস করতে পারো? রাতে ব্রা ধুয়ে দিতাম, পাগলের মত চেষ্টা করতাম যাতে শুকিয়ে যায়, পরেরদিন সকালে সেটা পরতাম। যদি কোনদিন ঠিকমত না শুকাতো, এরচেয়ে দুঃখজনক আর কিছু ছিল না। পৃথিবীর সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হল ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে ব্রা পরা। আমি হাঁটতাম আর চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে পড়তো। ভাবতাম একটা ফ্রাইয়ারের জন্য আমার এভাবে কষ্ট করতে হচ্ছে!"

"বুঝতে পারছি," হাসতে হাসতে বললাম আমি।

"এভাবে বলা ঠিক না কিন্তু তাও বলি, মা মারা যাওয়ার পর আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। আমি এখন আমার মত করে পরিবারের জন্য খরচ করতে পারি। যা ইচ্ছে কিনতে পারি। আমার এখন পুরো এক সেট একদম নতুন রান্নার বাসন কোসন আছে। আমার বাবা বাজেটের ব্যাপার-স্যাপার কিছু বোঝে না।"

"তোমার মা কবে মারা গেছেন?"

"দুই বছর আগে। ক্যানসার। ব্রেন টিউমার। দেড় বছরের মত হাসপাতালে ছিল। ভয়াবহ অবস্থা গেছে। একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভুগেছে। শেষের দিকে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আফিমের উপর থাকতো সবসময়। তারপরেও মৃত্যু আসছিল না, বাধ্য হয়ে ইনজেকশন দিয়ে মৃত্যু চাইলো। সবচেয়ে খারাপ রকমের মৃত্যু। রোগিও কষ্ট পাচ্ছে, তার পরিবার জাহান্নামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সব টাকা মায়ের পিছে শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাকে চব্বিশ ঘণ্টা নজরে রাখতে হত, যেসব ইনজেকশন দিত প্রতিটা বিশ হাজার ইয়েন করে দাম ছিল। আমি তাকে নিয়ে সারাক্ষন ব্যস্ত থাকতাম। পড়াশুনা করতে পারতাম না, এক বছর কলেজ বাদ দিয়েছিলাম। এতকিছু খারাপ যেন যথেষ্ট ছিল না–"

সে কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গেল। চপস্টিক টেবিলে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "আমাদের কথাবার্তা এরকম দুঃখি হয়ে গেল কখন?"

"ব্রা-এর অংশ থেকে," আমি বললাম।

"যাহোক, ডিম শেষ করো আর আমি যা বললাম তা নিয়ে চিন্তা করো," গম্ভির মুখ করে মিদোরি বলল।

আমি যা খেলাম তাতে পেট ভরে গিয়েছিল, মিদোরি সেই তুলনায় অনেক কম খেল। "রান্না করলে আমার খিদে নষ্ট হয়ে যায়," বলল সে। টেবিল পরিস্কার করে এক বক্স মার্লবোরো বের করল, একটা সিগারেট ম্যাচ দিয়ে জ্বালিয়ে মুখে দিল। ড্যাফোডিল রাখা গ্লাসটা নিয়ে ফুলগুলো পরীক্ষা করল সে। "আমার মনে হয় আমি এগুলো আর ফুলদানিতে রাখব না। এভাবে এখানে যদি রেখে দেই, মনে হবে যেন মাত্র কোন ডোবা থেকে তুলে এনেছি আর হাতের কাছে যা পেয়েছি তাতেই রেখে দিয়েছি।"

"আমি তো অটসুকা স্টেশনের সাথের ডোবা থেকেই এনেছি," বললাম তাকে।

মুখ টিপে হাসল সে। "তুমি আসলেই অদ্ভুত, মুখ শক্ত করে কৌতুক করতে পারো।"

গালে হাত রেখে অর্ধেক সিগারেট শেষ করে অ্যাশট্রেতে পিষে ফেলল সে। হাত দিয়ে চোখ ডলল যেন ধোঁয়া ঢুকেছে।

"মেয়েরা যখন সিগারেট নেভায় ভদ্রতার সাথে নেভায়। তুমি পুরো কাটখোট্টার মত নেভালে। এরকম ধুপ করে পিষে ফেলার বদলে উচিত ছিল ছাইয়ের অংশ হালকা করে চেপে নেভানো। তাহলে এরকম ভর্তা হয়ে যেত না। আর মেয়েরা কখনো এরকম নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে না। কোন মেয়ে একা কোন ছেলের সাথে খেতে বসে এরকম এক ব্রা তিন মাস পরার গল্প করে না।"

"আমি তো কাটখোট্টাই," মিদোরি বলল নাক চুলকাতে চুলকাতে। "আমি কখনো মেয়েলি হতে পারিনি। মজা করে হওয়ার চেষ্টা করি মাঝে মধ্যে সব সময় পারি না। আর কোন দোষ চোখে পড়ল?"

"মেয়েরা মার্লবোরো খায় না," আমি বললাম।

"পার্থক্য কি? সবগুলোই তো একইরকম বাজে খেতে," সে মার্লবোরো প্যাকেট লুফালুফি করতে করতে বলল। "আমি আসলে গত মাস থেকে ধূমপান শুরু করেছি। এমন না যে আমি তামাকের জন্য মারা যাচ্ছিলাম বা কিছু। স্রেফ মনে হল খাই।"

"কেন মনে হল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে তার দু-হাত একসাথে টেবিলের উপর রেখে কিছুক্ষণ ভাবল। "কি আসে যায়? তুমি ধূমপান করো না?"

"গত জুনে ছেড়ে দিয়েছি।"

"কিভাবে?"

"ঝামেলা লাগত। মাঝরাতে সিগারেট শেষ হয়ে গেলে মেজাজ খারাপ হত। আর কোন কিছু আমাকে নিয়ন্ত্রন করছে সেটা আমার পছন্দ নয়।"

"তোমার কি পছন্দ কি অপছন্দ সে ব্যাপারে তুমি অনেক স্পষ্ট," সে বলল।

"হয়ত," আমি বললাম। "হয়ত সেজন্যই আমাকে লোকজন পছন্দ করে না। কখনোই করেনি।"

"কারন তুমি তাদের দেখাচ্ছো," সে বলল, "তুমি পরিস্কার করে তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছো যে লোকজন পছন্দ করে কি করে না তাতে তোমার কিছু আসে যায় না," সে গালে হাত রেখে বিড়বিড় করে কী জানি বলল। "কিন্তু আমার তোমার সাথে কথা বলতে ভালো লাগে। তুমি অন্যরকমভাবে কথা বলো। 'কোন কিছু আমাকে নিয়ন্ত্রন করছে সেটা আমার পছন্দ নয়।'"

থালাবাসন ধুতে আমি ওকে সাহায্য করলাম। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, ও ধুলো, আমি মুছে কাউন্টারে সাজিয়ে রাখলাম।

"তোমার বাসার সবাই বাইরে আজকে?" আমি বললাম।

"আমার মা তার কবরে। দুই বছর আগে মারা গেছে।"

"হুম, শুনেছি সেটা।"

"আমার বোন তার বাগদত্তার সাথে ডেটে গেছে। সম্ভবত লং ড্রাইভে গেছে। তার বয়ফ্রেন্ড গাড়ির কোম্পানিতে কাজ করে। সে গাড়ি ভালোবাসে, আমি গাড়ি ভালোবাসি না।"

সে চুপ করে গেল, তারপর আবার ধোঁয়া শুরু করল। আমিও চুপ করে মুছতে থাকলাম।

"আর আমার বাবা," কিছুক্ষণ পর আবার বলল।

"হ্যাঁ?"

"সে গতবছর জুনের শেষ উরুগুয়ে গেছে তারপর থেকে সেখানেই আছে।"

"উরুগুয়ে?! উরুগুয়ে কেন?"

"বিশ্বাস করো আর নাই করো, সে সেখানে পাকাপাকিভাবে থেকে যাওয়ার কথা ভাবছে। তার এক পুরোন সৈনিক বন্ধুর খামার আছে সেখানে। হঠাৎ কথা নাই বার্তা নাই বাবা ঘোষণা দিল সে-ও যাচ্ছে। উরুগুয়েতে গিয়ে নাকি সে যা খুশি করতে পারবে, অনেক সম্ভাবনা সেখানে। যে কথা সেই কাজ, প্লেনে উঠে

চলে গেল। ব্যস। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি তাকে আটকানোর। এরকমও বলেছি, ‘সেখানে গিয়ে কি করবে, তুমি তো তাদের ভাষা জাননা, তাছাড়া তুমি টোকিওর বাইরেই গেছো হাতে গোনা কয়েকবার,’ কিন্তু সে কিচ্ছু শুনল না, মাকে হারানো তার জন্য বিশাল ধাক্কা ছিল। মাথা একদম গেছে। মাকে অনেক ভালোবাসত। সত্যি।”

আমি কী বলবো বুঝতে পারছিলাম না, হাঁ করে মিদোরির দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

“মা মারা যাওয়ার পর সে আমাদের দুই বোনকে কি বলেছে জানো? ‘তোমাদের দু-জনকে হারানোর বদলে যদি তোমাদের মাকে রক্ষা করা যেত আমি তাই করতাম’ ঘুষি খেয়ে দম হারানোর মত অবস্থা হয়েছিল আমার শুনে। বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম। বুঝতেই পারছ। তুমি চাইলেই কিন্তু কাউকে এরকম করে বলতে পারো না। ঠিক আছে বুঝলাম সে তার ভালোবাসার মানুষকে হারিয়েছে, তার জীবনসাথি। আমি তার দুঃখ বুঝতে পারছি, তার কষ্ট। তার জন্য আমারও খারাপ লেগেছে। কিন্তু তারমানে এই না যে, তুমি তোমার জন্ম দেয়া মেয়েদের বলবে, ‘তার জায়গায় তোমরা মরলে না কেন।’ কী ভয়াবহ ব্যাপার, তুমিই বলো?”

“হুম, ঠিকই বলেছো।”

“এই দুঃখ আমার কখনো যাবে না,” মাথা নেড়ে বলল সে। “যাহোক, আমার পরিবারের সবাই একটু আলাদা। আমাদের সবার মধ্যেই কিছু না কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে।”

“তাই তো দেখছি,” বললাম আমি।

“তারপরেও এটা দারুন ব্যাপার যখন দু-জন মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে, তাই না? একজন মানুষ তার স্ত্রীকে কতটা ভালোবাসলে তার মেয়েদেরকে এমন কথা বলতে পারে...”

“হয়ত। এখন কিন্তু তুমি অন্যভাবে দেখছো ব্যাপারটা।”

“তারপর আমাদের দু-জনকে ফেলে উরুগুয়ে পালিয়ে গেল।”

আমি কোন কথা না বলে আরেকটা ডিশ মুছতে লাগলাম। সব শেষ হলে, মিদোরি সব তুলে ক্যাবিনেটে রেখে দিল।

“এরপর তোমার বাবার থেকে কোন খবর পেয়েছো?” জিজ্ঞেস করলাম।

“একটা পোস্ট কার্ড। গত মার্চে। কি লিখেছিল জানো? ‘এখানে অনেক গরম’ কিংবা ‘ফল টল যেরকম ভেবেছিলাম তত ভালো না,’ এইসব হাবিজাবি। আমি মানে কি বলবো আর। আর পোস্টকার্ডে একটা গাধার ছবি। মাথা

পুরোপুরি গেছে। সে এইটুকু পর্যন্ত বলেনি ঐ লোককে সেখানে গিয়ে পেয়েছে কিনা–তার যে বন্ধু বা যাই ছিল। সে অবশ্য শেষের দিকে লিখেছিল যে গুছিয়ে বসলে আমাদেরকে নিতে পাঠাবে। তারপরে আর কোন খবর নেই। আমাদের কোন চিঠির উত্তরও দেয়নি।"

"তোমার বাবা যদি বলেন উরুগুয়ে চলে আসো, কি করবে?"

"আমি ঘুরে আসার জন্য হলেও একবার যাবো, মজাই হবে। আমার বোন বলে সে মানা করে দেবে। সে নোংরা একদম সহ্য করতে পারে না। নোংরা জায়গায় কখনো যায় না।"

"উরুগুয়ে নোংরা নাকি?"

"কে জানে? সে মনে করে নোংরা। যেমন ধরো, রাস্তাঘাট গাধার গোবরে ভর্তি, মাছি উড়ছে কিংবা হয়ত টয়লেট কাজ করে না। গিরগিটি আর কাঁকড়াবিছে সবখানে দৌড়াদৌড়ি করছে। সে হয়ত কোন সিনেমাতে এমন দেখেছে। পোকা একদম সহ্য করতে পারে না। সে চায় শুধু গাড়িতে চড়ে সুন্দর দৃশ্যওয়ালা জায়গায় যেতে।"

"তুমি তোমার বাবাকে পছন্দ করো?"

মিদোরি মাথা নাড়ল, "তেমন একটা না।"

"তাহলে তার পেছন পেছন উরুগুয়ে কি করে যাবে?"

"আমি তাকে বিশ্বাস করি।"

"বিশ্বাস করো মানে?"

"হ্যাঁ, আমি তাকে পছন্দ করি না, কিন্তু আমি আমার বাবাকে বিশ্বাস করি। কিভাবে করবো না বলো? এই লোক তার বাড়ি, তারা মেয়েদের, তার কাজ সব ফেলে উরুগুয়ে চলে গেছে তার স্ত্রীকে হারানোর শোকে? বুঝতে পারছো কি বলছি?"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "কিছুটা, পুরোপুরি বুঝতে পারছি না।"

মিদোরি হেসে ফেলল। আমার পিঠে থাপ্পড় দিয়ে বলল, "বাদ দাও, কিছু আসে যায় না।"

সেদিন বিকেলে একটার পর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। মিদোরির বাসার কাছেই কোথাও আগুন লেগেছিল। আমরা তিনতলার কাপড় শুকানোর জায়গায় গিয়েছিলাম আগুন দেখতে। সেখানে ওকে চুমোও খেয়েছিলাম বলা যায়। আজব শোনাচ্ছে জানি কিন্তু এরকমই ঘটেছিল।

খাওয়ার পর আমরা কফি খাচ্ছিলাম আর ভার্সিটি নিয়ে কথা বলছিলাম এমন সময় সাইরেনের শব্দ পেলাম। সাইরেনের শব্দ আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল

তারপর অনেকগুলো সাইরেনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। অনেক লোক দোকানের সামনে দিয়ে দৌড়ে গেল, কেউ কেউ চিল্লাচ্ছিল। মিদোরি রাস্তার দিকে মুখ করা রুমে গিয়ে জানালা খুলে বাইরে দেখল। "আমি একটু আসছি," এই বলে সে উধাও হয়ে গেল। পরে অবশ্য আমি উপরে তার পায়ের শব্দ পেলাম।

আমি একা বসে কফি খেতে থাকলাম আর মনে করার চেষ্টা করলাম উরুগুয়ে কোথায় অবস্থিত। ব্রাজিল এখানে, ভেনেজুয়েলা এখানে, কলাম্বিয়াও আশেপাশে কোথাও, কিন্তু উরুগুয়ে ঠিক কোথায় তা আমি মনে করতেই পারলাম না। মিদোরি কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে তাড়া দিল তার সাথে যেতে। আমি তার পেছন পেছন হলের শেষ পর্যন্ত গিয়ে খাড়া উপরে উঠলাম, তারপর একটা সরু সিঁড়ি বেয়ে কাঠের ছাদে উঠে পড়লাম। বাঁশ দিয়ে কাপড় শুকানোর ব্যবস্থা করা সেখানে। আশেপাশের বাড়ির তুলনায় ছাদটা উঁচু হওয়ায় চারপাশ ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল। তিন-চার বাড়ি পর এক জায়গা থেকে ঘন মেঘের মত কালো ধোঁয়া বের হচ্ছিল আর বাতাসের কারনে বড় রাস্তার দিকে ভেসে যাচ্ছিল। পোড়া গন্ধ চারপাশে।

"সাকামোটোর জায়গা ওটা," রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে মিদোরি বলল। "তারা ঐতিহ্যবাহী কাঠের দরজা আর ফিটিংস বানাতো এক সময়। এখন ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে।"

আমিও ওর সাথে রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করলাম কি হচ্ছে। একটা তিনতলা বিল্ডিঙের জন্য আমরা ঠিকমত দেখতে পারছিলাম না, কিন্তু মনে হল তিন-চারটা ফায়ার ইঞ্জিন কাজ করছে সেখানে। যে গলির ভেতর বাড়িতে আগুন ধরেছে সেখানে পাশাপাশি দু-জনের বেশি ঢুকতে পারছে না। সবাই বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে উৎসুক জনতার ভিড়।

"আচ্ছা, তুমি তোমার মূল্যবান জিনিস গুছিয়ে তৈরি থাকো, এই জায়গা ছাড়তে হতে পারে। বাতাস এখন অন্যদিকে বইছে ঠিকই কিন্তু যে কোন সময়ে এদিকে চলে আসতে পারে। তার উপর আবার এদিকে একটা গ্যাস স্টেশন রয়েছে। আমি তোমাকে সাহায্য করছি, চল।"

"মূল্যবান কি?" মিদোরি জানতে চাইলো।

"এমন কিছু যা তুমি রক্ষা করতে চাও–চেক বই, সিল, দলিল বা এরকম কিছু। নগদ টাকা।"

"ভুলে যাও, আমি যাচ্ছি না কোথাও।"

"যদি এখানে আগুন ধরে?"

"বললাম তো, আমার মরতে আপত্তি নেই।"

আমি তার চোখের দিকে তাকালাম, সে-ও আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকাল, বুঝতে পারলাম না সত্যি বলছে নাকি মজা করছে। আমরা এরকম কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম তারপর দুশ্চিন্তা করা বাদ দিলাম।

"ঠিক আছে," আমি বললাম "বুঝতে পেরেছি। আমিও থাকছি তোমার সাথে।"

"আমার সাথে মরবে?" মিদোরির চোখ জ্বলজ্বল করছিল।

"মাথা খারাপ," বললাম তাকে। "বিপজ্জনক কিছু ঘটলে আমি পালাবো। তুমি মরতে চাইলে একা মরো।"

"কঠিন হৃদয়ের হারামি তুমি!"

"তুমি আমাকে লাঞ্চ রান্না করে খাইয়েছো বলেই তোমার সাথে পুড়ে মরতে পারি না। অবশ্য যদি ডিনার খাওয়াও..."

"আচ্ছা, ভালো হয়েছে। আসো, এখানে বসে কিছুক্ষণ দেখি কি হয়। আমরা গান গাইতে পারি। যদি খারাপ কিছু হয়, তখন ভাবা যাবে।"

"গান গাইবো মানে?"

মিদোরি নিচ থেকে দুটো বালিশ নিয়ে এলো। সাথে চার ক্যান বিয়ার আর গিটার। আমরা বিয়ার খেতে খেতে ধোঁয়া উঠতে দেখলাম। মিদোরি গিটার বাজিয়ে গান ধরলো। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম গান শুনে প্রতিবেশীরা আবার ক্ষেপে যাবে না তো? ছাদে শুয়ে আগুন দেখতে দেখতে বিয়ার খাওয়া আর গান গাওয়া আমার কাছে প্রশংসনীয় কোন কাজ মনে হল না।

"সেসব ভুলে যাও," বলল সে। "আমরা কখনো আমাদের প্রতিবেশীরা কি ভাবল তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করি না।"

সে তার স্কুলের দলের সাথে বাজানো কিছু লোক সঙ্গীত গাইল। বলবো না খুব ভালো গেয়েছে, কিন্তু ও নিজের গাওয়া গান নিজে উপভোগ করছে মনে হল। পুরনো ধরনের সব কিছু বাজিয়ে গেল–*লেমন ট্রি*, *পাফ* (জাদুর ড্রাগন), *ফাইভ হান্ড্রেড মাইল্‌স*, *হয়ার হ্যাভ অল দ্য ফ্লাওয়ারস গন?*, *মাইকেল রো দ্য বোট আশোর*। প্রথম দিকে সে চাচ্ছিল আমি বেজের সাথে তাল মিলাই, কিন্তু আমি এত বাজে ছিলাম যে সে নিজেই বাদ দিল আমাকে, পরে একাই মন উজার করে গান গাইল। আমি বিয়ার খেতে খেতে গান শুনলাম, একই সাথে আগুনের দিকে খেয়াল রাখলাম। আগুন কয়েকবার দাউদাউ করে জ্বলে উঠে আবার কমে গেল। লোকজন চিৎকার করছে আর নির্দেশ দিচ্ছে। পত্রিকার সাংবাদিক হেলিকপ্টারে করে এসে ছবি তুলে গেল। আমার চিন্তা হচ্ছিল আমরাও ছবিতে আছি কিনা। এক পুলিশ লাউডস্পিকারে লোকজনকে পেছনে সরে যেতে

বলছিল। একটা বাচ্চা তার মায়ের জন্য কাঁদছিল। কোথাও শব্দ করে কাঁচ ভাঙল। আগে থেকে না বলে হঠাৎ বাতাস দিক বদলালে সাদা ছাই আকাশ থেকে পড়তে লাগল আমাদের উপর। কিন্তু মিদোরি বিয়ার খেতে খেতে গান চালিয়ে গেল। তার জানা গানের ভান্ডার শেষ হয়ে আসলে, নিজের লেখা একটা পুরনো গান গাইল সে :

আমি তোমার জন্য স্টু রাঁধতে চাই
কিন্তু আমার কাছে কোন পাত্র নাই
আমি তোমার জন্য স্কার্ফ বুনতে চাই
কিন্তু আমার কাছে কোন উল নাই
আমি তোমার জন্য কবিতা লিখতে চাই
কিন্তু আমার কাছে কোন কলম নাই।

"গানের নাম *আমার কিছু নেই*," মিদোরি জানাল।

যা তা রকমের বাজে গান ছিল ওটা। যেমন গানের কথা তেমন সুর। আমি এই জগাখিচুড়ি মার্কা গান শুনতে শুনতে ভাবছিলাম যদি গ্যাস-স্টেশনে আগুন লাগে তাহলে এই বাড়ি বিস্ফোরণে কিভাবে উড়ে যেতে পারে।

অবশেষে হাঁপিয়ে গিয়ে মিদোরি তার গিটার নামিয়ে রেখে আমার কাঁধে ঠেস দিয়ে বসল বিড়ালের মত। "আমার গান কেমন লাগল?" জানতে চাইলো সে।

আমি খুব সাবধানে উত্তর দিলাম। "অন্যরকম ছিল। তোমার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে।"

"থ্যানক্স। থিমটা হল আমার কিছু নেই।"

"হুম, আমিও তাই ধরে নিয়েছিলাম।"

"জানো," সে বলল, "যখন আমার মা মারা গেল..."

"হুম?"

"আমার একটুও খারাপ লাগেনি।"

"ওহ্।"

"বাবা চলে যাওয়ার পরেও আমার খারাপ লাগেনি।"

"তাই নাকি?"

"হুম, সত্যি। তোমার কি মনে হয় না আমি খুব খারাপ? কঠিন হৃদয় আমার?"

"নিশ্চয়ই তোমার কোন কারন আছে।"

"কারন তো আছেই। এই বাড়িতে সব কিছুই অনেক জটিল। কিন্তু আমি সবসময় ভাবতাম, তারা আমার বাবা মা, আমার অবশ্যই মন খারাপ হওয়ার কথা যদি তারা মারা যায় বা আমি তাদের আর দেখতে না পাই। অথচ আমার কিছুই মনে হয়নি। মন খারাপ লাগেনি, একা লাগেনি। আমার এমনকি তাদের কথা মনেও আসে না। কখনো কখনো স্বপ্ন দেখি অবশ্য। অন্ধকারের ভেতর থেকে আমার মা তাকিয়ে আছে, আমাকে দোষ দিচ্ছে সে মারা গেছে আর আমি খুশি সেজন্য। আমি তার মৃত্যুর জন্য খুশি নই। আমি স্রেফ দুঃখিত নই। আর সত্যি কথা বলি, আমি একবিন্দুও চোখের পানি ফেলিনি। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার বিড়াল মারা যাওয়ার পর সারারাত কেঁদেছিলাম।"

এত ধোঁয়া কেন? আমি ভাবছিলাম। কোন আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে না, আগুন ছড়াচ্ছেও মনে হচ্ছে না। কিন্তু ধোঁয়ার স্তম্ভ উঠে যাচ্ছে আকাশে। কি পুড়ছে এতক্ষন ধরে?

"কিন্তু শুধু আমাকে দোষ দেয়া যাবে না," মিদোরি বলে চলল, "এটা সত্যি আমি কঠিন। আমি স্বীকার করছি সেটা। কিন্তু তারা যদি–আমার বাবা মা–আমাকে আরেকটু ভালোবাসত, তাহলে হয়ত আমি কিছু অনুভব করতে পারতাম–যেমন ধরো সত্যিকারের খারাপ লাগা।"

"তোমার মনে হয় তোমাকে যথেষ্ট ভালোবাসেনি তারা?"

সে তার ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। " 'যথেষ্ট নয়' এবং 'একদমই নয়'-এর মাঝামাঝি। আমি সবসময় ভালোবাসার কাঙ্গাল ছিলাম। অন্তত একবারের জন্য আমি বুঝতে চাইছিলাম কেমন লাগে। শুধু একবার মন ভরে ভালোবাসা। কিন্তু তারা কখনো আমাকে দেয়নি সেটা, কখনো না। আমি যদি তাদের কাছে হাতজোড় করে কিছু চেয়েছি, তারা ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিয়েছে আর চিৎকার করেছে 'না! এর দাম অনেক বেশি!' সবসময় তাই শুনেছি। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, এমন একজনকে খুঁজে বের করবো যে আমাকে কোন শর্ত ছাড়া তিনশ পঁয়ষট্টি দিন ভালোবাসবে। আমি তখন এলিমেন্টারি স্কুলে, ক্লাস ফাইভ অথবা সিক্সে, কিন্তু তখন থেকে আমি মন শক্ত করে ফেলেছি।"

"ওয়াও!" আমি বললাম, "খুঁজে পেয়েছো?'

"ঐটাই তো কঠিন অংশ," মিদোরি বলল। কিছুক্ষণ ধোঁয়া ওঠা দেখে কি জানি ভাবল। "আমার মনে হয় আমি অনেকদিন ধরে নিখুঁত কাউকে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। ফলে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে গেছে।"

"নিখুঁত প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করছো?"

"আরে না, আরও ভালো তারচেয়ে। আমি খুঁজছি স্বার্থপরতা। নিখুঁত স্বার্থপরতা। যেমন ধরো, যদি বলি আমি স্ট্রবেরি সর্ট কেক খেতে চাই, সে সব কাজ ফেলে দৌড়ে যাবে আমার জন্য কেক কিনতে। দৌড়ে নিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁটু গেড়ে বসে আমাকে কেক সাধবে। আমি বলবো আমি চাই না আর এই কেক। তারপর কেক নিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। এরকম প্রেমিক খুঁজছি আমি।"

"বুঝতে পারছি না এর সাথে প্রেমের কোন সম্পর্ক আছে কিনা," হতবাক হয়ে বললাম আমি।

"অবশ্যই আছে," সে বলল, "তুমি কিছু জানো না। মেয়েদের জীবনে এমন সময় আসে যখন এরকম কিছু হওয়া খুবই জরুরি।"

"এরকম কিছু মানে জানালা দিয়ে স্ট্রবেরি কেক ছুঁড়ে ফেলা?"

"একদম ঠিক। আর আমি যখন করবো তখন আমি চাই সে আমার কাছে মাফ চাইবে। 'এখন বুঝতে পারছি আমি, মিদোরি, আমি কত বোকা! আমার জানা উচিত ছিল স্ট্রবেরি কেকের প্রতি তোমার আগ্রহ শেষ হয়ে যাবে। আমার বুদ্ধি একদম গাধার হাগুর মত। তোমার জন্য আমি আবার গিয়ে কেক নিয়ে আসবো। কি চাও তুমি? চকলেট মুজ? চিজ কেক?' "

"তারপর কি হবে?"

"তারপর আমি তাকে তার পাওনা সব ভালোবাসা দেবো।"

"পাগলামি মনে হচ্ছে আমার কাছে।"

"হতে পারে, আমার কাছে এটাই প্রেম, ভালোবাসা। সমস্যা হল আমাকে কেউ বুঝতে পারে না," মিদোরি তার মাথা আমার কাঁধের সাথে রেখে একটু ঝাঁকাল। "এক ধরনের মানুষের জন্য সামান্য কোন কিছু থেকেই ভালোবাসা শুরু হতে পারে। সেরকম কিছু অথবা একদমই কিছুই হয় না।"

"আমি আর কোন মেয়ে দেখিনি যে তোমার মত করে চিন্তা করে।"

"অনেক লোক আমাকে এই কথা বলেছে," নিজের চামড়া খুঁটতে খুঁটতে সে বলল। "কিন্তু একমাত্র এভাবেই আমি চিন্তা করতে পারি। সত্যি, আমি যা বিশ্বাস করি তাই তোমাকে বললাম। আমার কখনো মনে হয়নি আমার চিন্তা আর অন্যদের চিন্তা আলাদা হতে পারে। আমি আলাদা হতে চাচ্ছি না। কিন্তু আমি যখন মন থেকে বলি লোকজন মনে করে আমি ভাব নিচ্ছি কিংবা মজা করছি। এরকম হলে আমার মেজাজ খারাপ লাগে।"

"আর তখন তুমি আগুনে পুড়ে মরতে চাও?"

"আরে না, সেটা আলাদা ব্যাপার, স্রেফ কৌতূহল।"

"কিসের কৌতূহল? আগুনে পুড়ে মরার?"

"না আমি দেখতে চাইছিলাম তুমি কিভাবে নাও," মিদোরি বলল। "কিন্তু মরার ব্যাপারে আমি ভীত নই। সত্যি বলছি। এখানে আমি ধোঁয়াতে অচেতন হয়ে কিছু বোঝার আগেই মারা পড়বো। এই নিয়ে ভয় পাই না, আমার মা যেভাবে মারা গেছে দেখেছি কিংবা আমার কিছু আত্মীয়, সেই তুলনায় এটা কিছুই না। আমার সব আত্মীয় রোগে ভুগে অনেক কষ্ট পেয়ে মারা গেছে। আমাদের রক্তে আছে মনে হয় এটা। অনেকদিন ধরে এটা চলবে, শেষ দিকে তুমি দেখে বলতেও পারবে না সে বেঁচে আছে নাকি নেই। খালি আছে ব্যথা আর কষ্ট।"

মিদোরি একটা মার্লবোরো মুখে নিয়ে জ্বালাল।

"এধরনের মৃত্যুকে আমি ভয় পাই। মৃত্যু আস্তে আস্তে ছায়া ফেলে জীবনের অংশ খেতে থাকবে। তুমি বুঝে ওঠার আগেই চারপাশ অন্ধকার, কিছু আর দেখতে পাবে না, আর লোকজন মনে করবে তুমি জীবিতর চেয়ে মৃতই বেশি। আমার জঘন্য লাগে। আমি সহ্যই করতে পারবো না।"

আরও প্রায় আধঘন্টা পরে আগুন নেভানো সম্ভব হল। আগুন আর কোথাও ছড়াতেও পারেনি আর এই ঘটনায় কেউ হতাহতও হয়নি। একটা বাদে দমকলের সব গাড়ি ফিরে গেল। ভিড় গেল ভেঙে, লোকজন নিজেদের মত জড়ো হয়ে কথা বলছিল। পুলিশের একটা গাড়ি রয়ে গেল ট্রাফিক সামলানোর জন্য, ওটার ছাদে লাল নীল বাতি জ্বলছে। কাছাকাছি এক লাইটপোস্টে দুটো কাক বসে মনোযোগ দিয়ে নিচের ব্যাপার-স্যাপার লক্ষ্য করছিল।

মিদোরির মনে হল সব শক্তি শেষ। নিস্তেজ হয়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, কথা বলছেই না বলা যায়।

"ক্লান্ত?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"নাহ, সেরকম কিছু না। কাহিল লাগছে। হতবুদ্ধি হয়ে গেছি মনে হচ্ছে। অনেকদিন পর এমন হল।"

সে আমার চোখে তাকাল, আমি তার চোখে। সেই মুহূর্তে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। একটু কেঁপে উঠে নিজেকে ছেড়ে দিল সে, চোখ বন্ধ করে থাকল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। হেমন্তের সূর্য তার চোখের পাপড়ির ছায়া ফেলল গালের উপর। আর আমি দেখতে পেলাম পাপড়িগুলো কাঁপছে।

হালকা নরম চুমু ছিল, যা থেকে এর বেশি কিছু হওয়ার কথা নয়। আমি হয়ত মিদোরিকে সেদিন চুমু খেতাম না যদি না সেদিন ছাদে বসে বিয়ার খেতে খেতে আগুন দেখতাম। মিদোরিও হয়ত একইরকম মনে করেছিল। একসাথে

অনেকক্ষণ বসে ঝলমলে ছাদ, ধোঁয়া, লাল ফড়িং আর অন্যসব দেখার পর আমরা কাছাকাছি চলে এসেছিলাম, আর হয়ত আমরা মনে মনে অর্ধ সচেতনভাবে দু-জনই চাচ্ছিলাম। এটা ছিল সেরকম চুমু। কিন্তু সব চুমুর সাথেই একটু হলেও বিপদের উপাদান থেকে যায়।

মিদোরি প্রথমে কথা বলল। আমার হাত ধরে আমাকে বলল কিছু সমস্যা আছে কিন্তু সে আসলে একজনের সাথে জড়িত। আমি বললাম আমি বুঝতে পারছিলাম সেটা।

"তোমার পছন্দের কোন মেয়ে আছে?" জিজ্ঞেস করল সে।

"আছে," বললাম তাকে।

"তারপরেও তুমি প্রতি রবিবার ফ্রি থাকো?"

"মোটামুটি ভালো জটিল একটা সম্পর্ক," আমি বললাম।

তারপর হঠাৎ উপলব্ধি করলাম হেমন্তের বিকেলের সেই হালকা জাদুময় আমেজ কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে।

পাঁচটার দিকে আমি বললাম আমাকে কাজে যেতে হবে, মিদোরি চাইলে আমার সাথে বাইরে যেতে পারে নাস্তা করতে। সে বলল তার বাসায় থাকতে হবে, ফোন আসতে পারে।

"একটা ফোনের জন্য সারাদিন অপেক্ষা করতে আমার জঘন্য লাগে। যখন আমি সারাদিন একা থাকি আমার মনে হয় শরীরের মাংস একটু একটু করে পচে যাচ্ছে। পচে গলে সবুজ একটা ডোবার মত পড়ে আছে আর মাটি শুষে নিচ্ছে। বাসায় আটকে থাকলে আমার এরকম লাগে।"

"তোমার এরকম ফোনের জন্য আটকে থাকতে হলে আমাকে জানিয়ো, আমি এসে তোমাকে সঙ্গ দেবো যদি লাঞ্চ খাওয়াও।"

"দারুন," সে বলল, "আর ডেজার্টের জন্য আগুন লাগাবো কোথাও।"

মিদোরি পরেরদিন নাটকের ইতিহাস ক্লাসে আসল না। আমি ক্লাসের পর ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে একাকি ঠান্ডা বিষাদ লাঞ্চ খেয়ে সূর্যের আলোয় বসে ক্যাম্পাসের দৃশ্য দেখতে থাকলাম। আমার পাশেই দু-জন ছাত্রি দাঁড়িয়ে থেকে বিশাল এক আলাপ ফেদে বসেছে। একজন একটা টেনিস র‍্যাকেট বুকের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে রেখেছে যেন নিজের বাচ্চা জড়িয়ে রেখেছে, আরেকজনের হাতে কিছু বই আর লেনারড বার্নস্টেইনের একটা এলপি। দু-জনই সুন্দরি ছিল আর কথা বলতে মজা পাচ্ছিল মনে হল। স্টুডেন্ট ক্লাবের বিল্ডিং থেকে স্বরচর্চার শব্দ আসছে। এখানে সেখানে চার-পাঁচজন করে জড়ো হয়ে গল্প আর হাসি-ঠাট্টা করছিল। পার্কিংলটে কিছু ছেলে স্কেটবোর্ডিং করছিল। লেদার ব্রিফকেস নিয়ে

এক প্রফেসর সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় হাত দিয়ে স্কেটবোর্ড এড়াচ্ছিল। ইট বিছানো অংশে হেলমেট পরে বসে পেইন্টিং করছিল এক মেয়ে । বিষয় বস্তু হল এশিয়ার দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদি আমেরিকার আক্রমণ। দুপুরবেলা ভার্সিটির দৃশ্য মোটামুটি এমনি থাকে। কিন্তু আমি যখন বসে মনোযোগের সাথে দেখছিলাম তখন কিছু ব্যাপার উপলদ্ধি করতে পারলাম। যার যার মত সবাইকেই সুখি দেখাচ্ছিল। তারা আসলেই সুখি নাকি শুধু সুখি দেখাচ্ছিল আমি তা বলতে পারবো না। কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষে এই মনোরম দুপুরে তাদের সবাইকে সুখি লাগছিল আর আমি নতুন করে একাকি বোধ করলাম। যেন আমিই এখানে একমাত্র যে এসব লোকজনের অংশ না।

এসব নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমার মনে পড়ল শেষ কবে আমার নিজেকে কোন কিছুর অংশ মনে হয়েছিল। শেষ আমি যা মনে করতে পারছিলাম তা হল হারবারের কাছে বিলিয়ার্ড পার্লার, কিজুকি আর আমি বিলিয়ার্ড খেলেছিলাম বন্ধুত্তের মনোভাব নিয়ে। সে রাতেই আত্মহত্যা করেছিল কিজুকি আর তখন থেকেই আমার আর দুনিয়ার মধ্যে কষ্টের ঠাণ্ডা একটা পর্দা তৈরি হয়ে গেছিল। এই কিজুকি ছেলেটা, আমার কাছে তার অস্তিত্বের কি মূল্য? এর উত্তর আমার জানা নেই। আমি স্রেফ জানি–নিশ্চিতভাবে জানি–কিজুকির মৃত্যু আমার বয়সন্ধির একটা অংশ পুরোপুরি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু এর অর্থ বা এর ফলাফল আমার বোঝার বাইরে রয়ে গেছে।

আমি অনেকক্ষণ সেখানে বসে থাকলাম। ক্যাম্পাস আর লোকজনের চলাফেরা দেখলাম, আশা করছিলাম মিদোরিকে দেখা যাবে। কিন্তু সে আর আসেনি। দুপুর শেষ হলে আমি জার্মান ক্লাসের জন্য প্রস্তুত হতে লাইব্রেরিতে গেলাম।

পরের শনিবার বিকেলে নাগাসাওয়া আমার রুমে এসে প্রস্তাব করল শহরে গিয়ে মজা করার জন্য। সে আমার জন্য সারারাত বাইরে থাকার পাশ জোগাড় করে দেবে। আমি বললাম যাবো। গত এক সপ্তাহ ধরে আমার মাথা ভারি হয়েছিল, যে কারো সাথে বিছানায় যাবার জন্য রাজি ছিলাম, মানুষটা কে তাতে কিছু আসে যায় না।

সেদিন বিকেলে গোসল করে শেভ করে পরিস্কার কাপড় পরলাম–পোলো শার্ট আর সুতির জ্যাকেট–তারপর নাগাসাওয়ার সাথে ডাইনিং হলে ডিনার করে সিঞ্জুকুর বাস ধরলাম দু-জনে। বাস থেকে নেমে কিছুদূর হেঁটে আমরা আমাদের পরিচিত বারে গেলাম আর সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলাম পছন্দসই জোড়া মেয়ের জন্য। এই বারে মেয়েরা সাধারণত জোড়ায় আসে–ব্যতিক্রম হল শুধু

সেই সন্ধ্যায়। আমরা সেখানে প্রায় দুই ঘন্টা থাকলাম, অল্প হুইস্কি আর সোডা গিললাম যাতে মাতাল না হয়ে পড়ি। অবশেষে দু-জন চমৎকার মেয়েকে বারে দেখা গেল। গিম্লেট আর মারগারিটা অর্ডার দিল তারা। নাগাসাওয়া তাদের সাথে পরিচিত হতে গেল কিন্তু তারা বলল তারা তাদের বয়ফ্রেন্ডদের জন্য অপেক্ষা করছে। এরপরেও আমরা তাদের সাথে কিছুক্ষণ গল্প করলাম, তাদের ডেট চলে আসলে তারা চলে গেল।

নাগাসাওয়া আমাকে নিয়ে আরেক বারে গেল ভাগ্য পরীক্ষার জন্য, কানাগলির মধ্যে ছোট একটা জায়গা। অনেক বেশি শব্দ আর কাস্টমাররা বেশিরভাগই ততক্ষনে মাতাল। তিনজন মেয়ে একটা টেবিল দখল করে বসে ছিল, আমরা তাদের সাথে যোগ দিলাম। গল্প জমে উঠেছিল আর আমরা পাঁচজন ভালো মুডেই ছিলাম। নাগাসাওয়া তাদেরকে বলল অন্য কোথাও গিয়ে পান করার জন্য, কিন্তু মেয়েরা বলল কারফিউর সময় হয়ে এসেছে তারা ডরমে ফিরে যেতে চায়। এই হল আমাদের 'ভাগ্য।' আমরা আরও এক জায়গায় চেষ্টা করলাম কিন্তু ফলাফল শূন্য। যে কোন কারনেই হোক মেয়েরা আমাদের দিকে ঘেঁষছিল না সেদিন।

সাড়ে এগারোটা বেজে যাওয়ার পর নাগাসাওয়া হাল ছেড়ে দিল। "দুঃখিত তোমাকে শুধু শুধু ঘোরালাম।"

"ব্যাপার না," আমি বললাম, "তোমারও যে মাঝে মধ্যে খারাপ দিন যায় তা জানা হল।"

"হয়ত বছরে একদিন," স্বীকার করল সে।

সত্যি বলতে আমার তখন সেক্স করার মুড ছিল না। হৈচৈপূর্ণ শনিবার রাতে সিঞ্জুকুতে ঘোরাঘুরি করে, সেক্স আর অ্যালকোহলের রহস্যময়তা দেখে নিজের কামনা-বাসনা নিজের কাছেই ক্ষুদ্র লাগছিল।

"তুমি এখন কি করবে, ওয়াতানাবে?"

"মনে হয় সিনেমা হলে যাবো," আমি বললাম, "অনেক দিন কোন মুভি দেখা হয় না।"

"আমি তাহলে হাটসুমির বাসায় যাই," নাগাসাওয়া বলল, "যদি আপত্তি না থাকে তোমার।"

"আরে, কী বলো!" আমি বললাম, "আপত্তি থাকবে কেন?"

"তুমি যদি চাও আমি তোমাকে এক মেয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি, যে তোমাকে রাতে থাকতে দেবে।"

"নাহ থাক। আমি আসলেই আজকে মুভি দেখার মুডে আছি।"

"দুঃখিত," নাগাসাওয়া বলল, "অন্য কোন একদিন পুষিয়ে দেব তোমাকে।" তারপর সে ভিড়ে হারিয়ে গেল।

আমি একটা ফাস্ট ফুডের দোকানে চিজ বার্গার আর কফি খেলাম নেশা কাটানোর জন্য। তারপর পুরাতন এক সিনেমাহলে গেলাম *দ্য গ্র্যাজুয়েট* দেখতে। খুব একটা ভালো লাগেনি, কিন্তু আর কিছু করার ছিল না তাই আবার দেখলাম। ভোর চারটার দিকে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে সিঞ্জুকুর ঠান্ডা রাস্তায় অলস হাঁটতে লাগলাম। আর চিন্তা করছিলাম।

হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গেলে সারা রাত চলে এরকম এক কফি হাউজে গিয়ে বই আর কফি নিয়ে অপেক্ষা করলাম প্রথম ট্রেনের জন্য। জায়গাটায় অনেক ভিড় ছিল, সবাই প্রথম ট্রেনের জন্য বসে ছিল। একজন ওয়েটার এসে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে জানতে চাইলো আমার টেবিলে অন্য কেউ বসলে সমস্যা আছে কিনা। আমি বললাম কোন সমস্যা নেই। আমার সাথে কে বসল তাতে কিছু আসে যায় না, আমি শুধু বই পড়ছিলাম।

আমার বয়সি দু-জন মেয়ে এসে বসল। তাদের কেউই সুন্দরি না, আবার খারাপও না দেখতে। তারা চাপা স্বভাবের ছিল, তাদের পোশাক দেখে মনে হচ্ছিল না ভোর পাঁচটায় সিঞ্জুকুতে ঘোরাঘুরি করার মত মেয়ে তারা। সম্ভবত গত রাতের শেষ ট্রেন ধরতে পারেনি বা এরকম কিছু হবে। আমার এখানে বসতে পেরে যেন তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আমার পরনে ভদ্র পোশাক, কাল সন্ধ্যায় শেভও করেছি, তার উপর আমি পড়ছিলাম টমাস মানের *দ্য ম্যাজিক মাউন্টেইন*।

একটা মেয়ে একটু মোটা ধরনের ছিল। সে পরেছিল ধূসর রঙা পার্কা আর সাদা জিন্স। সাথে ভিনাইল পকেটবুক, কানে ঝিনুকের তৈরি বড় দুল। সাথেরজন একটু ছোট ধরনের মেয়ে, চশমা পরা। সে চেক শার্টের উপর নীল কারডিগান পরে ছিল। হাতে ছিল নীলকান্তমণির আঙটি। একটু পর পর চশমা খুলে চোখ ডলা ছোট মেয়েটির বদভ্যাস।

তারা দু-জনেই কেক, কফি আর দুধ অর্ডার করল। অর্ডার করতে তাদের সময় লাগছিল কারন কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার সুরে কথা বলছিল। মোটা মেয়েটা কয়েকবার মাথা কাত করে কথা বলার সময় ছোট মেয়েটা মাথা নাড়িয়ে সায় দিচ্ছিল। তাদের কথাবার্তা আমি ভালো করে শুনতে পাইনি কারন স্টেরিওতে *মরভিন গে, বিজিস* কিংবা অন্যকিছু চলছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল ছোট মেয়েটি কোন কারন রাগ অথবা মন খারাপ আর মোটা মেয়েটা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। আমি বইয়ে মনোযোগ না দিতে পেরে তাদের দেখতে থাকলাম।

ছোট মেয়েটা তার ব্যাগ নিয়ে লেডিস রুমের দিকে যেতে অন্যজন আমার সাথে কথা বলল। "আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আপনি কি বলতে পারেন আশেপাশে কোন বার আছে কিনা যেখানে এই সময়েও ড্রিঙ্ক করা যাবে?"

আমি বই সরিয়ে রেখে বললাম, "এই ভোর পাঁচটায়?"

"হ্যাঁ..."

"আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমি বলবো ভোর পাঁচটা বিশে বেশিরভাগ মানুষ বাসায় যায় ভদ্র হতে আর ঘুমায়।"

"আমি বুঝতে পারছি," সে অপ্রতিভ হয়ে বলল। "আমার বন্ধু ড্রিঙ্ক করতে চাইছে, তার কাছে এটা একটু জরুরি।"

"এখন মনে হয় বাসায় গিয়ে আর ড্রিঙ্ক করার কোন উপায় নেই।"

"কিন্তু আমাকে সকাল সাড়ে সাতটার ট্রেনে নাগানো যেতে হবে।"

"তাহলে উপায় হল কোন একটা ভেন্ডিং মেশিন থেকে কিনে কোথাও বসে খাওয়া। এছাড়া আর কি করবেন?"

"আমি জানি বেশি চাওয়া হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনি কি আমাদের সাথে আসতে পারবেন? দু-জন মেয়ে একা এরকম কিছু করলে ভালো দেখাবে না।"

সিঞ্জুকুতে আমার অনেক আজব আজব অভিজ্ঞতা হয়েছে কিন্তু ভোর পাঁচটা বিশে দু-জন অজানা মেয়ের সাথে ড্রিঙ্ক করার অনুরোধের মত কিছু আগে কখনো হয়নি। সময়ের কোন অভাব আমার ছিল না আর মানা করে দেয়ার চেয়ে ঝামেলা নেয়াটাই ভালো হবে মনে হল। তাই আমি ভেন্ডিং মেশিন থেকে সাকি আর স্ন্যাক্স কিনে স্টেশনের পশ্চিম দিকে বাইরের খালি লনে বসে চটজলদি একটা ড্রিঙ্কিং পার্টি করে ফেললাম।

মেয়েরা আমাকে বলল তারা একটা ট্রাভেল কোম্পানিতে একসাথে কাজ করার সময় বন্ধুত্ব হয়েছে। দু-জনেই জুনিয়র কলেজ থেকে এবছর পাশ করে জীবনের প্রথম চাকরি শুরু করেছে। ছোট মেয়েটার গত একবছর ধরে একটা বয়ফ্রেন্ড ছিল কিন্তু সম্প্রতি সে জানতে পেরেছে ঐ ছেলে আরেক মেয়ের সাথে ঘুমাচ্ছে। আর সে এটায় অনেক কষ্ট পেয়েছে। মোটা মেয়েটার গতরাতে তার ভাইয়ের বিয়েতে নাগানো যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু বন্ধুর অবস্থা দেখে সে তার সাথে রাত কাটিয়ে রবিবার সকালের প্রথম ট্রেন ধরছে।

"আপনি তো তাহলে খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন," আমি

ছোটটাকে বললাম। "কিন্তু কিভাবে বুঝলেন সে অন্য কারো সাথে ঘুমাচ্ছে?"

সাকিতে অল্প করে চুমুক দিয়ে সে পায়ের নিচে কিছু ঘাস মাড়িয়ে বলল, "আমার কিছু বুঝতে হয়নি, আমি দরজা খুলে তাকে ঐ অবস্থায় পেয়েছিলাম।"

"সেটা কবে?"

"গত পরশু রাতে।"

"বলো কী! দরজা খোলা ছিল?"

"হুম।"

"সে দরজা বন্ধ করেনি কেন?"

"তা কী করে বলবো?"

"ভেবে দেখুন ওর মনের অবস্থাটা," মোটাজন বলল, বন্ধুর প্রতি তার সত্যি দরদ ছিল। "কি রকম ধাক্কা খেয়েছে বেচারি। আপনার কি মনে হচ্ছে না পুরোটা জঘন্য ব্যাপার?"

"আমার কিছু বলার নেই," উত্তর দিলাম, "আপনার উচিত বয়ফ্রেন্ডের সাথে এ নিয়ে ভালোভাবে কথা বলা। তারপর ঠিক করুন তাকে ক্ষমা করবেন কিনা।"

"কেউ বুঝতে পারছে না আমার কেমন লাগছে," পা দিয়ে ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল সে।

এক ঝাঁক কাক পশ্চিম থেকে এসে বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের উপর দিয়ে উড়ে গেল। তখন সূর্য পুরোপুরি উঠে গেছে। নাগানো যাওয়ার ট্রেন আসার সময় হয়ে গিয়েছিল। আমরা বাকি সাকিটুকু গৃহহীন একজনকে দিয়ে প্লাটফর্মের টিকেট কাটলাম মোটাজনকে উঠিয়ে দিতে। ট্রেন চলে যাওয়ার পর আমি আর ছোট মেয়েটা কিভাবে জানি কাছের এক হোটেলে গিয়ে হাজির হলাম। আমাদের কেউই একজন আরেকজনের সাথে সেক্স করার জন্য মারা যাচ্ছিল না, কিন্তু যাহোক না কেন ব্যাপারটা ঐ মুহূর্তে আমাদের কাছে জরুরি মনে হচ্ছিল।

আমি কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে বিয়ার নিয়ে বাথটাবে গিয়ে বসলাম। সে-ও পোশাক খুলে এসে বসল। আমরা বাথটাবে চাপাচাপি করে বসে বিয়ার খেলাম। কেউই মাতাল হতে পারলাম না যদিও, আবার ঘুমও পাচ্ছিল না। ওর শরীর ছিল অনেক ফর্সা আর কোমল। বিশেষ করে পাগুলো ছিল খুবই সুন্দর। আমি তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করলে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে থ্যাংকস দিল।

কিন্তু একসাথে বিছানায় যেতেই সে যেন এক অন্য মানুষ বনে গেলো। আমার আলতো স্পর্শও তাকে উত্তেজিত করে তুলছিল। শরীর মুচড়ে আর্তনাদ

করে উঠছিল সে। তার শরীরে প্রবেশ করার সাথে সাথে সে আমার পিঠ নখ দিয়ে খামচে দিল। অর্গাজম হওয়ার আগ পর্যন্ত মোট ষোল বার সে অন্য আরেকজনের নাম ধরে ডাকতে থাকলো। অর্গাজম যতটা সম্ভব দীর্ঘ করানোর জন্য আমি গোণায় মনোযোগ দিয়েছিলাম। শেষ হওয়ার পর আমরা দু-জনেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সাড়ে বারোটায় যখন ঘুম থেকে উঠলাম সে ততক্ষণে চলে গেছে। কোন নোট রেখে যায়নি। অতিরিক্ত ড্রিঙ্কের কারনে মাথার একপাশ অদ্ভুত রকমের ভারি লাগছিল। আমি গোসল করলাম ভালো করে ঘুম ভাঙানোর জন্য। শেভ করলাম। তারপর ফ্রিজ থেকে এক বোতল জুস বের করে চেয়ারে নগ্ন বসে ভাবতে লাগলাম গত রাতের ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো নিয়ে। নিজের কাছেই সত্যি মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল দুই-তিন স্তর কাঁচের ভেতর থেকে দেখছি, কিন্তু যা ঘটেছে সত্যি সত্যি ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিয়ারের গ্লাসগুলো তখনো টেবিলের উপর রাখা আর বেসিনের কাছে একটা ব্যবহার করা টুথব্রাশ পড়ে আছে।

আমি সিঞ্জুকুতে হালকা লাঞ্চ করলাম, তারপর একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে মিদোরি কোবায়াসিকে ফোন করলাম এই আশায় যে, সে হয়ত বাসায় একা বসে ফোনের জন্য অপেক্ষা করছে। পনের বার ফোন বাজল কিন্তু কেউ ধরল না। মিনিট বিশেক পরে আমি আবার চেষ্টা করলাম, একই ফল। তারপর বাস ধরে ডরমে চলে এলাম। মেইল বক্সে স্পেশাল ডেলিভারির চিঠি অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। চিঠিটা পাঠিয়েছে নাওকো।

অধ্যায় ৫

"চিঠির জন্য ধন্যবাদ," নাওকো লিখেছে। তার পরিবার থেকে চিঠি তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল সে জানাল। বিপর্যস্ত না হয়ে বরং চিঠি পেয়ে সে খুশি হয়েছে। তাই সে নিজে নিজে লিখতে পারছে আমাকে।

এটুকু পড়ে আমি জানালা খুলে দিলাম, জ্যাকেট খুলে বিছানায় বসলাম। কাছাকাছি কোথাও কবুতর ডাকছে বাকবাকুম করে। হালকা বাতাসে পর্দা উড়ছিল। নাওকোর থেকে আসা সাত পৃষ্ঠার চিঠি হাতে নিয়ে আমার অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই কয়েক লাইন পড়ে আর পড়ছি না যে, তাতে দুনিয়ার সব রঙ হারিয়ে যেতে বসেছে। আমি কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে চিন্তাগুলোকে জড়ো করে একটা বড় শ্বাস নিয়ে পড়া শুরু করলাম।

"প্রায় চার মাস হয়েছে আমি এখানে এসেছি," সে লিখেছে। "এই পুরো সময় আমি তোমার কথা ভেবেছি। যতই আমি ভেবেছি ততই আমার মনে হয়েছে তোমার সাথে অন্যায্য আচরণ করেছি আমি। হয়ত তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করলে এখন আরও ভালো অবস্থায় থাকতাম।

যদিও এরকম করে সব সহজভাবে দেখা যায় না। আমার বয়সি মেয়েরা কখনো ন্যায্য শব্দটা ব্যবহার করে না। আমার মত সাধারণ মেয়েদের কাছে ন্যায্য-অন্যায্যর কোন পার্থক্য আসলে নেই। তাদের কাছে মূল ব্যাপার ন্যায্য অন্যায্য নয় বরং ব্যাপারটা সুন্দর কি অসুন্দর। কিংবা ব্যাপারটা তাদেরকে সুখি করবে কিনা। ন্যায্য-অন্যায্য ছেলেদের শব্দ। কিন্তু আমার কাছেও এখন এটা সঠিক শব্দ মনে হচ্ছে। আর যেহেতু সৌন্দর্য এবং সুখি হওয়ার প্রশ্ন আমার জন্য এখন কঠিন এবং জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমার মনে হয় অন্য মান যেমন–পছন্দ না অপছন্দ, কিংবা ন্যায্য-অন্যায্য, কথা বলাই আমার জন্য ঠিক হবে।

যাহোক না কেন, আমি মনে করি আমি তোমার সাথে অন্যায্য কিছু করেছি এবং এর ফলে তোমাকে এমন কিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে যে তুমি গভীর কষ্ট পেয়েছো। এরকম করায় আমি নিজেও এমন কিছুর মধ্যে দিয়ে গিয়েছি যে,

আমিও গভীরভাবে কষ্ট পেয়েছি। কোন অজুহাত দিচ্ছি না বা আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য বলছি না, সত্যি বলছি। আমি যদি তোমার ভেতর কোন ক্ষত তৈরি করে থাকি তাহলে সেটা শুধু তোমার নয় আমারও। তাই দয়া করে আমাকে ঘৃণা কোরো না। আমি একজন দোষ-ত্রুটিপূর্ণ মানুষ মাত্র, তুমি যতটুকু আমাকে জানো তার চেয়ে অনেক বেশি ত্রুটিপূর্ণ। সেজন্যই আমি আরো বেশি করে চাই তুমি যেন আমাকে ঘৃণা না করো। কারন তুমি যদি আমাকে ঘৃণা করো, আমি সত্যি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবো। তুমি যা পারো আমি তা পারি না। আমি চুপ করে খোলসের মধ্যে ঢুকে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারি না কখন ঝড় শেষ হয়ে যাবে। আমি জানি না তুমি এরকম আসলেই পারো কিনা কিন্তু কখনো কখনো তোমায় দেখে সেরকম মনে হয়েছে আমার। আমি সেজন্য তোমাকে কখনো কখনো হিংসা করতাম। সেজন্যই হয়ত তোমাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম।

হয়ত ব্যাপারগুলোর অতিরিক্ত বিশ্লেষণ হয়ে যাচ্ছিল। তুমি কি একমত? তারা আমাকে এখানে যে থেরাপি দেয় তা অবশ্যই অতিরিক্ত বিশ্লেষণ নয়। কিন্তু তুমি যদি আমার মত কয়েক মাস চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে যাও, চাও বা না চাও, কম বেশি তোমাকে বিশ্লেষণ করতেই হবে। 'এটার জন্য ওটা হয়েছে আর ওটার জন্য হয়েছে সেটা'–এরকম আর কি। আমি জানি না এরকম বিশ্লেষণ আমার জন্য দুনিয়াকে সহজ করছে নাকি আরও বিভক্ত করছে।

যাহোক, আমার মনে হচ্ছে আমি যে অবস্থায় ছিলাম তার থেকে সুস্থ হওয়ার দিকে এগুচ্ছি, আর এখানকার সবাইও একমত। জুলাইতে আমি তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলাম তা আমার নিজেকে নিংড়ে বের করতে হয়েছিল। (সত্যি কথা হল আমার মনে নেই কি লিখেছিলাম, ভয়াবহ কিছু ছিল কি?) কিন্তু এবার আমি খুবই ঠান্ডা মাথায় শান্তভাবে লিখছি। পরিস্কার বাতাস, চুপচাপ পরিবেশ, দুনিয়া থেকে আলাদা, দৈনিক রুটিন করা কাজ, ব্যায়াম, এসব আমার প্রয়োজন ছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে। কাউকে চিঠি লিখতে পাড়াটা কি দারুন ব্যাপার! ডেস্কে বসে কলম তুলে নিজের চিন্তাগুলোকে শব্দে রুপান্তরিত করে তারপর আরেকজনকে হস্তান্তর করার অনুভূতি সত্যি অবিশ্বাস্য। অবশ্য আমি যখন লিখি তখন আসলে যা বলতে চাই তার ক্ষুদ্র অংশ বলতে পারি। তারপরেও এটা অনেক। আমি কাউকে চিঠি লিখতে চাই এটা অনুভব করেই আমি খুশি। আর তাই তোমাকে লিখছি। এখানে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাজে, ডিনার করা শেষ। মাত্র গোসল করেছি। এই জায়গা একদম চুপচাপ, আর বাইরে গাঢ় অন্ধকার। জানালা দিয়ে

বাইরে কিচ্ছু দেখছি না, কোন আলো নেই। সাধারনত আমি এখানে বসে বাইরে তারা স্পষ্ট দেখতে পাই, আজকে পাচ্ছি না মেঘের জন্য। এখানে সবাই আকাশের তারা চেনে। আমাকে বলে 'ঐযে ওটা কন্যা' কিংবা 'ঐযে ওটা ধনু।' তারা শিখতে চায় সেজন্য শেখে তা নয়, সূর্য ডোবার পর কিছু করার নেই বলে হয়ত শেখে। সেজন্যই তারা পাখি, ফুল কিংবা পোকা সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। তাদের সাথে কথা বলে আমি বুঝতে পারি আমি এসব জিনিস একসময় খেয়ালই করতাম না।

এখানে এখন প্রায় সত্তুর জনের মত বাস করে। এর বাইরে স্টাফ (ডাক্তার, নার্স, অফিস স্টাফ ইত্যাদি) আছে আরও জন বিশেক। এই জায়গাটা একদম খোলা মেলা, তাই সত্তুরজন আসলে বেশি কিছু না। চারপাশে প্রকৃতি আর সবাই চুপচাপ থাকে–এত্ত চুপচাপ যে কখনো কখনো মনে হয় এটাই আসল দুনিয়া। আসলে অবশ্যই তা নয়। আমরা এখানে এভাবে বাস করি কারন এখানে বাস করার কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে।

আমি টেনিস আর বাস্কেটবল খেলি। বাস্কেটবল দলগুলো স্টাফ আর রোগিদের (আমি শব্দটা বলতে চাইনি কিন্তু আর কোন উপায় নেই) সম্মিলনে হয়। আমি যখন খেলায় মিশে যাই তখন ভুলে যাই কে রোগি আর কে স্টাফ। এটা অদ্ভুত ব্যাপার। আমি জানি অদ্ভুত শোনাচ্ছে, কিন্তু আমি যখন খেলার মধ্যে আশেপাশের লোকজনের দিকে তাকাই তখন সবাইকেই সমানভাবে ভাঙাচোরা দেখায়।

আমি এটা একদিন যে ডাক্তার আমার দায়িত্বে আছেন তাঁকে বলেছিলাম, উনি আমাকে বলেছিলেন, একদিক দিয়ে আমি ঠিকই অনুভব করেছি। আমরা এখানে যারা আছি তারা নিজদের বিকৃতি ঠিক করাতে আসিনি, এসেছি এর সাথে অভ্যস্ত হতে। আমাদের সমস্যাগুলোর একটা হচ্ছে আমরা আমাদের বিকৃতি বুঝতে পারি না বা বুঝলেও নিজেরাই গ্রহন করতে পারি না। ঠিক যেভাবে একজন মানুষের হাঁটার মধ্যে স্বকীয়তা আছে, ঠিক তেমনি চিন্তা করার ধরণ, কোন কিছু দেখা বা অনুভব করার মধ্যেও স্বকীয়তা রয়েছে। আর তুমি যদি সেটা ঠিক করতে চাও, রাতারাতি কখনো সম্ভব নয়। যদি জোর করার হয়, তাহলে সাময়িকভাবে ঠিক হতে পারে হয়ত, পরে অন্য কিছুতে সমস্যা শুরু হবে। ডাক্তার আমাকে খুব সহজ একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, অবশ্য এটা আমাদের সমস্যার ক্ষুদ্র একটা অংশ। কিন্তু আমার ধারনা তিনি যা বলতে চেয়েছেন আমি

তা বুঝতে পেরেছি। এমন হতে পারে যে আমরা কখনোই আমাদের বিকৃতির সাথে পুরোপুরি অভ্যস্ত হতে পারবো না। এই বিকৃতি এমন কষ্টের সৃষ্টি করে যে, আমরা আমাদের নিজেদের ভেতরই স্থান খুঁজে পাই না, এরকম জায়গায় আসি এ থেকে মুক্তি পেতে। যতক্ষণ আমরা এখানে আছি কারো থেকে আঘাত পাই না বা কাউকে আঘাত করিও না কারন আমরা জানি আমরা সবাই বিকৃত। বাইরের দুনিয়া থেকে এটাই আমাদের আলাদা করেছে এখানে। বাইরের দুনিয়ায় বেশিরভাগ মানুষ নিজেদের বিকৃতি উপলদ্ধি করতে পারে না, আর এখানে বিকৃতি হল পূর্বশর্ত। ঠিক যেমন ইন্ডিয়ানরা তাদের গোত্র আলাদা করার জন্য মাথায় পালক পরে, আমরা এখানে আমাদের বিকৃতি ধারন করি। চুপচাপ বাস করি, কাউকে দুঃখ দেই না।

খেলাধুলার বাইরে আমরা সব্জি চাষ করি : টমেটো, বেগুন, শসা, তরমুজ, স্ট্রবেরি, পেঁয়াজ, বাঁধাকপি, মুলা আরও কত কি। আমরা সব কিছুর চাষ করি। গ্রিন হাউজও ব্যবহার করি। এখানকার লোকজন সব্জি চাষ সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। তারা এর পেছনে অনেক শ্রম দেয়। এই বিষয়ের উপর বই পড়ে, বিশেষজ্ঞদের ফোন করে আর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কথা বলে কোন মাটির অবস্থা কেমন হলে কি সার ভালো হবে এইসব। আমার সব্জি চাষ করতে ভালো লাগে। বিভিন্ন সঞ্জি আর ফল দিনে দিনে বড় হচ্ছে তা দেখতে খুব ভালো লাগে। তুমি কখনো তরমুজ চাষ করেছো? ছোট জন্তুর মত ওগুলো ফুলে উঠে।

আমরা প্রতিদিন টাটকা সব্জি আর ফলমূল খাই। তারা অবশ্য মাছ আর মাংসও খেতে দেয়, কিন্তু তুমি যখন এখানে বাস করবে, সেগুলো খাওয়ার ইচ্ছে এমনিতেই কমে যাবে। কারন সঞ্জিগুলো একদম টাটকা আর খুবই সুস্বাদু। মাঝে মাঝে আমরা বাইরে যাই বন্য লতাপাতা আর মাশরুম সংগ্রহের জন্য। আমাদের সাথে বিশেষজ্ঞরা (বুঝতেই পারছো এই জায়গা বিশেষজ্ঞ দিয়ে ভর্তি) আছে যারা বলতে পারে কোন লতাপাতাগুলো তুলতে হবে কোনগুলো এড়িয়ে যেতে হবে। যার ফল হল আমি এখানে আসার পর ছয় পাউন্ড ওজন বেড়েছে। আমার ওজন এখন যথাযথ, ধন্যবাদ ব্যায়াম আর খাওয়ার রুটিনকে।

আমরা যখন ক্ষেতে কাজ করি না তখন বই পড়ি কিংবা গান শুনি অথবা উল বুনি। আমাদের টিভি-রেডিও নেই কিন্তু বেশ ভদ্রগোছের একটা লাইব্রেরি আছে বই আর রেকর্ডের। রেকর্ডের সংগ্রহে মাহ্‌লার সিম্ফনি থেকে বিটল্‌স পর্যন্ত সবকিছু আছে, আমি সবসময় রেকর্ড ধার করে এনে রুমে বসে শুনি।

এই জায়গার একমাত্র সমস্যা হল, একবার তুমি এখানে আসলে ছেড়ে যেতে চাইবে না আর। কিংবা বলা যায় ছেড়ে যেতে ভয় পাবে। যতক্ষণ এখানে আছি আমরা শান্তি অনুভব করি। আমাদের বিকৃতি স্বাভাবিক মনে হয়। আমাদের মনে হয় আমরা সুস্থ হয়ে গেছি। কিন্তু আমরা কখনো নিশ্চিত হতে পারি না বাইরের দুনিয়া আমাদেরকে একইভাবে গ্রহণ করবে কিনা।

আমার ডাক্তার বলেছেন আমার সময় হয়েছে বাইরের লোকজনের সাথে যোগাযোগ করার–মানে বাইরের দুনিয়ার সাধারণ মানুষের সাথে। সে যখন এটা বলল আমার চোখে খালি তোমার চেহারা ভাসল। সত্যি কথা বলতে আমি আমার বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে চাই না। তারা আমাকে নিয়ে মর্মাহত, আর তাদেরকে দেখলে আমার মুড খারাপ হয়ে যায়। তাছাড়া তোমাকে আমার কিছু জিনিস বলার আছে। আমি জানি না ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারবো কিনা, কিন্তু জরুরি ব্যাপারগুলো আমি বেশিদিন এড়িয়ে থাকতে চাই না।

তারপরেও আমাকে তোমার বোঝা মনে করার প্রয়োজন নেই। আমি কারো বোঝা হতে চাই না। আমার প্রতি তোমার দরদ আমি বুঝতে পারি। সেজন্য আমি সুখি। আমি চাই এই চিঠি তোমাকে সেই সুখ পৌঁছে দিক। তোমার দরদই হয়ত এখন আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি দরকার। আমাকে ক্ষমা কোরো যদি এই চিঠির কোন কিছুতে কষ্ট পেয়ে থাকো। যা বলেছি আগে, যতটুকু আমাকে জানো তার চেয়ে আমি অনেক বেশি ত্রুটিপূর্ণ।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কেমন হত যদি তোমার আমার একদম সাধারণ অবস্থায় দেখা হত এবং আমরা একে অপরকে পছন্দ করতাম? যদি আমি স্বাভাবিক হতাম আর তুমি স্বাভাবিক হতে (অবশ্যই তুমি স্বাভাবিক এখনও)। আর যদি কিজুকি বলে কেউ না থাকতো, কেমন হত? অবশ্য এই 'যদি' অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আমি পরিস্কার আর সৎভাবে চেষ্টা করছি। এইটুকুই এই মুহূর্তে করতে পারি। আমি চাই আমার অনুভুতির কিছু অল্প অংশ তোমাকে পাঠাতে।

যেহেতু এটা কোন সাধারণ হাসপাতাল নয় তাই সবসময়ই এখানে ভিজিটিং আওার। একদিন আগে জানিয়ে রাখলে যে কোন সময় তুমি আসতে পারো। তুমি এমন কি আমার সাথে খেতে পারো, থাকার জায়গাও আছে। যখন তোমার সুবিধা হয় এসে আমাকে দেখে যাও। আমি তোমার সাথে দেখা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। সাথে একটা ম্যাপও পাঠাচ্ছি। দুঃখিত, চিঠি অনেক বড় হয়ে গেল।"

আমি নাওকোর লেখা পুরোটা টানা পড়ে গেলাম, তারপর আবার পড়লাম। এরপর নিচে গিয়ে ভেন্ডিং মেশিন থেকে কোক কিনলাম, কোক খেতে খেতে চিঠি আরো একবার পড়লাম। সাত পৃষ্ঠার চিঠি খামে ঢুকিয়ে ডেস্কে রেখে দিলাম। গোলাপি খামের উপর আমার নাম-ঠিকানা ছোট অক্ষরে নিখুঁতভাবে লেখা। একজন মেয়ের জন্য একটু বেশিই নিখুঁত। আমি ডেস্কে বসে খামটা পরীক্ষা করতে লাগলাম। খামের পেছনে প্রেরকের ঠিকানা লেখা : 'আমি হোস্টেল।' কী অদ্ভুত নাম। আমি কিছুক্ষণ ভাবলাম তারপর মনে হল, "আমি" সম্ভবত ফ্রেঞ্চ শব্দ যার অর্থ "বন্ধু।"

চিঠিটা ডেস্কের ড্রয়ারে রেখে দেয়ার পর পোশাক বদলে বাইরে গেলাম। ভয় পাচ্ছিলাম যদি কাছে থাকি তাহলে হয়ত আরও দশ-বিশবার অথবা না জানি কতবার পড়ে ফেলবো। টোকিওর রাস্তায় নিরুদ্দেশ হাঁটতে থাকলাম। রবিবার নাওকোর সাথে যেরকম হাঁটতাম। একের পর এক রাস্তা ধরে হাঁটলাম, চিঠির লাইনগুলো মনে করতে করতে। সন্ধ্যায় ডরমে ফিরে আমি হোস্টেলে লং ডিস্টেন্স কল করলাম। একজন মহিলা রিসেপশনিস্ট ফোন ধরলো। আমি জানতে চাইলাম নাওকোর সাথে পরেরদিন দুপুরে দেখা করা সম্ভব হবে কিনা। সে আমার নাম লিখে নিল আর বলল আধা ঘন্টা পরে আবার ফোন করতে।

আমি খাওয়ার পর আবার ফোন করতেই একই মহিলা ধরলো। সে বলল আমি নাওকোর সাথে দেখা করতে পারবো। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিলাম। ন্যাপস্যাকে কিছু কাপড় আর টয়লেট আইটেম ভরে বিছানায় শুয়ে ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিতে দিতে *ম্যাজিক মাউন্টেইন* পড়তে লাগলাম যতক্ষণ না ঘুম পায়। তারপরেও রাত একটার আগে ঘুমাতে পারিনি।

অধ্যায় ৬

সোমবার সকাল সাতটায় উঠেই হাতমুখ ধুয়ে, শেভ করে, নাস্তা না খেয়েই সোজা ডরম প্রধাড়নে রুমে গেলাম তাকে জানাতে যে, আমি দু-দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি হাইকিং করতে। তার জানা ছিল, আমি অবসর সময়ে এরকম অল্প দিনের জন্য বাইরে ঘুরতে যাই, তাই অবাক হলেন না। ভিড়ের মধ্যে কমিউটার ট্রেনে চেপে টোকিও স্টেশনে গিয়ে সেখান থেকে কিয়োটোর বুলেট ট্রেনের টিকেট কাটলাম। কফি আর স্যান্ডউইচ দিয়ে নাস্তার করে ঘন্টাখানেক ঝিমালাম।

কিয়োটো পৌছালাম এগারোটা বাজার একটু আগে। নাওকোর নির্দেশ অনুযায়ি টার্মিনাল থেকে উত্তরের শহরগুলোতে যাওয়ার ছোট বাসে চড়লাম। আমাকে বলা হল যেতে এক ঘণ্টার মত লাগবে। পরবর্তি বাস ছাড়বে ১১:৩৫-এ। আমি টিকেট কিনে রাস্তা পার হয়ে বইয়ের দোকানে গেলাম ম্যাপ কেনার জন্য। ম্যাপ কিনে ওয়েটিং রুমে বসে নাওকোর আমি হোস্টেল খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। যতটুকু ধারনা করেছিলাম দেখা গেল তার চেয়েও পাহাড়ি এলাকার অনেক ভেতরে হোস্টেলটা। উত্তরে অনেকগুলো পাহাড় পার হয়েছে শেষ মাথায় একটা গিরিখাত আছে যার পরে আর রাস্তা নেই। ওখানে বাস নামিয়ে দিয়ে শহরে ফিরে আসবে। নাওকোর কথানুযায়ী সেখান থেকে পায়ে হাঁটার একটা রাস্তা থাকার কথা, সেটা ধরে মিনিট বিশেক হাটলে 'আমি হোস্টেল।' পাহাড়ি এলাকার এত ভেতরে যা চুপচাপ জায়গাই হওয়ার কথা, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

বিশজন যাত্রি নিয়ে কিয়োটোর কামো নদীর পাশ ঘেঁসে বাস উত্তরদিকে যাত্রা শুরু করল। ঘর বাড়ি এমনিতেই কম এদিকে, চারদিকে খোলা প্রান্তর। বাস যখন গিরিখাতে ঢুকল ড্রাইভারকে রীতিমত স্টিয়ারিং ধরে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল রাস্তা এত এঁকেবেঁকে গেছে। আমার বমি বমি লাগছিল। সকালে খাওয়া কফি যেন উঠে আসছিল গলা দিয়ে। বাঁক যখন কমে এল আর আমিও একটু ভালো বোধ করছিলাম, হঠাৎ সিডার বন শুরু হল। গাছগুলো এত পুরনো আর এত বড় যে সূর্য হারিয়ে যায়। ঠান্ডা বিবর্ণ ছায়ার মধ্যে দিয়ে বাস যেতে লাগল। খোলা জানালা দিয়ে ঠান্ডা এসে চামড়ায় বিঁধছিল। নদীর পাড় ধরে সিডার বনের মধ্যে দিয়ে যেতে এতক্ষন লাগছিল যে মনে হচ্ছিল পুরো পৃথিবী বনে ঢাকা পড়ে

গেছে। বন যেখানে শেষ হল সেখানে অববাহিকা। চারদিক পর্বতে ঘেরা। আর যেদিকে চোখ যায় সবুজ কৃষিভূমি। রাস্তার ধারে নদীর পানি আলো পড়ে চকচক করছে। দূরে কোথাও হতে ধোঁয়া উড়তে দেখা যাচ্ছে। কোন কোন বাড়ির সামনে কাপড় শুঁকাতে দেয়া। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যেকটা খামারবাড়ির সামনে জ্বালানি কাঠ স্তুপ করে রাখা। বেশিরভাগ স্তুপের উপরই দেখা যায় বিড়াল শুয়ে আছে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অনেকগুলো বাড়ি চোখে পড়লেও কোন মানুষ চোখে পড়লো না।

এই একই দৃশ্যর পুনরাবৃত্তি হতেই থাকল। বাস ঢুকল সিডার বনে, এরপর গ্রাম, আবার বন। গ্রামে বাস থামলে লোকজন নামে, কিন্তু কাউকে উঠতে দেখা গেল না। শহর ছাড়ার মিনিট চল্লিশ পর বাস এক খোলা গিরিপথে গিয়ে পৌছল। ড্রাইভার বাস থামিয়ে জানাল এখানে পাঁচ-ছয় মিনিট অপেক্ষা করা হবে, কেউ চাইলে বাস থেকে নেমে হাঁটাহাঁটি করতে পারে। আমাকেসহ তখন যাত্রি মাত্র চারজন। আমরা সবাই নেমে গা-হাত-পা ঝাড়া দিলাম, ধূমপান করলাম, উপর থেকে কিয়োটর প্যানারোমা দৃশ্য দেখলাম। ড্রাইভার এক দিকে গিয়ে মূত্র বিসর্জন দিয়ে আসল। রোদে পোড়া এক লোক, যার বয়স পঞ্চাশের মত হবে, আমাকে জিজ্ঞেস করল পর্বতে হাইকিঙে যাচ্ছি কিনা। সহজ উত্তর দিলাম, হ্যাঁ।

গিরিখাতের অন্য দিক থেকে আরেকটা বাস এসে আমাদের বাসের পাশে দাঁড়ালে ড্রাইভার নেমে আমাদের ড্রাইভারের সাথে কথা বলল। ঐ বাসের দু-জন উঠে পড়লে আমরা চারজনও আমাদের বাসে উঠে পড়লাম। তারপর বাস দুটো নিজেদের বিপরীতে যে যার রাস্তায় চলা শুরু করল। প্রথমে বুঝিনি কেন আমাদের বাস ঐ বাসের আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু অল্পদূর যেতেই বুঝলাম যখন রাস্তা অস্বাভাবিক সরু হয়ে গেল। পাশাপাশি দুটো বাস যাওয়া অসম্ভব, এমনকি সাধারণ প্রাইভেটকার সাইড দিয়েও সাবধানে চেপেচুপে চালাতে হচ্ছিল।

এখানকার গ্রামগুলো ছোট ছোট, চাষের জমিও কম। পর্বতের খাড়া দেয়াল যেন বাসের জানালায় লেগে যাচ্ছিল। কিন্তু কুকুর মনে হল অন্য জায়গার চেয়ে কম নেই এখানে। বাস থামতেই তাদের চিৎকারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

আমি যেখানে নামলাম সেখানে কিচ্ছু নেই। কোন ঘর না, কোন মাঠ না, স্রেফ একটা 'বাস স্টপ' সাইন, একটা পানির ধারা, আর পাহাড়ি রাস্তার মুখ। ন্যাপস্যাক কাঁধে ঝুলিয়ে আমি রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকলাম। পানির ধারাটা রাস্তার

বাম দিক দিয়ে বয়ে গেছে। ডানপাশে বন। হালকা ঢালু রাস্তা দিয়ে পনের মিনিটের মত ওঠার পর যে রাস্তায় উঠে আসলাম তার ভেতর দিয়ে একটা গাড়ি যাওয়ার মত জায়গা। রাস্তার শেষ মাথায় সাইন লাগানো 'আমি হোস্টেল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অনুপ্রবেশ নিষেধ।'

টায়ারের দাগ ফেলা রাস্তা গিয়ে গাছের ফাঁকে হারিয়ে গেছে। বনের ভেতর মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ আসছে। শব্দ এত স্পষ্ট যেন বনের উপর থেকে কোন স্পিকার শব্দ বাড়িয়ে তুলছে। একবার শুনলাম অনেক দূর থেকে আসা রাইফেলের শব্দ, দূর থেকে আসায় ভোঁতা শোনাল। যেন অনেক কিছুতে ছেঁকে তারপর কানে এসে পৌঁছেছে।

বনের ভেতর দিয়ে গিয়ে সাদা পাথরের দেয়ালের সামনে পড়লাম। দেয়ালের উচ্চতা আমার সমান। কালো লোহার মেইন গেট যথেষ্ট শক্ত মনে হল দেখে কিন্তু হাঁ করে খোলা। গার্ড হাউজেও কাউকে পাহারা দিতে দেখা গেল না। আগের মত আরেকটা সাইন দেখা গেল, 'আমি হোস্টেল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অনুপ্রবেশ নিষেধ।' দেখে মনে হল কিছুক্ষণ আগেও এখানে একজন গার্ড ছিল। অ্যাশট্রেতে তিনটা সিগারেটের অবশিষ্টাংশ, একটা আধা খাওয়া চায়ের কাপ, শেলফে রাখা ট্রাঞ্জিস্টার রেডিও, দেয়ালে ঝুলানো ঘড়ি শুষ্ক শব্দ করে সময় জানান দিয়ে যাচ্ছে। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম গার্ডের ফেরার জন্য, কিন্তু তার কোন নমুনা দেখা গেল না। বেলের মত একটা সুইচ দেখে চাপাচাপিও করলাম। গেটের ভেতরের জায়গাটা পার্কিংলট। সেখানে রাখা একটা মিনিবাস, একটা ফোর হুইল ড্রাইভ ল্যান্ড ক্রুজার, আর নীল ভলভো। পার্কিংলটে ত্রিশটার মত গাড়ি রাখার জায়গা থাকলেও এই তিনটা রাখা আছে।

দুই কি তিন মিনিট যাওয়ার পর নেভি ব্লু ইউনিফর্ম পরা গার্ডকে দেখা গেল রাস্তা দিয়ে হলুদ রঙের একটা সাইকেল চালিয়ে আসতে। লম্বা একজন মানুষ, দেখে মনে হল ষাটের মত বয়স, টাক পড়া শুরু হয়েছে। "আপনাকে অপেক্ষা করতে হল বলে আমি খুবই দুঃখিত," বলল সে। যদিও গলা শুনে দুঃখিত মনে হল না। তার হলুদ সাইকেলে সাদা রঙ দিয়ে লেখা বত্রিশ। আমি তাকে আমার নাম বললে সে ফোন করে কাউকে দুবার বলল আমার নাম। তারপর, "আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি," বলে রেখে দিল।

"প্রধান ভবনে গিয়ে ডাক্তার ইসিডার খোঁজ করবেন," বলল সে। "এই রাস্তা ধরে গিয়ে বামের দ্বিতীয় রাস্তা, বুঝতে পেরেছেন? আপনার বাম দিকের দ্বিতীয়। দেখবেন একটা পুরনো বাড়ি। ডানে মোড় নিলে একটু পরেই কংক্রিটের বিল্ডিং। ওটাই প্রধান ভবন। একদম সহজ। সাইন দেখে দেখে যান।"

আমি তার কথামত বামে গিয়ে সুন্দর একটা পুরনো বাড়ি পেলাম যেটা অবশ্যই কারো খামারবাড়ি ছিল কোন কালে। বাড়ির সামনে সুন্দর বাগান আর পাথরের লণ্ঠন। ডানে মোড় নিতেই গাছের ফাঁক দিয়ে একটা খোলা জায়গায় কংক্রিটের তৈরি তিনতলা বিল্ডিং চোখে পড়ল। একদম সাধারণ পরিস্কার দেখতে বাড়ি, আহামরি কিছু না।

ঢোকার জায়গা দোতলায়। আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে গেলাম। রিসিপশনে লাল ড্রেস পরা কম বয়সি এক মেয়ে বসা। তাকে আমি আমার নাম বললাম, আরও বললাম আমাকে বলা হয়েছে ডাক্তার ইসিডার সাথে কথা বলতে। সে আমাকে হেসে বাদামি একটা সোফা দেখিয়ে দিল, ডাক্তার না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। তারপর ফোন ডায়াল করল। আমি ন্যাপস্যাক নামিয়ে নরম সোফায় বসে চারপাশ ভালো করে দেখলাম। পরিস্কার সুন্দর লবি। টবে গাছ সাজানো। দেয়ালে টাঙানো বিমূর্ত পেইন্টিঙে রুচির ছাপ স্পষ্ট। আর পালিশ করা মেঝে। মেঝেতে জুতোর প্রতিফলন দেখতে দেখতে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মাঝখানে একবার রিসিপনিস্ট জানাল, "ডাক্তার শিগগিরি এসে পড়বে।"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। কি অবিশ্বাস্য রকমের নিরব জায়গা। কোথাও কোন ধরনের কোন শব্দ নেই। সবাই মনে হয় দুপুরে ঘুমাচ্ছে। মানুষ, জীবজন্তু, পোকামাকড়, গাছপালা সবকিছু গভীর ঘুমে শায়িত বলে মনে হল।

অল্পক্ষণ পরেই রাবার সোলের হালকা শব্দ শুনতে পেলাম। একজন পূর্ণবয়স্কা, ঝাঁটামার্কা চুলওয়ালা মহিলা এসে হাজির হলেন। আমার পাশে এসে পা ভাঁজ করে বসলেন তিনি। আমার হাত ধরে হ্যান্ডসেকের বদলে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

"তুমি মনে হয় কখনো কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাওনি, অন্তত গত কয়েক বছরে নয়। তাই না?" এই ছিল তার প্রথম কথা।

"না," আমি আমার হাত টেনে নিয়ে বললাম, "তোমার ধারনা একদম সঠিক।"

"তোমার হাত দেখে বোঝা যাচ্ছে," সে হেসে বলল।

এই মহিলার মধ্যে কিছু একটা রহস্যময় ব্যাপার আছে। তার মুখে বয়সের ভাঁজ। সবার আগে সেগুলোই চোখে পড়ে, কিন্তু সেগুলোর জন্য তাকে বয়স্ক লাগে না, বরং মনে হচ্ছিল সেগুলো যৌবনকেই ফুটিয়ে ধরছে। দাগগুলো যেন যেখানে থাকার সেখানেই আছে, যেন জন্ম থেকেই মুখের অংশ। যখন সে হাসে, ভাঁজগুলোও যেন সাথে সাথে হাসে। সে যখন বিরক্তভাবে তাকায়, ভাঁজগুলো

বিরক্ত হয়। যখন সে হাসেও না, বিরক্তও না, তখন ভাঁজগুলো সারা মুখে আজবভাবে ছড়িয়ে থাকে যেন বিদ্রুপ করছে। তার বয়স ত্রিশের শেষের দিকে, দেখে মনে হয় না সুবিধার মানুষ, কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব আকর্ষণীয়। আমি তাকে দেখামাত্র পছন্দ করে ফেললাম।

তার উসকোখুসকো করে কাঁটা চুল কপালে ঝুলে ছিল, খারাপ লাগছিল না বরং তাকে মানিয়েছিল ভালো। সে পরেছিল সাদা টিশার্টের উপর একটা নীল ওয়ার্ক শার্ট, ক্রিম কালারের ঝোলা প্যান্ট আর টেনিস শু। সে লম্বা আর শুকনো, বুক বলে কিছু নেই। তার ঠোঁট একটু পর পর একদিকে বেঁকে যাচ্ছিল, তার চোখের পাশের ভাঁজ নড়ছিল। তাকে দেখে সদয়, দক্ষ কিন্তু জীবনের উপর বিতৃষ্ণা এসে যাওয়া একজন কাঠমিস্ত্রি মনে হচ্ছিল আমার কাছে।

থুতনি নামিয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল। আমার মনে হচ্ছিল যে কোন সময় সে ফিতা বের করে আমার সবদিক মেপে দেখবে।

"তুমি কি কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারো?" সে জিজ্ঞেস করল।

"না," বললাম তাকে।

"খুব খারাপ," বলল সে। "বাজাতে পারলে মজা হত।"

"আমারও তাই মনে হয়," বললাম আমি। এতকিছু থাকতে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে কথা কেন?

সে তার বুক পকেট থেকে সেভেন স্টারের প্যাকেট বের করল, একটা ঠোঁটে নিয়ে লাইটার বের করে ধরিয়ে আনন্দের সাথে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

"আমার মনে হয় নাওকোর সাথে দেখা হওয়ার আগে তোমাকে প্রথমে এই জায়গা সম্পর্কে ধারনা দেয়া উচিত, মিস্টার–ওয়াতানাবে, ওয়াতানাবেই তো তাই না? তাই আমি আমাদের মধ্যে এই কথা বলার ব্যবস্থা করেছি। আমি হোস্টেল একটু অন্যরকম। কোন ধারনা যদি না থাকে তাহলে অনেকটাই গোলমেলে ঠেকবে তোমার কাছে। আমার ধারনা তুমি এই জায়গা সম্পর্কে কিছুই জানো না, তাই না?"

"বলা যায় একদমই কিছু জানি না।"

"তাহলে সবার আগে..." সে আঙুল ফুটিয়ে শুরু করল, "আগে বলো তুমি কি লাঞ্চ করেছো? আমার ধারনা তুমি ক্ষুধার্ত।"

"হ্যাঁ, খিদে লেগেছে বটে।"

"চল তাহলে, আমরা ডাইনিঙে গিয়ে খেতে খেতে কথা বলি। লাঞ্চের সময় যদিও শেষ, কিন্তু এখনও গেলে হয়ত কিছু পাওয়া যাবে।"

সে পথ দেখিয়ে আগে আগে চলল। সিঁড়ি দিয়ে প্রথম তলায় নামার পরই ডাইনিং হল। বেশ বড় একটা রুম, প্রায় দুইশ লোক বসতে পারবে, কিন্তু অর্ধেক ব্যবহার করা হচ্ছে। বাকি অর্ধেক পার্টিশন দিয়ে ঢাকা, অফসিজনের রিসোর্টের মত। সেদিনের মেনুতে ছিল আলুর স্টু দিয়ে নুডুলস, সালাদ, কমলার জুস আর রুটি। সব্জিগুলো খুবই মজার ছিল, নাওকো চিঠিতে যেরকম বলেছিল, আমি প্লেটের সব চেটেপুটে খেলাম।

"তুমি খেতে ভালোবাস," সে বলল।

"খাবার চমৎকার," আমি বললাম, "তাছাড়া আমি সারাদিন কিছুই খাইনি বলা চলে।"

"তুমি আমার খাবারটুকুও খেতে পারো যদি চাও, আমার পেট ভরা। এই নাও।"

"তুমি যদি না খেতে চাও তাহলে খাবো।"

"আমার পেটে জায়গা কম। বেশি খেতে পারি না। সিগারেট দিয়ে সেটা পুষিয়ে নেই," আরেকটা সেভেন স্টার ধরালো সে। "ও আচ্ছা, তুমি আমাকে রেইকো ডাকতে পারো। সবাই আমাকে এই নামেই ডাকে।"

"তুমি নাওকোর ডাক্তার?" আমি জানতে চাইলাম।

"আমি? নাওকোর ডাক্তার?" মুখ কুঁচকে ফেলল সে। "কেন তোমার মনে হল আমি ডাক্তার?"

"ওরা যে বলল ডাক্তার ইসিডার সাথে কথা বলতে।"

"ওহ আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। না না, আমি এখানে মিউজিক শেখাই। রোগিদের জন্য থেরাপির মত কাজ করে। কেউ কেউ আমাকে মিউজিক ডাক্তার বলে আবার কখনো বলে ডাক্তার ইসিডা। কিন্তু আমি আসলে তাদের মতই আরেকজন রোগি। এখানে সাত বছর ধরে আছি। মিউজিক শেখাই আর অফিসে কাজ করি। আসলে এখানে বলা মুশকিল কে রোগি আর কে স্টাফ। নাওকো তোমাকে আমার সম্পর্কে কিছু বলেনি?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"অদ্ভুত ব্যাপার তো," রেইকো বলল। "আমি নাওকোর রুমমেট। ওর সাথে থাকতে ভালো লাগে আমার। আমরা সব কিছু নিয়ে কথা বলি। তোমাকে নিয়েও।"

"আমাকে নিয়ে কি কথা হয়?"

"আগে তোমাকে বুঝতে হবে এই জায়গাটা সম্পর্কে।" আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে রেইকো বলল। "প্রথমত যে জিনিসটা বোঝা দরকার সেটা হল এই

জায়গাটা কোন সাধারণ হাসপাতাল নয়। এখানে সুস্থ হওয়ার চিকিৎসা করা হয় না। আমাদের কিছু ডাক্তার আছে ঠিকই, তারা শুধু রোগিদের অবস্থা পরীক্ষা করে, শরীরের তাপমাত্রা রেকর্ড করা এইসব হাবিজাবি, সাধারণ হাসপাতালের মত 'চিকিৎসা' করে না। এখানে জানালায় কোন গরাদ নেই, দরজা সবসময় খোলা। লোকজন তাদের ইচ্ছেমত আসে, তাদের ইচ্ছে হলে চলে যেতে পারে। এখানে ভর্তি হওয়ার জন্য একটা বিশেষ অবস্থার সাথে মিশতে পারার প্রয়োজন হয়। আর যাদের বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তারা তাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হাসপাতালে ভর্তি হয় গিয়ে। এতটুকু পর্যন্ত পরিস্কার?"

"মনে হয়," আমি বললাম। "কিন্তু এই 'বিশেষ অবস্থার সাথে মিশতে পারা' মানে কি? উদাহরণ দিতে পারো?"

রেইকো ধোঁয়ার মেঘ ছেড়ে, গ্লাসে কমলার জুস যা বাকি ছিল গিলে ফেলল। "এখানে বাস করা হল 'বিশেষ অবস্থার সাথে মিশতে পারা,' " সে বলল। "একটা নিয়মিত রুটিন, ব্যায়াম, বাইরের দুনিয়া থেকে আলাদা থাকা, পরিস্কার বাতাস, নিরিবিলি, ইত্যাদি। আমাদের এখানে কৃষিজমি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোন রেডিও-টিভি নেই এখানে। প্রকৃতির মধ্যে বাস করা গোষ্ঠির কথা নিশ্চয়ই শুনেছো, তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য হল এখানে বাস করতে প্রচুর টাকা লাগে।"

"প্রচুর?"

"সেরকম প্রচুর খরচ না, কিন্তু সস্তা বলা যাবে না কোনভাবেই। চারদিকে তাকিয়ে দেখো। এখানে প্রচুর জমি। অল্প কিছু রোগি, বিশাল স্টাফ, আর আমি তো অনেকদিন ধরে এখানে আছি। এটা সত্যি, আমি নিজে প্রায় একজন স্টাফ, আমি কিছু ছাড় পাই, কিন্তু তারপরেও...কফি খাবে নাকি?"

খেলে ভালো হয়, আমি জানালাম। সে তার সিগারেট নিভিয়ে কাউন্টারে গিয়ে দুকাপ কফি নিয়ে আসল। নিজেরটায় চিনি দিয়ে নেড়ে চুমুক দিল।

"ব্যাপারটা হল," বলল সে, "এটা কোন লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয়। সুতরাং একদম উপায় না থাকা পর্যন্ত এটা কোন মূল্য না নিয়ে চলতে পারে। এখানের জমি দানে পাওয়া। তাদের এই প্রতিষ্ঠানটা করার একটা কারন আছে। যে দান করেছে তার সামার হাউজ ছিল এ জায়গাটা প্রায় বছর বিশেক আগে। তুমি তো পুরনো বাড়িটা দেখেছো মনে হয়।"

দেখেছি জানালাম।

"একসময় ঐটাই একমাত্র বিল্ডিং ছিল। সেখানে গ্রুপ থেরাপি করত তারা। সেভাবে পুরো ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। ডোনারের ছেলের মানসিক সমস্যার মত

ছিল, বিশেষজ্ঞরা বলেছিল গ্রুপ থেরাপি করতে। তাদের বক্তব্য ছিল যদি তোমরা কিছু রোগিকে একসাথে জড়ো করতে পারো, আর তারা যদি শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে পারে, যদি একজন ডাক্তার থাকে পরামর্শ আর পরীক্ষা করার জন্য, তাহলে এধরনের মানসিক সমস্যাগুলোর সমাধান হতে পারে। তো, তারা চেষ্টা করে দেখল, কাজের পরিধি বাড়ল, আরও জমি কৃষি কাজের সাথে যুক্ত হল। প্রধান বিল্ডিংটা তৈরি হল পাঁচ বছর আগে।।"

"এর মানে, থেরাপি ঠিকমত কাজে দিচ্ছিল।"

"সবার জন্য নয়। অনেক মানুষের উন্নতি হয়নি। আবার অনেকের যাদের অন্য জায়গায় কাজ হয়নি, তারা এখানে এসে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল। এখানে সবচেয়ে ভালো যেটা সেটা হল সবাই সবাইকে সাহায্য করে। সবাই জানে তারা সবাই কোন না কোনভাবে ক্রটিগ্রস্ত। অন্য জায়গায় এভাবে কাজ করে না যেটা খুবই দুঃখজনক। সেসব জায়গায় ডাক্তাররা ডাক্তার, রোগিরা রোগি। রোগিদের সাহায্য প্রয়োজন হলে ডাক্তাররা সাহায্য করে। কিন্তু এখানে সবাই সবাইকে সাহায্য করে। আমরা একজন আরেকজনের আয়নার মত, আর ডাক্তাররা আমাদের অংশ। তারা পাশ থেকে আমাদের উপর লক্ষ্য রাখেন আর যখন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, এসে আমাদের সাহায্য করেন। আবার এমনও হয় আমরাও তাদের সাহায্য করি। অনেক সময় আমরা অনেক কিছুতে তাদের চেয়ে দক্ষ। যেমন ধরো, আমি একজন ডাক্তারকে পিয়ানো শেখাচ্ছি। আরেকজন রোগি একজন নার্সকে ফ্রেঞ্চ শেখাচ্ছে। এরকম আর কি। আমাদের মত রোগিদের ক্রটির পাশাপাশি বিশেষ রকমের দক্ষতাও আছে। তাই এখানে সবাই সমান–রোগি, স্টাফ–আর তুমি। তুমি এখানে যতক্ষণ থাকবে তুমি আমাদেরই একজন, আমি তোমাকে সাহায্য করবো, তুমি আমাকে সাহায্য করবে," রেইকো হাসল। নড়েচড়ে উঠল তার মুখের সব ভাঁজ। "তুমি নাওকোকে সাহায্য করবে, নাওকো তোমাকে সাহায্য করবে।"

"আমাকে তাহলে কি করতে হবে? শক্ত উদাহরণ দাও।"

"প্রথমের ঠিক করো তুমি অন্যদের সাহায্য করবে, আর তোমার অন্যদের সাহায্যর প্রয়োজন হবে। তারপর তোমাকে ঠিক করতে হবে তুমি সৎ। তুমি মিথ্যা বলবে না, কোন কিছু বানিয়ে বলবে না, কোন কিছু লুকিয়ে বলবে না যার জন্য লজ্জায় পড়তে হয়। এই তো।"

"চেষ্টা করবো," বললাম তাকে। "কিন্তু আমাকে বলো তো রেইকো, তুমি এখানে সাত বছর ধরে কেন আছো? তোমার সাথে এভাবে কথা বলে আমার মনে হচ্ছে না তোমার কোন সমস্যা রয়েছে।"

"দিনের বেলায় সেটা মনে হবে না," সে মুখ অন্ধকার করে বলল, "কিন্তু যখন রাত নামে আমার মুখ দিয়ে লালা পড়তে থাকে আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি খেতে থাকি।"

"বলো কি!"

"আরে নাহ, মজা করলাম," বিরক্তির সাথে মাথা নেড়ে সে বলল। "আমি পুরোপুরি সুস্থ, অন্তত এখনকার জন্য। আমি এখানে থাকছি কারন অন্যদের সাহায্য করতে, মিউজিক শেখাতে, সব্জি চাষ করতে আমার ভালো লাগে। এই জায়গাটাই আমার ভালো লাগে। এখানে কম বেশি সবাই বন্ধু। সেদিক থেকে বললে বাইরের দুনিয়ায় আমার কি আছে? আমার বয়স আটত্রিশ, শিগগিরি চল্লিশ হবে। আমি নাওকোর মত নই। আমার রিলিজের জন্য কেউ অপেক্ষা করছে না, কোন পরিবার বসে নেই আমাকে ফেরত নেয়ার জন্য। আমার বলার মত কোন কাজ নেই, প্রায় কোন বন্ধুই নেই। আর সাত বছর পর আমি জানিও না বাইরে এখন কি চলছে। লাইব্রেরিতে মাঝেমধ্যে পত্রিকা পড়ি, কিন্তু এই জায়গার বাইরে আমি গত সাত বছর পা ফেলিনি। আমি জানি না আমি কি করবো।"

"কিন্তু নতুন পৃথিবী তোমার জন্য ভালোও তো হতে পারে," আমি বললাম। "একবার চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়?"

"হুম, হয়ত তোমার কথাই ঠিক," সে আঙুলে ধরে লাইটার ঘোরাতে ঘোরাতে বলল। "কিন্তু আমার নিজের কিছু সমস্যা আছে, তুমি যদি চাও তাহলে হয়ত কখনো তোমাকে বলতে পারি সে-ব্যাপারে।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "আর নাওকো?" আমি বললাম। "ওর কি কোন উন্নতি হচ্ছে?"

"হুম, মনে তো হচ্ছে। সে যখন এখানে এল তখন বেশ বিভ্রান্ত ছিল, ওকে নিয়ে আমাদের অনেকদিন দুশ্চিন্তাও ছিল। কিন্তু এখন সে শান্ত হয়ে এসেছে। কথা বলে নিজের ভাবনা উপস্থাপন করাতে উন্নতিও করছে। কোন সন্দেহ নেই, সে ঠিক দিকে এগুচ্ছে। কিন্তু যখন সে চিকিৎসা পেল তার অনেক আগেই তার চিকিৎসা শুরু করা দরকার ছিল। ওর বয়ফ্রেন্ড কিজুকির আত্মহত্যার পর থেকেই ওর সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছিল। ওর পরিবারের সেগুলো খেয়াল করা দরকার ছিল, ওর নিজেরও বোঝা উচিত ছিল সবকিছু ঠিক নেই। অবশ্য ওর বাসার পরিস্থিতিও ভালো ছিল না..."

"বাসার পরিস্থিতি মানে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তুমি জানো না?" রেইকো মনে হল আমার চেয়েও বেশি অবাক হয়েছে।

আমি মাথা নাড়লাম।

"মনে হয় সেটা নাওকো নিজে বললেই ভালো হয়। ও তোমার সাথে কিছু জরুরি কথা বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে," রেইকো তার সিগারেটে টান দিয়ে কফিতে চুমুক দিল।

"আরেকটা জিনিস যেটা তোমার এখন জানা থাকা প্রয়োজন," বলল সে। "এখানকার নিয়ম অনুযায়ি তুমি আর নাওকো একসাথে একা থাকতে পারবে না। দর্শনার্থীরা রোগিদের সাথে একা থাকতে পারে না। অবশ্যই একজন পর্যবেক্ষক সারাক্ষন থাকবে। এই ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষক হলাম আমি। দুঃখিত, কিন্তু আমার উপস্থিতি তোমার সহ্য করে চলতে হবে। ঠিক আছে?"

"কোন সমস্যা নেই," হেসে বললাম।

"কিন্তু তারপরেও," সে বলল। "তোমরা নিজেদের মধ্যে যে কোন কিছু নিয়ে কথা বলতে পারো। ভুলে যাও আমি আশেপাশে আছি। তোমার আর নাওকো সম্পর্কের প্রায় সব কিছুই আমি জানি।"

"সব কিছুই?"

"প্রায় সব কিছুই। এখানে গ্রুপ বৈঠক হয়, আমরা একজন আরেকজন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। তাছাড়া নাওকো আর আমি সব কিছু নিয়ে কথা বলি। আমাদের মধ্যে তেমন কোন গোপনীয়তা নেই।"

আমি রেইকোর দিকে তাকালাম কফি খেতে খেতে। "সত্যি কথা বলতে কি," আমি বললাম, "আমি বিভ্রান্ত বোধ করছি। আমি এখনও জানি না টোকিওতে সেদিন নাওকোর সাথে কি করেছি কিংবা ভুল করেছি নাকি ঠিক করেছি। তখন থেকে এ নিয়ে ভাবছি কিন্তু আমি এখনও কিছু বুঝতে পারিনি।"

"আমিও না," রেইকো বলল। "আর নাওকোও জানে না। তোমাদের দু-জনকেই কথা বলে এটা বের করতে হবে। কি বলেছি বুঝেছো? সেদিন যা হয়েছিল, তোমরা দু-জন মিলেই সেটাকে সঠিক দিকে নিতে পারো–যদি তোমরা কথা বলে কোন পারস্পরিক বোঝাপড়ায় পৌছুতে পারো। সেটা হওয়ার পর তুমি ভাবতে পারো সেদিন ঠিক করেছো নাকি ভুল করেছো। কি বলো?"

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

"আমার মনে হয় আমরা তিনজন সবাই সবাইকে সাহায্য করতে পারবো–তুমি, নাওকো আর আমি–যদি আমরা সত্যি চাই, আর যদি আমরা সৎ থাকি। তিনজন একসাথে কাজ করা খুবই ফলপ্রসূ। তুমি কতদিন থাকছো?"

"পরশু সন্ধ্যার আগে আমাকে টোকিও ফিরতে হবে। আমার কাজ আছে আর বৃহস্পতিবার জার্মান পরীক্ষাও আছে।"

"ভালো," সে বলল। "তুমি আমাদের সাথে থাকতে পারো। তাহলে তোমার আলাদা কোন খরচ হবে না, যখন খুশি কথাও বলতে পারবে তাহলে।"

"তোমাদের সাথে মানে?"

"নাওকো আর আমার সাথে," রেইকো বলল। "আমাদের আলাদা বেডরুম আছে, লিভিং রুমে একটা সোফা-বেডও আছে। তুমি সেখানে আরাম করে ঘুমাতে পারো। চিন্তার কোন কারন নেই।"

"হাসপাতালে এরকম থাকার অনুমতি দেয়?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে। "এরকম মেয়েদের রুমে একজন পুরুষ দর্শনার্থি থাকতে পারে?"

"আমি ধরে নিচ্ছি মাঝরাতে তুমি আমাদেরকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করবে না?"

"বাজে কথা বোলো না।"

"তাহলে আর কোন সমস্যা নেই। আমাদের সাথেই থাকো, আমরা মজা করবো, অনেক অনেক কথা বলবো। এরচেয়ে ভালো আর কিছু নেই। তাহলে আমরা একে অপরকে ভালোভাবে বুঝতে পারবো। আমি তোমাকে গিটার বাজিয়ে শোনাবো। আমি অনেক ভালো বাজাই।"

"তুমি নিশ্চিত আমি কোন ঝামেলা করছি না?"

রেইকো তার ঠোঁট বেঁকিয়ে তৃতীয় সেভেন স্টার ধরালো। "নাওকো আর আমি এ নিয়ে আগেই কথা বলেছি। আমরা দু-জন তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রন জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকতে। তোমার কি মনে হয় না ভদ্রভাবে সেটা গ্রহণ করা উচিত?"

"অবশ্যই। আমি খুশি মনেই গ্রহণ করছি।"

রেইকো তার চোখের পাশের ভাঁজগুলোকে গভীরভাবে কুঁচকে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। "তোমার কথা বলার ধরন কেমন জানি হাস্যকর," সে বলল। "তুমি নিশ্চয়ই *ক্যাচার ইন দ্য রাই* বইয়ের ছেলেটাকে নকল করছো না?"

"মাথা খারাপ?" আমি হেসে বললাম।

রেইকো নিজেও হাসল। তার মুখে সিগারেট। "তুমি একজন ভালো মানুষ। তোমার দিকে তাকিয়ে আমি এটা বলে দিতে পারি। সাত বছর এখানে থেকে আর বিভিন্ন ধরনের মানুষ দেখে আমি বুঝতে পারি কারা মন খুলে কথা বলতে পারে আর কারা বলতে পারে না। মন খুলে কথা বলতে পারে যারা, তুমি তাদের একজন। কিংবা তুমি হয়ত বলো না কিন্তু চাইলেই মন খুলে বলতে পারো।"

"মন খুলে কথা বললে কি হয়?"

ঠোঁট থেকে সিগারেট ঝুলছে, রেইকো তার হাত টেবিলে রাখল। সে এইসব কথাবার্তায় মজা পাচ্ছিল। "তাদের আত্মার উন্নতি হয়," বলল সে। কথা বলতে গিয়ে ছাই টেবিলে পড়ল কিন্তু সে পাত্তা দিল না।

রেইকো আর আমি প্রধান ভবন থেকে বেরিয়ে একটা পাহাড় পার হলাম, এরপর একটা সুইমিং পুল পাশ কাটালাম। তারপর কয়েকটা টেনিস কোর্ট আর একটা বাস্কেটবল কোর্ট। টেনিস কোর্টে দু-জন খেলছিল, একজন চিকন মধ্যবয়স্ক, আরেকজন তরুণ এবং মোটা। দু-জনই ভালো র‍্যাকেট চালাচ্ছিল, কিন্তু আমার মনে হল না তারা টেনিস খেলছে। মনে হচ্ছিল তাদের আগ্রহ বল কি করে ড্রপ খায় সেটা পরীক্ষা করা। তারা অদ্ভুত মনোযোগের সাথে একজন আরেকজনকে বল পাঠাচ্ছিল। দু-জনেই ঘেমে গোসল। তরুনজন, যে কোর্টে আমাদের দিকে ছিল, রেইকোকে খেয়াল করে এগিয়ে এল। তারা কিছু কথা বলল, হাসাহাসিও করল। কোর্টের পাশ দিয়ে এক লোক, যার মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই, একটা বড় ঘাস কাটার যন্ত্র দিয়ে ঘাস কেটে যাচ্ছে।

সামনে এগুতেই আমরা ছোট একটা বন পেলাম এরপর পনের থেকে বিশটার মত ছোট ছোট কটেজ একটু পর পর দাঁড়ানো। মেইন গেটের গার্ডের মত হলুদ সাইকেল মোটামুটি সব কটেজের সামনে একটা করে রাখা। "স্টাফ আর তাদের পরিবার এগুলোতে থাকে," রেইকো বলল।

"আমাদের যা যা দরকার সবকিছু এখানে আছে, শহরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না," হাটতে হাঁটতে সে বলল। "আগেই বলেছি খাদ্যের ব্যাপারে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের নিজস্ব মুরগির ফার্ম থেকে ডিম পাই। বই, রেকর্ড আর ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে, নিজেদের প্রয়োজনের জন্য দোকান আছে। প্রতি সপ্তাহে নাপিত এবং বিউটিশিয়ান আসে। ছুটির দিনে এমনকি আমরা মুভিও দেখি। বিশেষ কিছুর প্রয়োজন হলে স্টাফ কাউকে বললেই শহর থেকে কিনে এনে দেয়। ক্যাটালগ দেখে পোশাক অর্ডার করি আমরা। এখানে বাস করা কোন সমস্যাই না।"

"কিন্তু তোমরা শহরে যেতে পারো না?"

"না, পারি না। এমন কিছু যদি হয় যেটা জরুরি, যেমন ধর ডেন্টিস্ট দেখানো বা কিছু তাহলে অন্য ব্যাপার, কিন্তু নিয়ম হল আমরা শহরে যেতে পারবো না। প্রত্যেকে যে কোন সময়ে এখান থেকে চলে যেতে পারে চাইলে, কিন্তু একবার গেলে তুমি আর ফিরে আসতে পারবে না। সেতু পুড়িয়ে যেতে হবে। কিছুদিনের জন্য শহরে যাবে আবার এসে থাকবে এমন হবে না। তাহলে সবাই তাই করত, কাজের কাজ কিছু হত না।"

বনের পরে একটা হালকা ঢালু জায়গা। ঢালুর শেষে সারি দিয়ে দোতলা কাঠের ঘর যেগুলোর মধ্যে কি জানি অস্বাভাবিকতা রয়েছে। কি অস্বাভাবিক সেটা বলা মুশকিল কিন্তু প্রথম দেখাতেই আমি সেটা অনুভব করেছি। আমার প্রতিক্রিয়া ছিল যেন অনেকটা এরকম অনুভূতি যখন আমরা নিজেদের মত করে সুন্দরভাবে অবাস্তব কিছু আঁকার চেষ্টা করি। আরও ভালো করে বোঝানো যাবে যদি বলি ডিজনি মুভি যদি এডভারড মুখের পেইন্টিঙের অ্যানিমেটেড কিছু করার চেষ্টা করে সেরকম। প্রত্যেকটা ঘর একই সাইজের, একই রঙের, চতুর্ভুজ আকৃতির। বড় বড় দরজা এবং প্রচুর জানালা। এগুলোর ভেতর রাস্তা এমনভাবে এঁকেবেঁকে গেছে যেন ড্রাইভিং স্কুলের প্র্যাকটিসের রাস্তা। কেটে ছেঁটে সুন্দরভাবে সাইজ করা ফুলওয়ালা স্ট্রবেরি গাছ দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যেক ঘরের সামনে। কোথাও কোন মানুষ নেই, সব জানালাতে পর্দা টাঙানো।

"এই জায়গাটার নাম এরিয়া সি। মেয়েরা এখানে থাকে, আমরা! এখানে দশটা বাড়ি আছে, প্রত্যেকটা চার ইউনিটের, প্রত্যেক ইউনিটে দু-জন থাকে। এরমানে হল আশিজন একসাথে থাকতে পারে। এখন অবশ্য আছে মাত্র বত্রিশ জন।"

"খুবই নীরব জায়গা, তাই না?"

"কারন এখন এখানে কেউ নেই," রেইকো বলল। "আমার বিশেষ অনুমতি আছে ইচ্ছেমত ঘোরাঘুরি করার, বাকি সবাই যে যার রুটিনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কেউ ব্যয়াম করছে, কেউ বাগানে ব্যস্ত, কেউ গ্রুপ থেরাপিতে আছে, কেউ কেউ গেছে জংলি লতাপাতা সংগ্রহে। সবাই যে যার রুটিন নিজে নিজে তৈরি করে। যেমন ধর নাওকো এখন কি করছে? আমার মনে হয় সে এখন রঙ করা এবং ওয়ালপেপার লাগানোর কাজে আছে। মনে নেই। এরকম কিছু কাজ আছে পাঁচটা পর্যন্ত।"

রেইকো যে বাড়িটায় ঢুকল তাতে লেখা 'সি-৭।' সিঁড়ি বেয়ে উঠে করিডরের শেষ মাথায় গিয়ে ডান দিকের দরজা খুলল, কোন রকম তালা মারা ছিল না। সে আমাকে চার রুমের অ্যাপার্টমেন্ট ঘুরিয়ে দেখাল। লিভিংরুম, বেডরুম, রান্নাঘর এবং বাথরুম। একদম সাধারণ কিন্তু আরামদায়ক। অতিরিক্ত কোন আসবাবপত্র বা অলংকরন নেই। জায়গাটা তেমন বড়ও না। বলার মত বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু সেখানে থাকা মানে যেন রেইকোর সাথে থাকা। শরীর ছেড়ে দিয়ে টেনশন বের করে দেয়ার মত। লিভিং রুমে একটা সোফা, একটা টেবিল, আর একটা রকিং চেয়ার। রান্নাঘরে আরেকটা টেবিল। দুটো টেবিলেই দুটো বড় অ্যাশট্রে রাখা। বেডরুমে দুটো বিছানা, দুটো ডেস্ক, একটা ক্লজিট। দুই বিছানার মাঝে একটা ছোট নাইট টেবিল। তার উপর একটা ল্যাম্প আর একটা

পেপারব্যাক বই উল্টো করে রাখা। রান্নাঘরে ছোট ইলেকট্রিক চুলা আর ফ্রিজ। সাধারণ রান্নার জন্য যথেষ্ট।

"কোন বাথটাব নেই, স্রেফ শাওয়ার। ভালোই, কি বলো? গোসল আর লন্ড্রির জন্য বাইরে কমন ব্যবস্থা আছে।"

"অনেক ভালো। আমার ডরমের রুমে খালি ছাদ আর জানালা আছে।"

"আহ, কিন্তু তুমি এখানকার শীত দেখোনি," রেইকো বলল। "লম্বা এবং রূঢ়। চারদিকে কিচ্ছু নেই, যেদিকে তাকাও খালি বরফ আর বরফ। ঘরবাড়ি স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে ঠান্ডায় হাড় পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। শীতে আমাদের কাজ কোদাল দিয়ে বরফ সরানো। বেশিরভাগ সময় আমরা ভেতরে থাকি কারন ভেতরে উষ্ণ। আমরা কথা বলি, গান শুনি কিংবা উল বুনি। এইটুকু জায়গা যদি না থাকে দম বন্ধ হয়ে আসবে তোমার। একবার শীতে আসলে বুঝবে।"

শীতের কথা চিন্তা করে রেইকো এখনই দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "তোমার বিছানা," সোফায় চাপড় দিয়ে সে বলল। "আমরা বেডরুমে ঘুমাবো, তুমি ঘুমাবে এখানে। কোন সমস্যা হবে না আশা করি।"

"একদমই না।"

"তাহলে ঠিক আছে," রেইকো বলল। "আমরা পাঁচটার দিকে ফেরত আসবো। নাওকো আর আমার দু-জনেরই ততক্ষন পর্যন্ত কাজ আছে। একা থাকতে কোন সমস্যা নেই তো?"

"নাহ, কোন সমস্যা নেই, আমি জার্মান পড়বো ততক্ষন।"

রেইকো চলে যাওয়ার পর আমি সোফায় সটান শুয়ে চোখ বন্ধ করলাম। চুপচাপ চারদিক, হঠাৎ কোত্থেকে জানি আমার মনে পড়ল কিজুকি আর আমার মোটরসাইকেল ট্রিপের কথা। তখনও হেমন্ত চলছিল। কত বছর আগে সেটা? হ্যাঁ, চার বছর আগের কথা। আমি এমনকি কিজুকির চামড়ার জ্যাকেটের গন্ধও মনে করতে পারলাম। আর সেই লাল ইয়ামাহা ১২৫ সিসি থেকে হওয়া শব্দ। আমরা উপকুল পর্যন্ত গিয়ে আবার সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে এসেছিলাম একেবারে কাহিল হয়ে। বলার মত কিছু ঘটেনি সেই ট্রিপে, কিন্তু আমার পরিস্কার মনে আছে সব। হেমন্তের কড়া বাতাস আমার কানে লাগছিল। কিজুকির জ্যাকেট ধরে বসে আমি উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মনে হচ্ছিল মহাকাশে ছিটকে পড়বো।

আমি অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে একটার পর একটা স্মৃতি মনের ভেতর বয়ে যেতে দিলাম। কোন অদ্ভুত কারনে হোক বা যাহোক অনেক পুরনো স্মৃতি ফিরে আসল যা অনেকদিন মনে আসেনি। কিছু আনন্দের স্মৃতি আর কিছু দুঃখের।

কতক্ষন এমন চলল আমি জানি না। আমি স্মৃতির স্রোতে এমনভাবে ডুবে ছিলাম যে খেয়ালই করিনি কখন নিঃশব্দে নাওকো দরজা খুলে ভেতরে এল। আমি চোখ খুলে দেখি সে আমার দিকে তাকিয়ে সোফার হাতলে বসে আছে। মাথা তুলে তার চোখের দিকে তাকালাম। প্রথমে ভেবেছি স্মৃতির কোন দৃশ্য, কিন্তু না সে ছিল আসলেই নাওকো।

"ঘুমাচ্ছিলে?" ফিসফিস করে বলল সে।

"না। ভাবছিলাম।" উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন আছো?"

"ভালো আছি," সে বিষন্ন হাসি হেসে বলল। "আমার হাতে বেশি সময় নেই। এখন এখানে আসার কথা না। আমি এক মিনিটের জন্য এসেছি। এখনি আবার ফেরত যেতে হবে। আমার চুল কি তোমার কাছে জঘন্য মনে হচ্ছে?"

"একদমই না," বললাম তাকে, "কিউট লাগছে।" তার চুল স্কুলের মেয়েদের মত সাধারণভাবে কাটা, এক সাইড ব্যারেট দিয়ে আটকানো আগে যেরকম পরতো। নাওকোকে এরকম ভালো মানায়। এরকম চুলের স্টাইলে তাকে মধ্যযুগের বাঁধানো পুরনো ছবির সুন্দর ছোট বালিকাদের মত দেখায়।

"চুল কাটা একটা ঝামেলা। রেইকো কেটে দেয় আমাকে। আসলেই তোমার কাছে কিউট লাগছে?"

"সত্যি বলছি।"

"মায়ের কাছে জঘন্য লাগে," সে তার ব্যারেট খুলে চুল ঝুলে পড়তে দিল। তারপর আঙুল দিয়ে সমান করে আবার ব্যারেট দিয়ে আটকাল। ব্যারেটটা দেখতে প্রজাপতির মত।

"আমরা তিনজন একসাথে হওয়ার আগেই আমি একা তোমাকে দেখতে চাচ্ছিলাম। এমন না যে বিশেষ কিছু বলার মত আছে। আমি তোমার চেহারা দেখতে চাচ্ছিলাম আর তুমি এখানে সেটা মানিয়ে নিতে চাচ্ছিলাম। নাহলে আমার হয়ত তোমাকে বুঝতে আবার সমস্যা হত। মানুষের সাথে মিশতে পারি না আমি।"

"তাহলে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "কাজ হচ্ছে মনে হয়?"

"একটু," নিজের ব্যারেট ছুঁয়ে সে বলল। "কিন্তু সময় শেষ, আমাকে ফিরে যেতে হবে।"

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

"তরু," সে শুরু করল, "তোমাকে ধন্যবাদ দিতে চাই এখানে আমাকে দেখতে আসার জন্য। আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু আমার কোন কিছু যদি তোমার কাছে বোঝা মনে হয়, আমাকে জানাতে দ্বিধা কোরো না। এটা একটা বিশেষ জায়গা, বিশেষ রকমের ব্যবস্থা আছে এখানে, সবাই এখানে মেলাতে

পারে না। তোমার যদি সেরকম সমস্যা হয়, আমাকে খোলাখুলি জানিয়ো। আমি ভেঙে পারবো না। আমরা এখানে খোলাখুলি কথা বলি। একজন আরেকজনকে সৎভাবে সব কথা বলি।"

"প্রয়োজন হলে আমি তোমাকে বলবো," বললাম। "আর সৎ থাকবো।"

নাওকো আমার শরীর ঘেঁসে সোফায় বসল। আমি আমার হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে নিলাম। সে তার মাথা আমার কাঁধে রেখে গলায় মুখ ঘষল। এভাবে কিছুক্ষণ সে বসে থাকল যেন আমার তাপমাত্রা পরীক্ষা করছে। ওকে জড়িয়ে থেকে আমার বুকে উষ্ণতা অনুভব করলাম। কিছুক্ষণ পর সে উঠে দাঁড়াল আর কিছু না বলে যেভাবে নিঃশব্দে এসেছিল সেভাবেই দরজা লাগিয়ে চলে গেল।

নাওকো চলে যাওয়ার পর আমি সোফায় ঘুমাতে গেলাম। এমন না যে ঘুমাতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু অনেকদিন পর আমি এরকম গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। সেই সাথে চারপাশে নাওকোর উপস্থিতি অনুভব করছিলাম। রান্নাঘরে থালাবাসন রাখা যেগুলোতে নাওকো খেয়েছে। বাথরুমে রাখা নাওকোর ব্যবহার কড়া টুথব্রাশ। বেডরুমে তার বিছানা, যেখানে সে ঘুমায়। তার অ্যাপার্টমেন্টে এরকম গভীর ঘুম আমার শরীরের প্রতিটি কোষ থেকে অবসাদ নিংড়ে বের করে নীল। আমি স্বপ্নে দেখলাম আধো আলোতে একটা প্রজাপতি উড়ছে।

যখন ঘুম ভাঙল, আমার হাতঘড়িতে তখন সাড়ে চারটা বাজে। আলো বদলে গেছে, বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, মেঘের আকৃতিও বদলে গেছে তখন। ঘুমের মধ্যে ঘেমে গিয়েছিলাম, ন্যাপস্যাক থেকে তোয়ালে বের করে মুখ মুছে নিলাম। পোশাক বদলে নতুন পোশাক পরলাম। রান্নাঘরে গিয়ে পানি খেতে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। জানালার দিকে মুখ করা পাশের বিল্ডিংয়ের জানালা দিয়ে ভেতর ঝুলতে থাকা কাগজের খেলনা দেখা গেল–পাখি, মেঘ, গরু, বিড়াল, চমৎকারভাবে কাগজ দিয়ে বানানো। আগের মতই কোন মানুষের চিহ্ন দেখা গেল না, আর নেই কোন প্রকার শব্দ। আমার মনে হল পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও একা আমি শুধু বেঁচে আছি।

পাঁচটা বাজার কিছু পরে এরিয়া সি-এর লোকজন ফিরতে শুরু করল। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখলাম, তিনজন মহিলা নিচে হেঁটে যাচ্ছে। মাথায় টুপি থাকায় তাদের বয়স বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু গলা শুনে মনে হল বয়স্কই হবে। তারা চলে যাওয়ার পরপরই আরও চারজন মহিলা একই দিক থেকে আসল, এবং আগের গ্রুপের মত একই দিকে হারিয়ে গেল। সব কিছুতে যেন সান্ধ্যকালিন মেজাজ টের পাওয়া যাচ্ছে। লিভিং রুমের জানালা থেকে আমি দূরের পাহাড় চূড়া আর গাছের সারি দেখতে পাচ্ছিলাম। শৈলশিরার উপর দিয়ে সূর্যের ম্লান আলো হারিয়ে যাচ্ছিল।

সাড়ে পাঁচটার সময় নাওকো আর রেইকো একসাথে ফিরলো। নাওকো আর আমি এমনভাবে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানালাম যেন এই প্রথম দেখা হল। ওকে দেখে বিব্রত মনে হল। রেইকো আমার বই দেখে জানতে চাইলো কি বই পড়ছিলাম। টমাস মানের *দ্য ম্যাজিক মাউন্টেইন*–তাকে বললাম।

"এরকম একটা বই তুমি এরকম জায়গায় কী করে আনলে?" সে জবাব দাবি করল। অবশ্যই তার প্রশ্নটি সঠিক ছিল।

রেইকো এরপর আমাদের তিনজনের জন্য কফি বানাল। আমি নাওকোকে জানালাম স্টর্ম ট্রুপারের হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার কাহিনী। আর শেষ দিনে আমাকে জোনাকি দেয়ার গল্প।

"শুনে খারাপ লাগল যে সে চলে গেছে," সে বলল। "আমি তার আরও গল্প শুনতে চেয়েছিলাম।"

রেইকো জানতে চাইলো স্টর্ম ট্রুপার কে। আমি তাকে তার গল্প শোনালে সে হাসিতে ফেঁটে পড়ল। সারা পৃথিবী সুখ আর হাসিতে ভরপুর থাকে যতক্ষণ স্টর্ম ট্রুপারের গল্প চলে।

ছয়টায় আমরা প্রধান ভবনের ডাইনিং হলে গেলাম ডিনারের জন্য। নাওকো আর আমি নিলাম ভাজা মাছ সাথে গ্রিন সালাদ, সেদ্ধ সব্জি, ভাত আর মিসো সুপ। রেইকো নিল খালি পাস্তা সালাদ আর কফি এবং সিগারেট।

"বয়স বাড়তে থাকলে বেশি খাওয়ার দরকার পড়ে না," ব্যাখ্যা দিল সে।

কম বেশি বিশ জনের মত মানুষ ছিল ডাইনিং হলে। আমরা খেতে খেতে কেউ আসল কেউ চলে গেল। বয়সের বিভিন্নতা বাদ দিলে ডাইনিঙের দৃশ্য প্রায় আমার ডরমের মতই। পার্থক্য যেখানে সেটা হল কথা বলার শব্দে। এখানে কোন জোরে কথা নেই, কোন ফিসফিসও নেই। কেউ জোরে হাসছে না কিংবা চিৎকার করে কাদছে না, একজন আরেকজনের প্রতি চিল্লিয়ে কিছু বলছে না। চুপচাপ কথা হচ্ছে। সবাই সমান উচ্চতার স্বরে কথা বলছে। তিন থেকে পাঁচ জনের গ্রুপ করে লোকজন খেতে বসেছে। একজন কথা বলছে বাকিরা শুনছে কিংবা মাথা নাড়ছে। তার কথা শেষ হলে আরেকজন বলছে, এভাবে কথা চলছে। আমি নিশ্চিত না তারা কি নিয়ে কথা বলছিল কিন্তু তাদের কথা বলার ভঙ্গি দেখে আমার দুপুরের অদ্ভুত টেনিস খেলার কথা মনে পড়ে গেল। অবাক হয়ে ভাবছিলাম নাওকো তাদের সাথে যখন থাকে তখন এভাবে কথা বলে কিনা। আরও অদ্ভুত ব্যাপার হল, কিছুটা হিংসা আর একাকিত্বর মিশ্র এক অনুভূতি টের পেলাম আমি নিজের মধ্যে।

আমার পেছনের টেবিলে বসেছিল সাদা কোট পরা টাক মাথার এক লোক।

যার ভাবসাবে মনে হচ্ছিল ডাক্তার হবে। গ্যাস্ট্রিক রস আর ওজন কমার মধ্যে সম্পর্কের উপর তার সামনে বসা দু-জনকে লেকচার দিচ্ছিল। দু-জনের একজন নার্ভাস চেহারার চশমা পরা এক যুবক আর একজন কাঠবিড়ালির মত চেহারার এক মধ্যবয়স্কা মহিলা। তারা দু-জন শুনছিল আর মাঝে মাঝে "সর্বনাশ" কিংবা "বলেন কি" ধরনের মন্তব্য করছিল। কিছুক্ষণ টাক লোকটার কথা শুনে আমি নিশ্চিত হলাম সে ডাক্তার নয়।

ডাইনিং হলের কেউ আমাকে বিশেষ গুরুত্ব দিল না। কেউ আমার দিকে তাকাল না, এমনকি আমি যে ওখানে আছি তা খেয়াল করল বলেও মনে হল না। মনে হল আমার উপস্থিতি খুবই সাধারণ একটি ঘটনা।

খালি একবার, সাদা পোশাক পরা লোকটা যে আশেপাশে ঘোরা ফেরা করছিল, আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কতদিন এখানে থাকবেন?"

"দুই রাত," আমি বললাম, "বুধবার চলে যাবো।"

"এখানে থাকার জন্য এই সময়টা চমৎকার, তাই না? কিন্তু শীতে পারলে আসবেন। সবকিছু সাদা হয়ে যায়, খুবই দারুন লাগে।"

"বরফ পড়ার আগেই হয়ত নাওকো বেরিয়ে যাবে এখান থেকে," রেইকো লোকটাকে বলল।

"তা ঠিক, কিন্তু তারপরেও, শীত এখানে খুবই চমৎকার," লোকটা বিষন্ন চেহারা করে একই কথা আবারো বলল। আমার আবারো দোটানায় পড়ে গেলাম এই লোক ডাক্তার নাকি না।

"তোমরা কি নিয়ে কথা বলো?" রেইকোকে বললাম, মনে হল না সে আমার প্রশ্ন বুঝল।

"কি নিয়ে কথা বলি? সাধারণ ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে। সারাদিন কি হল, কি কি বই পড়লাম আমরা, কিংবা ধর কালকের আবহাওয়া, এই তো। আমাকে বোলো না, তুমি ভাবছো লোকজন লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলে 'যদি আজকে মেরু ভাল্লুক আকাশের সব তারা খেয়ে ফেলে তাহলে কালকে বৃষ্টি হবে!' "

"না না, অবশ্যই তা ভাবছি না," আমি বললাম, "আমি ভাবছিলাম এই যে চুপচাপ কথাবার্তা হচ্ছে সবার মধ্যে সেগুলো কি নিয়ে।"

"এটা চুপচাপ জায়গা তাই লোকজন আস্তে কথা বলে," নাওকো বলল। সে তার থালার চারপাশ দিয়ে মাছের কাঁটাগুলো বেছে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে আর রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে। "এখানে উচ্চস্বরে কথা বলার কিছ নেই। তোমার কাউকে পটানোর প্রয়োজন নেই, কারো মনোযোগ আকর্ষণের দরকার পড়ে না কারো।"

"তাই তো মনে হচ্ছে," আমি বললাম, এরকম চুপচাপ লোকজনের মধ্যে খেতে গিয়ে আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম ডরমের ডাইনিঙের কোলাহল কতটা মিস করছি। তাদের হাসি, শুধু শুধু চিৎকার, বাড়িয়ে বলা গল্প সবকিছু মিস করছিলাম। গত কয়েকমাস সেই কোলাহলে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু এখন এই পরিবেশে আমি সহজ হতে পারছিলাম না। এখানের ডাইনিঙের আবহাওয়া আর মেশিন টুল প্রদর্শনীর মেলার আবহাওয়া একই রকম মনে হচ্ছিল। কম লোকের আগ্রহ আছে এমন কোন একটা বিষয়ে আগ্রহি লোকজন জড় হয়েছে একটা জায়গায়, এমন বিষয় নিয়ে কথা চালাচালি হচ্ছে যা তারা ছাড়া বাইরের কেউ বুঝবে না।

রাতের খাওয়ার পর রুমে এসে নাওকো আর রেইকো ঘোষণা দিল তারা এরিয়া সি'র কমন গোসলখানায় গোসল করতে যাবে। আমি যদি চাই তো তাদের বাথরুমে গোসল করতে পারি। আমি বললাম সেটাই করবো। ওরা চলে যাওয়ার পরে পোশাক ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে গোসল সেরে নিলাম। বুককেসে বিল ইভান্সের একটা রেকর্ড পেলাম। গান শুনতে শুনতে চুল শুকচ্ছিলাম তখন খেয়াল হল এই একই রেকর্ড সেই রাতে বাজানো হয়েছিল। নাওকোর জন্মদিন ছিল যেদিন, যে রাতে সে কেঁদেছিল আর আমি তাকে বুকে টেনে নিয়েছিলাম। মাত্র ছয় মাস আগের ঘটনা অথচ মনে হচ্ছে দূর কোন এক অতীত। হয়ত এরকম মনে হচ্ছে কারন আমি অনেক ভেবেছি এ নিয়ে–অনেক। যার কারনে সময়ের হিসেব নষ্ট হয়ে গেছে।

আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ, আলো নিভিয়ে দিয়ে সোফায় শুয়ে বিল ইভান্সের পিয়ানো শুনতে লাগলাম। চাঁদের আলো জানালায় পড়ে লম্বা ছায়া তৈরি করছিল। ন্যাপস্যাক থেকে পাতলা মেটাল ফ্লাস্ক বের করে গলায় ব্র্যান্ডি ঢাললাম, তরল উষ্ণতা গলা দিয়ে ধীরে ধীরে পাকস্থলিতে নেমে গেল তারপর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল। আরও এক ঢোক খেয়ে ফ্লাস্ক ন্যাপস্যাকে রেখে দিলাম। এখন মনে হল চাঁদের আলো মিউজিকের সাথে তাল মিলিয়ে দুলছে।

মিনিট বিশেক পরে নাওকো আর রেইকো গোসল সেরে ফিরে এল।

"ওহ কি অন্ধকার! আমরা তো ভেবেছি তুমি ব্যাগ গুছিয়ে টোকিও ফেরত গেলে কিনা," রেইকো বলল।

"চমৎকার লাগছে কিন্তু," নাওকো বলল। "রেইকো গতবার বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর কেনা মোমবাতিগুলো কি আছে এখনও?"

"আছে মনে হয়, রান্নাঘরের ড্রয়ারে দেখো তো।"

নাওকো রান্নাঘর থেকে বড় একটা সাদা মোমবাতি নিয়ে আসল। আমি

জ্বালালাম সেটা, প্লেটে একটু মোম ফেলে তার উপর মোমবাতি দাঁড় করালাম। রেইকো মোমবাতি দিয়ে সিগারেট ধরালো। আমরা তিনজন মোমবাতির দিকে মুখ করে বসলাম। মনে হচ্ছিল পৃথিবীর এই প্রান্তে আমরা তিনজন ছাড়া কেউ বেঁচে নেই। চাঁদের আলো আর মোমবাতির আলো যেন মিশে গেছে অ্যাপার্টমেন্টের সালা দেয়ালের সাথে। নাওকো আর আমি সোফায় পাশাপাশি বসলাম, রেইকো আমাদের সামনে রকিং চেয়ারে বসল।

"ওয়াইন হলে কেমন হয়?" রেইকো প্রস্তাব করল।

"তোমাদের মদ খাওয়ার অনুমতিও আছে নাকি?" আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

"তা নেই," রেইকো বিব্রত হয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে বলল। "কিন্তু তারা সমস্যা করে না যদি তুমি মাতাল না হয়ে যাও। স্টাফদের মধ্যে আমার এক বন্ধু আছে যে আমাকে মাঝে মধ্যে অল্প পরিমাণ কিনে এনে দেয়।"

"আমরা ড্রিঙ্কিং পার্টি করি কখনো কখনো," নাওকো দুষ্টুমির স্বরে বলল। "শুধু আমরা দু-জন।"

"তাহলে তো ভালোই," আমি বললাম।

রেইকো ফ্রিজ থেকে হোয়াইট ওয়াইনের বোতল বের করে কর্কস্ক্রু দিয়ে ছিপি খুলল আর তিনটা গ্লাস নিয়ে আসল। ওয়াইনটা এত স্বচ্ছ আর উপাদেয় ছিল যেন মনে হচ্ছিল ঘরে বানানো। রেকর্ড শেষ হয়ে গেলে রেইকো বিছানার নিচ থেকে গিটার বের করল। এমনভাবে টিউন করতে বসল যে বোঝাই যাচ্ছিল খুব পছন্দের জিনিস। তারপর বাখের একটা স্লো মিউজিক বাজানো শুরু করল। বাজানোতে মাঝে মধ্যে আঙুল ছুটে যাচ্ছিল কিন্তু সে যে বাখ বাজাচ্ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাখের মিউজিকের উষ্ণ অন্তরঙ্গ আনন্দময় অনুভূতি পুরোপুরি উপস্থিত ছিল বাজানোর মধ্যে।

"আমি এখানে আসার পর গিটার বাজানো শুরু করেছি," রেইকো বলল। "এখানে রুমে কোন পিয়ানো নেই। আমি নিজে নিজে গিটার শিখেছি। অবশ্য গিটার বাজানোর মত হাত নেই আমার, তাই ভালোভাবে বাজাতে পারি না। কিন্তু গিটার আমার ভালো লাগে। ছোট একটা জিনিস, বাজানো খুব সহজ, মনে হয় উষ্ণ ছোট ঘরের মত অনেকটা।"

সে বাখের আরেকটা মিউজিক বাজালো। মোমবাতির আলো, হোয়াইট ওয়াইন, রেইকোর বাজানো বাখ...আমি অনুভব করলাম আমার ভেতরের সব টেনশন ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। রেইকো বাখ শেষ করলে নাওকো অনুরোধ করল বিটল্‌স বাজাতে।

"অনুরোধের আসর," আমার দিকে চোখ টিপে বলল রেইকো। "নাওকো আমাকে প্রতিদিন বলে বিটল্‌স বাজাতে, আমি যেন ওর দাসি।"

নাওকর জোরাজুরিতে রেইকো বাজালো *মিশেল*।

"চমৎকার গান," রেইকো বলল। "আমার অনেক পছন্দ এই গানটা।" এক চুমুক ওয়াইন দিলে একটা সিগারেট ধরালো। "গানটা শুনলেই মনে হয় আমি ঘাসভূমির মধ্যে দিয়ে হাঁটছি আর চারপাশে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে।"

তারপর ও বাজালো *নোহয়্যার ম্যান* আর *জুলিয়া*। বাজানোর সময় সে চোখ বন্ধ করে মাথা দুলাতে থাকে। শেষ হলে মদ আর সিগারেটে ফেরত যায়।

"*নরওয়েজিয়ান* উড বাজাও," নাওকো বলল।

রেইকো রান্নাঘরে গিয়ে পরসেলিনের তৈরি বিড়ালের মত দেখতে একটা কয়েন ব্যাঙ্ক নিয়ে আসল। নাওকো একশ ইয়েনের একটা নোট ব্যাগ থেকে বের করে সেটায় ঢুকাল।

"এসবের অর্থ কি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এটা নিয়ম," নাওকো বলল। আমি যখনই *নরওয়েজিয়ান* উড শুনতে চাই, ব্যাঙ্কে একশ ইয়েন দিতে হবে। আমার পছন্দের গান, তাই এর জন্য টাকা দেই। যখন খুব শুনতে ইচ্ছে হয় শুধু তখনই গানটার জন্য অনুরোধ করি।"

"এইভাবেই আমি সিগারেটের টাকা পাই!" রেইকো বলল।

রেইকো আঙুল ফুটিয়ে তারপর *নরওয়েজিয়ান* উড বাজানো শুরু করল। আবারো চমৎকার বাজাল। আবেদন পুরোপুরি ঠিক রাখল কিন্তু ভাবালু হতে দিল না। আমিও পকেট থেকে একশ ইয়েন বের করে ব্যাঙ্কে ঢুকালাম।

"থ্যাংক ইউ," রেইকো হেসে বলল।

"এই গানটা শুনলে আমার মনে খারাপ হয়," নাওকো বলল। "জানি না, আমার মনে হয় যেন গভীর জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছি। ঠান্ডা, অন্ধকার আর আমি একদম একা, কেউ আমাকে উদ্ধার করতে আসবে না। তাই আমি অনুরোধ না করলে রেইকো কখনো বাজায় না এই গানটা।"

"*কাসাব্ল্যাংকার* মত শোনাল," হেসে বলল রেইকো।

এরপর সে ব্রাজিলিয়ান কিছু মিউজিক বাজালো আর আমি নাওকোকে খেয়াল করতে লাগলাম। চিঠিতে যেমন লিখেছিল, ব্যায়াম আর মাঠে কাজ করে তার স্বাস্থ্যের আসলেই উন্নতি হয়েছে। ওর চোখগুলো আগের মতই গভীর কিন্তু পরিস্কার পুকুরের মত, ওর ছোট ছোট ঠোঁটগুলো এখনও হালকা কাঁপে, কিন্তু সব মিলিয়ে ওর সৌন্দর্য এখন একজন পরিণত নারীর মত হয়েছে। যা হারিয়ে গেছে তা হল ধারালো অংশ–ছুরির ঠান্ডা ধার–হয়ত ওর সৌন্দর্যের কোথাও তার

আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায় সবই এখন সমান, শান্ত। মাত্র ছয় মাসে কেউ এত বদলে যেতে পারে তা ভাবতে অবাক লাগল। তার এই নতুন চেহারা, সৌন্দর্য আমাকে নাড়া দিল। আমি ওর প্রতি আরও আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম আগের চেয়েও বেশি। কিন্তু এর মধ্যে সে কি হারিয়েছে ভাবতেই অনুতপ্ত বোধ হল। বয়সন্ধিকালের যে সৌন্দর্য তা তো আর ফিরে পাবে না।

নাওকো জানতে চাইলো আমার দিন কিভাবে চলত। আমি ওকে বললাম ছাত্রদের ধর্মঘটের কথা, নাগাসাওয়ার কথা। এই প্রথম তার সম্পর্কে কোন কিছু নাওকোকে বললাম আমি। নাগাসাওয়ার অদ্ভুত মানবতাবোধ, অনন্য দর্শন, বিকেন্দ্রিক নৈতিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা দিতে আমার বেশ বেগ পেতে হল। কিন্তু নাওকো মনে হল বুঝতে পেরেছে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি। ওর সাথে যে রাতে আমি নারীসঙ্গ শিকারে বের হতাম তা চেপে গেলাম। এই লোকই যে পুরো ডরমে একমাত্র লোক যার সাথে আমি সত্যিকারের সময় কাটাই তা বললাম অবশ্য। অন্যদিকে রেইকো বাখের যে মিউজিকটা বাজিয়েছিল সেটা আবার প্র্যাক্টিস করছিল, আর মাঝে মাঝে বিরতি দিচ্ছিল সিগারেট আর ওয়াইনের জন্য।

"খুবই অদ্ভুত মানুষ মনে হচ্ছে," নাওকো বলল।

"সে খুবই অদ্ভুত," আমি বললাম।

"কিন্তু তুমি তাকে পছন্দ করো?"

"আমি নিশ্চিত নই। আমার মনে হয় আমি তাকে ঠিক পছন্দ করি না। নাগাসাওয়া আসলে পছন্দ করা না করার বাইরে। সে নিজেকে পছন্দ করানোর চেষ্টাও করে না। সেদিক দিয়ে বললে সে খুবই সৎ একজন মানুষ, কিন্তু নির্বিকার। সে কাউকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে না।"

"নির্বিকার? এত মেয়ের সাথে শোওয়ার পরও? খুবই অস্বাভাবিক," নাওকো হাসতে হাসতে বলল। "কত জনের সাথে সে শুয়েছে?"

"এখন সম্ভবত আশি পার হয়ে গেছে," আমি বললাম। "আসলে সংখ্যা যত বাড়ছে সে তত কম চেষ্টা করছে। আমার মনে হয় সে সেটাই করতে চাইছে।"

"আর তুমি বলছো এটা 'নির্বিকার'?"

"ওর জন্য তাই।"

নাওকো আমার কথাগুলো নিয়ে এক মিনিট চিন্তা করল। "আমার মনে হয় সে আমার চেয়ে বেশি অসুস্থ।"

"আমিও তাই," বললাম তাকে। "কিন্তু সে তার এইসব অদ্ভুত গুণ যুক্তির সাথে খাটাতে পারে। সে খুবই মেধাবি। তুমি যদি তাকে ধরে এখানে নিয়ে

আসো, সে দুদিনে বের হয়ে যাবে। সে বলবে, 'আরে বুঝেছি, সব জানি এইসব। এইখানে কি হচ্ছে সব বুঝি'–সে এরকম মানুষ। এধরনের মানুষদের আমি শ্রদ্ধা করি।"

"আমার মনে হয় আমি মেধাবির বিপরীত," নাওকো বলল। "এখানে কি হচ্ছে আমি কিছুই বুঝি না–নিজেকেও বুঝি না।"

"সেটা তুমি মেধাবি না সে জন্য নয়," আমি বললাম। "তুমি একদম সাধারণ। আমিও অনেক কিছু আছে কিছু বুঝি না। তুমি আমি দু-জনই সাধারণ মানুষ।"

নাওকো শোফার কোনায় পা তুলে থুতনি রাখল হাঁটুর উপর। "আমি তোমার সম্পর্কে আরও জানতে চাই," সে বলল।

"আমি খুবই সাধারণ একজন মানুষ–পরিবার সাধারণ, পড়াশুনা সাধারণ, চেহারা সাধারণ, রেজাল্ট সাধারণ, চিন্তা-ভাবনাও সাধারণ।"

"তুমি স্কট ফিটজারেল্ডের একজন বড় ভক্ত...সে না বলেছে তুমি এমন কাউকে বিশ্বাস করবে না যে দাবি করে সে সাধারণ? তুমি নিজেই আমাকে বইটা দিয়েছিলে!" নাওকো দুষ্টু হাসি হেসে বলল।

"কথা সত্যি," আমি বললাম, "কিন্তু আমি বানিয়ে বলছি না। আমি সত্যি সত্যি ভেতর থেকে বিশ্বাস করি আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমার মধ্যে তুমি কি কিছু পেয়েছো যেটা সাধারণ নয়?"

"অবশ্যই আমি পেয়েছি," নাওকো একটু ধৈর্যহারা সুরে বলল, "তুমি কি ভেবেছো? আমি কেন তোমার সাথে শুয়েছিলাম? কারন আমি এতই মাতাল ছিলাম যে যার তার সাথে শুয়ে পড়তাম?"

"না, আমি তা ভাবিনি," বললাম তাকে।

নাওকো এরপর অনেকক্ষণ নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল। আমিও কথা খুঁজে না পেয়ে আরেকটা ড্রিঙ্ক নিলাম।

"তুমি কতজন মেয়ের সাথে শুয়েছো, তরু?" নাওকো এত আস্তে জিজ্ঞেস করল যে, আমি ভাবলাম ও পাগল হয়ে গেল নাকি।

"আট অথবা নয়," সত্যিটাই বললাম।

রেইকো গিটার বাজানো থামিয়ে কোলের উপর রাখল। "বলো কী! তোমার বয়স তো বিশও হয়নি! কী রকম জীবনের দিকে যাচ্ছো তুমি?"

নাওকো চুপ করে থেকে তার সেই পরিস্কার দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। আমি রেইকোকে বললাম, যে মেয়ের সাথে আমি প্রথম শুয়েছি তার কথা আর কিভাবে আমাদের সম্পর্কচ্ছেদ হল। আমি ব্যাখ্যা করলাম কেন তাকে

ভালোবাসা আমার জন্য অসম্ভব ছিল। তারপর বললাম নাগাসাওয়ার খপ্পরে পড়ে কি করে একটার পর একটা মেয়ের সাথে শুয়েছি।

"আমি কোন অজুহাত দিচ্ছি না, কিন্তু আমি অনেক কষ্টে ছিলাম," বললাম নাওকোকে। "তোমার সাথে প্রতি সপ্তাহে দেখা হত, কথা হত, কিন্তু জানতাম তোমার মনে আছে স্রেফ কিজুকি। খুব কষ্ট হত। খুব। আর সেজন্যই আমি হয়ত যেসব মেয়েদের চিনতাম না তাদের সাথে শুতাম।"

নাওকো মাথা দোলাল কিছুক্ষণ, তারপর মুখ তুলে বলল, "তুমি জানতে চেয়েছিলে সেদিন, আমি কেন কখনো কিজুকির সাথে সেক্স করিনি, মনে আছে? তুমি কি এখনও উত্তরটা চাও?"

"আমার মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর জানাটা আমার জন্য খুবই জরুরি," বললাম তাকে।

"আমারও তাই মনে হয়," নাওকো বলল। "যে মরে গেছে সে সবসময়ের জন্য মরে গেছে, কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম। রেইকো একই অংশ বারবার বাজিয়ে চলল যতক্ষণ না পুরোপুরি ঠিক হচ্ছে।

"আমি ওর সাথে সেক্সের জন্য তৈরি ছিলাম," নাওকো বলল। ব্যারেট সরিয়ে চুলগুলো ছেড়ে দিল। আঙুলগুলো একসাথে করে প্রজাপতির মত করল। "আর অবশ্যই সে-ও আমার সাথে শুতে চেয়েছিল। আমরা চেষ্টা করেছিলাম। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কখনো কাজ হয়নি। আমরা সেক্স করতে পারিনি। আমি তখন জানতাম না, এখনও জানি না কেন পারিনি। আমি ওকে ভালোবাসতাম, সতীত্ব হারানোর ভয় আমার ছিল না। ও যা চাইত আমি সব কিছু করতে রাজি ছিলাম। কিন্তু কখনো কাজ করেনি।"

নাওকো ব্যারেট দিয়ে আবার চুল আটকালো।

"আমার শরীর সাড়া দেয়নি," আস্তে করে বলল সে। "ওর কাছে আমার শরীর উত্তেজিত হত না, তাই ব্যথা পেতাম। আমরা সবকিছু চেষ্টা করেছি—ক্রিম আর যা যা কিছু—কিন্তু তারপরেও ব্যথা পেতাম। তাই আমি ওর জন্য আমার হাত ব্যবহার করতাম, কিংবা ঠোঁট। ওভাবে সবকিছু করতাম। তুমি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি।"

আমি কোন কথা না বলে মাথা ঝাঁকালাম।

নাওকো জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরের চাঁদ এখন আগের চেয়েও বড় আর উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। "আমি কখনো এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাইনি," সে বলল। "আমি মনের ভেতর কোথাও লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম।

যদি পারতাম। কিন্তু কথা না বলে উপায় ছিল না। আমার কোন উত্তর জানা ছিল না। মানে ধরো, তোমার সাথে তো আমি বেশ উত্তেজিত হয়েছিলাম, তাই না?"

"হুম," আমি বললাম।

"সেদিন আমার বিশতম জন্মদিনের রাতে যে মুহূর্তে তুমি আমার অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিলে তখন থেকেই আমি উত্তেজিত ছিলাম। আমি চেয়েছিলাম তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরো। আমি চেয়েছিলাম তুমি আমাকে নগ্ন করে আমাকে স্পর্শ করো, আমাকে গ্রহণ করো। আমি আগে কখনো এমন অনুভব করিনি। কখনো না। কেন করিনি বলো তো? কেন এমন হল? আমি, আমি তো তাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসতাম।"

"আমাকে না," আমি বললাম, "তুমি জানতে চাইছো তুমি কেন আমার জন্য এমন অনুভব করলে যেখানে আমাকে ভালোবাসতে না?"

"আমি দুঃখিত," নাওকো বলল। "আমি তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য বলিনি, কিন্তু তোমাকে ব্যাপারটা বুঝতে হবে। কিজুকি আর আমার মধ্যে বিশেষ একটা সম্পর্ক ছিল। আমাদের যখন তিন বছর বয়স তখন থেকে আমরা একসাথে বড় হয়েছি। সবসময় একসাথে ছিলাম আমরা। সবসময় একে অপরের সাথে সবকিছু নিয়ে কথা বলেছি, একজন আরেকজনকে পুরোপুরি বুঝতাম। যখন সিক্সথ গ্রেডে ছিলাম তখন আমরা প্রথম চুমু খেয়েছি, খুবই চমৎকার ছিল ব্যাপারটা। প্রথম যখন আমার পিরিয়ড হয়, আমি ওর কাছে ছুটে গিয়েছিলাম আর বাচ্চার মত কাঁদছিলাম। আমি জানি না অন্য কাউকে ভালোবাসা কিভাবে সম্ভব।"

সে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে গ্লাস নিতে গেল কিন্তু ধাক্কা লেগে কার্পেটে ওয়াইনসহ গ্লাস পড়ে গেল। আমি লাফ দিয়ে গ্লাসটা তুলে টেবিলে রাখলাম। ও কি আরেকটু ওয়াইন চায়? আমি জিজ্ঞেস করলাম। নাওকো চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল। সারা শরীর কাঁপছিল ওর। সামনে ঝুঁকে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সে সেই রাতের মত। রেইকো গিটার রেখে নাওকোর পাশে গিয়ে হাত রাখল ওর পিঠে। যখন সে নাওকোকে জড়িয়ে ধরলো, নাওকো ওর বুকে মুখ রেখে কাঁদতে থাকল।

রেইকো আমাকে বলল, "আমার মনে হয় তুমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসো। ধরো বিশ মিনিটের জন্য? দুঃখিত, কিন্তু মনে হচ্ছে এর প্রয়োজন আছে।"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। শার্টের উপর একটা সোয়েটার পরে নিলাম। "সময়মত থাকার জন্য ধন্যবাদ," বললাম রেইকোকে।

"ব্যাপার না," সে চোখ টিপে বলল। "তোমার কোন দোষ নেই এখানে। চিন্তা কোরো না, যতক্ষণে তুমি ফিরে আসবে ততক্ষনে সে ঠিক হয়ে যাবে।"

আমার পা আমাকে রাস্তার দিকে টেনে নিয়ে গেল। চাঁদের অবাস্তব উজ্জ্বল আলোতে রাস্তা আর বন আলোকিত হয়ে আছে। এমন চাঁদের আলোর সাথে সব শব্দ কেমন যেন অদ্ভুত অনুরণন তুলছিল। আমার পা ফেলার ভোঁতা শব্দ মনে হচ্ছিল অন্য কোথাও থেকে আসছে। যেন অন্য কেউ হাঁটছে আর আমি সাগরের নিচ থেকে তা শুনতে পাচ্ছি। আমার পেছনে, কখনো কখনো পাতা মাড়ানোর শব্দ আসছিল। মনে হচ্ছিল নাটকের শেষ অংশ, বনের প্রাণীগুলো দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে কখন আমি তাদের কে পারো করে চলে যাবো।

রাস্তা যেখানে বাঁক নিয়ে গাছের সারির ভেতর দিয়ে চলে গেছে সেখানে বসলাম আমি। তাকিয়ে থাকলাম নাওকো যে বাড়িটায় থাকে সেদিকে। ওর রুম কোনটা তা সহজেই বোঝা যাচ্ছিল। একমাত্র যে জানালায় মৃদু আলো কাঁপছিল সেটাই। আমি একটানা সে আলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। মনে হচ্ছিল শেষ দম ফেলার আগে আত্মার ধুকধুকানি। যে কোন সময় নিভে যাবে। আমার মনে হচ্ছিল হাত দিয়ে ঢেকে রক্ষা করি। জে গ্যাটসবি যেভাবে ঐ পারের মৃদু আলোর দিকে তাকিয়ে ছিল, আমি সেভাবে মোমবাতির মৃদু আলোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আধঘন্টা পরে যখন ফেরত গেলাম, মেইন দরজার সামনে থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম রেইকো গিটার প্র্যাকটিস করছে। আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে শব্দ না করে ভেতরে গেলাম। নাওকোর কোন চিহ্ন নেই আশেপাশে। রেইক একা কার্পেটে বসা, গিটার বাজাচ্ছে। সে বেডরুমের দিকে হাত তুলে বোঝাল নাওকো ভেতরে। তারপর গিটার রেখে সে সোফায় গিয়ে বসে আমাকে ইশারা করল তার পাশে বসতে। আমরা বাকি যা ওয়াইন ছিল দু-জন দু গ্লাসে ভাগ করে নিলাম।

"নাওকো ঠিক আছে," আমার হাঁটুতে হাত রেখে বলল সে। "চিন্তা কোরো না, তার এখন শুধু একটু বিশ্রাম দরকার। তাহলেই সে শান্ত হয়ে আসবে, একটু উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে আমরা একটু হেঁটে আসলে কেমন হয়?"

"ভালো হয়," আমিও বললাম।

রেইকো আর আমি উজ্জ্বল রাস্তায় নেমে আসলাম। টেনিস আর বাস্কেটবল কোর্টের কাছে পৌঁছে আমরা একটা বেঞ্চে বসলাম। ও বেঞ্চের নিচ থেকে একটা বাস্কেট বল বের করে লুফালুফি করতে লাগল। আমাকে জিজ্ঞেস করল টেনিস খেলি কিনা। আমি জানালাম জানি কিভাবে খেলতে হয় কিন্তু বাজে খেলি।

"আর বাস্কেটবল?"

"বেশি ভালো না।"

"তুমি কিসে বেশি ভালো?" রেইকো চোখ কুঁচকে হেসে জিজ্ঞেস করল। "মেয়েদের সাথে বিছানায় খেলা ছাড়া?"

"সেটাতেও আমি সুবিধার না," ওর খোঁচা এড়িয়ে বললাম আমি।

"মজা করলাম। রাগ কোরো না। কিন্তু আসলেই তুমি ভালো কিসে?"

"তেমন কিছু নেই। কিছু জিনিস আছে যা করতে আমার ভালো লাগে।"

"যেমন?"

"হাইকিং ট্রিপ, সুইমিং, বই পড়া।"

"যেগুলো তুমি একা করতে ভালোবাস?"

"মনে হয়, আমার কখনো অন্যদের সাথে খেলতে মজা লাগে না। একদমই পারি না, আগ্রহ থাকে না।"

"তাহলে তোমার শীতে এখানে আসা উচিত। আমরা ক্রস কান্ট্রি স্কিইং করি। আমি নিশ্চিত তোমার ভালো লাগবে। সারাদিন ধরে বরফে স্কিইং, ভালো ঘামও হয়।" স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোয় রেইকো এমনভাবে নিজের ডান হাত পরীক্ষা করতে লাগল যেন সেটা কোন অ্যান্টিক বাদ্যযন্ত্র।

"নাওকোর কি প্রায়ই এরকম হয়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হয় মাঝে মধ্যে," রেইকো বলল বাম হাত পরীক্ষা করতে করতে। "মাঝে মধ্যে সে এরকম কান্না করে। কিন্তু এটা ভালো ওর জন্য। সে তার অনুভূতিগুলো বের হয়ে আসতে দিচ্ছে। বের হতে না দিতে পারাই বরং ভয়ের ব্যাপার। অনুভূতিগুলো তখন ভেতরে জমাট বেধে শক্ত হয়ে মরতে থাকে। তখন সমস্যা হয়।"

"আমি কি এমন কিছু বলেছি যা বলা উচিত ছিল না?"

"না, একদমই না। এ নিয়ে চিন্তা কোরো না। তুমি যা মন থেকে মনে করো, তাই বলবে। সততাই সবচেয়ে উত্তম পন্থা। হয়ত সত্যি কথা মাঝে মাঝে খারাপ লাগে, নাওকোর মত অবস্থা হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে এটাই সবচেয়ে ভালো। নাওকোকে যদি আবার ভালো দেখতে চাও তাহলে তোমার তাই করা উচিত। প্রথমে যেরকম বলেছিলাম, তুমি যদি ওকে সুস্থ করতে সাহায্য করতে চাও তোমার নিজেরও সাহায্য প্রয়োজন হবে। এভাবেই এখানে কাজ হয়। তাই যা সত্যি মনে আসবে এখানে যতদিন আছো অন্তত বলে ফেলবে। বাইরের দুনিয়ায় এভাবে কাজ হয় না মনে হয়, তাই না?"

"মনে হয় না," আমি বললাম।

"গত সাত বছরে আমি এখানে সব ধরনের মানুষ দেখেছি," রেইকো বলল। "সম্ভব একটু বেশিই দেখে ফেলেছি। তাই একজনের দিকে তাকিয়ে আমি নিজে থেকে বলে দিতে পারি সে সুস্থ হবে কি হবে না। কিন্তু নাওকোর ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। আমি একদমই জানি না ওর কপালে কি আছে। আমি যা বুঝি তা হল, হয় সে আগামি মাসেই একদম শতভাগ সুস্থ হয়ে যাবে অথবা বছরের পর বছর সে এভাবেই চলবে। তাই এই পরামর্শর বাইরে তোমাকে বলার মত আর কিছু নেই আমার কাছে। সৎ থাকো, একজন আরেকজনকে সাহায্য করো।"

"নাওকোর ব্যাপারটা কেন তোমার কাছে জটিল লাগছে?"

"আমি ওকে অনেক পছন্দ করি সে কারনে হয়তো। আমার আবেগ মাঝে চলে আসে বলে আমি ওরটা পরিস্কার করে দেখতে পাই না। সেটা বাদ দিলেও ওর অনেক আলাদা আলাদা সমস্যা আছে যেগুলো তারের মত একটা আরেকটার সাথে পেঁচিয়ে গেছে। ওগুলো ছুটাতে হয়তো অনেক সময় লেগে যাবে। অথবা হয়তো কোন সুইচে চাপ পড়ে সব একসাথে ছুটে যাবে। পুরো ব্যাপারটাই এরকম, তাই আমি ওকে নিয়ে নিশ্চিত হতে পারছি না।"

সে আবার বাস্কেটবল নিয়ে হাতে ঘুরিয়ে মাটিতে ড্রপ খাওয়াতে লাগল। "সবচেয়ে জরুরি হল ধৈর্য না হারানো," রেইকো বলল। "তোমার জন্য এটা আমার আরেকটা পরামর্শ। ধৈর্যহারা হলে চলবে না। এমনকি যখন সবকিছু এরকম গিট্টু লেগে যাবে আর তোমার কিছু করার থাকবে না, তখনও তাড়াহুড়ো করা যাবে না। তোমাকে বুঝতে হবে এটা অনেক সময়ের ব্যাপার, আর ধীরে কাজ করে যেতে হবে, একবারে একটা একটা করে। তোমার কি মনে হয় পারবে এভাবে?"

"চেষ্টা করবো," আমি বললাম।

"অনেক বেশি সময় লেগে যেতে পারে। বুঝো কিন্তু, সে হয়তো কখনো পুরোপুরি সুস্থ নাও হতে পারে। ভেবেছো কখনো?"

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

"অপেক্ষা অনেক কষ্টের," বল ড্রপ করতে করতে রেইকো বলল। "বিশেষ করে তোমার বয়সি কারোর জন্য। অপেক্ষা করবে কবে সে ঠিক হবে। কোন নিশ্চয়তা নেই, কোন তারিখ বেঁধে দেয়া নেই। তোমার কি ধারনা তুমি তা পারবে? তুমি কি নাওকোকে অতটা ভালোবাস?"

"আমি জানি না," সত্যিটাই বললাম। "নাওকোর মত আমি নিজেও জানি না আরেকজনকে ভালোবাসা কাকে বলে। যদিও সে অন্য কারনে বলেছে। আমি আমার সর্বচ্চো চেষ্টা করে যাবো, আমাকে করতেই হবে নাহলে আমি জানি না

আমি কী করবো। তুমি যেরকম বলেছো একটু আগে, আমাদের একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে হবে। নিজেদেরকে বাঁচানোর এটাই একমাত্র উপায় আমাদের।"

"আর তুমি মেয়ে ধরে ধরে শুতে থাকবে?"

"আমি জানি না সেটা নিয়েও কি করবো। তোমার কি মনে হয়? আমি অপেক্ষায় থাকবো আর মাস্টারবেট করবো? আমার সেখানেও নিজের উপর নিয়ন্ত্রন নেই।"

রেইকো বল মাটিতে রেখে আমার হাঁটুতে হাত রাখল। "শোন, আমি তোমাকে বলছি না মেয়েদের সাথে বিছানায় যেও না। তোমার যদি ভালো লাগে তাহলে ঠিক আছে। তোমার জীবন, সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। আমি শুধু বলতে চাইছি তুমি এমন কিছু কোরো না যেটার কোন মানে নেই। বুঝতে পারছো কি বলছি? নিজেকে নষ্ট কোরো না। উনিশ-বিশ বছর অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময় জীবনের। এই সময়ে যদি তুমি নষ্ট হয়ে যাও, পরে গিয়ে কষ্ট পাবে। সত্যি বলছি। ভেবেচিন্তে কাজ কোরো। যদি নাওকোর যত্ন নিতে চাও, নিজেরও যত্ন নিতে হবে তোমার।"

আমি বললাম আমি ভেবে দেখবো।

"আমার বয়সও একসময় বিশ ছিল। **কোন এক সময়। বিশ্বাস হয়?"**

"অবশ্যই বিশ্বাস হয়।"

"মন থেকে বলছো?"

"মন থেকে," হেসে বললাম আমি।

"আর আমি দেখতে কিউটও ছিলাম। নাওকোর মত জন্তুটা না, কিন্তু ছিলাম। আমার তখন মুখের এই ভাঁজগুলো ছিল না।"

আমি ওকে বললাম আমার ওর ভাঁজগুলো পছন্দ। সে ধন্যবাদ দিল আমাকে।

"আর কখনো ভুলেও কোন মেয়েকে বলবে না যে তার মুখের ভাঁজ তোমার পছন্দ," সে বলল। "আমার শুনতে খারাপ লাগে না, কিন্তু আমি আলাদা অন্যদের চেয়ে।"

"আমি সাবধান থাকবো এরপর থেকে," বললাম তাকে।

সে প্যান্টের পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে একটা ছবি দিল আমার হাতে। উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরা দশ বছর বয়সের কিউট পিচ্চি একটা মেয়ের রঙ্গিন ছবি। বরফের মধ্যে স্কি করার সরঞ্জাম পরে আছে। ক্যামেরার দিকে হাসি হাসি মুখ করা।

"সুন্দর না? আমার মেয়ে," রেইকো বলল। "গত জানুয়ারিতে সে আমাকে পাঠিয়েছে এই ছবি। সে এখন, মনে হয় ফোর্থ গ্রেডে পড়ে।"

"তোমার হাসি পেয়েছে সে," আমি বললাম ছবিটা ফিরিয়ে দিতে দিতে।

রেইকো ছবিটা ওয়ালেটে ভরে পকেটে রেখেদীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা সিগারেট ধরালো। "আমার একজন কনসার্ট পিয়ানিস্ট হওয়ার কথা ছিল। আমার মেধা ছিল, লোকজন সেটা ধরতেও পেরেছিল, যখন বড় হচ্ছিলাম, এটা নিয়ে হইচইও করেছিল। আমি অনেক প্রতিযোগিতা জিতেছিলাম, মিউজিক স্কুলে টপ গ্রেড পেতাম, পাশ করার পর আমার জার্মান পড়ার কথা ছিল। দিগন্ত পর্যন্ত কোথাও কোন মেঘের ছায়াও ছিল না। সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। ঠিক না থাকলে কেউ না কেউ ছিল ঠিক করার জন্য। কিন্তু তারপরেও একদিন কিছু একটা হল, আর সব কিছু উড়ে গেল। মিউজিক স্কুলের সিনিয়র ক্লাসে ছিলাম তখন, আর সামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা ছিল। আমি টানা প্র্যাকটিসের উপর ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার বাম হাতের কড়ে আঙুলে সাড়া পাচ্ছিলাম না। আমি জানি না কেন। আমি ম্যাসাজ করলাম, গরম পানিতে চুবিয়ে রাখলাম, কিছুদিন প্র্যাকটিস বন্ধ রাখলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ভয় পেয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটে গেলাম। তারা তাদের পক্ষে যা যা সম্ভব সব করল কিন্তু কোন লাভই হল না। আঙুলের কোন সমস্যা নেই, সব নার্ভ ঠিকই আছে তারা বলল। না নড়ার কোন কারণই নাকি নেই। সমস্যা সম্ভবত মানসিক। তারপর আমি সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে গেলাম, সে-ও কিছু করতে পারল না। সে ধারনা করল সম্ভবত প্রতিযোগিতার চাপ বেশি হয়ে এরকম হয়েছে। আমাকে বলল পিয়ানো থেকে কিছুদিন দূরে থাকতে।"

রেইকো জোরে টেনে তারপর ধোঁয়া ছাড়ল। এদিক ওদিক মাথা নাড়াল কিছুক্ষণ।

"তারপর আমি ইযুতে আমার নানিবাড়ি গেলাম বিশ্রামের জন্য। বুঝতে পারলাম আপাতত আমাকে ঐ প্রতিযোগিতার কথা ভুলে যেতে হবে। পিয়ানো থেকে একশ হাত দূরে থাকতে হবে। আরাম করতে হবে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পিয়ানো ছাড়া আর কিছু আমি চিন্তাও করতে পারছিলাম না। হয়তো আমার আঙুল আর কখনোই কাজ করবে না। কি নিয়ে বাঁচবো তাহলে আমি। এই এক চিন্তা আমার মাথায় ঘুরপাক খেতেই লাগল। অবাক হওয়ার কিছু নেই, তখন পর্যন্ত আমার জীবন বেড়েই উঠেছে পিয়ানোকে কেন্দ্র করে। আমার বয়স যখন চার তখন থেকে আমি বাজানো শুরু করেছি, আর বড় হয়েছি সারাক্ষন পিয়ানোর কথা ভেবেই। আর কোন কিছু না। আমি কখনো বাসার কাজ করিনি কারন

আঙুলের ক্ষতি হতে পারে। লোকজন আমাকে দাম দিত একটাই কারনে। পিয়ানো বাজানোতে আমার মেধার জন্য। সুতরাং এমন ভেবে বেড়ে ওঠা একজনের থেকে পিয়ানো সরিয়ে ফেললে আর কি থাকে? তারপর ধুপ! মাথার ভেতর সব দলা পাকিয়ে গেল। তারপর সব অন্ধকার।"

সে সিগারেট মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে আরো কয়েকবার মাথা নাড়াল।

"আমার কনসার্ট পিয়ানিস্ট হওয়ার স্বপ্ন ওখানেই শেষ। দু-মাস হাসপাতালে ছিলাম। হাসপাতালে যাওয়ার কিছু পরেই আমি আঙুল আবার নাড়াতে পারছিলাম। তাই আবার মিউজিক স্কুলে ফিরে ফিরে আমি পাশ করলাম। কিন্তু আমার ভেতরে কিছু একটা হারিয়ে গিয়েছিল। কোন একটা আলো বা শক্তি বা যাহোক নাই হয়ে গিয়েছিল–ভেতর থেকে উবে গিয়েছিল। ডাক্তার বলেছিল কনসার্ট পিয়ানিস্ট হওয়ার মত মানসিক শক্তি আমার নেই, তাই এই চিন্তা পুরোপুরি বাদ দিতে। তাই পাশ করার পর আমি বাসায় ছাত্র নিয়ে পিয়ানো শেখাতে লাগলাম। কিন্তু ভেতরে যে কষ্ট হচ্ছিল তা বর্ণনাতীত। যেন জীবন শেষ হয়ে গেছে। আমার বয়স তখন বিশের শুরুতে অথচ জীবনের সেরা অংশ ততদিনে শেষ। বুঝতে পারছো আমার অবস্থাটা? কত সম্ভাবনা ছিল আর একদিন হঠাৎ উঠে দেখি সব উধাও। কেউ আর হাততালি দেয় না, কেউ আর আমাকে নিয়ে হৈচৈ করে না, কেউ আর বলে না আমি কী দারুন! আমি দিনের পর দিন আশেপাশের বাচ্চাদের বেয়ের আর সোনাটিনা শেখাতে লাগলাম। খুব খারাপ লাগত, আমি সবসময় কাঁদতাম কি হারিয়েছি তা চিন্তা করে। আমার চেয়ে অনেক কম মেধাবি লোকজন শুনতে পেতাম প্রতিযোগিতায় জিতছে কিংবা হলে বাজাচ্ছে, কান্না থামাতে পারতাম না এসব শুনলে।

"আমার বাবা-মা পা টিপে টিপে হাঁটত যেন আমার সমস্যা না হয়। কিন্তু আমি জানতাম তারা কতখানি হতাশ আমার উপর। যেই মেয়েকে নিয়ে তারা গর্বিত ছিলে হঠাৎ করে সে এখন মানসিক হাসপাতাল ফেরত। তারা এমনকি আমাকে বিয়ে দিয়ে ভাগাতে পারছিল না। তুমি যখন কারো সাথে বাস করবে তুমি বুঝতে পারবে তারা কি ভাবছে। আমার ঘৃণা হত। আমি বাইরে যেতে ভয় পেতাম, লোকজন কি বলছে আমাকে নিয়ে সেটা নিয়ে ভয় পেতাম। সুতরাং আবার ধুপ! আবার মাথার ভেতর সব দলা পাকিয়ে গেল। আবারো সব অন্ধকার। তখন আমার বয়স ছিল চব্বিশ। সেইবার আমাকে সাত মাস মানসিক হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। এরকম জায়গায় নয়, একদম সাধারণ পাগলাগারদ। উঁচু দেয়াল, বন্ধ দরজা। পিয়ানো ছাড়া জঘন্য একটা জায়গা। আমি জানতাম না আমি কি করবো। আমি শুধু জানতাম আমাকে এই জায়গা

থেকে বের হতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সাত মাস: দীর্ঘ সাতটা মাস। তখন থেকেই আমার মুখে ভাঁজ পড়তে লাগল।"

রেইকো হাসল, ঠোঁটের এই কোণা থেকে ঐ কোণা পর্যন্ত টেনে।

"হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার কিছু পরেই আমার একজনের সাথে পরিচয় হল আর বিয়ে করে ফেললাম। সে আমার চেয়ে এক বছরের ছোট ছিল, উড়োজাহাজ তৈরির এক কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার ছিল। আর আমার ছাত্র ছিল। চমৎকার মানুষ। বেশি কথা বলতো না, কিন্তু সে উষ্ণ আর যত্নশীল ছিল। আমার কাছে সে প্রায় ছয় মাসের মত লেসন নিয়েছিল তারপর হঠাৎ একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করল তাকে বিয়ে করবো কিনা। একদম এভাবেই হয়েছিল–একদিন ক্লাসের পর আমরা চা খাচ্ছিলাম তখন। বিশ্বাস করতে পারো? আমরা কখনো ডেটে যাইনি, কখনো হাত পর্যন্ত ধরিনি। আমাকে পুরোপুরি অপ্রস্তুত অবস্থা ধরে ফেলল। আমি তাকে বললাম বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বললাম আমি তাকে পছন্দ করি, আমি মনে করি সে একজন চমৎকার মানুষ, কিন্তু কিছু কারনে আমার তাকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। সে জানতে চাইলো কারনগুলো। আমি তখন তাকে সব ইতিহাস জানালাম, কিছু লুকাইনি–আমি যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে দুবার মানসিক হাসপাতালে ছিলাম সেটা বললাম। সব কিছু বলেছি–কি কি কারন, আমার মানসিক অবস্থা, আবারো যে একইরকম হতে পারে, সব। সে বলল চিন্তা করার জন্য সময় চায়। আমি তাকে বললাম সে যত সময় খুশি নিতে পারে। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে ক্লাসে এসে সে জানাল বিয়ে করতে চায় আমাকে। আমি তাকে তিন মাস অপেক্ষা করতে বললাম। বললাম আমরা তিন মাস একজন আরেকজনকে চিনি। তিন মাস পর যদি সে মনে করে আমাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে এ নিয়ে তখন কথা হবে।"

তিন মাস আমরা প্রতি সপ্তাহে একবার ডেট করলাম। সব জায়গায় গেলাম, সব কিছু নিয়ে কথা বললাম, আমি ওকে অনেক পছন্দ করে ফেললাম। যখন ওর সাথে থাকতাম, আমার মনে হত আমি আমার জীবন ফিরে পেয়েছি। ওর সাথে একা থাকলে মুক্তির স্বাদ অনুভব করতাম। আমার সাথে যে ভয়াবহ ব্যাপারগুলো ঘটেছে তা একদম ভুলে যেতাম। কনসার্ট পিয়ানিস্ট হতে পারিনি তো কি হয়েছে, মানসিক হাসপাতালে ছিলাম তো কি হয়েছে? আমার জীবন তো শেষ হয়ে যায়নি। জীবনে এখনো অনেক সুন্দর জিনিস আমার দেখা বাকি। শুধু এই অনুভূতিটা দেয়ার জন্য হলেও আমি তার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। তিন মাস পর সে আমাকে আবার বিয়ের জন্য বলল। এবার আমি তাকে বললাম, 'তুমি যদি আমার সাথে বিছানায় যেতে চাও, আমার আপত্তি নেই, আমি কারো সাথে

কখনো শুইনি আর আমি তোমাকে অনেক পছন্দও করি। কিন্তু বিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। তুমি যদি আমাকে বিয়ে করো, আমার সব সমস্যার ভার তোমাকে নিতে হবে, তুমি ভাবতেও পারবে না কত ভয়াবহ হতে পারে সেটা।' "

"সে বলল তার কিছু আসে যায় না, সে আমার সাথে শুতে চায়নি, সে চেয়েছে বিয়ে করতে, আমার ভেতরে যা আছে তা ভাগাভাগি করে নিতে। শুধু বলার জন্য বলেনি, সে এটা মন থেকে চায়। সে হচ্ছে সেরকম মানুষ যে যা বলে মন থেকে বলে আর যা বলে তা করে ছাড়ে। সুতরাং আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি হলাম। আমার পক্ষে ওইটুকুই সম্ভব ছিল করা। আমরা বিয়ে করলাম। মনে নেই, সম্ভবত চার মাস পর সে তার বাবা-মায়ের সাথে আমাকে নিয়ে লড়াই করল, তাকে ত্যাজ্য করল তারা। তার পরিবার সিকোকু'র গ্রামের দিকে বাস করত। তারা আমার অতীত নিয়ে খোঁজ খবর করেছিল আর জেনে গেছিল যে আমি দুবার হাসপাতালে ছিলাম। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তারা আমাদের বিয়ের বিরুদ্ধে ছিল। যাহোক, আমাদের বিয়ের কোন অনুষ্ঠান হয়নি। আমরা স্রেফ ওয়ার্ড অফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করেছি আর দুই রাতের জন্য হাকোনে ট্রিপে গিয়েছিলাম। ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল আমাদের জন্য। আমরা সুখি ছিলাম। বিয়ের আগের দিন পর্যন্তও আমি কুমারি ছিলাম। আমার বয়স তখন পঁচিশ বছর! ভাবতে পারো?"

রেইকো দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বাস্কেটবল নিল হাতে।

"আমি ধরে নিয়েছিলাম যতক্ষণ আমি তার সাথে আছি, আমি ঠিক থাকবো," বলে চলল সে। "যতক্ষণ আমি ওর সাথে ছিলাম, আমার কোন সমস্যা ছিল না। আমাদের অসুস্থতার একটা বড় ব্যাপার হল বিশ্বাস করতে পারা। আমি যদি এই লোকের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেই, আমি ঠিক থাকবো। যদি আমার অবস্থা এক বিন্দুও খারাপ হয়–একটা স্ক্রু যদি ঢিলে হয়–সে টের পাবে আর ধৈর্য ও যত্নের সাথে সে ব্যবস্থা নেবে। স্ক্রু আবার শক্ত করবে, সব জড়িয়ে যাওয়া তার জায়গামত গুছিয়ে রাখবে। আমাদের যদি এরকম বিশ্বাস থাকে, আমাদের অসুস্থতা দূরে থাকে। আর নেই কোন ধুপ! আমি খুবই আনন্দিত ছিলাম! আমার এরকম মনে হত যেন কেউ আমাকে ঠান্ডা, উত্তাল সমুদ্র থেকে তুলে এনে কম্বল দিয়ে মুড়ে উষ্ণ বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। বিয়ের দুই বছর পরে আমাদের একটা বাচ্চা হল, আমার কোল পূর্ণ হল। আমি আমার অসুস্থতার কথা পুরোপুরি বুলে গেলাম। আমি সকালে উঠতাম, বাসার কাজ করতাম, বাচ্চার যত্ন নিতাম, স্বামী বাসায় ফিরলে তাকে খেতে দিতাম। একই কাজ দিনের পর দিন করতাম কিন্তু আমি এই নিয়েই সুখি ছিলাম। খুব সম্ভব এই সময়টাই ছিল আমার

জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্ত। কতবছর পর্যন্ত এরকম ছিল? অন্তত আমার একত্রিশ হওয়া পর্যন্ত মনে হয়। তারপর, হঠাৎ আবার, ধুপ! আবার ঘটল একই ঘটনা। আমি ভেঙে পড়লাম।"

রেইকো সিগারেট ধরালো। বাতাস ততক্ষনে বন্দ হয়ে গিয়েছিল। সিগারেটের ধোঁয়া সোজা উপরে গিয়ে রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল। তখনই আমি প্রথম খেয়াল করলাম আকাশ ভর্তি তারা।

"কিছু ঘটেছিল নাকি?" আমি জানতে চাইলাম।

"হ্যাঁ," বলল সে। "যা ঘটেছিল তা খুবই অস্বাভাবিক ছিল। যেন আমার জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছিল। এমনকি এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।" রেইকো খালি হাত দিয়ে কপালের পাশে ঘষতে লাগল। "আমি দুঃখিত, তোমাকে আমার কাহিনী জোর করে শোনাচ্ছি। তুমি এসেছো নাওকোকে দেখতে, আমার কাহিনী শুনতে নয়।"

"আমার শুনতে ভালোই লাগছে অবশ্য," বললাম তাকে। "তোমার কোন সমস্যা না হলে বাকিটুকুও শুনতে চাই।"

"ঠিক আছে," রেইকো বলল, "আমাদের মেয়ে যখন কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হল, আমি অল্প অল্প করে আবার বাজানো শুরু করলাম। অন্য কারো জন্য নয়, আমার জন্য। বাখ, মোজার্ট, স্কারলাটির ছোট ছোট পিস দিয়ে শুরু করলাম। স্বাভাবিকভাবেই এরকম বিশাল বিরতির পর বাজানোর মধ্যে যে আবেগ তা আসছিল না ঠিকমত। আগে যেভাবে আমার আঙুল চলত, সেভাবে চলছিল না। কিন্তু আমি উত্তেজিত ছিলাম যে আবার পিয়ানো বাজাতে পারছি। বাজাতে গিয়ে বুঝতে পারছিলাম মিউজিক আমি কি পরিমাণ ভালোবাসি, কি রকম ক্ষুধার্ত ছিলাম এর জন্য। নিজের জন্য বাজানো একটা চমৎকার ব্যাপার কিন্তু।"

"আগেও বলেছি, আমি যখন বাজানো শুরু করি, আমার বয়স তখন চার, কিন্তু তখন থাকে আমি কখনো নিজের জন্য বাজাইনি। আমি সবসময় চেষ্টা করেছি পরীক্ষায় পাশ করার জন্য, অ্যাসাইনমেন্টের জন্য, কিংবা কাউকে দেখানর জন্য। ওগুলাও গুরুত্বপূর্ণ যদি তুমি কোন বাদ্যযন্ত্রে ওস্তাদ হতে চাও। কিন্তু একটা বয়সের পর তুমি আসলে নিজের জন্য বাজাতে শুরু করবে। সেটাই আসল মিউজিক। সেটা বোঝার জন্য আমাকে কোর্স বাদ দিতে হয়েছে, একত্রিশ বছর পার করতে হয়েছে। আমি বাচ্চাকে কিন্ডারগার্টেনে পাঠিয়ে তাড়াহুড়ো করে বাসার কাজ শেষ করে এক-দুই ঘন্টা সময় বের করতাম পিয়ানো বাজানোর জন্য। এখন পর্যন্ত সব ভালো মনে হচ্ছে, তাই না?"

আমি সায় দিলাম।

"তারপর একদিন আমার প্রতিবেশী এক মহিলা আসল, যাকে আমি তেমন একটা চিনিও না, রাস্তায় দেখা হলে হাই-হ্যালো পর্যন্ত পরিচয়। আমাকে অনুরোধ করলেন তার মেয়েকে পিয়ানো শেখানোর জন্য। একই এলাকায় থাকলেও আমাদের বাসার মধ্যে দূরত্ব ভালোই, আর সেজন্যই হয়তো আমি তার মেয়েকে চিনতাম না। কিন্তু মহিলার বক্তব্য ছিল, তার মেয়ের আমার বাসার সামনে দিয়ে যায়, আমার পিয়ানো বাজানো শুনতে ভালোবাসে। সে নাকি আমাকে কয়েকবার দেখেছে, তারপর তার মাকে ধরেছে আমার কাছে পিয়ানো শেখার জন্য। সে মিডল স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে, আগেও কয়েকজনের কাছে শিখতে গেছিল কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি আর তাই এখন তার কোন শিক্ষক নেই।

"আমি তাকে মানা করে দিলাম। অনেক বছর না বাজানোয় আমার নিজেরই এখন প্রথম থেকে শুরু করতে হবে, সেখানে যে কয়েক বছর ধরে শিখছে তাকে শেখাতে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া আমি আমার বাচ্চার পেছনে যথেষ্ট ব্যস্ত ছিলাম। যদিও আমি এই মহিলাকে কিছু বলিনি কিন্তু আমার মনে হয় না যে কিছুদিন পর পর শিক্ষক বদলায় তাকে কেউ কিছু শেখাতে পারবে। মহিলা আমাকে অনুরোধ করল অন্তত একবার তার মেয়ের সাথে দেখা করতে। এই নাছোড়বান্দা মহিলা আমাকে সহজে ছাড়বেনা বুঝতে পেরে আমি রাজি হলাম তার মেয়ের সাথে দেখা করতে–স্রেফ দেখা করতে। তিনদিন পর মেয়েটা নিজে আমাদের বাসায় আসল। একদম সাক্ষাত পরীর মত ছিল সে দেখতে। আমি আমার জীবনে কখনো এত সুন্দর একটা ছোট মেয়ে দেখিনি। কালির মত গাড়, লম্বা, চকচকে কালো চুল ছিল তার। স্লিম, সুন্দর হাত পা, উজ্জ্বল চোখ, ছোট্ট নরম মুখ, দেখে মনে হত কারো হাতে বানানো। তার সাথে যখন দেখা হল আমি কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম, এত সুন্দর ছিল সে দেখতে। আমার সোফায় সে বসার সাথে সাথে যেন আমার লিভিং রুম বদলে কোন ঝকমকে পার্লার হয়ে গেল। ওর দিকে সরাসরি তাকানো যেত না, আমি আড় চোখে তাকাতাম। যাহোক সে দেখতে এরকম ছিল। আমি এখনও তার চেহারা স্পষ্ট মনে করতে পারি।"

রেইকো চোখ কুঁচকে ফেলল যেন সে সামনাসামনি দেখতে পাচ্ছে মেয়েটাকে।

"কফি খেতে খেতে আমরা পুরো এক ঘন্টা কথা বললাম। সবকিছু নিয়ে কথা বললাম : মিউজিক, তার স্কুল, সবকিছু। আমি পরিস্কার বুঝতে পারছিলাম সে খুবই স্মার্ট। সে জানে কিভাবে আলাপ চালিয়ে যেতে হয় তার একদম

পরিস্কার, সোজা বক্তব্য ছিল, আর ছিল লোকজনকে বশ করার জন্মগত ক্ষমতা। ভীতিকর ব্যাপার অবশ্যই। কি জন্য তাকে ভীতিকর মনে হত, তখন আমি বলতে পারতাম না। আমি খালি বুঝতে পারছিলাম সে ভীতিকর রকমের চালাক। কিন্তু ওর উপস্থিতিতে আমি আমার বিচার করার সাধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। এত বাচ্চা আর সুন্দর মেয়ে, আমার নিজেকে অপূর্ণ মনে হত, মনে হত আমার বিকৃত নোংরা মন হিংসায় তার বিরুদ্ধে অজুহাত বের করছে।"

রেইকো কয়েকবার তার মাথা ঝাঁকাল।

"আমি যদি ওর মত সুন্দর আর বুদ্ধিমতি হতাম, আমি আরও সাধারণ মানুষ হতাম। তুমি যদি এরকম সুন্দর আর বুদ্ধিমতি হতে পারো, আর কি দরকার তোমার বলো? তোমার কাউকে কষ্ট দেয়ার বা চারপাশের দূর্বল মানুষদের পিষে ফেলার কোন প্রয়োজন নেই কারন সবাই তো তোমাকে ভালোবাসবে। এরকম করার কোন মানে আছে?"

"সে তোমার সাথে খারাপ কিছু করেছে?"

"আমি বলতে চাই, সে পুরোপুরি বিকারগ্রস্ত একটা মিথ্যাবাদি ছিল। পুরোপুরি অসুস্থ ছিল সে। সে সব কিছু বানিয়ে বলতো। যখন সে কাহিনী বানাতো তখন সে নিজেও সেগুলো বিশ্বাস করত, আর কাহিনীর সাথে মেলানোর জন্য আশেপাশের অনেক কিছু অদল বদল করত। সে দ্রুত চিন্তা করতে পারত, তোমার থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে থেকে সব এমনভাবে সাজাত যে, তুমি ধরতেই পারবে না, তোমার মাথায়ই আসবে না, সে মিথ্যা বলছে। সবচেয়ে বড় কথা, কেউ এক বিন্দু সন্দেহ করবে না এরকম ছোট একটা সুন্দর মেয়ে সাধারণ ব্যাপার নিয়েও মিথ্যা কথা বলবে। আমি তো কোনই সন্দেহ করিনি। সে ছয়মাস ধরে আমাকে টনকে টন মিথ্যা কথা বলে গেছে যতদিন পর্যন্ত না আমি টের পেয়েছি কোথাও ঘাপলা আছে। সে সবকিছু নিয়ে মিথ্যা বলতো, আমার কখনো সন্দেহ হয়নি। আমি জানি আমার কথা অনেক আজব শোনাচ্ছে।"

"কি মিথ্যা বলতো সে?"

"আমি যখন বলেছি সবকিছু, তারমানে সবকিছু," রেইকো ঠাট্টার সুরে হাসল। "যখন লোকজন কোন কিছু নিয়ে মিথ্যা বলে, তাদের আরও কিছু মিথ্যা জোড়া দিতে হয় প্রথম মিথ্যের সাথে। এর একটা নাম আছে–মিথোম্যানিয়া। যখন মিথোম্যানিয়াকরা মিথ্যা বলে, সেগুলো সাধারণত নিরীহ ধরনের হয়, লোকজন বুঝতে পারে। কিন্তু এই মেয়েরটা সেরকম নয়। নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে চোখের পাতি না ফেলে গড়গড় করে কঠিন সব মিথ্যা বলে ফেলতে পারে। সে যা চায় তা পাওয়ার জন্য সবকিছু করতে পারে। তার মা বা কাছের

বন্ধুদের কাছে সে মিথ্যা বলতই না প্রায় কারন তারা সহজে ধরে ফেলবে। কিংবা হয়তো এমন সতর্কতার সাথে বলবে যেন ধরা না পড়ে কখনো। তারপরেও যদি ধরা পড়ে সে এমন অজুহাত বার করবে বা এমন করুণ সুরে কান্না শুরু করবে যে কেউ রাগ করতেই পারবে না।

"আমি এখনও জানি না কেন সে আমাকে বেছে নিয়েছিল। আমি কি তার আরেকজন শিকার ছিলাম নাকি তার মোক্ষ অর্জনের রাস্তা ছিলাম আমি জানি না। অবশ্য এখন কিছু আসে যায় না। এখন সব শেষ। এখন আমার অবস্থা এরকম।"

এরপর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

"সে তার মায়ের মত একই কথা বলল, যে সে বাসার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে বাজাতে শুনেছে, রাস্তায়ও দেখেছে কয়েকবার, তারপর আমাকে রীতিমত পূজা করা শুরু করেছে। সে আসলেই 'পূজা' শব্দটা ব্যবহার করেছিল। আমি লাল হয়ে গিয়েছিলাম শুনে। এরকম একটা পুতুলের মত মেয়ে আমাকে 'পূজা' করে! যদিও আমি মনে করি না এটা পুরোপুরি মিথ্যা ছিল। আমার বয়স তখন ত্রিশের কোঠায়, তা ঠিক, আমি হয়তো তার মত সুন্দরি ছিলাম না, বলার মত কোন প্রতিভা হয়ত আমার ছিল না, কিন্তু আমার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা ছিল যা তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, এমন কিছু যেটা হয়ত তার নিজের মধ্যে ছিল না। জানি না কি কিন্তু যাহোক না কেন, কোন একটা কারনে অবশ্যই তার আমার প্রতি আগ্রহ জন্মেছিল। বাড়িয়ে বলছি না, পেছনে তাকালে আমার এটা মনে হয় এখন।"

"না, আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাচ্ছো।"

"সে বলল সে আমাকে বাজিয়ে শোনাতে পারে কিনা। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সে বাখের একটা পিস বাজাল। ওর বাজানো সম্পর্কে বলা যায়...উমম ইন্টারেস্টিং ছিল। কিংবা হয়তো বলা উচিত অদ্ভুত ছিল? সাধারণ কিছু ছিল না। আবার নিখুঁত কিছুও ছিল না। সে কোন পেশাদার স্কুলে যায়নি, আর ভেঙে ভেঙে লেসন নিয়েছে, বলা যায় যা শিখেছে পুরোটাই নিজে নিজে শেখা। তার বাজানো শুনে বোঝা যাচ্ছিল তাকে কেউ প্রশিক্ষণ দেয়নি। কোন মিউজিক স্কুলের অডিশন হলে সে সোজা বাদ পড়ে যেত। তার বাজানোর নব্বই ভাগই ফালতু, দশ ভাগ ঠিক ছিল, আসল মিউজিক ছিল। আসল বাখ ছিল। তাই আমারও আগ্রহ জন্মাল ওর প্রতি। আমিও জানতে চেয়েছিলাম ওর ব্যাপারে।"

"বলাবাহুল্য এই দুনিয়ায় হাজার হাজার বাচ্চা আছে যারা ওর চেয়ে অনেক ভালোভাবে বাখ বাজাতে পারে। এমনকি বিশগুণ ভালও। কিন্তু তাদের

বাজানোর কোন অর্থ তাদের কাছে নেই। তারা ভেতরে শূন্য, ফাঁপা। এই মেয়ের বাজানো খারাপ ছিল, কিন্তু তার মধ্যে কিছু একটা ছিল যেটা আমার চোখে পড়েছিল, তার বাজানোর মধ্যে কিছু একটা। তাই আমি ভাবলাম ওকে সেখালে সময় নষ্ট হবে না। অবশ্য এটা ঠিক যে সে যে পর্যায়ে আছে সেখান থেকে পেশাদার পিয়ানিস্ট তৈরি করে আনা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমার মন বলছিল তাকে আমার মত একজন সুখি পিয়ানিস্ট হিসেবে তৈরি করা সম্ভব, তখন আমি যেরকম ছিলাম। আমি এখনও সেরকমই আছি, নিজের আনন্দের জন্য বাজাই। যদিও পড়ে বুঝেছি সেই আশার গুড়ে বালি ছিল। সে নিজের জন্য কিছু করা টাইপ ছিল না। সে খুব হিসাব নিকাশ করে কাজ করত আর এমন কিছু করত যাতে লোকজন মুগ্ধ হয়ে যায়। সে জানত তাকে কি করতে হবে, কি করলে লোকজন তাকে প্রসংসা করবে। আর সে একদম সেভাবেই বাজিয়েছিল যাতে আমার আগ্রহ হয় তার প্রতি। আমি নিশ্চিত সে এভাবেই বাজান প্র্যাকটিস করেছিল আমাকে ধরার জন্য, একদম হিসাব নিকাশ করে করেছিল সব। আমি এখন সব বুঝতে পারি।"

"তারপরেও এখনও আমার মনে হয়, তার বাজানোটা অসামান্য ছিল। আমি যদি আবারো শুনি তাহলে আবারো একইভাবে গায়ে কাঁটা দেবে প্রথমবার যেমন দিয়েছিল। ওর সব শয়তানির পরেও। তোমাকে বলছি, পৃথিবীটা খুবই আজব জায়গা।"

রেইকো শুকনো কাশি দিয়ে গলা পরিস্কার করল।

"তো তুমি তাকে ছাত্রি হিসেবে নিলে?" আমি জানতে চাইলাম

"অবশ্যই। সপ্তাহে একটা লেসন। শনিবার সকালে। শনিবার ওর স্কুল বন্ধ ছিল। সে কখনো ক্লাস মিস করতনা, কখনো দেরি করত না, একদম আদর্শ ছাত্রি ছিল। সে সবসময় তার লেসন প্র্যাকটিস করে আসতো। ক্লাস শেষে আমরা কেক খেতাম আর কিছুক্ষণ গল্প করতাম।"

এই পর্যায়ে এসে হঠাৎ রেইকোর কিছু একটা মনে পড়ল।

"আমাদের কি ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত নাঃ নাওকোর জন্য চিন্তা হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই ওর কথা ভুলে যাওনি, নাকি?"

"অবশ্যই না," আমি হেসে ফেললাম। "আমি তোমার গল্পে ঢুকে পড়েছিলাম।"

"তোমার যদি আগ্রহ থাকে শোনার তাহলে বাকিটা কালকে বলবো। লম্বা কাহিনী–একবারে বলা যাবে না।"

"তুমি দেখি আলিফ লায়লার সেহরাজাদি।"

"ঠিক বলেছো," হাসতে হাসতে বলল সে। "গল্পও শেষ হবে না, তুমিও টোকিও ফিরে যেতে পারবে না।"

আমরা আগের পথ ধরেই বনের মধ্যে দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গেলাম। মোমবাতি গলে আগুন নিভে গেছে। বেডরুমের দরজা খোলা ছিল, নাইট টেবিলের উপরের ল্যাম্প জ্বালানো ছিল। সেই আলো হালকাভাবে লিভিং রুমে এসে পড়ছিল। পা ভাঁজ করে সোফায় বসে ছিল নাওকো। পোশাক বদলে ঢিলে ঢালা, কলার ঘাড় পর্যন্তও ওঠানো নিল রঙের একটা নাইট-গাউন পরে ছিল সে।

রেইকো গিয়ে তার মাথায় হাত রাখল। "এখন ঠিক আছো?"

"আমি ঠিক আছি। সরি," আস্তে করে বলল নাওকো। তারপর আমার দিকে ঘুরে একইভাবে সরি বলল। "তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি, তাই না?"

"বেশি না...অল্প," হেসে বললাম তাকে।

"কাছে আসো," বলল সে। আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম। নাওকো আমার দিকে মুখ বাড়িয়ে দিল যেন কিছু বলতে চায় কানে কানে কিন্তু তারপর কানে চুমু খেল। "সরি," আবার বলল। এবার কানে কানে। তারপর আমার থেকে সরে বসল। "কখনো কখনো আমার এমন হয়। আমি দিশেহারা হয়ে যাই, বুঝতে পারি না কী হচ্ছে।"

"আমার এরকম সব সময়ই হয়," আমি বললাম।

নাওকো হেসে আমার দিকে তাকাল।

"তোমার সমস্যা না হলে আমি তোমার সম্পর্কে আরও জানতে চাই," বললাম তাকে, "এখানে তোমার জীবন কেমন, কি করো সারাদিন, অন্যরা কেমন...এইসব।"

নাওকো তার প্রতিদিনের রুটিন বলল অল্প অল্প করে ভাগ করে। সকাল ছয়টায় ঘুম থেকে ওঠে। অ্যাপার্টমেন্টে সকালের নাস্তা করে। পাখির ঘর পরিস্কার করে। তারপর ফার্মের কাজ করে। সে সব্জির দেখাশোনা করে। লাঞ্চের আগে কিংবা পড়ে এক ঘন্টা ডাক্তারের সাথে কথা বলে কিংবা গ্রুপ ডিসকাশনে বসে। বিকালে তার পছন্দের কোন কোর্স করে, কাজ বা স্পোর্টসের বাইরের। সে এখন পর্যন্ত অনেকগুলো কোর্স করেছে, ফ্রেঞ্চ, সূচিকর্ম, পিয়ানো, প্রাচীন ইতিহাস ইত্যাদি।

"রেইকো আমাকে পিয়ানো শেখায়," সে বলল। "সে গিটারও শেখায়। আমরা সবাই ছাত্র আবার শিক্ষকও। যার ফ্রেঞ্চ ভালো, সে ফ্রেঞ্চ শেখায়, যে সমাজ বিদ্য পড়েছে সে ইতিহাস শেখায়, আরেকজন সুই-সুতোর কাজ ভালো পারে সে সূচিকর্ম শেখায়, দারুন একটা স্কুল আছে এখানে। দুঃখের ব্যাপার আমি কিছুই পারি না তাই কাউকে কিছু শেখাতেও পারি না।"

"আমিও কিছু পারি না," বললাম।

"আমি কলেজে যে পরিশ্রম করেছি তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি করি এখানে। এখানে খাটতে ভালো লাগে।"

"রাতে খাওয়ার পর কি করো?"

"রেইকোর সাথে গল্প করি, বই পড়ি, গান শুনি। মাঝে মাঝে অন্যদের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে গেমস খেলি, এইসব আর কি।"

"আমি গিটার প্র্যাকটিস করি আর নিজের জীবনী লিখি," রেইকো বলল।

"জীবনী?"

"মজা করলাম," রেইকো হাসল। "আমরা দশটায় ঘুমাতে যাই। খুবই স্বাস্থ্যকর জীবনধারা, তাই না? আমরা একদম মরার মত ঘুমাই।"

আমি ঘড়ি দেখলাম। নয়টা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। "তার মানে একটু পরেই ঘুমের সময়।"

"সমস্যা নেই, আমরা আজকে একটু দেরি করে ঘুমাতে যাবো," নাওকো বলল। "কতদিন পর তোমাকে দেখলাম, অনেক কথা বলতে চাই। কথা বলো।"

"দুপুরে যখন একা ছিলাম, হঠাৎ আমার পুরনো কথা মনে পড়ছিল," আমি বললাম। "তোমার মনে আছে আমি আর কিজুকি হাসপাতালে গিয়েছিলাম তোমাকে দেখতে? সাগরতীরের হাসপাতাল। যতদূর মনে পড়ে হাই-স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষের কথা।"

"আমার বুকে অপারেশন হয়েছিল তখন," নাওকো হেসে বলল, "অবশ্যই মনে আছে। তুমি আর কিজুকি মোটর সাইকেলে চেপে এসেছিলে। তুমি আমার জন্য এক বাক্স চকলেট এনেছিলে, সব গলে একসাথে লেগে গিয়েছিল। অনেক শক্ত ছিল, খাওয়া যাচ্ছিল না। জানি না, মনে হচ্ছে সেই কত আগের কথা।"

"হুম, আসলেই। আমার মনে হয় তুমি তখন কবিতা লিখছিলে, বিশাল একটা কবিতা।"

"সব মেয়েই ঐ বয়সে কবিতা লেখে," নাওকো লাজুক সুরে বলল। "এতকিছু থাকতে কেন এটাই মনে পড়তে হল তোমার?"

"জানি না। সাগরের বাতাসের গন্ধ, করবীর সুবাস, কিছু বোঝার আগেই স্মৃতিটা হঠাৎ এসে হাজির হল। কিজুকি কি তোমাকে প্রায়ই দেখতে যেত হাসপাতালে?"

"মোটেই না। এই নিয়ে পরে আমাদের মধ্যে বিশাল যুদ্ধ হয়েছিল। সে নিজে একবার এসেছিল, তারপর তোমার সাথে একবার, ব্যাস ওইটুকুই। জঘন্য

ছিল ও। একবার এসেই বেশিক্ষণ বসতে পারেনি, দশ মিনিট মত ছিল। আমার জন্য কিছু কমলা এনেছিল আর কি কি জানি বলছিল কিছু বুঝিনি, আমাকে একটা কমলা ছিলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। হাসপাতাল সহ্য করতে পারত না ও," নাওকো হাসতে হাসতে বলল। "সে ওইরকম ছিল। মানে, কে হাসপাতাল পছন্দ করে বলো? সেজন্যই সবাই হাসপাতালে দেখতে যায়, রোগি যাতে ভালো অনুভব করে, নতুন শক্তি পায়। কিজুকি বুঝতো না ব্যাপারটা।"

"আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন সে খারাপ ছিল না কিন্তু, ওর মত নরমালই ছিল।"

"কারন তুমি সাথে ছিলে," নাওকো বলল। "সে সবসময় তোমার আশেপাশে থাকতে পছন্দ করত। সে তার এই দূর্বলতা ঢেকে রাখার চেষ্টা করত। কিন্তু আমি জানি সে তোমার খুব ভক্ত ছিল। সে তোমাকে তার ভালো দিক তুলে ধরেছিল। আমার সাথে সে ওরকম ছিল না। সব ছেড়ে দিত। মুড বদলাত অহরহ। এই এক মিনিট হাসিখুশি, পরের মিনিটেই আবার চুপচাপ। সবসময় এমন হত। যখন থেকে সে ছোট ছিল তখন থেকেই। অবশ্য নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করত সে।"

নাওকো সোফায় পা তুলে বসল।

"সে অনেক চেষ্টা করেছে, কাজ হয়নি তেমন। এর জন্য ও রেগেও যেত আবার মন খারাপও করত। ওর অনেক ভালো গুণ ছিল কিন্তু ও সেসবে ভরসা পেত না। 'আমার এটা করতে হবে, আমার ওটা বদলাতে হবে' সে সবসময় এরকম চিন্তা করত। বোকা কিজুকি!"

"তারপরেও," আমি বললাম, "যদি এটা সত্যি হয়, সে শুধু তার ভালো দিক আমাকে দেখানোর চেষ্টা করছে, তাহলে আমি বলবো সে সফল। আমি খালি তার ভালো দিকই দেখেছি।"

নাওকো হাসল। "সে জানলে খুশি হত। তুমি তার একমাত্র বন্ধু ছিলে।"

"আর কিজুকিও আমার একমাত্র বন্ধু ছিল," আমি বললাম। "ওর আগে বা পরে ওকে ছাড়া আর কেউ নেই যাকে কিনা আমি বন্ধু বলতে পারি।"

"সেজন্যই তোমাদের দু-জনকে একসাথে থাকতে দেখতে আমার ভালো লাগত। আমিও তখন খালি ওর সব ভালো দিক দেখতে পেতাম। আমরা তিনজন যখন একসাথে থাকতাম, তখনই কেবল আমি কোন দুশ্চিন্তা ছাড়া থাকতে পারতাম। আমার প্রিয় মুহূর্ত ছিল সে সময়গুলো। আমি জানি না তুমি কি মনে করো।"

"আমি চিন্তা করতাম তুমি কি ভাবছো," আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম।

"সমস্যা হচ্ছে এরকম কোন কিছু সারাজীবন চলতে পারে না," নাওকো বলল। "এরকম নিখুঁত বন্ধুত্ব বজায় রাখা অসম্ভব। কিজুকি জানত সেটা, আমিও জানতাম, তুমিও জানতে। ঠিক বলেছি না?"

আমি সায় দিলাম।

"সত্যি কথা বলতে কি," নাওকো বলে চলল, "আমি ওর দূর্বল অংশটাও পছন্দ করতাম। ওর ভালো অংশ যতটুকু পছন্দ করতাম, দূর্বল অংশও ততখানিই পছন্দ করতাম। ওর মধ্যে কোন হিংসা বা খুতখুতামি ছিল না। সে স্রেফ দূর্বল ছিল, ওইটুকুই। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, বিশ্বাস করেনি আমাকে। সে বলতো, আমরা তিন বছর বয়স থেকে একসাথে চলেছি, আমি তাকে ভালোভাবে চিনতাম, এতই ভালোভাবে চিনতাম, তার দোষ আর গুণ আলাদা করে ধরতে পারতাম না, আমার কাছে নাকি সব সমান মনে হত। আমার ব্যাপারেও তার ধারনা একই ছিল। অবশ্য সে আমার মন ধারনা বদলাতে পারেনি, আমি তাকে একইরকম ভালোবাসতাম, আর কারো প্রতি আগ্রহি ছিলাম না আমি।"

নাওকো একটু দুঃখিত হাসি দিয়ে আমার দিকে তাকাল।

"আমাদের ছোটবেলার সম্পর্কও অন্যরকম ছিল। যেন আমাদের শরীর কোথাও জোড়া লাগান ছিল। আমরা কখনো আলাদা হলে কোন ধরনের মাধ্যাকর্ষণ বলের টানে আবার একসাথে হয়ে যেতাম। খুবই স্বাভাবিক যে আমরা বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড হয়ে গেলাম। এনিয়ে চিন্তার কোন সুযোগ ছিল না বা বাছাই করারও কোন সুযোগ ছিল না। আমরা প্রথম চুমু খেয়েছিলাম বার বছর বয়সে। অন্তরঙ্গ সময় কাটাতে শুরু করেছি তের থেকে। আমি ওর রুমে যেতাম কিংবা সে আমার রুমে আসতো আর আমি হাত ব্যবহার করে ওকে সুখ দিতাম। আমাদের কখনো মনে হয়নি সাবধানতার দরকার আছে। সে যদি আমার স্তন কিংবা যোনি নিয়ে খেলতে চাইত, আমি কিছুই মনে করতাম না। সে যদি বীর্যপাত করতে চাইত, আমি খুশি মনে তাকে সাহায্য করতাম। আমি নিশ্চিত কেউ যদি আমাদের কাউকে বলতো যে আমরা ভুল করছি তাহলে আমরা অবাক হতাম। কারন আমরা কিছু ভুল করছিলাম না। আমরা তাই করছিলাম যা আমাদের করার কথা। আমরা একে অপরের দেহের সব অংশ চিনেছি। যেন আমরা যৌথভাবে দেহ দুটির মালিক। অন্তত আমি যা বললাম, আমরা এর বেশি কিছু করিনি, আমার ভয় ছিল আমি সন্তানসম্ভবা হয়ে যেতে পারি। আমরা জানতাম না কি করে সেটা না হওয়া যায় তাই কোথাও না কোথাও থামতেই হত। যাইহোক এই হল কাহিনী আমরা কিভাবে একসাথে বেড়ে উঠেছি, হাতে

হাত ধরে, একজন আরেকজনর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। বয়সন্ধিতে অন্যাদের যেরকম বদল হয়, অহংকার আসে, সেক্স এর বাপারে ধারনা হয়, আমাদের সেরকম কিছুই হয়নি। আমরা সেক্সের বাপারে খোলাখুলি ছিলাম, অহংকার ধরনের কিছু হয়নি, বা হলেও একজন আরেকজনের মধ্যে মিশে গেছে বুঝতেও পারিনি কিছু। বুঝতে পারছো কি বলছি?"

"মনে হয়," আমি বললাম।

"আমরা আলাদা হয়ে থাকতে পারতাম না। সুতরাং কিজুকি বেঁচে থাকলে আমি নিশ্চিত আমরা একসাথেই থাকতাম, একজন আরেকজনকে ভালোবাসতাম, আর আস্তে আস্তে অসুখি হয়ে পড়তাম।"

"অসুখি মানে? অসুখি কেন?"

"কারন যা পাওনা তা পৃথিবীকে ফিরিয়ে দিতে হবে," সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল। "বেড়ে ওঠার মূল্য। আমরা সে মূল্য পৃথিবীকে দেইনি। বাকি পড়ে গেছে। সেজন্যই কিজুকি যা করার করেছে, আর আমি এখানে এসে পড়েছি। মরুভূমিতে নগ্ন বেড়ে ওঠা বাচ্চা-কাচ্চার মত ছিলাম আমরা। খিদে পেলে কলা জোগাড় করেছি, একাকিত্ব অনুভব করলে একজন আরেকজনের কোলে ঘুমিয়েছি। কিন্তু রকম কোনকিছু সারাজীবন থাকতে পারে না। আমরা তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছিলাম আর সমাজে ঢোকা জরুরি ছিল, তাই তুমি এত গুরুত্বপূর্ণ ছিলে আমাদের কাছে। বাইরের দুনিয়ার সাথে আমাদের একমাত্র যোগাযোগ ছিলে তুমি। আমরা তোমাকে দিয়ে বাইরের দুনিয়ায় মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত কাজ হয়নি।"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম।

"আমি চাই না তুমি ভাব, তোমাকে আমরা ব্যবহার করেছি, কিজুকি তোমাকে সত্যি পছন্দ করত। সৌভাগ্যক্রমে বাইরের দুনিয়ার সাথে আমাদের প্রথম সম্পর্ক হয়ে গেল তোমার সাথে সম্পর্ক। আর কিজুকি যেমন তোমাকে পছন্দ করতে, আমিও করি। আমরা কখনো তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি, কিন্তু মনে হয় দিয়ে ফেলেছি। শেষ পর্যন্ত তোমার ভেতর গভীর একটা ক্ষত তৈরি হয়ে গেছে। আমরা কখনো ভাবিনি এমন হবে।"

নাওকো মাথা নিচু করে চুপ হয়ে গেল।

"এক কাপ কোকোয়া হলে কেমন হয়?" রেইকো প্রস্তাব করল।

"ভালো হয়, আমিও চাই একটু," বলল নাওকো।

"তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে আমি বরং একটু ব্র্যান্ডি খেতে চাই," আমি বললাম।

“কোন সমস্যা নেই,” রেইকো বলল। “আমি এক ঢোক খেতে পারি?”

“নিশ্চয়ই,” হেসে বললাম।

রেইকো দুটো গ্লাস আনলো, আমরা টোস্ট করলাম। তারপর সে রান্নাঘরে গেল কোকোয়া বানাতে।

“আমরা কি একটু মজার কোন কিছু নিয়ে কথা বলতে পারি না?” নাওকো বলল।

মজার কিছু বলার মত আমি খুঁজে পেলাম না। শুধু যদি স্টর্ম ট্রুপার এখনো থাকত, আমি ভাবলাম! অনেকগুলো গল্প পাওয়া যেত। এরমধ্যে অবশ্যই কিছু থাকতো যাতে সবাই মজা পেত। সুতরাং সবচেয়ে ভালো যা বলার মত পেলাম তা হল ডরমের ছেলেপেলের নোংরা অভ্যেসগুলোর কথা বলা। জঘন্য ব্যাপারগুলো বলতে আমার গা গুলালেও, নাওকো আর রেইকো রীতিমত হাসতে হাসতে পড়ে গেল, এইসবই তাদের কাছে নতুন। এরপর রেইকো অন্য মানসিক রোগিদের অভিনয় করে দেখাল। ওইটাও মজার ছিল। এগারোটার দিকে নাওকোকে ঘুম ঘুম লাগছিল, তাই রেইকো সোফা টেনে বিছানা করল আর আমাকে বালিশ, চাদর আর কম্বল দিল ঘুমানোর জন্য।

“তোমার যদি মাঝরাতে উঠে ধর্ষণ করতে ইচ্ছে হয়, ভুলজনকে করতে যেও না,” রেইকো বলল। “বাম দিকের বিছানাটা নাওকোর।”

“মিথ্যে কথা! আমার বিছানা ডান দিকে,” নাওকো বলল।

রেইকো যোগ করল, “যাহোক, কালকের দুপুরের রুটিনে কিছু অদল বদল করেছি আমি আমাদের জন্য। আমরা তিনজন পিকনিকে গেলে কেমন হয়? কাছাকাছি একটা সুন্দর জায়গা চেনা আছে আমার।”

“দারুন আইডিয়া,” আমি বললাম।

মেয়েরা তাদের দাঁত ব্রাশ করে বেডরুমে ফিরে গেল। আমি এক ঢোক ব্র্যান্ডি খেয়ে বিছানায় চিতপটাং হলাম। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যা যা হল তা নিয়ে ভাবছিলাম। অনেক বড় একটা দিন ছিল। চাঁদের আলোতে সাদা হয়ে ছিল ঘরটা। মাঝে মাঝে বিছানার হালকা চড়চড় শব্দ ছাড়া নাওকো রেইকোর বেডরুম থেকে কোন শব্দই আসছিল না। চোখ বন্ধ করলাম, মনে হচ্ছিল অন্ধকারের ভেতর ছোট ছোট নকশার মত কিছু ভাসছে, আর রেইকোর গিটারের সুর তরঙ্গ যেন এখনও পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। কিন্তু বেশিক্ষণ এরকম হল না, ঘুম এসে আমাকে মনে হল উষ্ণ কাদার স্রোতের মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। স্বপ্নে দেখলাম উইলো। হালকা বাতাস বইছে, কিন্তু উইলোর ডাল নড়ছিল না। কেন? আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, আর তখন দেখলাম সব গাছের সব ডালে ছোট

ছোট পাখি বসা। তাদের ওজনে ডাল নড়ছে না। আমি একটা কাঠি তুলে কাছের ডালে বাড়ি দিলাম, যাতে পাখি উড়ে যায় আর ডাল নড়তে পারে। কিন্তু তারা উড়ে গেল না। ওড়ার বদলে তারা ধাতুর দলাতে পরিণত হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

যখন আমি চোখ খুললাম, মনে হল স্বপ্ন শেষ হয়নি। চাঁদের আলোতে ঘর তখনও একইভাবে আলোকিত হয়ে আছে। আমি চট করে উঠে বসলাম, ধাতুর পাখিগুলো খুঁজতে লাগলাম আশেপাশে। অবশ্যই কিছু ছিল না। এর বদলে দেখলাম নাওকো বিছানার পায়ের কাছে বসা, জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। হাঁটু ভাঁজ করে তার উপর থুতনি রাখা, মনে হচ্ছিল কোন ক্ষুধার্ত এতিম বসে আছে। আমি বালিশের পাশে আমার ঘরিটা খুঁজলাম কিন্তু যেখানে রেখেছিলাম সেখানে সেটা নেই। চাঁদের আলোর কোণ দেখে আন্দাজ করলাম রাত দুই কিংবা তিনটা বাজে। আমার অনেক পিপাসা পেল কিন্তু আমি সব বাদ দিয়ে নাওকোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আগে যখন দেখেছিলাম, সেই একই নীল নাইট গাউন পরেছিল সে। চুলের এক পাশ ব্যারেট দিয়ে বাঁধা। প্রজাপতি ওয়ালা ব্যারেট। সুন্দর মুখের একপাশে চাঁদের আলো পড়ছিল। অদ্ভুত, আমি ভাবলাম। ঘুমাতে যাওয়ার আগে সে নিশ্চয়ই ব্যারেট খুলে রেখেছিল।

নাওকো বরফের মত অনড় হয়ে বসে ছিল। যেন চাঁদের আকর্ষণে ছোট্ট একটা নিশাচর প্রাণী আটকা পড়েছে। ঠোঁটের উপর আলো পড়ে এমন একটি আবছায়া তৈরি করেছিল যে মনে হচ্ছিল অন্ধকারে ফিসফিস করছে।

তৃষ্ণা মেটানোর উদ্দেশ্যে আমি ঢোক গিললাম, রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে ঢোক গেলার শব্দ বেশ জোরেই শোনা গেল। নাওকো উঠে দাঁড়াল, প্রায় ভেসে বিছানার মাথার দিকে এগিয়ে এল সে। বালিশের কাছে এসে জোরে বসল, চোখ আমার উপর স্থির। আমিও তাকালাম, ওর চোখে কোন ভাষা খুঁজে পেলাম না। স্বচ্ছ চোখগুলো যেন অন্য জগতে প্রবেশ করার প্রবেশদ্বার, কিন্তু আশ্চর্য, যখন গভীরে তাকালাম, কিছুই দেখা গেল না। আমাদের দু-জনের মুখের মধ্যে দূরত্ব হয়ত দশ ইঞ্চিও ছিল না, কিন্তু মনে হচ্ছিল সে যেন আমার থেকে আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে।

কাছে গিয়ে নাওকোকে ছোঁয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে পিছিয়ে গেল। তার ঠোঁট কাঁপছিল। এক মুহূর্ত পরে আস্তে আস্তে তার গাউনের বোতাম খুলতে লাগল সে। আমার মনে হচ্ছিল আমার স্বপ্ন তখনও চলছে। ওর লম্বা সুন্দর আঙুলগুলো আস্তে আস্তে উপর থেকে শুরু করে একটার পর একটা বোতাম খুলতে লাগলো। সাতটা ছোট ছোট সাদা বোতাম। তারপর গাউনটা কাঁধ থেকে

খসে পড়তে দিল। অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলল যেন কোন পোকা গায়ের উপর এসে পড়েছিল। গাউনের নিচে আর কিছু ছিল না। ওর পড়নে শুধু ছিল মাথার ব্যারেট। বিছানার পাশে সম্পুর্ন নগ্ন দাঁড়িয়ে সে আমাকে দেখতে লাগলো। কামনায় পরিপূর্ন তার চকচকে নগ্ন দেহ চাঁদের কোমল আলোয় স্নান করে নিচ্ছিল। তার প্রতিটি নড়া চড়া এক ধরণের অদ্ভুত আলো-ছায়ার খেলার সৃষ্টি করছিল। তার সুগঠিত গোলাকার স্তন, ছোট ছোট স্তনবৃন্ত, নাভির খাঁজ, তার নিতম্ব আর গুপ্তকেশ, সব একসাথে এমন একটি ছায়া তৈরি করেছিল যেরকমটি শান্ত পুকুরে ঢিল পড়লে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।

কি অপূর্ব নিখুঁত দেহ! আমি মনে মনে ভাবলাম। কবে নাওকোর দেহ এরকম সুন্দর এরকম নিখুঁত হল? গত বসন্তে আমি তার যে দেহ দেখেছিলাম, সেটা কোথায় গেল?

সে রাতে নাওকো যখন কাঁদছিল আর আমি তাকে নগ্ন করে দিচ্ছিলাম তখন তো এরকম নিখুঁত মনে হয়নি। তার স্তন ছিল শক্ত, স্তনবৃন্তগুলো বেরিয়ে ছিল, নিতম্ব ছিল দৃঢ়। সে সুন্দরি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার দেহও ছিল অসামান্য রকমের আকর্ষণীয়। সেই রাতে সে আমাকে যথেষ্ট উত্তেজিত করে তুলেছিল, উত্তেজনায় আমি একরকম ভেসে গিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরেও তাকে জড়িয়ে ধরে যখন চুমু খাচ্ছিলাম তখন কেমন যেন অস্বাভাবিকতা অনুভব করছিলাম। নাওকোকে জড়িয়ে ধরে বলতে চাইছিলাম, "এই মিলন, কিছু আসে যায় না এসবে। আমরা যা বলছি বা যা করছি তা হল স্রেফ দুটি অপরিপূর্ণ মাংস পিন্ডের ঘষাঘষি। এসব করে শুধুই নিজেদের অপূর্ণতা ভাগাভাগি করছি আমরা।" কিন্তু কিছু বলিনি। আশংকা ছিল সে বুঝবে না। আমি শুধু ওকে শক্ত করে ধরে ছিলাম। আর তখন অনুভব করেছি তার শরীরের ভেতর শক্ত, অস্বাভাবিক, অপরিচিত কিছু একটা। এমন কিছু একটা যা আমাকে দূরে ঠেলে রেখেছিল। আর সেই অনুভূতি একই সাথে আমাকে উত্তেজিত করেছিল বিপুলভাবে, আবার নাওকোর প্রতি আমার হৃদয়কে পরিপূর্ণও করে তুলেছিল।

এখন নাওকোর যে শরীর আমার সামনে উন্মুক্ত, সে রাতের সাথে এর কোন মিল নেই। মনে হচ্ছিল চাঁদের আলোয় পুরনো দেহ বদলে গিয়ে নতুন নিখুঁত দেহে পরিণত হয়েছে। এ দেহ এখন একজন পরিপূর্ণ নারীর দেহ। আমি শুধু বিস্মিত হয়ে চেয়ে আছি, বুক থেকে নিতম্ব কি দারুন বাঁকে সুগঠিত, গোল ভরাট স্তন, নিঃশ্বাসের তালে তালে মেদহীন পেটের উঠানামা, আর নিচে কোমল, কালো গোপন ছায়া।

প্রায় পাঁচ মিনিটের মত সম্পুর্ন নগ্ন দেহে দাঁড়িয়ে থেকে গাউন দিয়ে আবার

ঢেকে বোতাম লাগিয়ে নিল সে। শেষ বোতাম লাগানো হতেই আবার ভেসে তার রুমের দিকে উড়ে গেল। শব্দহীনভাবে দরজা খুলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি একইভাবে বসে থাকলাম না জানি কতক্ষন, তারপর মনে হল বিছানা ছেড়ে ওঠার কথা। মেঝে থেকে হাতঘড়ি তুলে চাঁদের আলোয় সময় দেখলাম। তিনটা চল্লিশ। রান্নাঘরে গিয়ে কয়েক গ্লাস পানি খেলাম। তারপর আবার বিছানায় ফিরে গেলাম। কিন্তু সকাল হওয়ার আগে আর ঘুম আসলো না। সূর্যের আলো ঘরে ঢুকে চাঁদের আলোর সব ছাপ মুছে ফেলল। আমি ঝিমাচ্ছিলাম, রেইকো কানের কাছে এসে "সকাল হয়ে গেছে! সকাল হয়ে গেছে!" চিৎকার করতেই লাফিয়ে উঠলাম।

রেইকো যখন আমার সোফা-বেড গোছাচ্ছিল, নাওকো ততক্ষনে রান্নাঘরে নাস্তা বানানো শুরু করে দিয়েছে। আমার দিকে হেসে বলল, "গুড মর্নিং।" "গুড মর্নিং" আমি উত্তর দিলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাওকোর কাজ দেখতে লাগলাম। সে গুনগুন করতে করতে পানি গরম করতে দিল, ব্রেড স্লাইস করল। তার হাবভাবে আমি কোন চিহ্ন পেলাম না গত রাতের ঘটনার।

"তোমার চোখ লাল হয়ে আছে," কফি ঢালতে ঢালতে বলল, "ঠিক আছো তো?"

"মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেছিল আর ঘুম আসেনি।"

"বাজি ধরে বলতে পারি আমরা তখন নাক ডাকছিলাম," রেইকো বলল।

"একদমই না," আমি বললাম।

"তাহলে ভালো," নাওকো বলল।

"ও আসলে ভদ্রতা করে বলছে," হাই তুলতে তুলতে বলল, রেইকো।

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম নাওকো রেইকোর সামনে এড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রেইকো রুম থেকে বের হয়ে গেলেও তার কথায় কোন বদল দেখা গেল না। তার চোখ বরাবরের মতই স্বচ্ছ।

"তোমার ঘুম কেমন হয়েছে?" আমি প্রশ্ন করলাম নাওকোকে।

"কুকুরের মত," সহজ উত্তর দিল সে। অলঙ্কার বলতে শুধু একটা হেয়ারপিন পরে ছিল।

আমি কী বলবো বুঝতে না পেরে ব্রেডে বাটার লাগালাম, সিদ্ধ ডিমের খোসা আলাদা করলাম। আড়চোখে নাওকোর দিকে তাকালামও কোন ইশারা দেয় কিনা।

"তুমি এভাবে চোরের মত আমার দিকে তাকাচ্ছো কেন?" হাসতে হাসতে জানতে চাইলো সে।

"আমার ধারনা ও কারো প্রেমে পড়েছে," বলল রেইকো।

"তুমি কারো প্রেমে পড়েছো নাকি?" জানতে চাইলো নাওকো।

"পড়তেও পারি," আমিও হেসে বললাম। যখন ওরা দু-জন আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করা শুরু করল, আমি গতরাতের চিন্তা বাদ দিয়ে ব্রেড আর কফিতে মন দিলাম।

নাস্তার পর রেইকো আর নাওকো বলল তারা বার্ড হাউজে যাবে পাখিগুলোকে খাওয়াতে। আমিও সাহায্য করতে যেতে চাইলাম। তারা তাদের পোশাক বদলে জিন্স আর ওয়ার্ক শার্ট পরল, সাথে রাবারের বুট।

বার্ড হাউজটা টেনিস কোর্টের পেছনের ছোট পার্কটার ভেতর। মুরগি, কবুতর থেকে শুরু করে টিয়া, ময়ুর সব ছিল। আশেপাশে ফুলের বাগান, স্ট্রবেরি আর কিছু বেঞ্চ। চল্লিশের মত বয়সের দু-জন লোক চলার রাস্তা থেকে পাতা পরিস্কার করছিল। একজন মহিলা হেঁটে যেতে যেতে গুড মর্নিং জানালে রেইকো তার আরেকটা কৌতুক বলে হাসাল। ফুলের বাগানে কসমস ফুটে ছিল। স্ট্রবেরিগুলো যত্ন করে পরিস্কার করা। রেইকোকে দেখে পাখিগুলো চেঁচামেচি শুরু করে খাঁচার ভেতর উড়তে লাগল।

এক ব্যাগ খাবার আর হোসপাইপ নিয়ে মেয়েরা ঢুকল খাঁচার ছাউনির ভেতরে। নাওকো হোসপাইপ কলে লাগিয়ে দিল। পাখি যাতে বের না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রেখে ওরা ঢুকল খাঁচার মধ্যে। নাওকো পানি চালিয়ে দিয়ে ময়লা ধুচ্ছিল আর রেইকো ব্রাশ দিয়ে মেঝে ঘষে দিচ্ছিল। সূর্যের আলোয় পানি ছিটকে ঝলমল করে উঠল। ময়ুরগুলো খাঁচার কোনায় চলে গেল পানি এড়াতে। একটা টার্কি মাথা উঁচিয়ে খামখেয়ালি বুড়োর মত আমাকে দেখতে লাগল। অন্যদিকে একটা টিয়া বিরক্ত হয়ে ডানা ঝাপটাতে লাগল। রেইকো টিয়ার দিকে মিয়াঁও শব্দ করল, টিয়া উত্তর দিল,"ধন্যবাদ, পাগল কোথাকার, মাথা মোটা!"

"কে যে পাখিটাকে এই বাজে কথা শিখিয়েছে," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল নাওকো।

"আমি নই," বলল রেইকো। "এরকম কিছু আমাকে দিয়ে হবে না," সে আবার মিয়াঁও মিয়াঁও করতে লাগলে টিয়াটা চুপ করে গেল।

রেইকো হাসতে হাসতে ব্যাখ্যা করল, "এই টিয়া বাবাজির সাথে একবার এক বিড়ালের লেগেছিল, তারপর থেকে সে বিড়াল অনেক ভয় পায়।"

পরিস্কার করা হয়ে গেলে ওরা ওদের জিনিসপত্র রেখে ফিডারগুলো খাবার দিয়ে ভরে দিল। দৌড়ে নিজের ফিডারে গিয়ে মাথা ডুবিয়ে খেতে শুরু করল টার্কিটা। কোন দিকে হুঁশ নেই ওটার।

"তোমরা কি প্রতি সকালেই একই কাজ করো?" আমি নাওকোকে জিজ্ঞেস করলাম।

"প্রতিদিন!" সে বলল। "তারা সাধারণত এই কাজটা নতুন মেয়েদের দেয়। অনেক সহজ তো। খরগোশগুলো দেখবে?"

"অবশ্যই," আমি বললাম।

খরগোশের খাঁচা বার্ড হাউজের পেছনেই। ভেতরে দশটার মত খরগোশ খড়ের উপর পড়ে ঘুমাচ্ছে। নাওকো ওদের নোংরা ঝাড়ু দিয়ে বের করল। খাবারে বাক্সে খাবার রাখল, একটা বাচ্চা তুলে গালের সাথে ঘষতে লাগল।

"কি দারুন না?" সে আমাকে দিল ধরতে। ছোট্ট একটা পশমের বল, আমার হাতে নাক ঘষতে লাগল।

"ভয় পেও না, ও তোমাকে ব্যথা দেবে না," খরগোশটাকে বলল ও। আঙুল দিয়ে বাচ্চাটার মাথা ঘষে দিতে দিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। ওর হাসি এত প্রাণবন্ত ছিল, কোন ছায়া ছিল না, আমিও না হেসে পারলাম না। আর গত রাতের নাওকো? আমি অবাক হয়ে ভাবলাম। আমি নিশ্চিত, কোন স্বপ্ন ছিল না, আসল নাওকোই ছিল সে। অবশ্যই সে তার পোশাক খুলে আমাকে নগ্ন দেহ দেখিয়েছিল।

রেইকো শিষ দিয়ে *প্রাউড মেরি* তুলে একটা ভিনাইল ব্যাগে জড়ো করা সমস্ত নোংরা ভরে ব্যাগের মুখ বাধল। আমি ওদেরকে সাহায্য করলাম জিনিসপত্র আর খাবারের ব্যাগ ছাউনির ভেতর নিয়ে যেতে।

"আমার কাছে দিনের সবচেয়ে ভালো লাগে সকালটা," নাওকো বলল। "সব কিছু সজীব আর নতুন মনে হয়। দুপুর থেকে আমার মন খারাপ হতে শুরু করে, সূর্য ডুবলে আর ভালো লাগে না। প্রতিদিন একইরকম লাগে আমার।"

"আর এরকম লাগতে লাগতেই তোমরা জওয়ানরা একদিন আমার মত বুড়ো হয়ে যাবে," রেইকো হাসিমুখে বলল। "এখন তোমরা ভাবছো দিন রাত নিয়ে হঠাৎ দেখবে তোমরা বুড়ো।"

"কিন্তু তোমার তো বুড়ো হওয়া ভালো লাগে," নাওকো বলল।

"ঠিক তা নয়, কিন্তু অবশ্যই আমি জওয়ান হতে চাই না আবার।"

"কেন নয়?" আমি জানতে চাইলাম।

"কারন সেটা ঘাড় ব্যথার মত মনে হয়," সে বলল। তারপর ঝাড়ু রেখে ছাউনির দরজা লাগিয়ে দিল শিষ দিয়ে *প্রাউড মেরি* বাজাতে বাজাতে।

অ্যাপার্টমেন্টে ফেরত আসার পর ওরা রাবার বুট বদলে টেনিস শু পরে নিল। বলল ওরা এখন ফার্মে যাচ্ছে। রেইকো বলল আমাকে এখানেই থাকতে,

বই-টই পড়তে কারন ফার্মে গিয়ে আমি কোন মজা পাবো না আর ওখানে ওরা গ্রুপে কাজ করে।

"আরেকটা কাজ করতে পারো, আমরা আমাদের নোংরা আন্ডারওয়্যারগুলো সিঙ্কের নিচে রেখেছি, ওগুলো ধুয়ে ফেলতে পারো," সে বলল।

"মজা করছো," আমি পিছিয়ে গিয়ে বললাম।

"অবশ্যই," সে হাসতে লাগল। "ইউ আর সো সুইট। তাই না, নাওকো?"

"একদম," নাওকোও হাসতে হাসত বলল।

"আমি বরং জার্মান পড়ি বসে বসে," দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম।

"হ্যাঁ, ভালো ছেলের মত হোমওয়ার্ক শেষ করো," রেইকো বলল। "আমরা লাঞ্চের আগেই চলে আসবো।"

ওর দু-জন কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল। ওদের সাথে আরও কিছু লোকজনের গলা আর সিঁড়িতে পায়ের শব্দ কানে আসল।

আমি বাথরুমে গিয়ে এবার মুখ ধুয়ে, একটা নেল কাটার জোগাড় করে নখ কাটলাম। দু-জন নারীর শেয়ার করা বাথরুম হলেও ভেতরের জিনিসপত্র একদম সাধারণ। কসমেটিক্স বলতে কিছু নেই, স্রেফ খালি কিছু ক্লিন্সিং ক্রিম, লিপ ময়েসচারাইজার আর সানব্লক ক্রিমের বোতল। এরপর কফি বানালাম আর কফি টেবিলে বসে জার্মান পড়তে লাগলাম। সূর্যের আলোয় রান্নাঘরে বসে আমি যখন গ্রামার চার্ট মনে করার চেষ্টা করছিলাম তখন এক অদ্ভুত অনুভূতি হল। আমার মনে হল এই কিচেন টেবিল আর অনিয়মিত জার্মান ক্রিয়াপদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে যতটুকু দূরত্ব কল্পনা করা সম্ভব।

সাড়ে এগারোটার দিকে মেয়েরা ফিরে আসল ফার্ম থেকে। গোসল সেরে নতুন কাপড় পরে নিল। আমরা তিনজন ডাইনিং হলে গেলাম লাঞ্চ করতে, তারপর গেলাম মেইন গেটের দিকে। এই সময় গার্ড হাউজে একজন লোক ডিউটিতে ছিল। সে তার ডেস্কে বসে লাঞ্চ করছিল, সম্ভবত ডাইনিং হল থেকে আনা। শেলফের ট্রাঞ্জিস্টার রেডিও থেকে পুরনো দিনের পপ সুর ভেসে আসছিল। কাছে যেতেই সে একজন বন্ধুর মত হাত নাড়িয়ে হাই দিল, আমরাও উত্তরে হ্যালো বললাম।

রেইকো জানাল, আমরা ঘন্টা তিনেকের জন্য বাইরে ঘুরতে যাচ্ছি।

"দারুন," সে বলল। "আজকের আবহাওয়া চমৎকার। খালি ভ্যালি রোড থেকে দূরে থেকো, টানা বৃষ্টিতে ঐ রাস্তা ভেসে গেছে। আর কোন সমস্যা নেই।"

রেইকো রেজিস্ট্রি খাতায় তার আর নাওকোর নাম, তারিখ আর সময় লিখল।

"মজা করো," গার্ড বলল, "আর সাবধানে থেকো।"

"চমৎকার লোক," আমি বললাম।

"ওর এখানে একটু সমস্যা আছে," নিজের মাথা দেখিয়ে বলল রেইকো।

আবহাওয়ার ব্যাপারে সে অবশ্য ঠিকই বলেছিল। আকাশ একদম মাত্র রঙ করা নীলের মত, অল্প একটু সাদা মেঘ ঝুলে আছে একখানে, যেন রঙ পরীক্ষা করতে লাগানো হয়েছে। আমরা আমি হোস্টেলের পাথরের নিচু দেয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে চললাম কিছুক্ষণ, তারপর একটা খাড়া সরু রাস্তা নিলাম। রেইকো আগে আগে গেল, নাওকো মাঝখানে, শেষে আমি। রেইকো এই এলাকার সব পাহাড় পর্বত ভালোমত চেনে তাই আত্মবিশ্বাসের সাথে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। আমরা মনোযোগ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম, তেমন একটা কথা বলছিলাম না। নাওকো নীল জিন্স আর সাদা ব্লাউজ পরেছিল। আর হাতে জ্যাকেট। ওর সোজা চুল কাঁধের কাছে নেমে এদিক ওদিক ঝুলছিল। সে মাঝে মধ্যেই পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল আর চোখে চোখ পড়লেই হাসছিল। রাস্তা এত খাড়া উঠে গেছিল যে মাথা ঘুরাচ্ছিল, কিন্তু রেইকো একই গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। ওর সাথে তাল মেলানোর চেষ্টা করছিল নাওকো। কিছুক্ষণ পর পর ঘাম মুছছিল মুখ থেকে। অনেকদিন এরকম পাহাড়ে চড়া হয় না বলে আমার দমে কুলাচ্ছিল না।

"তুমি এরকম প্রায়ই পাহাড়ে চড়ো নাকি?" আমি নাওকোকে জিজ্ঞেস করলাম।

"হয়তো সপ্তাহে একবার," উত্তর দিল সে, "কষ্ট হচ্ছে নাকি?"

"একটু," আমি বললাম।

"আমরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছি," রেইকো বলল। "তিন ভাগের দুভাগ চলে এসেছি, জোর লাগাও, তুমি না পুরুষ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু অভ্যেস নেই তো।"

"বিছানায় খেলার অভ্যেস তো ঠিকই আছে," নাওকো আপনমনে বিড়বিড় করে বলল।

আমি কিছু একটা উত্তর দিতে গিয়েও দিলাম না। একটু পর পর মাথায় ঝুঁটিওয়ালা লাল পাখি আমাদের সামনে দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। নীল আকাশের সামনে ওগুলোকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। আমাদের আশেপাশের মাঠগুলো সাদা, নীল আর হলুদ ফুলে ভর্তি, সাথে প্রচুর মৌমাছিও উড়ছিল। এক পা এক পা করে এগুচ্ছিলাম কিন্তু আমার মাথায় কিছু ছিল না আশেপাশের দৃশ্য ছাড়া।

আরও মিনিট দশেক চলার পর ঢাল শেষ হল, আমরা একটা মালভূমির মত জায়গায় হাজির হলাম। সেখানে বসে ঘাম মুছে, দম নিয়ে, পানি খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম আমরা। রেইকো একটা পাতা দিয়ে বাঁশী বাজাতে লাগল।

এরপর রাস্তা একটু নেমে গিয়ে ঘন ঢেউ খেলানো লম্বা ঘাসে গিয়ে মিশেছে। এর ভেতর দিয়ে মিনিট পনের যাওয়ার পর আমরা একটা গ্রামে গিয়ে পৌছলাম। লোকজনের কোন চিহ্নও দেখা গেল না। বিভিন্ন বয়সের ক্ষয়প্রাপ্ত ডজন খানেক বাড়ি রয়েছে শুধু। বুক পর্যন্ত উঁচু ঘাস জমে আছে বাড়িগুলোর চারপাশে। দেয়ালের গর্তে কবুতর বাসা বেঁধেছে। শুধু মাত্র একটা বাড়ির খাম্বা ছাড়া কিছু নেই, বাকিগুলো মোটামুটি বসবাসের মত অবস্থায় আছে। এই মৃত বাড়িগুলো রাস্তার দুপাশে একে অপরের সাথে চেপে আছে। মাঝের রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে গেলাম।

"সাত কি আট বছর আগে এই গ্রামে লোকজন থাকতো," রেইকো জানাল। "চাষের জমি ছিল এখানে। জীবন কঠিন ছিল এখানে, শীতে কয়েক স্তর বরফে আটকা পড়তে হত। মাটিও তেমন উর্বর না। শহরের জীবন এর থেকে আরামের।"

"কি বিশাল অপচয়!" আমি বললাম "কয়েকটা বাড়ি দেখে তো মনে হল সুন্দর বাস করা যাবে।"

"কিছু হিপ্পি মাঝখানে এখানে থাকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হাল ছেড়ে দিয়েছে। শীত এখানে অসম্ভব কঠিন।"

গ্রাম পার হওয়ার পরেই বেড়া দেয়া একটা জায়গা, দেখে মনে হল চারণভূমি। ভেতরে কিছু ঘোড়া চড়তে দেখলাম। বেড়ার পাশ ধরে যেতে থাকলাম আমরা। একটা বড় কুকুর লেজ নাড়াতে নাড়াতে দৌড়ে এল আমাদের দিকে। রেইকোর উপর দুপা তুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ শুঁকল। নাওকোর আশেপাশে লাফালাফি করল খেলার ছলে। আমি শিষ দিলে আমার দিকে এসে লম্বা জিহ্বা বের করে আমার হাত চেটে দিল।

নাওকো কুকুরটার মাথায় হাত বুলাতে বলাতে বলল যে এটা চারনভূমির কুকুর। "বাজি ধরে বলতে পারি এর বয়স বিশের কাছাকাছি," সে বলল। "ওর দাঁতের অবস্থা এত করুণ যে শক্ত কিছু খেতে পারে না। দোকানের সামনে সারাদিন পড়ে ঘুমায়, আর কারো পায়ের শব্দ পেলে ছুটে আসে।"

রেইকো তার ন্যাপস্যাক থেকে এক টুকরো চিজ বের করল। গন্ধ পেয়েই কুকুরটা ওর দিকে ছুটে গিয়ে গপ করে গিলে ফেলল চিজের টুকরোটা।

"আমরা আর খুব বেশিদিন একে দেখতে পাবো না মনে হয়," রেইকো কুকুরের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল। "অক্টোবরের মাঝামাঝি তারা সব গরু-ঘোড়া ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। খামার বন্ধ হয়ে যায় তখন। গ্রীষ্মের সময় শুধু এখানে পশু চরান হয়। অইসময় তারা এখানে টুরিস্টদের জন্য একটা কফি শপ

চালায়। টুরিস্টও ভালোই আসে! দিনে প্রায় বিশ জনের মত হাইকার। আচ্ছা চল, কিছু ড্রিংক করি?"

"ভালো প্রস্তাব," আমি বললাম।

কুকুরটা আগে আগে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। কফি হাউজটা একটা ছোট সাদা রঙের বাড়িতে। সামনে খোলা বারান্দা, আর কফি কাপের আকৃতির একটা মলিন সাইনবোর্ড ঝুলছে। কুকুরটা বারান্দায় উঠে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। আমরা বারান্দায় একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম। সাদা সোয়েট শার্ট আর সাদা জিন্স পরা, চুল পনিটেইল করে বাঁধা একজন মেয়ে এসে রেইকো আর নাওকোকে পুরনো বন্ধুর মত জড়িয়ে ধরলো।

"এ হচ্ছে নাওকোর বন্ধু," রেইকো আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল।

"হাই," সে বলল।

"হাই," আমি উত্তর দিলাম।

মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল আর আমি টেবিলের নিচে বুড়ো কুকুরটার গলা চুলকে দিতে লাগলাম। আরামে চোখ বন্ধ করে ফেলল কুকুরটা।

"এর নাম কি?" মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"পেপে।"

"হেই, পেপে," আমি ডাকলেও কুকুরটা নড়ল না।

"ওর শোনার সমস্যা আছে," মেয়েটা বলল। "জোরে না বললে সে শুনতে পায় না।"

"পেপে!" আমি জোরে ডাকলাম। কুকুরটা চোখ খুলে ঘেউ ঘেউ করে জবাব দিল।

"কিছু না, পেপে," মেয়েটা বলল। "বেশি করে ঘুমাও, আর অনেকদিন বেঁচে থাকো।" পেপে ধুপ করে আমার পায়ের উপর শুয়ে পড়ল।

নাওকো আর রেইকো ঠান্ডা দুধ অর্ডার করল, আর আমি বিয়ার।

"রেডিও শোনা যাক," রেইকো বলল। মেয়েটা অ্যামপ্লিফায়ার অন করে ঘুরিয়ে একটা এফএম স্টেশনে দিল। 'ব্লাড, সয়েট অ্যান্ড টিয়ারস'-এর গান হচ্ছিল *স্পিনিং হুইল*।

রেইকোকে সন্তুষ্ট দেখাল। "এজন্যেই আমরা এখানে আসি! আমাদের রুমে রেডিও নেই, এখানে যদি না আসি বাইরে এখন কি গান হচ্ছে জানতেই পারতাম না।"

"তুমি কি রাতে এখানেই থাকো?" আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"মাথা খারাপ!" সে হাসল। "আমি রাতে এখানে থাকলে নিঃসঙ্গতায় মারাই

যাবো। খামারের লোক আমাকে শহরে দিয়ে আসে, সকালে আমি আবার চলে আসি।" বাইরে অফিসের সামনে রাখা ফোর হুইল ড্রাইভ ট্রাকটা দেখাল সে।

"তোমার তো ছুটি খুব শিগগিরি শুরু হচ্ছে তাই না?" রেইকো জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ, বেশি দেরি হওয়ার আগেই আমরা এই জায়গা বন্ধ করে দেবো।" মেয়েটা বলল। রেইক তাকে একটা সিগারেট সাধল, নিজে দুইটা খাওয়া শেষ।

"তোমাকে মিস করবো," রেইকো বলল।

"মে মাসেই এসে যাবো অবশ্য," মেয়েটা হাসি দিয়ে বলল।

রেডিওতে 'ক্রিম'-এর *হোয়াইট রেডিও* বাজছিল। একটা বিজ্ঞাপনের পর শুরু হল 'সাইমন অ্যান্ড গারফাঙ্কেল'-এর *স্কারবরো ফেয়ার*।

"ভালো লেগেছে," গান শেষ হলে রেইকো বলল।

"আমি সিনেমাটাও দেখেছি," জানালাম তাকে।

"কে ছিল সিনেমায়?"

"ডাস্টিন হফম্যান।"

"চিনি না," দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়ে বলল সে। "দুনিয়া অনেক বদলে গেছে অথচ আমি কিছুই জানি না কী হচ্ছে।"

সে মেয়েটাকে গিটারের জন্য বলল। "অবশ্যই।" মেয়েটা রেডিও বন্ধ করে দিয়ে পুরনো একটা গিটার নিয়ে আসল। কুকুরটা মাথা তুলে শুঁকে দেখল সেটা।

"এটা খাওয়ার জিনিস না," মজা করে বলল রেইকো। বাতাসে ঘাসে গন্ধ উড়ে এল বারান্দায়। পর্বতগুলো সামনে ছড়িয়ে আছে, শৃঙ্গগুলো আকাশের দিকে চোখা হয়ে আছে।

"মনে হচ্ছে *দ্য সাউন্ড অফ মিউজিক*-এর কোন দৃশ্য।" রেইকোর গিটার টিউন করা দেখে বললাম।

"সেটা আবার কি?" প্রশ্ন করল সে।

গিটারের তারে হালকা বাড়ি দিয়ে রেইকো বোঝার চেষ্টা করল, *স্কারবরো ফেয়ার*-এর হোমকর্ড কি হতে পারে। কয়েকবার ভুল বাজিয়ে অবশেষে সে ঠিকমত তুলতে পারল। নিজস্ব কিছু মাত্রাও যোগ করল। "আমার কান ভালো।" চোখ টিপে বলল আমাকে। "আমি সাধারনত কোন গান বার তিনেক শুনলেই তুলতে পারি।"

মুখে সুর গুনগুন করতে সে *স্কারবরো ফেয়ার* বাজাল। আমরা তিনজন হাততালি দিলে মাথা নুইয়ে করে সেটা গ্রহণ করল রেইকো।

"মোজার্টের কনসার্টে আমি আরও বেশি হাততালি পেতাম," বলল সে।

মেয়েটা বলল, যদি রেইকো বিটল্‌স-এর *হিয়ার কামস দ্য সান* বাজিয়ে শোনায় তাহলে তার বিল মাফ। রেইকো আনন্দের সাথেই গানটা ধরলো। গলা খুলে না গাইলেও সুন্দর গাইল। অতিরিক্ত ধূমপান ওর গলা একটু খসখসে টান এনে দিয়েছে। আমার আসলেই মনে হচ্ছিল এখন সূর্য উঠবে। আর আমি সেখানে বসে বিয়ার খেতে খেতে পর্বতের দিকে তাকিয়ে দেখবো। আরামদায়ক উষ্ণ একটা অনুভূতি।

রেইকো গিটার ফেরত দিয়ে বলল রেডিও আবার চালিয়ে দিতে। তারপর সে আমাকে আর নাওকোকে বলল আমরা চাইলে আশেপাশে ঘন্টাখানেক ঘুরে আসতে পারি।

"আমি এখানে বসে রেডিও শুনবো আর এই মেয়ের সাথে গল্প করবো। তোমরা তিনটার মধ্যে ফেরত আসলেই হবে।"

"এতক্ষন আমরা একা একা থাকলে সমস্যা হবে না?"

"সত্যি বলতে কি, এটা অবশ্যই নিয়মের বাইরে। জাহান্নামে যাক নিয়ম, আমি তো তোমাদের দেখাশোনা করার চাকরি করি না। আমারও বিশ্রাম দরকার। আর তুমিও কতদুর থেকে এসেছো, নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত অনেক কিছু বলার আছে ওকে।" রেইকো বলতে বলতে আরেকটা সিগারেট ধরালো।

"চল যাই," নাওকো উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

আমি উঠে ওর পেছন পেছন গেলাম। কুকুরটাও ঘুম থেকে উঠে আমাদের পেছন পেছন আসল কিছুদূর তারপর আগ্রহ হারিয়ে আবার বারান্দায় ফিরে গেল। আমরা বেড়ার পাশ দিয়ে একটা ছোট পথে হাঁটতে লাগলাম। নাওকো একটু পর পর হয় আমার হাত ধরছিল কিংবা ওর হাত দিয়ে আমার হাত জড়িয়ে ধরছিল।

"একদম সেই পুরনো দিনগুলোর মত লাগছে, তাই না?" সে বলল।

"সে দিনগুলো মোটেও কোনো পুরনো দিন না," আমি হাসতে হাসতে বললাম। "এই বছরেরই বসন্তের সময়ের কথা! এগুলোকে পুরনো দিন বললে দশ বছর আগের দিন তো প্রাচীন ইতিহাস।"

"প্রাচীন ইতিহাসই মনে হয়," নাওকো বলল। "যাহোক, কালকের রাতের ঘটনার জন্য সরি। আমি বুঝতে পারিনি ভেতরে এত কিছু জমে ছিল। তুমি এতদিন পর এতদূর থেকে আসলে, আমার এরকম করা একদম উচিত হয়নি।"

"ব্যাপার না," আমি বললাম। "আমাদের দু-জনেরই ভেতরে অনেক কিছু জমে আছে যা বের হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তাই তোমার যদি মনে হয় তোমার অনুভূতিগুলো বের করে দিয়ে কাউকে ভর্তা করে ফেলতে চাও, আমাকেই করো। তাহলে আমরা একজন আরেকজনকে ভালোভাবে বুঝতে পারবো।"

“আমাকে যদি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে কি হবে?”

“তুমি বুঝতে পারোনি মনে হয়,” আমি বললাম। “কি হবে সেটার কোন উত্তর নেই। কিছু লোক আছে যারা সারাদিন ট্রেনের টাইমটেবল পড়ে, কিছু লোক আছে যারা ম্যাচের কাঠি দিয়ে মডেল বোট বানায় আর কিছু করে না। আর একজন যদি তোমাকে বুঝতে চায় তাহলে সমস্যা কোথায়?”

“হবি বা শখের মত?” দ্বিধা সুরে বলল সে।

“হতে পারে, চাইলে শখ বলতে পারো। সাধারণ মানুষ হয়তো এর নাম দেবে বন্ধুত্ব কিংবা ভালোবাসা কিংবা অন্যকিছু। তুমি যদি শখ বলতে চাও তাতে কোন সমস্যা নেই।”

“আচ্ছা বলো,” নাওকো বলল। “তুমি তো কিজুকিকে পছন্দ করতে, তাই না?”

“অবশ্যই,” আমি বললাম।

“রেইকো?”

“ওকেও পছন্দ করি। চমৎকার মানুষ।”

“আমি বুঝি না তুমি কি করে শুধু আমাদের মত মানুষ পছন্দ করো? মানে, বলতে চাচ্ছি আমাদের মত ত্রুটিপূর্ণ-সমস্যাওয়ালা মানুষ, আমি, কিজুকি কিংবা রেইকো...সাধারণ মানুষ পছন্দ করতে পারো না?”

“কারন আমি তোমাদেরকে সেরকম ভাবি না,” কিছুক্ষণ ভেবে বললাম। “তোমাকে, কিজুকি কিংবা রেইকোকে আমার সমস্যাওয়ালা মানুষ মনে হয় না। বরং অন্য যাদেরকে দেখি তাদেরই মনে হয় কোন কিছুর ঠিক নেই।”

“কিন্তু আমাদের সমস্যা তো আছেই,” নাওকো বলল। “আমি পরিস্কার বুঝতে পারি সেটা।”

আমরা চুপচাপ কিছুক্ষণ হাঁটলাম। রাস্তার শেষে বেড়া পার হয়ে গোলাকার ঘাসভূমি ধরনের জায়গা। পুকুরের চারপাশে গাছ থাকলে যেমন দেখায় সেরকম।

“মাঝে মাঝে রাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। অনেক ভয় লাগে,” নাওকো আমার হাত চেপে ধরে বলল। “ভয় লাগে আমি হয়তো আর কখনোই সুস্থ হবো না। আমি সারাজীবন এরকম সমস্যার মধ্যে থেকে বুড়ো হয়ে পচে মরবো এখানে। এত ঠাণ্ডা লাগে যেন আমার ভেতরটা বরফ হয়ে গেছে। ভয়াবহ...ঠান্ডা।”

আমি আমার হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে আরও কাছে টানলাম।

“আমার মনে হতে থাকে অন্ধকার থেকে কিজুকি হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছে, ‘কাছে আসো নাওকো, আমাদের না একসাথে থাকার কথা।’ যখন আমি এরকম শুনতে পাই বুঝি না কী করবো।”

"তখন কি করো তুমি?"

"উমম অন্য কিছু ভেবো না এখন ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে, ভাববো না।"

"রেইকোকে বলি আমাকে ধরে থাকতে। আমি ওকে ঘুম থেকে ওঠাই, ওর বিছানায় ওর সাথে শুয়ে থাকি আর ও আমাকে চেপে ধরে থাকে। আর কাঁদি। সে আমাকে আদর করতে থাকে যতক্ষণ না আমার ভেতরের বরফ গলে যায়, আবার উষ্ণ হয়ে যায়। তোমার কি মনে হয় এটা খারাপ কিছু করি?"

"না, একদমই না। আমি যদি তোমাকে এরকম করে ধরে থাকতে পারতাম," বললাম তাকে।

"তাহলে এখন আমাকে ধরে থাকো। এখানে...এখনই।"

আমরা ঘাসভূমির শুকনো ঘাসের উপর বসে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে থাকলাম। লম্বা লম্বা ঘাস আমাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখল। আকাশ আর মেঘ ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছিল না। নাওকোকে আস্তে করে শুইয়ে দিয়ে ওর নরম উষ্ণ দেহ বুকে জড়িয়ে ধরলাম। গভীরভাবে একে অপরকে চুমু খেতে লাগলাম।

"আমি একটা কথা জানতে চাই, তরু," নাওকো আমার কানে ফিসফিস করল।

"কি সেটা?"

"তুমি কি আমার সাথে শুতে চাও?"

"অবশ্যই চাই," আমি বললাম।

"অপেক্ষা করতে পারবে?"

"অবশ্যই পারবো।"

"আমরা আরেকবার করার আগে আমি আরেকটু ঠিক হয়ে নিতে চাই। তোমার শখের জন্য নিজেকে আরেকটু প্রস্তুত করে নিতে চাই। ততদিন কি অপেক্ষা করতে পারবে?"

"হ্যাঁ, অপেক্ষা করবো।"

"তুমি কি এখন শক্ত?"

"জুতার কথা জিজ্ঞেস করছো?"

"বোকা কোথাকার," নাওকো কিচমিচ করে বলল।

"তুমি যদি জিজ্ঞেস করে থাকো যৌন উত্তেজনা বোধ করছি কিনা, তাহলে আমি অবশ্যই উত্তেজিত।"

"তুমি কি দয়া করে 'অবশ্যই' বলা বন্ধ করবে?"

“ঠিক আছে, করলাম বন্ধ।”

“এটা কি অনেক কঠিন কিছু?”

“কি কঠিন কিছু?”

“ওই জিনিসটার এরকম শক্ত হওয়া? আমি জানতে চাচ্ছি তোমার কষ্ট হয় কিনা?”

“ব্যাপারটা নির্ভর করে তুমি কিভাবে দেখছো সেটার উপর।”

“তুমি কি চাও আমি তোমার ভারমুক্ত করি?”

“তোমার হাত দিয়ে?”

“হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে কি, তুমি আমার গায়ের উপর শোয়ার পর থেকে তোমার ঐটার গুতো অনুভব করছি।”

আমি ওর উপর থেকে আমার কোমর সরিয়ে নিলাম। “এখন?”

“ঠিক আছে এখন, ধন্যবাদ।”

“আমার কি মনে হয় জানো?” আমি বললাম।

“কি?”

“তুমি ভারমুক্ত করে দিলে ভালোই হয়।”

“ওকে,” হেসে বলল সে। তারপর আমার প্যান্টের চেইন খুলে উত্তেজিত লিঙ্গ ওর হাতের মুঠোতে নিয়ে নিল। “একেবারে গরম হয়ে আছে।”

তারপর হাত দিয়ে নাড়াতে লাগল। আমি ওর ব্লাউজ আর ব্রা খুলে নিলাম। ওর নরম গোলাপি স্তনবৃন্তে আলতো চুমু খেলাম। সে চোখ বন্ধ করে আমার লিঙ্গের ওপর হাত চালাতে লাগল।

“বাহ্, তুমি তো ভালোই পারো,” আমি বললাম।

“ভদ্র ছেলের মত চুপ করে থাকো,” নাওকো বলল।

শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি ওকে জড়িয়ে ধরে আবার চুমু খেলাম। নাওকো ওর ব্রা আর ব্লাউজ পরল, আমি চেইন লাগালাম।

“এখন কি হাঁটতে সুবিধা হবে?” জানতে চাইলো সে।

“আমি ঋণি থাকলাম।”

“তাহলে স্যার আমরা আরেকটু সামনে যাই?”

“চল যাই।”

ঘাসভূমি পার হলাম আমরা, এরপর কিছু গাছ, তারপর আবার ঘাসভূমি। নাওকো তার মৃত বোনের কথা বলল। বলল সে খুব কম মানুষকে তার বোনের কথা বলেছে। তার মনে হয়েছে আমাকে বলা উচিত।

“সে আমার চেয়ে ছয় বছরের বড় ছিল, আমাদের ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি

আলাদা ছিল, কিন্তু আমরা খুব আপন ছিলাম। আমরা কখনো ঝগড়া মারামারি করিনি, একবারও না। অবশ্য আমাদের যে বয়সের পার্থক্য ছিল, ঝগড়া মারামারি হওয়ার কথাও না।"

ওর বোন ছিল ওইসব মেয়েদের মত যারা সব কিছুতেই এক নাম্বার–খুব ভালো ছাত্রি, ভালো অ্যাথলেট, জনপ্রিয়, একজন লিডার, দয়ালু, স্পষ্টবাদি, ছেলেরা পছন্দ করত ওকে, শিক্ষকরাও পছন্দ করত, ওর দেয়াল ভর্তি ছিল সার্টিফিকেট দিয়ে। সব পাবলিক স্কুলে এরকম একটা মেয়ে থাকে। "আমার বোন বলে বাড়িয়ে বলছি না, এত খ্যাতি তাকে অন্ধ করে দেয়নি কখনো, লোক দেখানো কোন কিছু ওর মধ্যে ছিল না। আর তুমি ওকে কিছু করতে দিলে সে যে কারো চেয়ে ভালোভাবে তা করে দিতে পারতো।

"আর আমি যখন পিচ্চি ছিলাম আমার ঠিক করেছিলাম আমি লক্ষ্মী মিষ্টি মেয়ে হবো।" এক গুচ্ছ ঘাস হাতে নিয়ে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে নাওকো বলল। "মানে, বুঝতেই পারছো আমি বড় হতে হতে দেখেছি সবাই বলছে আমার বোন কত স্মার্ট, খেলাধুলায় সে কত ভালো, সবাই তাকে কত পছন্দ করে। আমি বুঝতে পারছিলাম ওর সাথে প্রতিযোগিতায় পারবো না। আমার চেহারা ওর চেয়ে একটু ভালো ছিল বোধ হয়, তাই আমার বাবা মা ঠিক করলেন আমাকে কিউট হিসেবে বড় করবেন। আমাকে সেরকম স্কুল দেখে ভর্তি করানো হল। তারা আমাকে ভেলভেটের ড্রেস পরাতেন, আর লেদার শু। সেই সাথে পিয়ানো লেসন আর ব্যালে ক্লাস। আমার বোন আমার প্রতি আরও পাগল হয়ে গেল–তার ছোট্ট কিউট বোন আমি। সে আমাকে কিউট কিউট সব উপহার দিত, সব জায়গায় তার সাথে আমাকে নিয়ে যেত, হোমওয়ার্ক করতে সাহায্য করত। সে এমনকি ডেটে গেলেও আমাকে নিয়ে যেত। এর চেয়ে ভালো বড় বোন আর চিন্তাও করা যায় না।

"কেউ জানে না কেন সে আত্মহত্যা করল। কিজুকির মত। একদম এক। তার বয়সও ছিল তখন সতের। সে কাউকে কখনো একটু ইশারা পর্যন্তও দেয়নি যে সে আত্মহত্যা করতে পারে। কোন চিরকুটও রেখে যায়নি। একদম এক কাহিনী। তাই না, বলো?"

"একই রকম শোনাচ্ছে।"

"সবাই বলতো সে খুব স্মার্ট, প্রচুর বই পড়তো। সে আসলেও অনেক পড়তো। হাজার হাজার বই ছিল ওর। ওর মৃত্যুর পর আমি কিছু বই পড়েছিলাম। অনেক খারাপ লেগেছিল। বইয়ের পাতার মার্জিনে ওর মন্তব্য লেখা থাকতো। পাতার ভাঁজে বয় ফ্রেন্ডদের থেকে পাওয়া শুকনো ফুল আর চিঠি, এরকম কিছু যখন আমি দেখতাম অনেক কান্না পেত, অনেক কাঁদতামও।"

নাওকো কিছুক্ষণ চুপ থাকল আর ঘাস প্যাঁচাতে লাগল।

"সে সেরকম মানুষ ছিল যারা সব কাজ নিজে নিজে করে। কারো সাহায্য বা মতামত নেয় না। অহংকারের জন্য যে তা নয়। সে করত কারন তার কাছে সেটাই ঠিক লাগত। আমার বাবা-মা এতে অভ্যস্ত ছিল, ওকে একা বাসায় রেখে যেত। আমি যখন কোন উপদেশের জন্য তার কাছে গিয়েছি, সে সবসময় আমাকে সাহায্য করত। কিন্তু সে নিজে কখনো কারো সাহায্য নিতে যেত না। সে তার মত করে সব কিছু নিজে নিজে করত। কখনো রাগ বা মেজাজ খারাপ করত না। সত্যি বলছি, কোন কিছু বাড়িয়ে বলছি না। বেশিরভাগ মেয়েরা পিরিয়ড কিংবা কিছু হলে মেজাজ খারাপ করে থাকে আর অন্য লোকের উপর ঝাড়ে। সে নিজেকে দমিয়ে রাখত। হয়তো দুই-তিন মাসে তার একবার এমন হত যে সে সব বাদ দিয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানায় পড়ে থাকতো। কোন কিছু মুখে দিত না, আলো নিভিয়ে রাখত, কথা বলতো না কারো সাথে। কিন্তু মেজাজ খারাপ থাকতো না ওর। আমি যখন স্কুল থেকে বাসায় যেতাম, আমাকে রুমে ডেকে নিয়ে ওর পাশে বসিয়ে সারাদিন কি কি হয়েছে সব জানতে চাইত। আমি তাকে সবকিছু বলতাম–বন্ধুদের সাথে কি কি খেলা করেছি কিংবা টিচার কি বলেছো কিংবা পরীক্ষার রেজাল্ট কি হয়েছে এইসব আর কি। সে সব কিছু খুঁটিনাটি শুনত, মন্তব্য করত বা উপদেশ দিত, কিন্তু যেই আমি বেরিয়ে যেতাম বা খেলতে যেতাম কারো সাথে কিংবা ব্যালে ক্লাসে যেতাম, সে আবার চুপচাপ হয়ে যেত। এরকম দুদিন থেকে সে ঝাড়া দিয়ে উঠে আবার স্কুলে যেত। এরকম হয়ত প্রায় চার বছরের মত হয়েছিল। আমার বাবা মা প্রথমে একটু চিন্তিত ছিলেন, ডাক্তারের কাছেও গিয়েছিলেন যতদূর মনে পড়ে, কিন্তু যেহেতু দুইদিন পর ও নিজে নিজে ঠিক হয়ে যেত, তারা ওকে ওর মত ছেড়ে দিয়েছিলেন।

"ও মারা যাওয়ার পর, আমার বাবা মা কে বলতে শুনেছি আমার এক ছোট চাচা এরকম মারা গিয়েছিলেন অনেক আগে। তিনিও অনেক মেধাবি ছিল, কিন্তু চার বছর সব বাদ দিয়ে ঘরে বসে ছিলেন। তারপর একদিন বাসা থেকে বের হয়ে ট্রেনের সামনে লাফিয়ে পড়লেন। আমার বাবা বলছিল, 'সম্ভবত এইসব আমাদের রক্তেই আছে–আমার দিক থেকে এসেছে।' "

নাওকো যখন কাহিনী বলছিল পাশাপাশি ঘাস টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ওড়াচ্ছিল। ধারালো ঘাসে ওর আঙুল কেটে যাচ্ছিল।

"ও যে মারা গেছে তা আমিই প্রথম খেয়াল করেছি," সে বলে চলল। "হেমন্ত কাল ছিল। আমি তখন সিক্সথ গ্রেডে। নভেম্বর। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল, অন্ধকার। আমার বোন তখন হাই-স্কুলে সিনিয়র ছাত্রি। পিয়ানোর ক্লাস শেষ করে সাড়ে ছয়টায় আমি বাসায় এসেছিলাম, মা ডিনার রেডি করছিল। আমাকে

বলল বোনকে বলতে ডিনার রেডি। আমি উপরে গিয়ে ওর দরজায় নক করে বললাম 'ডিনার রেডি,' কোন উত্তর দিল না। ওর রুম একদম চুপচাপ। আমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল, আরেকবার নক করলাম তারপর দরজা খুলে উঁকি দিলাম ভেতরে। হয়ত ঘুমাচ্ছে। কিন্তু সে বিছানায় ছিল না। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। দৃষ্টি বাইরের দিকে। ঘাড় একটু একপাশে বেঁকে আছে। মনে হচ্ছিল যেন কিছু চিন্তা করছে। আলো নিভানো ছিল, রুম অন্ধকার, আমি ভালো মত দেখতে পারছিলাম না কিছু। 'কি করো তুমি,' জিজ্ঞেস করলাম। 'ডিনার কিন্তু রেডি।' ঠিক তখন আমি খেয়াল করলাম ওকে অস্বাভাবিক লম্বা লাগছে। ব্যাপারটা কি। আজব তো! ও কি হাই হিল পরেছে নাকি? নাকি কিছুর উপর দাঁড়িয়ে আছে? আমি কাছে গেলাম আরা আবার যখন কিছু বলতে গেলাম তখন খেয়াল করলাম তার মাথার উপর একটা দড়ি, সিলিং থেকে সোজা নেমে গেছে। একদম সরল রেখার মত সোজা, যেন কেউ রুলার দিয়ে সোজা করে এঁকেছে। আমার বোন সাদা ব্লাউজ পরেছিল, সাধারণ ধরণের, যেমন আমি পরে আছি–আর একটা ধূসর স্কার্ট, ব্যালেরিনার মত তার পায়ের বুড়ো আঙুলগুলো নিচু হয়ে ছিল। পার্থক্য শুধু মেঝে আর পায়ের মধ্যে দূরত্ব হয়ত সাত-আট ইঞ্চি। আমি সবকিছু ভালো করে দেখলাম। তার মুখও। আমি চাচ্ছিলাম দৌড়ে নিচে গিয়ে মাকে জানাই। চিৎকার করতে চাচ্ছিলাম কিন্তু আমার শরীর কাজ করছিল না। মন আর শরীর যেন আলাদা হয়ে গিয়েছিল। শরীর চাচ্ছিল তাকে টেনে নামাতে, আর মন চাচ্ছিল দৌড়ে নিচে যেতে। অবশ্যই একটা ছোট মেয়ের অত শক্তি ছিল না ওকে নামানোর, আমি স্রেফ দাঁড়িয়েছিলাম। হারিয়ে গিয়েছিলাম সম্ভবত পাঁচ-ছয় মিনিটের জন্য। একদম ফাঁকা হয়ে গেছিল সব, যেন কিছু একটা মারা গেছে আমার ভেতরে। আমি স্রেফ দাঁড়িয়ে ছিলাম আমার বোনের সামনে, অন্ধকার আর ঠাণ্ডার ভেতর, যতক্ষণ না মা উপরে দেখতে আসল আমরা কি করছি।"

নাওকো মাথা ঝাঁকাল।

"তিনদিন আমি কোন কথা বলতে পারিনি। মরা মানুষের মত বিছানায় পড়ে ছিলাম খালি, চোখ খোলা, দৃষ্টি শূন্য। কি হচ্ছিল কিছুই বুঝছিলাম না," নাওকো আমার হাতের সাথে নিজেকে চেপে ধরলো। "তোমাকে চিঠিতে বলেছিলাম, মনে আছে? তুমি যতটুকু জানো তারচেয়ে অনেক বেশি সমস্যা আমার মধ্যে। তোমার যতটুকু মনে হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ আমার অসুস্থতা, এর শিকড় অনেক গভীরে । আর তাই আমি চাই তুমি আমাকে রেখে এগিয়ে যাও যদি পারো। আমার জন্য অপেক্ষা করো না। অন্য মেয়েদের সাথে শুতে চাইলে

শুতে পারো। আমার জন্য চিন্তা করে আটকে থেকো না। যা করতে চাও করো। নাহলে হয়তো তোমার অবস্থা আমার মতই হবে যা আমি কিছুতেই চাই না। আমি তোমার জীবনে ঝামেলা করতে চাই না। আমি কারো জীবনেই ঝামেলা করতে চাই না। আগেই বলেছি, আমি শুধু চাই তুমি মাঝে মধ্যে আমাকে দেখতে আসো, আর সবসময় আমাকে মনে রেখো। এইটুকুই শুধু আমি চাই।"

"আমি অবশ্য তা চাই না," বললাম তাকে।

"আমার জন্য তুমি তোমার জীবন নষ্ট করছো।"

"আমি কিছুই নষ্ট করছি না।"

"কিন্তু আমি হয়তো কখনোই সুস্থ হতে পারবো না। তুমি কি সারাজীবন অপেক্ষা করবে নাকি? দশ বছর? বিশ বছর?"

"তুমি শুধু শুধুই অনেক কিছু নিয়ে ভয় পাচ্ছো," আমি বললাম। "অন্ধকার, দুঃস্বপ্ন, মৃত মানুষ। তোমাকে এসব ভুলতে হবে। আমি জানি তুমি চাইলে ভুলতে পারবে।"

"যদি পারি," নাওকো মাথা দোলাতে দোলাতে বলল।

"তুমি যদি এ জায়গা থেকে বের হতে পারো, আমার সাথে থাকবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে আমি তোমাকে অন্ধকার আর দুঃস্বপ্ন থেকে রক্ষা করতে পারবো। তাহলে তুমি রেইকোর বদলে আমাকে পাবে। এমন কেউ যে তোমাকে খারাপ সময়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরে থাকতে পারবে।"

নাওকো আমাকে আস্তে করে চেপে ধরে থাকল। "খুবই চমৎকার হবে তাহলে," সে বলল।

আমরা তিনটার কিছু আগে কফি হাউজে ফেরত আসলাম। রেইকো বই পড়ছিল আর রেডিও'তে ব্রামের সেকেন্ড পিয়ানো কনসার্ট শুনছিল। পুরো ব্যাপারটাই দারুন, ব্রামের মিউজিক আর সাথে যতদূর চোখ যায় নির্জন ঘাসভূমি। থার্ড মুভমেন্টের চেলো অংশের সাথে রেইকো শিষ বাজাচ্ছিল।

"বাক্কাস অ্যান্ড বোহম," সে বলল। "আমি একসময় এই রেকর্ড গিলেছিলাম। একদম আক্ষরিকভাবে প্রত্যেকটা নোট গিলে খেয়েছিলাম। মিউজিক চুষে চুষে খেয়েছিলাম।"

নাওকো আর আমি কফি অর্ডার করলাম।

"অনেক কথা হয়েছে বুঝি?" রেইকো জানতে চাইলো।

"কয়েক টন," নাওকো বলল।

"ওর ইয়ে সম্পর্কে আমাকে বলবে কিন্তু, মানে বুঝতে পারছো তো কি, এখন না পরে।"

"আমরা সেরকম কিছু করিনি," নাওকো লাল হয়ে বলল।

"সত্যি?" রেইকো আমাকে প্রশ্ন করল, "কিছুই না?"

"কিচ্ছু না," আমি বললাম।

"কত্ত বোওওওরিং!" বিরক্ত চেহারা করে সে বলল।

"একদম," কফিতে চুমুক দিতে দিতে বললাম আমি।

ডাইনিং হলের দৃশ্য একদম আগের দিনের মতই। একই আবহাওয়া, একইরকম শব্দ, একই চেহারা। শুধু মেন্যু বদল হয়েছে। গতকাল টাক মাথার সাদা পোশাক পরা যে লোকটা ওজনহীন অবস্থায় গ্যাস্টিক জুসের নির্গমন নিয়ে কথা বলছিল, সে আমাদের তিনজনের পাশে বসে বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্রেইনের সাইজের সম্পর্ক নিয়ে অনেকক্ষণ বকবক করে গেল। আমরা সয়াবিনের হ্যাম বার্গার স্টেক খেতে খেতে বিসমার্ক আর নেপোলিয়নের ব্রেনের সাইজ সম্পর্কে জানলাম। সে তার প্লেট সরিয়ে রেখে কলম দিয়ে নোট পেপারে ব্রেনের স্কেচ করল। একবার আঁকে, তারপর বলে না হয়নি ঠিকমত, তারপর আবার নতুন করে আঁকে। এরকম কয়েকবার হল। আঁকা শেষ হলে সে যত্নের সাথে বাকি নোট পেপার তার সাদা জ্যাকেটের পকেটে ভরল, আর কলম রাখল বুক পকেটে। বুক পকেটে তার সব মিলিয়ে তিনটা কলম ছিল, সাথে পেন্সিল আর রুলারও। খাওয়া শেষ হলে সে আমাকে আগেরদিন যা বলেছিল তাই আবার বলল, "এখানে শীতকাল খুব সুন্দর। আপনার অবশ্যই শীতে আরেকবার আসা উচিত।" তারপর ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে গেল।

"এই লোক কি ডাক্তার, নাকি রোগি?" রেইকোকে জিজ্ঞেস করলাম।

"তোমার কি মনে হচ্ছে?"

"আমি বুঝতে পারছি না। যেটাই হোক না কেন, মনে হচ্ছে না সব ঠিক আছে।"

"সে একজন ডাক্তার," নাওকো বলল। "ডাক্তার মিয়াটা।"

"হ্যাঁ," রেইকো বলল, "কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি সে এখানের সবচেয়ে আজব ডাক্তার।"

"মি. ওমুড়া, দারোয়ান যিনি, সে-ও আজব," নাওকো উত্তর দিল।

"ঠিক," কাঁটাচামচ দিয়ে ব্রকলি খোঁচাতে খোঁচাতে রেইকো বলল। "সে প্রতিদিন সকালে জোরে জোরে চিৎকার করে আজব ব্যায়ামগুলো করে। নাওকো তুমি আসার আগে একটা মেয়ে ছিল এখানে বিজনেস অফিসে, মিস কিনোসিটা, যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। গত বছর তারা একজন মেইল নার্সের চাকরি বাতিল করেছে, তোকুসিমা, তার ভয়াবহ আসক্তি ছিল মদের প্রতি।"

“মনে হচ্ছে রোগি আর স্টাফরা নিজেদের জায়গা অদল বদল করতে পারে,” আমি বললাম।

“ঠিক বলেছো,” রেইকো কাঁটা চামচ নাড়াতে নাড়াতে বলল। “আশা করি এখন একটু একটু বুঝতে পারছো এখানে কি হয়।”

“মনে হয়।”

“আমরা নরমাল থাকি কারন আমরা জানি আমরা নরমাল নই,” রেইকো বলল।

রুমে ফেরত আসার পর, নাওকো আর আমি কার্ড খেললাম। রেইকো তার গিটার নিয়ে বাখ প্র্যাকটিস করতে লাগল।

“কালকে তুমি কখন যাচ্ছো?” রেইকো গিটার রেখে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল।

“সকালের নাস্তা করেই,” আমি বললাম। “নয়টায় বাস ধরলে আমি ঠিক সময়ে গিয়ে রাতের কাজ ধরতে পারবো।”

“খারাপ লাগছে, তুমি আরো কিছুদিন থাকলে ভালো হত।”

“আমি যদি এখানে বেশিদিন থাকি, সারাজীবনের জন্য এখানেই আটকে যেতে পারি,” হাসতে হাসতে বললাম।

“হয়ত,” রেইকো বলল, তারপর নাওকোর দিকে তাকালো সে, “ও আচ্ছা, ওকার থেকে আমার কিছু আঙ্গুর আনার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।”

“তুমি চাও আমি সাথে আসি?” নাওকো জানতে চাইলো।

“তারচেয়ে বরং তোমার মি. ওয়াতানাবেকে ধার নিতে পারি?”

“নিশ্চয়ই,” নাওকো বলল।

“দারুন। চল, শুধু আমরা দু-জন আবার রাতের অভিসারে যাই,” রেইকো আমার হাত ধরে বলল। “কালকে প্রায় চলে গিয়েছিলাম, আজকে পুরোটা যাই চল।”

“ঠিক আছে,” নাওকো কপট রাগ দেখিয়ে বলল, “যা খুশি করো।”

রাতের ঠান্ডা বাতাস বাইরে। রেইকো তার শার্টের উপর ধূসর নিল রঙের কারডিগান পরে জিন্সের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাটছিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে কুকুরের মত করে ঘ্রান নিল বাতাসের। “বৃষ্টির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে,” বলল সে।

আমি গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। আকাশে অনেক মেঘ ছিল সত্যি, চাঁদ ঢেকে যাচ্ছিল।

আমরা গাছপালাসমৃদ্ধ জায়গাটায় গেলাম যেখানে স্টাফরা থাকে। রেইকো আমাকে এক মিনিট দাঁড়াতে বলে একটা ঘরের দরজায় গিয়ে বেল দিল। এক

মহিলা দরজা খুলল, কোন সন্দেহ নেই সে এই বাসার গৃহকর্তি। রেইকো সেখানে দাঁড়িয়ে গল্প করল তার সাথে। মহিলা ভেতরে গিয়ে একটা বড় প্লাস্টিক ব্যাগ এনে দিল। রেইকো তাকে ধন্যবাদ দিয়ে গুডনাইট বলে ফিরে আসল আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

"দেখো," ব্যাগ খুলে দেখাল সে।

ভেতরে থোকায় থোকায় আঙ্গুর ভর্তি।

"আঙ্গুর পছন্দ করো তো?"

"অবশ্যই।"

সে সবচেয়ে উপরের থোকাটা আমার হাতে দিল। "খেতে পারো, ধুয়ে রাখা আছে।"

আমরা আঙ্গুর খেতে খেতে এগুলাম। আঙুরের খোসা আর বীজ মাটিতে ফেলতে লাগলাম। একদম টাটকা আর সুস্বাদু ছিল আঙ্গুরগুলো।

আমি ওদের ছেলেকে মাঝে মধ্যে পিয়ানো লেসন দেই, তার বদলে ওরা আমাকে বিভিন্ন জিনিস দেয়। ওয়াইনও ওদের থেকে পাওয়া। মাঝে মধ্যে ওদের দিয়ে শহর থেকে জিনিসপত্র কিনে আনাই।"

"তোমার কালকের গল্পের বাকি অংশ শুনতে চাই," আমি বললাম।

"ঠিক আছে," রেইকো বলল। "কিন্তু আমরা যদি প্রতিদিন দেরি করে ফিরি তাহলে নাওকো অন্য সন্দেহ করতে পারে।"

"আমি সেই ঝুঁকি নিতে রাজি আছি।"

"ওকে, চল আমার মাথার উপর ছাদ দরকার, আজকে একটু ঠাণ্ডা বাইরে।"

টেনিস কোর্টের দিকে আসতেই সে বামে গেল। আমরা সরু একটা সিঁড়ি বেয়ে নামলাম। সেখানে কিছু স্টোর হাউজের সারি। রেইকো সবচেয়ে কাছের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালাল। "ভেতরে আসো। কিছুই নেই এখানে অবশ্য।"

স্টোর হাউজের ভেতরে স্কি, বুট আর পোল জমা করে রাখা। আর মেঝেতে বরফ সরানোর সরঞ্জাম আর রক সল্টের ব্যাগ।

"যখন একা থাকতে ইচ্ছে হত আমার, এখানে চলে আসতাম গিটার প্র্যাকটিসের জন্য। ছিমছাম, তাই না?"

রেইকো এক ব্যাগ রক সল্টের উপর বসল, আমাকে বলল পাশের ব্যাগে বসতে। আমি তাই করলাম।

"এখানে বায়ু চলাচলের তেমন ব্যবস্থা নেই, ধূমপান করলে তোমার সমস্যা হবে?"

"কোন সমস্যা নেই, করতে পারো," আমি বললাম

"এই একটা অভ্যেস আমি কোনভাবেই বাদ দিতে পারছি না," সে তৃপ্তির ধোঁয়া ছেড়ে বলল। সবাই এরকম ধূমপান পছন্দ করে না রেইকো যতটা করে। আমি আঙ্গুর খেতে লাগলাম। সাবধানে খোসা ছারিয়ে। খেয়াল রাখলাম খোসা আর বীজ যেন বাইরে না পড়ে, একটা টিনের কৌটাকে ময়লার ডিব্বা হিসেবে ব্যবহার করলাম।

"তাহলে শুরু করা যাক, কতদুর গিয়েছিলাম কালকে আমরা?" রেইকো জিজ্ঞেস করল।

"অন্ধকার ঝড়ের রাতে তুমি পাখির বাসা জোগাড় করতে খাড়া পাহাড়ে উঠেছিলে।"

"তুমি দারুনভাবে মুখ স্বাভাবিক রেখে কৌতুক করতে পারো," রেইকো বলল। "উমম দাঁড়াও, মনে হয় শেষ বলেছিলাম আমি মেয়েটাকে প্রতি শনিবার সকালে পিয়ানো লেসন দিচ্ছিলাম।"

"হ্যাঁ, সেটাই।"

"পৃথিবীর মানুষকে তুমি দুভাগে ভাগ করতে পারো–যারা ভালো শেখাতে পারে, আর যারা পারে না–আমি প্রথম দলের," রেইকো বলল। "যখন ছোট ছিলাম তখন আমি এ নিয়ে কখনো ভাবিনি, কিংবা আমি হয়তো নিজেকে শিক্ষক হিসেবে কখনো দেখতেও চাইনি। কিন্তু বয়স হওয়ার পর, নিজেকে চেনার পর, বুঝতে পারলাম আমি আসলেই ভালো শিক্ষক। বেশ ভালো।"

"সে নিয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"নিজের চেয়ে অন্যর প্রতি আমার ধৈর্য অনেক বেশি, অন্যদের ভেতর থেকে তার ভালোটা বের করে আনতে পারি আমি যতটা না নিজের থেকে পারি। আমি সেরকম মানুষ। ম্যাচের বাক্সের ঘষা অংশটার মত হলাম আমি। আর তাতেই আমি খুশি। এ নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। দ্বিতীয় সারির ম্যাচ হওয়ার চেয়ে প্রথম সারির ম্যাচের বাক্স হওয়া ভালো। আমি নিজের ভেতর এটা পরিস্কার টের পেয়েছি, তারপরেই ঐ মেয়েকে শেখানো শুরু করেছি। এর আগেও যখন বয়স কম ছিল, কয়েকজনকে শিখিয়েছি, কিন্তু নিজের মত করে নয়, অন্যর সহকারি হিসেবে। ওকে শেখানো শুরুর পর থেকে নিজেকে সেভাবে দেখা শুরু করেছি। সবাই দেখো–আমি একজন ভালো শিক্ষক। এতই ভালো ছিল লেসনগুলো।"

"কালকে যা বলছিলাম, টেকনিক্যাল বাজানোর মত কিছু মেয়েটার মধ্যে ছিল না, আর তার পেশাদার মিউজিশিয়ান হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, তাই আমার কাজ সহজ ছিল। তার উপর সে যে স্কুলে পড়ছিল, সেখানে যে কেউ মোটামুটি

মাঝারি গ্রেড পেলেও সহজেই কলেজে ভর্তি হতে পারে, তারমানে তাকে মরার মত পড়াশোনাও করতে হবে না, আর ওর মাও সমস্যা ছিল না, তাই শেখানো সহজ ছিল। আমি তাকে কিছুর জন্য চাপ দেইনি। ওর সাথে প্রথম দেখাতেই বুঝতে পেরেছিলাম ও সেরকম মেয়ে যাদেরকে চাপ দিয়ে কিছু করানো যাবে না। সে ছিল সেরকম মেয়ে যে মিষ্টি করে সবকিছুতে হ্যাঁ-হ্যাঁ বলবে কিন্তু যা সে চায় না তা সে করবে না। তাই প্রথমেই আমি ওকে তা করতে দিলাম যা সে করতে চায়। একশ ভাগ নিজের মত করে বাজানো। তারপর একই জিনিস আমি ওর সামনে অন্যভাবে বাজালাম। তারপর আমরা আলোচনা করলাম কোনটা বেশি ভালো, কোনটা সে পছন্দ করে। তারপর তাকে আবার বাজাতে দিলাম, আগেরবারের চেয়ে তার বাজানো এবার দশগুণ ভালো হল। সে নিজে থেকেই বুঝতে পারল কোনটা ভালো কাজ করে আর সেগুলো সে নিজের মধ্যে নিয়ে আসল।"

রেইকো এক মুহূর্তের জন্য থেমে সিগারেটের জ্বলন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। আমি কিছু না বলে চুপচাপ আঙ্গুর খেতে থাকলাম।

"আমি জানি মিউজিক সম্পর্কে আমার নিজের ভালো ধারনা আছে, কিন্তু তার আরও বেশি ছিল। আমার মনে হত কি বিশাল অপচয়! আমার মনে হত যদি সে একজন ভালো শিক্ষকের কাছে শুরু করতে পারত, ভালো ট্রেনিং পেত, সে অনেকদুর যেতে পারত! কিন্তু আমার ধারনা ভুল ছিল। সে ঐ ধরনের মেয়ে না যে যথাযথ ট্রেনিং হজম করতে পারবে। এরকম কিছু মানুষ আছে। তাদের মেধা অসামান্য, কিন্তু সে মেধা কাজে লাগানোর কোন চেষ্টাই তারা করে না। অল্প কিছু নাড়াচাড়া করেই তারা শেষ করে দেয়। আমি এরকম মানুষ অনেক দেখেছি। প্রথমে তোমার মনে হবে তারা খুবই দারুন। ধর তারা কোন জটিল মিউজিক পিস দেখা মাত্র বুঝে ফেলতে পারে, আর ভালোভাবে বাজিয়েও ফেলতে পারে। তুমি তাদের বাজানো দেখে পাগল হয়ে যাবে। তোমার মনে হবে আমি হাজার বছর ধরে চেষ্টা করলেও এরকম বাজাতে পারবো না। কিন্তু তাদের দৌড় ঐ পর্যন্তই। এর বেশি তারা যেতে পারে না। কেন পারে না? কারন তারা কোন চেষ্টা, কোন পরিশ্রম করে না। তাদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নেই। তারা বিপথে চলে গেছে। তাদের যথেষ্ট মেধা ছিল, তাই তারা অনেককিছু ভালো বাজাতে পারত কোন চেষ্টা ছাড়াই, আর তারা ছোটবেলা থেকেই লোকজনের প্রসংসা শুনে বড় হয়েছে, তাই পরিশ্রম তাদের কাছে সময় নষ্ট মনে হয়। তারা এমন কিছু মিউজিক পিস বেছে নেবে যেটা অন্যদের তুলতে হয়তো তিন সপ্তাহ লাগবে, তারপর তারা অর্ধেক সময়ে তা মোটামুটি তুলে ফেলবে, আর

শিক্ষকদের মনে হবে তারা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে, তাই তাদেরকে পরের কাজ করতে দেবে। তারা সেটাও অর্ধেক সময়ে করবে আর তারপরেরটা শুরু করবে। তারা কখনোই শিক্ষকের চাপের মধ্যে নিজেকে ফেলবে না। চরিত্র গঠনের জন্য যেটা সবচেয়ে জরুরি। খুব খারাপ। আমার নিজের স্বভাবও এমন ছিল কিন্তু ভাগ্য ভালো যে আমি খুব কঠিন একজন শিক্ষক পেয়েছিলাম যে চাপের মধ্যে রাখত।"

"যাহোক, ওকে শেখানোর মধ্যে আনন্দ পেয়েছিলাম। যেন খোলা রাস্তায় স্পোর্টস কার চালানোর মত, যেগুলোতে হালকা স্পর্শতেই কাজ করে–কখনো কখনো একটু বেশি তাড়াতাড়ি কাজ করে। এই ধরনের বাচ্চাদের শেখানোর উপায় হল, তাদের বেশি প্রশংসা না করা। তারা প্রসংসায় এত অভ্যস্ত থাকে যে তারা প্রশংসা দাম দেয় না। তোমাকে বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে হবে এদের সাথে। আর তুমি তাদের উপর কিছু চাপিয়েও দিতে পারবে না। তাদেরকে নিজে নিজে করতে শেখাতে হবে। তাদেরকে তাড়াহুড়ো করে একটা শেষ করে পরেরটা শুরু করতে দেয়া যাবে না। তাদেরকে চিন্তা করাতে হবে। ব্যাস, ওইটুকুই। ওইটুকু করতে পারলেই তুমি ভালো ফলাফল পাবে।"

রেইকো তার ঠোঁট থেকে সিগারেটে অবশিষ্ট মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেলল। তারপর লম্বা নিশ্বাস নিল যেন নিজেকে শান্ত করতে চাইছে।

"যখন ওর ক্লাস শেষ হত, আমরা একসাথে বসে গল্প করতাম রঙ চা খেতাম। কখনো কখনো আমি ওকে জ্যাজ পিয়ানো বাজানোর স্টাইল দেখাতাম–যেমন, বাড পাওয়েল এভাবে বাজায়, কিংবা থেলোনিয়াস মঙ্ক এভাবে বাজায়। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই সে কথা বলতো। আর কত্ত কথা যে সে বলতে পারত! সে ঠিকই তোমার মনোযোগ নিয়ে নেবে। কালকে যেমন বলেছিলাম, আমার মনে হয় তার বেশিরভাগ কাহিনীই বানোয়াট ছিল। তবে ইন্টারেস্টিংও ছিল। সে খুব পর্যবেক্ষক ছিল, বুঝেশুনে প্রতিটা কথা বলতো, স্পষ্ট কিন্তু মজা করে। সে তোমার আবেগ ছিদ্র করে ঢুকে যাবে। হ্যাঁ সত্যি, সেটা সে খুব ভালো পারতো। লোকজনের মন নিয়ে খেলা। তোমাকে পুতুলের মত নাচানো। আর সে জানত তার এই ক্ষমতা আছে। সে এই ক্ষমতা দক্ষতা আর কার্যকরিভাবে ব্যবহার করত। সে যা চায় তা সে তোমাকে অনুভব করতে বাধ্য করতে পারবে–রাগ কিংবা দুঃখ কিংবা সহানুভূতিশীল কিংবা হতাশ কিংবা সুখি। সে কোন কারন ছাড়াই মানুষের আবেগ নিয়ে খেলে কারন সে তার নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করতে চায়। অবশ্য আমি এসব বুঝেছি পরে। তখন আমার কোন ধারনা ছিল না সে কি করছে আমাকে নিয়ে।"

রেইকো কয়েকটা আঙ্গুর খেতে খেতে মাথা নাড়াল।

"অসুস্থ," সে বলল। "মেয়েটা পুরোই অসুস্থ ছিল। সে ছিল পচা আপেলের মত, যার সাথে থাকলে বাকি আপেলও পচে যায়। আর কোনকিছুতেই তার সুস্থ হওয়ার সুযোগ নেই। মারা যাওয়া না পর্যন্ত সে এরকম অসুস্থই থাকবে। সেদিক থেকে ভাবলে সে ছিল দুঃখি ছোট একটা রাক্ষুসি। তার প্রতি হয়তো আমার সমবেদনা থাকতো যদি না আমাকে সে তার শিকার বানাতো। আমি হয়তো তাকেই কারো শিকার হিসেবে দেখতাম।"

রেইকো আরও কয়েকটা আঙ্গুর মুখে পুরল। মনে হল সে ভাবছে কিভাবে আরও ভালোভাবে গুছিয়ে গল্পটা বলা যায়।

"যাহোক, ছয়মাস আমার তার সাথে ভালো সময়ই কেটেছিল। তার গল্প কখনো কখনো আমার কাছে একটু অদ্ভুত লাগত। সে হয়তো কাহিনী বলছে, আমার শুনে ভয় লাগত, সে কাউকে একটু বেশিই ঘৃণা করে ফেলছে, কিংবা সে হয়তো একটু বেশিই চালাক। আমি মনে মনে ভাবতাম তার মনের ভেতর আসলে কি আছে। কিন্তু যত যাহোক, সবার মধ্যেই তো কিছু না কিছু দোষ থাকে, তাই না? আর সবচেয়ে বড় কথা হল ওর চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার আমি কে? আমি তো স্রেফ ওর পিয়ানো টিচার। আমার চিন্তা শুধু ও ঠিকমত প্র্যাকটিস করে কিনা। তাছাড়া সত্যি বলতে আমি ওকে পছন্দ করতাম। ভালোই পছন্দ করতাম।

"তারপরেও আমি সাবধান ছিলাম, ওকে আমার কোন ব্যক্তিগত কথা বলিনি। আমার ভেতর থেকে মনে হয়েছে ওর সাথে নিজের ব্যাপারে কোন কথা না বলাই ভালো। সে আমাকে একশ একটা প্রশ্ন করেছে–আমার ব্যাপারে জানার জন্য সে মারা যাচ্ছিল–কিন্তু আমি শুধু তাকে সাধারণ জিনিস বলেছি, যেমন আমার ছোটবেলা কিংবা কোন স্কুলে গিয়েছি এইসব। সে আরও বেশি জানতে চাইত, কিন্তু আমি ওকে বলেছি আর কিছু নেই বলার মত, আমার জীবন খুবই বোরিং, আমার স্বামী খুবই সাধারণ একজন মানুষ, বাচ্চাও সাধারণ, আর সারাদিন বাসার কাজ করি। 'আমি তোমাকে অনেক পছন্দ করি,' সে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলতো। তার চোখের ভাষায় কোন ইশারা ছিল, আমার গায়ে কাঁটা দিত। ভালো লাগত কিন্তু তবুও আমি তাকে এর বেশি কিছু বলিনি।

"তারপর এল সেই বিশেষ দিন–মে মাসের একদিন, যতদুর মনে পড়ে–তার লেসনের মাঝখানে সে বলল তার শরীর খারাপ লাগছে। দেখলাম তার মুখ শুকিয়ে গেছে, ঘাম হচ্ছে। আমি প্রশ্ন করলাম সে বাসায় যেতে চায়

কিনা, কিন্তু সে বলল কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে তার হয়তো ভালো লাগবে। আমি আক্ষরিকভাবেই তাকে কোলে করে বেডরুমে নিয়ে গেলাম। আমাদের সোফা অনেক ছোট ছিল, বিছানা ছাড়া কোথাও তাকে শোয়ানো সম্ভব ছিল না। সে এই সমস্যার জন্য ক্ষমা চাইতে লাগল, আমি ওকে শান্ত করলাম এই বলে যে, এটা কোন সমস্যাই না, সে কোন কিছু পান করতে চায় কিনা। সে না করল, বলল আমি যেন তার কাছেই থাকি, আমি বললাম কোন সমস্যা নেই।

"কয়েক মিনিট পরে সে বলল আমি তার পিঠটায় একটু ম্যাসাজ করে দিতে পারবো কিনা। ওর গলা শুনে মনে হচ্ছিল সে অনেক কষ্ট পাচ্ছে, আর ভয়াবহ ঘামছিল, আমি তাকে ভালো করে ম্যাসাজ করে দিতে লাগলাম। তারপর সে আবার ক্ষমা চেয়ে বলল, তার ব্রা খুলে দিতে আমার কোন সমস্যা আছে কিনা, তার নাকি ব্যথা লাগছে। আমিও কিছু না বুঝে তাই করলাম। ওর পরনে ছিল স্কিন টাইট ব্লাউজ, আমার বেশ কসরত করে ওর ব্লাউজের বোতামগুলো আর ব্রায়ের হুক খুলতে হল। তের বছরের একজন মেয়ের তুলনায় ওর বুক বেশ উন্নত। আমার প্রায় দ্বিগুন। আর সে কিশোরিদের ব্রা পরা ছিল না, তার ব্রা ছিল একদম পূর্ণবয়স্কা মডেলদের মত দামি। অবশ্যই আমি তখন এসবে এত মনোযোগ দেইনি, আমি গাধার মত তার পিঠ মাসাজ করতে লাগলাম। সে বার বার ক্ষমা চেয়ে যেতে লাগল, তার গলা শুনে মনে হচ্ছিল কষ্টে মারা যাচ্ছে। আর আমি খালি বলছিলাম 'ইটস ওকে, ইটস ওকে।' "

রেইকো তার পরবর্তি সিগারেটের ছাই ঝারল মেঝেতে। আর আমি আঙ্গুর খাওয়া বাদ দিয়ে আমার পুরো মনোযোগ ওর গল্পের মধ্যে ঢেলে দিয়েছি।

"কিছুক্ষণ পর সে ফোঁপাতে লাগল। 'কি হয়েছে? কি হয়েছে?' আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম। 'কিছু না।' সে বলল। 'মনে তো হচ্ছে না কিছু না।' আমি বললাম। 'সত্যি কথা বলো আমাকে। কি হয়েছে তোমার?' তারপর সে বলল 'আমার এরকম মাঝে মাঝে হয়। আমি বুঝতে পারি না কী করবো। আমি খুব একা আর দুঃখি, আমি কারো সাথে মন খুলে কথা বলতে পারি না, কেউ আমাকে ভালোবাসে না। যখন অনেক কষ্ট পাই তখন এরকম হয়। আমি রাতে ঘুমাতে পারি না। আমার খাওয়ার রুচি চলে যায়। শুধু এখানে পিয়ানো শিখতে আসলেই আমার যা একটু ভালো লাগে।' সুতরাং আমি বললাম, 'তুমি আমার সাথে কথা বলতে পারো। বলো এরকম কেন হচ্ছে তোমার।' তার বাসার অবস্থা ভালো নয়, সে বলল। তার বাবা তার মাকে ভালোবাসতে পারছে না। তারাও তাকে ভালোবাসে না। বাবার সাথে আরেক মহিলার সম্পর্ক হয়েছে তাই খুব কম বাসায় আসে। একারনে তার মা আধপাগল হয়ে গেছে, আর সমস্ত রাগ ওর

উপর ঝাড়ে। ওর মা নাকি ওকে প্রায় প্রতিদিনই মারধোর করে, তাই ওর আর বাসায় যেতে ইচ্ছে করে না। সে বিলাপ করছিল, তার চোখ ভর্তি পানি। আহা, ঐ সুন্দর চোখগুলো। ঈশ্বরের মনকেও গলিয়ে দিতে পারে ঐ চোখগুলো। তাই আমি ওকে বললাম, ওর বাসায় যদি এরকম ঘটনা হয়, সে যখন খুশি আমার এখানে চলে আসতে পারে। এটা শুনে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ওহ আমি সরি, তুমি না থাকলে আমি যে কী করতাম। আমাকে কখনো ছেড়ে যেও না। আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।'

"তারপর আমি জানি না, আমি ওর মাথা বুকে চেপে ছিলাম আর সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে ছিল। তার হাত আমার পিঠে ঘসছিল, আমার কেমন জানি অদ্ভুত লাগতে লাগল, আমি উত্তেজিত বোধ করতে শুরু করলাম। মানে, বুঝতে পারছো, এরকম ছবির মত সুন্দর একটি মেয়ে আমার সাথে বিছানায়, আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে, আমার শরীরে হাত ঘষছে এমনভাবে যা আমি আমার স্বামীর সাথেও বোধ করিনি। আমার মনে হচ্ছিল, যতবারই সে আমাকে স্পর্শ করছে, আমার শরীরের সব স্ক্রু একটার পর একটা ঢিলে হয়ে খুলে আসছে, আর আমি কিছু বোঝার আগেই সে আমার ব্লাউজ আর ব্রা খুলে ফেলে বুকে তার মুখ ঘষতে লাগল। শুধু সেই সময়ই আমি বুঝতে পারলাম, সে উপরে যাই সাজুক ভেতরে একজন সমকামি...লেসবিয়ান। এরকম আমার আগেও একবার হয়েছিল, হাই-স্কুলে থাকতে, উপরের ক্লাসের মেয়েদের সাথে। যাহোক, আমি তাকে থামতে বললাম।

'ওহ্ প্লিজ!' বলল সে, 'আর একটু, আমি খুব একা। আমাকে বিশ্বাস করো, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, আমাকে দূরে ঠেলে দিও না।' সে আমার হাত নিয়ে তার বুকে রাখল–তার চমৎকার সুডৌল স্তন, অবশ্যই আমি একজন নারী, কিন্তু তারপরেও ওর স্তন ছুতেই আমার ভেতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম না কি করা উচিত। আমি খালি বোকার মত না না না করছিলাম। মনে হচ্ছিল অবশ হয়ে গিয়েছি, নড়তে পারছিলাম না এক বিন্দু। হাই-স্কুলে মেয়েদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে পেরেছিলাম, কিন্তু এবার আমি কিছুই করতে পারছিলাম না। আমার শরীর কোন নির্দেশ নিচ্ছিল না। সে তার বাম হাত দিয়ে আমার ডান হাত ধরে রেখে আমার বুকে চুমু খাচ্ছিল, আর ডান হাত দিয়ে আমার পেছনে, পাশে আর নিচে হাতাচ্ছিল। দৃশ্যটা বুঝতে পারছো? আমি আমার বেডরুমে বিছানায়, জানালার পর্দা টানা, তের বছরের একটা মেয়ে আমাকে প্রায় নগ্ন করে ফেলেছে, আমার শরীরের বিভিন্ন অংশে স্পর্শ করে যাচ্ছে আর আমি যৌন উত্তেজনায় মোচড়াচ্ছি। এখন ভাবলে আজব

লাগে। পুরোই পাগলামি না? কিন্তু সে সময় সে যেন আমাকে জাদু করে ফেলেছিল।"

সিগারেটে টান দেয়ার জন্য একটু বিরতি দিল রেইকো।

"জানো? এই প্রথম আমি কোন পুরুষকে এই কাহিনী বললাম," সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল। "তোমাকে বলেছি কারন কেন জানি আমার মনে হয়েছে তোমাকে আমার বলতে হবে। কিন্তু আসলে পুরো ব্যাপারটা আমার জন্য খুবই বিব্রতকর।"

"আমি সরি," বললাম তাকে, কারন আর কি বলা যেতে পারে আমার মাথায় আসল না।

"এরকম কিছুক্ষণ চলল, তারপর ওর ডান হাত নিচে নামাতে নামাতে আমার প্যান্টির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ততক্ষনে আমি পুরোপুরি উত্তেজিত। বলতে লজ্জা লাগছে কিন্তু এটা সত্যি আমি কখনো এরকম উত্তেজিত হইনি, একবারও না। সেক্সের ব্যাপারে আমার কখনো সেরকম আগ্রহ ছিল না। কিন্তু সে যখন তার সুন্দর লম্বা নরম আঙুলগুলো আমার প্যানটির ভেতর ঢুকালো আর...বুঝতেই পারছো...আমার পক্ষে বলে বোঝানো মুশকিল। মানে, একজন ছেলের মোটা গাবদা হাত ওখানে দেয়ার থেকে পুরোপুরি আলাদা ব্যাপার। অন্যরকম একটা অনুভূতি। আমার মনে হচ্ছিল মাথার তার সব ছিঁড়ে যাবে যে কোন সময়। তারপরেও আমার অবশ ব্রেনের কোথাও এই চিন্তা আসল যে আমাকে এটা থামাতে হবে। একবার যদি আমি এটা হতে দেই, আমি আর কখনো থামাতে পারবো না, আমাকে সারা জীবন এই গোপনিয়তা বহন করতে হবে, আমার মাথায় আবার সব জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। আমি আমার মেয়ের কথাও ভাবলাম। কেমন হবে যদি সে আমাকে এই অবস্থায় দেখে ফেলে? তার শনিবার আমার বাবা-মায়ের বাসায় তিনটা পর্যন্ত থাকার কথা, যদি সে কোন কারনে আগে চলে আসে না বলে? এইসব চিন্তা আমাকে শক্তি যোগাল, বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালাম আমি। 'থামো, এক্ষুনি থামো!' আমি চিৎকার করে বললাম।

"সে থামল না, বরং টান দিয়ে আমার প্যান্টি নামিয়ে তার জিহ্বা দিয়ে শুরু করল। আমি আমার স্বামীকেও কখনো এমন করতে দেইনি। আমার কাছে খুবই বিব্রতকর লাগে। আর এখন কিনা একটা তের বছরের মেয়ে এই কাজ করছে। আমি সব ছেড়ে দিলাম। কাঁদা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। আর অনুভূতিটি ছিল স্বর্গিয়।

" 'থামো!' আমি আরেকবার চিৎকার করে বললাম, তারপর যত জোরে

সম্ভব একটা চড় বসিয়ে দিলাম ওর গালে। অবশেষে সে থামল, উঠে আমার দিকে তাকাল। আমরা দু-জন নগ্ন, বিছানায় হাঁটুর উপর ভর দিয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে আছি। ওর বয়স তের, আমার একত্রিশ, আমি জানি না কেন কিন্তু ওর নগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। ঐ দৃশ্য আমার মনে এখনও স্পষ্ট। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি একটা তের বছরের মেয়ের শরীরের দিকে তাকিয়ে আছি, এখনও বিশ্বাস হয় না। ওর তুলনায় আমার যে শরীর ছিল তা দেখলে তুমি কেঁদে ফেলতে, বিশ্বাস করো।"

আমার বলার কিছু ছিল না, বললামও না কিছু।

"'কি সমস্যা তোমার?' আমাকে বলল সে। 'তোমার তো ভালোই লাগছিল, বলো লাগছিল না? আমি জানতাম তোমার ভালো লাগবে, প্রথম দিনে যখন দেখা হল তখনই বুঝেছিলাম। একজন পুরুষের সাথে মিলিত হবার চেয়ে তো ভালো, নাকি? দেখো তুমি কতখানি উত্তেজিত, ভিজে গেছো। আমি তোমাকে আরও সুখ দিতে পারবো, বিশ্বাস করো। সত্যি বলছি তোমার মনে হবে শরীর যেন গলে যাচ্ছে। তুমি চাও আমি তা করি, চাও না?' সে ঠিকই বলেছিল। তার সাথে এসব করা আমার স্বামীর সাথে করার চেয়ে অনেক ভালো ছিল। আমি আসলে চাচ্ছিলাম সে আরও করুক! কিন্তু আমি তা হতে দিতে পারিনি, 'সপ্তাহে একবার করবো খালি,' সে বলল। 'কেউ কখনো জানবে না, আমাদের মধ্যেই গোপন থাকবে।' "

"কিন্তু আমি বিছানা থেকে নেমে শরীরে রোব জড়ালাম আর ওকে বললাম বেরিয়ে যেতে, আর কখনো যেন না আসে। সে আমার দিকে খালি তাকিয়ে থাকল। তার চোখ একদম সমতল হয়ে গিয়েছিল। আমি ওগুলোকে আগে কখনো অমন দেখিনি। যেন কার্ড বোর্ডে রঙ করা। কোন গভীরতা ছিল না। আমার দিকে এভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে কোন কথা না বলে তার কাপড় সব জড়ো করল, তারপর যত ধীরে সম্ভব একটা একটা করে পরল। পিয়ানোর রুমে গিয়ে ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়ে, রুমাল বের করে ঠোঁট থেকে রক্ত মুছে জুতো পরে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাওয়ার আগে সে বলল, 'তুমি একজন লেসবিয়ান, তুমি জানো সেটা, এটা সত্যি। তুমি লুকানোর চেষ্টা করতে পারো, কিন্তু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তুমি লেসবিয়ানই থাকবে।'"

"এটা কি সত্যি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

রেইকো তার ঠোঁট বাঁকিয়ে একটু চিন্তা করল কিছুক্ষণ। "হ্যাঁ এবং না। আমার স্বামীর চেয়ে ওর সঙ্গ আমার বেশি ভালো লেগেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেটা সত্যি। একটা সময় এই প্রশ্ন আমাকে অনেক কষ্ট দিত। হয়তো

আমি লেসবিয়ান ছিলাম কিন্তু সেইদিনের আগে বুঝিনি। কিন্তু এখন আর সেরকম মনে হয় না। বলা ঠিক হবে না, আমার সেরকম কোন ঝোঁক নেই। হয়ত আছে। কিন্তু সংজ্ঞা অনুযায়ি আমি লেসবিয়ান নই। আমি কখনো কোন মেয়ের দিকে তাকিয়ে সেরকম অনুভব করি না। বোঝাতে পারলাম?"

মাথা ঝাঁকালাম আমি।

"কয়েক ধরনের মেয়েদের দেখলে আমার সেরকম অনুভূতি হয়, আমি বুঝতে পারি যখন হয়। আমি নাওকোকে জড়িয়ে ধরে থাকলে আমার সেরকম কোন কিছু অনুভব হয় না। গরমের সময়ে আমরা অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে রীতিমত নগ্ন ঘুরে বেড়াই, একসাথে গোসল করি, কখনো কখনো এক বিছানায় একসাথে ঘুমাই, কিন্তু কিছু হয় না, আমি কিছু অনুভব করি না। আমি জানি ওর সুন্দর একটা শরীর আছে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তবে নাওকো আর আমি একবার একটা খেলা খেলেছিলাম। আমরা বিশ্বাস করিয়েছিলাম, আমরা লেসবিয়ান। কাহিনীটা শুনতে চাও?"

"অবশ্যই শুনতে চাই।"

"আমরা দু-জন দু-জনকে সব কিছু বলি, যখন আমি আমার এই কাহিনীটা, যেটা এইমাত্র তোমাকে বললাম, তাকে জানালাম-নাওকো একটা পরীক্ষা চালাল। আমরা দু-জন জামাকাপড় খুলে নগ্ন হলাম। সে আমাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা চালাল। কাজ হয়নি। কাতুকুতু লাগছিল শুধু। আমার মনে হচ্ছিল হাসতে হাসতে মারা যাবো আমি। ভাবলে এখনও আমার কাতুকুতি পায়। ওর অবস্থা ছিল জবরজং! আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুমি এটা শুনে খুশি হয়েছো।"

"সত্যি কথা বলতে, হ্যাঁ।"

"যাইহোক, এই হল কাহিনী।" আঙুল দিয়ে ভুরু চুলকাতে চুলকাতে রেইকো বলল। "মেয়েটা ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর আমি একটা চেয়ারে বসে কিছুক্ষনের জন্য দিশা হারিয়ে ফেললাম। বুঝতে পারছিলাম না কী করবো। বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডের বাড়ি শুনতে পারছিলাম। মনে হচ্ছিল আমার হাত পায়ের ওজন কয়েক টন বেড়ে গেছে, মুখের ভেতর মনে হচ্ছিল কোন পোকা খেয়ে ফেলেছি বা কিছু, একদম শুকিয়ে গিয়েছিল। আমি নিজেকে টেনে বাথটাবে নিয়ে গেলাম, যদিও জানতাম যে কোন সময়ে আমার মেয়ে এসে পড়বে। আমি চাইছিলাম, যে জায়গায় সে আমাকে স্পর্শ করেছে সব ধুয়ে পরিস্কার করতে। আমি বারবার সাবান ঘষতে লাগলাম, কিন্তু সে যে স্পর্শের অনুভূতি ফেলে গেছে তা কোনভাবেই যাচ্ছিলনা। আমি জানতাম যে এসব আমার কল্পনা মাত্র, কিন্তু জানলেও কোন কাজ হচ্ছিল না। সে রাতে আমার স্বামী আমাকে বিছানায়

চাইলো, আমার জন্য মুক্তির রাস্তা ছিল বলা যেতে পারে, আমি তাকে কিছুই জানাইনি–আমি পারিনি আসলে। আমি তাকে খালি বলছিলাম ধীরে করতে সব কিছু, অন্য সময়ের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে করতে। আর সে তাই করেছিল। সে ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলোতে মনোযোগ দিয়ে যত্নসহকারে সময় নিয়ে সব করেছিল। ঐ রাতে আমার যে রকমভাবে অরগাজম হয়েছিল আগে তা কখনো হয়নি, আমার পুরো বিবাহিত জীবনে নয়। তোমার কি মনে হয় কেন? কারন সেই মেয়ের আঙুলের স্পর্শ তখনও আমার শরীর ছিল, সেজন্যই।

"কী আর বলবো, খুবই বিব্রতকর, খুবই লজ্জাজনক ছিল পুরো ব্যাপারটা। দেখো আমি ঘেমে গিয়েছি! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আমি তোমাকে এগুলো বলছি, 'আমার স্বামী আমাকে বিছানায় চাইলো,' 'ওরকম অরগাজম কখনো হয়নি'!" রেইকো ঠোঁট বাঁকিয়ে আবার হাসল। "কিন্তু কাজ হয়নি, দু-তিনদিন পরেও তার স্পর্শ সেখানে ছিল। আর তার শেষ কথাগুলো আমার মাথায় প্রতিধ্বনি তুলছিল।

"পরের শনিবার সে আসেনি। সারাটা দিন আমার বুক ধড়পড় করছিল যদি সে আসে! আমি কোন কাজ করতে পারিনি, মনোযোগ বসছিল না। আর কখনো আসেনি অবশ্য। ও অহংকারী ছিল ঠিকই, আমার উপর ওর বিশ্বাস শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে তার পরের সপ্তাহেও আসেনি, তার পরের পরের সপ্তাহেও না, এক মাস পার হয়ে গেল। আমি ধরে নিয়েছিলাম সময় গেলে আমি সব ভুলে যেতে পারবো, কিন্তু পারিনি। যখন বাসায় একা থাকতাম, তার উপস্থিতি অনুভব করতাম, স্নায়ুতে আঘাত করত। পিয়ানো বাজাতে পারতাম না, কিছু চিন্তা করতে পারতাম না, প্রথম মাস আমি একদম কোন কাজ করতে পারিনি। তারপর একদিন বাইরে গেলে আমার মনে হল কোন কিছু একটা ঠিক নেই। আশেপাশের লোকজন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। ওদের দৃষ্টি ছিল অন্যরকম। দেখা হলে তারা ভদ্রভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু তাদের গলার সুর অন্যরকম শোনাচ্ছিল। তাদের ব্যবহার অস্বাভাবিক লাগছিল আমার কাছে। আমার প্রতিবেশী মহিলা, যে মাঝে মধ্যে আমার সাথে গল্প করতে আসতো, আমাকে এড়িয়ে চলছে মনে হল। আমি এসব নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা করতে চাইলাম না। কারন এসব মনে হওয়া আমার অসুস্থতার প্রথম লক্ষণ।

"তারপর একদিন আরেকজন মহিলা, যার সাথে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, দেখা করতে আসল। আমরা সমবয়সি ছিলাম, সে ছিল আমার মায়ের বান্ধবির মেয়ে, আর ওর মেয়েও আমার মেয়ের সাথে একই কিন্ডারগার্টেনে গিয়েছিল, তাই আমরা ভালোই ঘনিষ্ঠ ছিলাম বলা যায়। সে একদিন হাজির হয়ে

বলল আমাকে নিয়ে খুব খারাপ একটা গুজব চলছে আমি কিছু জানি কিনা। আমি বললাম আমি কিছু জানি না।"

"কি গুজব?" জানতে চাইলাম।

"বলতে পারবো না, খুবই জঘন্য," সে বলল

"কিন্তু এতটুকু যখন বলেছো, বাকিটা তো বলতেই হবে।"

"তারপরেও সে অনেকক্ষণ গরিমসি করল কিন্তু আমি তার থেকে বের করেই ছাড়লাম। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল সে যা শুনেছে আমাকে তা বলা, সুতরাং একসময় না একসময় তাকে বলতেই হত। তার ভাষ্যমতে, লোকজন বলছে আমি একজন সুযোগ সন্ধানি ছুপা লেসবিয়ান, যে কিনা কিছুদিন পরপর মানসিক হাসপাতালে যায়। আর আমি নাকি আমার পিয়ানোর ছাত্রির জামাকাপড় টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছি, খারাপ কিছু করতে চেয়েছি। সে বাঁধা দিলে এমন মারধোর করেছি যে তার মুখ ফুলে গেছে। তারা এসব কাহিনী বানালেও, খারাপ বিষয় যেটা সেটা হল, তারা জানতো আমি হাসপাতালে ছিলাম।

"আমার বান্ধবি সবাইকে বলছিল সে আমাকে অনেকদিন থেকে চেনে, যেরকম বলা হচ্ছে আমি মোটেও সেরকম না, কিন্তু ঐ মেয়ের বাবা-মা স্বাভাবিকভাবেই মেয়ের গল্পটাই বিশ্বাস করেছিল আর চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। সেই সাথে তারা আমার ব্যাপারে খোঁজ-খবরও নিয়েছিল। সেজন্য আমার মানসিক অসুস্থতার ইতিহাস তাদের অজানা নয়।

"আমার বান্ধবি যেরকমভাবে কাহিনীটা শুনেছে সেটা হল, মেয়েটা ক্লাস থেকে বাসায় গেছে একদিন–সেইদিন। তার মুখ ফোলা, ঠোঁট কাঁটা এবং রক্তাক্ত, ব্লাউজের বোতাম নেই, এমনকি তার অন্তর্বাস পর্যন্ত ছেঁড়া। বিশ্বাস করা যায়? সে এসব সব করেছে তার কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য। তার মা তার থেকে পুরো কাহিনী 'টেনে' বের করে। আমি পুরো দৃশটা দেখতে পারছি–ব্লাউজে রক্ত ফেলছে, বোতাম ছিঁড়ছে, ব্রা এর ফিতা ছিঁড়ছে, চোখ লাল না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কেঁদে যাচ্ছে, চুল আউলা ঝাউলা, মাকে এক বস্তা মিথ্যা গল্প শোনাচ্ছে।

"যারা ওর গল্প বিশ্বাস করেছে তাদের আমি দোষ দিচ্ছি না। আমি নিজেও তাকে বিশ্বাস করতাম। এই পুতুলের মত সুন্দর মেয়েটার জিহ্বা সাপের মত। সে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় আসল, কিছু বলতে পারছে না কারন লজ্জাজনক ব্যাপার, শেষে কোনরকমে বলে ফেলল কি ঘটেছে, লোকজন অবশ্যই তাকে বিশ্বাস করবে। আরও খারাপ ব্যাপার, আমার সত্যি সত্যি হাসপাতালে থাকার

ইতিহাস আছে, আমি তাকে সত্যি সত্যি থাপ্পড় মেরেছি, আমাকে কে বিশ্বাস করতে যাবে? হয়তো শুধুমাত্র আমার স্বামী আমাকে বিশ্বাস করতে পারে। আর কেউ না।"

"পরের কিছুদিন আমি নিজের সাথে যুদ্ধ করলাম তাকে সব খুলে বলবো কিনা, যখন বললাম, সে আমাকে বিশ্বাস করল। অবশ্যই। আমি তাকে সব বললাম, ঐদিন যা যা হয়েছে–লেসবিয়ান মেয়েটা কি কি করেছে আমার সাথে, কিভাবে আমি তাকে থাপ্পড় মেরেছি। আমি শুধু তাকে বলিনি আমার অনুভূতি কি ছিল। আমার পক্ষে সেটা বলা সম্ভব ছিল না। যাহোক, সে ভীষণ ক্ষেপে গেল, জোরাজুরি করতে লাগল, ঐ মেয়ের বাসায় যাবে। 'আমাকে বিয়ে করেছো তুমি, তুমি একজন মা। কোনভাবেই তুমি একজন লেসবিয়ান নও। ফাজলামির জায়গা পায় না।'

"কিন্তু আমি তাকে যেতে দেইনি। আরও খারাপ হত তাহলে পুরো ব্যাপারটা। আমি জানতাম ঐ মেয়ে ভীষণভাবে অসুস্থ। আমি কয়েকশো অসুস্থ মানুষ দেখেছি আমি। মেয়েটার ভেতরটা একদম পচে গিয়েছিল। ঐ সুন্দর চামড়া তুলে ফেলো, ভেতরে পচা মাংসও ছাড়া আর কিছু পাবে না তুমি। আমি জানি আমি খুব খারাপভাবে বলছি কিন্তু এটা পুরোপুরি সত্যি। আমি এটাও জানতাম সাধারণ মানুষ তার সত্যিকারের দিক কখনো দেখতে পারবে না। আমাদের জেতার কোন সুযোগই নেই। প্রথম কথা, কে বিশ্বাস করবে একজন তের বছরের মেয়ে ফাঁদে ফেলে একত্রিশ বছরের এক মহিলাকে সমকাম করতে চেয়েছে? আমরা যাই বলি না কেন তারা তাই বিশ্বাস করবে যা তারা বিশ্বাস করতে চায়। আমরা যত যুদ্ধ করবো তারা তত বিপদ বাড়বে।

"আমাদের সাথে একমাত্র পথ যেটা খোলা ছিল তা হল অন্য কোথাও চলে যাওয়া। এখানে যদি আমি এরকম চাপে আর বেশিদিন থাকি, আমি হয়তো আবার অসুস্থ হয়ে পড়বো। লক্ষণ টের পাচ্ছিলাম। আমাদেরকে অন্য কোথাও যেতে হবে যেখানে কেউ আমাদের চেনে না। আমার স্বামী যাওয়ার জন্য তৈরি ছিল না। সে বুঝতে পারেনি সমস্যাটা কত বড়। আর সময়টাও খারাপ ছিল। সে তার চাকরি পছন্দ করত, আমরা নিজেদের বাসায় থিতু হতে পেরেছি, আমাদের মেয়ে তার কিন্ডারগার্টেন পছন্দ করে। 'কিছুদিন অপেক্ষা করো' সে বলল, 'আমরা হুট করে কোথাও চলে যেতে পারি না। চাকরি তো পেতে হবে। বাড়িও বিক্রি করতে হবে। আরেকটা কিন্ডারগারটেন পেতে হবে। দুই মাস সময় লাগবে কমপক্ষে।'

" 'দু-মাস অপেক্ষা করতে পারবো না,' তাকে বললাম। 'আমি একদম শেষ

হয়ে যাবো। বিশ্বাস করো, বানিয়ে বলছি না, আমি জানি কি চলছে' লক্ষণ স্পষ্ট তখন। কান ভো ভো করে, আজব সব শব্দ শুনতে পাই, ঘুমাতে পারছিলাম না আমি। সে প্রস্তাব করল, তাহলে আমি আগে যাই কোথাও। সে সব ঝামেলা মিটিয়ে পরে আমার কাছে চলে আসবে।

" 'না,' আমি বললাম, 'একা কোথাও যাবো না। তুমি না থাকলে আমি একদম ভেঙে পড়বো। তোমাকে আমার প্রয়োজন। আমাকে একা ছেড়ে দিও না।'

"সে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমাকে বোঝাল, অনুরোধ করল একটু ধৈর্য ধরতে। স্রেফ একমাস সময় চাইলো সে। এর মধ্যে সে সব গুছিয়ে ফেলবে–এই চাকরি ছেড়ে নতুন চাকরি নেবে, বাড়ি বিক্রি করবে, কিন্ডারগার্টেনের খোঁজ নেবে। এমনও হতে পারে অস্ট্রেলিয়া চলে যেতে হতে পারে। একমাস, তারপর সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমার এরপর আর কিছু বলার ছিল না। আমি যদি এর বেশি জোরাজুরি করি তো ফল আরও খারাপ হবে।"

রেইকো দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিলিঙের লাইটের দিকে তাকাল।

"একমাস অপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। একদিন আবার সেরকম হল। ধুপ! এইবার খুবই খারাপ অবস্থা। আমি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলাম। চুলার গ্যাসও চালানো ছিল। হুঁশ ফিরল যখন আমি হাসপাতালে। সবকিছু শেষ ততক্ষনে। কয়েকমাস লাগল চিন্তা করার মত শান্ত হতেই, তারপ আমার স্বামীকে বললাম আমাকে ডিভোর্স দিতে। আমি বললাম তার আর আমার মেয়ের জন্য এটাই সবচেয়ে ভালো হবে। সে বলল তার কোন ইচ্ছে নেই আমাকে ডিভোর্স দেয়ার।

" 'আমরা নতুন করে শুরু করতে পারি আবার' সে বলল। 'আমরা তিনজন নতুন কোথাও যেতে পারি, নতুন করে সব শুরু করতে।'"

"'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।' আমি তাকে বললাম। 'সবকিছু সেদিনই শেষ হয়ে গেছে যেদিন তুমি আমাকে বলেছিলে এক মাস অপেক্ষা করতে। তুমি যদি সত্যি নতুন করে শুরু করতে চাইতে, আমাকে সেটা বলা উচিত হয়নি। এখন আমরা যেখানেই যাই না কেন, যতদূরেই যাই না কেন, এই একই ঘটনা বার বার হতে থাকবে। আমিও একই জিনিস বার বার চাইতে থাকবো আর তুমি কষ্ট করবে। তা আমি আর চাই না।'"

"সুতরাং আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেল। কিংবা বলা যায় আমিই তাকে ডিভোর্স দিলাম। অবশ্য দুবছর আগে সে আবার বিয়ে করেছে। আমি খুশি যে আমি তাকে আমাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছি। সত্যি বলছি। আমি জানি আমি

সারাজীবন এরকমই থাকবো, আমি চাইনি আমার সাথে আরও কাউকে টেনে নিয়ে যেতে। আমি চাইনি কাউকে জোর করে আমার সাথে থাকতে আর সারাক্ষন ভয়ে ভয়ে থাকুক যে কখন আবার আমি পাগল হয়ে যাই।

"সে সবসময় আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে, একজন আদর্শ স্বামী, বিশ্বস্ত, শক্ত, এবং ধৈর্যশীল, যার উপর আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারতাম। আমাকে সুস্থ করার জন্য সে সবকিছু চেষ্টা করেছে, আমি সুস্থ হওয়ার জন্য সবকিছু চেষ্টা করেছি, তার জন্য আর আমাদের মেয়ের জন্য। আমি বিশ্বাস করতাম আমি সুস্থ হবো। আমাদের বিবাহিত জীবনের ছয় বছর আমি অত্যন্ত সুখি ছিলাম। দুপ! যা যা আমরা তৈরি করেছিলাম সব গুঁড়িয়ে গেল। এক সেকেন্ডের ভেতর সবকিছু নাই হয়ে গেল। ঐ মেয়েটা সব ধ্বংস করে ফেলল।"

রেইকো সিগারেটের সবগুলো অবশিষ্টাংশ তুলে টিনের ডিব্বায় ফেলল।

"ভয়াবহ কাহিনী। আমরা অনেক কষ্ট করেছি, অনেক, একটার পর একটা ইট দিয়ে নিজেদের পৃথিবী গড়েছি। আর যখন ধ্বংস হয়ে গেল, ধ্বংস হল চোখের পলকে। বোঝার আগেই সব শেষ।" রেইকো উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, "চল যাওয়া যাক, দেরি হয়ে গেছে।"

আকাশ আরও অন্ধকার বাইরে, মেঘ আর ঘন হয়ে জমেছে, চাঁদ পুরোপুরি অদৃশ্য। এখন টের পেলাম, রেইকোর মত আমিও বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ পাচ্ছি। সেই সাথে আমার হাতে ধরা ব্যাগের আঙুরের মিষ্টি গন্ধ।

"এজন্যই আমি এ জায়গা ছেড়ে যেতে পারি না," সে বলল। "বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে ভয় পাই। নতুন মানুষের সাথে দেখা করতে, নতুন অনুভুতির সাথে পরিচিত হতে ভয় পাই।"

"বুঝতে পারছি," আমি বললাম। "কিন্তু আমার মনে হয় তুমি পারবে।"

রেইকো হাসল কিন্তু কিছু বলল না।

*

নাওকো বই নিয়ে সোফায় বসে ছিল। পা ভাঁজ করে কপালের পাশে হাত রেখে বই পড়ছিল। তার আঙুল দেখে মনে হচ্ছিল প্রত্যেকটা শব্দ মাথায় ঢোকার আগে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটা বাড়ির চালে পড়ে শব্দ শুরু করল। ল্যাম্প লাইটের আলো যেন নাওকোর চারপাশে হালকা ধুলোর মত ভাসছিল। রেইকোর সাথে অনেকক্ষণ কথা বলার পর নাওকো যৌবন যেন নতুনভাবে আমাকে ধাক্কা মারল।

"সরি, আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেল," রেইকো নাওকোর মাথায় হাত রেখে বলল।

"মজা করেছো তো ঠিকমত?" নাওকো তার দিকে তাকিয়ে বলল।

"অবশ্যই," রেইকো উত্তর দিল।

"কি কি করেছো, শুনি?" নাওকো আমাকে প্রশ্ন করল, "দু-জন একা একা?"

"বলার অনুমতি নেই, ম্যাডাম," আমি উত্তর দিলাম।

নাওকো মুখ টিপে হেসে বই নামিয়ে রাখল। তারপর আমরা তিনজন একসাথে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে আঙ্গুর খেলাম।

"যখন এরকম বৃষ্টি হয়," নাওকো বলল। "মনে হয় যেন এই দুনিয়াতে শুধু আমরাই আছি। যদি এই বৃষ্টি শেষ না হত কখনো ভালো হত, আমরা তিনজন একসাথে থাকতে পারতাম তাহলে।"

"খুব ভালো," রেইকো বলল, "আর তোমরা দু-জন প্রেম করতে, আমি সম্ভবত দাসের মত বাতাস করতাম কিংবা পেছনে বসে গিটার বাজাতাম!"

"আরে না, তোমাকেও মাঝে মধ্যে সুযোগ দিতাম," নাওকো হাসতে হাসতে বলল।

"তাহলে ঠিক আছে, আমি রাজি," রেইকো বলল, "বৃষ্টি! চলতে থাক, থামিস না।"

আর বৃষ্টি চলতেই থাকল, থামল না। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাল। আমাদের আঙ্গুর খাওয়া শেষ হলে রেইকো তার সিগারেটে ফেরত গেল। বিছানার নিচ থেকে গিটার বের করে বাজান শুরু করল। প্রথমে *ডিসফিনাডো* এবং *দ্য গার্ল ফ্রম ইপানিমা,* তারপর কিছু বাখারাখ, এরপর কিছু লেনন আর ম্যাকারটনির গান। রেইকো আর আমি ওয়াইন খেলাম, ওয়াইন শেষ হলে আমার ফ্লাস্কে থাকা বাকি ব্র্যান্ডিটুকু ভাগ করে খেলাম। চমৎকার সে রাতে আমরা তিনজন একসাথে বসে অন্তরঙ্গভাবে গল্প করলাম আর মনে মনে নাওকোর সাথে আমিও চাইলাম যেন বৃষ্টি না থামে।

"আমাকে আবার দেখতে আসবে তো?" নাওকো আমাকে বলল।

"অবশ্যই আসবো," বললাম তাকে।

"আর চিঠি লিখবে না?"

"প্রতি সপ্তাহে লিখবো।"

"আমার জন্যেও কয়েক লাইন লেখো," রেইকো বলল।

"ঠিক আছে, খুশি মনেই লিখবো।"

এগারোটা বাজলে আগের রাতের মত রেইকো সোফা খুলে আমার জন্য

বিছানা বানাল। আমরা শুভ রাত্রি জানিয়ে আলো নিভিয়ে বিছানায় ঘুমাতে গেলাম। ঘুম আসছিল না, তাই আমি *দ্য ম্যাজিক মাউন্টেইন* আর ফ্ল্যাশলাইট বের করলাম ব্যাগ থেকে, কিছুক্ষণ পড়ার জন্য। গতরাতের মত নয়, নাওকো সাধারণ নাওকোর মতই এল। দ্রুত এসে আমার কানে কানে বলল, "জানি না কেন জানি ঘুম আসছে না।"

"আমারও," বললাম তাকে। বই রেখে ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে দিলাম। ওকে বুকে জড়িয়ে চুমু খেলাম। অন্ধকার আর বৃষ্টির শব্দ আমাদের ঘিরে রাখল।

"রেইকো কি ভাবছে?"

"চিন্তা কোরো না, সে গভীর ঘুমে। সে যখন ঘুমায়, মরার মত ঘুমায়।" তারপর নাওকো বলল, "তুমি সত্যি আমাকে দেখতে আসবে?"

"কোন সন্দেহ নেই তাতে।"

"আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারবো না তারপরেও আসবে?"

আমি অন্ধকারে মাথা ঝাঁকালাম। আমার বুকে ওর ভরাট স্তনের চাপ টের পাচ্ছিলাম। ওর গাউনের উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে ওর দেহের ভাঁজ বুঝতে পারছিলাম। কাঁধ থেকে নিতম্ব পর্যন্ত আমি বার বার হাত বুলালাম। ভাঁজ আর দেহের কোমলতা আমার মাথায় গেঁথে নিচ্ছিলাম। এরকম কিছুক্ষণ শান্তভাবে মিশে থেকে, নাওকো আমার কপালে চুমু খেয়ে বিছানা থেকে নেমে গেল। অন্ধকারে ওর ধূসর নীল গাউন যেন পানিতে মাছের মত ঝিলিক দিল।

"গুড বাই," আস্তে করে বলল সে।

বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

পরেরদিন সকালেও বৃষ্টি হচ্ছিল। গতরাতের মত মুষলধারে বৃষ্টি নয়, হালকা ঝিরিঝিরি অদৃশ্য প্রায় বৃষ্টি। বৃষ্টি হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম পাতা থেকে পড়া পানির শব্দ আর মাটিতে পানির ছিটকে ওঠা দেখে। আমি যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন জানালার বাইরে কুয়াশার মত হয়ে ছিল, কিন্তু সূর্য উঠতেই বাতাস এসে কুয়াশা সরিয়ে নিয়ে গেল। আশেপাশের গাছপালা আর পাহাড়ের চেহারা দেখা গেল।

আগেরদিনের মত আমরা তিনজন নাস্তা করে বার্ড হাউজে গেলাম। নাওকো আর রেইকো টুপিওয়ালা হলুদ ভিনাইলের রেইন কোট পরল। আমি একটা সোয়েটার আর ওয়াটারপ্রুফ উইন্ডব্রেকার পরলাম। বাইরের বাতাস ঠান্ডা আর স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে ছিল। পাখিগুলোও মনে হল বৃষ্টি থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছে। সব একসাথে খাঁচার পেছনে জড় হয়ে ছিল।

"বৃষ্টি হলে এখানে ঠান্ডা পড়ে, তাই না?" রেইকোকে বললাম।

"এখন প্রতিবার বৃষ্টির সাথে ঠাণ্ডা বাড়তে থাকবে যতদিন না বরফ পড়া শুরু হয়," সে বলল। "জাপান সাগরের থেকে আসা মেঘ এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় কয়েক টন তুষার ফেলবে।"

"শীতের সময় পাখিগুলোকে কি করো?"

"ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়, আর কি করবো, বসন্তে বরফ খুঁড়ে বের করবো? তারপর গরম করে বলবো সবাই তৈরি হও?"

আমি তারের খাঁচায় বাড়ি দিলাম আর টিয়া পাখি ডানা ঝাপ্টিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "মাথামোটা! ধন্যবাদ! পাগল কোথাকার!"

"আমি চাই ঐটা জমে যাক," নাওকো হতাশ দৃষ্টি দিয়ে বলল। "আমার সত্যি মনে হয় পাগল হয়ে যাবো যদি প্রতি সকালে আমাকে এসব শুনতে হয়।"

পাখির খাঁচা পরিস্কারের পর আমরা অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গেলাম। আমি আমার জিনিসপত্র গোছাতে লাগলাম। মেয়েরা তাদের খামারের জিনিসপত্র নিয়ে প্রস্তুত। আমরা একসাথে বিল্ডিং থেকে বের হলাম আর টেনিস কোর্টের কাছে গিয়ে আলাদা হলাম। তারা ডানে গেল আর আমি গেলাম সোজা। একে অপরকে বিদায় জানালাম আর আমি কথা দিলাম আবার আসবো। নাওকো ছোট হাসি দিল।

মেইন গেটের দিকে যেতে আমাকে অনেক লোকজনের সাথে দেখা হল, সবাই একইরকম হলুদ রেইন কোট পরা, বৃষ্টিতে হলুদ পরিস্কার ফুটে উঠেছিল। মাটির রঙ কালো, পাইনের ডাল উজ্জ্বল সবুজ, আর হলুদে মোড়ানো মানুষগুলো যেন ঘুরে বেড়ান কোন বিশেষ রকমের আত্মা, যাদের শুধু বৃষ্টির সকালে দেখা পাওয়া যায়। তারা চুপচাপ সাথে যন্ত্রপাতি, বালতি আর বস্তা হাতে নিয়ে মাটির উপর ভেসে চলেছে।

দারোয়ান আমার নাম মনে রেখেছে, আমি বেরিয়ে যেতে গেস্ট লিস্টে টিক চিহ্ন দিল। "দেখতে পাচ্ছি তুমি টোকিও থেকে এসেছো," বুড়ো লোকটা বলল। "আমি ওখানে একবার গিয়েছিলাম। স্রেফ একবার। ওখানে ভালো পর্ক পাওয়া যায়।"

"তাই নাকি?" কি উত্তর দেব বুঝতে না পেরে আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

"টোকিওর বেশির ভাগ খাবার আমার ভালো লাগেনি, কিন্তু পরক অনেক মজা ছিল। আমার মনে হয় তারা কোন বিশেষভাবে শূকরগুলোকে বড় করে, তাই না?"

আমি বললাম আমি জানি না, এই প্রথম আমি এরকম কিছু শুনলাম। "কবেকার কথা এটা? আপনি কখন টোকিও গিয়েছিলেন?"

"উমম দাঁড়াও মনে করে দেখি," সে মাথা চুলকিয়ে বলল। "মাননীয় রাজপুত্রের যখন বিয়ে হল তখন ছিল নাকি? আমার ছেলে তখন টোকিওতে ছিল, আমাকে বলেছিল এ জায়গা একবার হলেও দেখা উচিত। ঐ সময়, মনে হয় ১৯৫৯।"

"ওহ্, তাহলে হয়তো ঐ সময়ে টোকিওতে পরক ভালো ছিল," আমি বললাম

"আর এখন কেমন?"

আমি নিশ্চিত নই, আমি বললাম, কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কখনো বিশেষ কিছু শুনিনি। সে মনে হল একটু আহত হল। কথা চালিয়ে যাওয়ার সব ইশারা দিল সে, কিন্তু আমি তাকে আমাকে বাস ধরতে হবে বলে হাঁটা দিলাম। রাস্তার উপর কিছু কুয়াশা ভেসে ছিল, কিন্তু বাতাস সেগুলোকে ভাসিয়ে কাছের পর্বতের দিকে নিয়ে গেল। আমি কিছুদূর হেঁটে বার বার থেমে পেছনে দেখছিলাম আর কারন ছাড়াই দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি অন্য কোন গ্রহে এসেছি যেখানে মাধ্যাকর্ষণ ভিন্ন। আর অবশ্যই মন খারাপ করে নিজেকে মনে করিয়ে দিলাম যে আমি এখন বাইরের দুনিয়ায় চলে এসেছি।

সাড়ে চারটায় ডরমে ফিরেই পোশাক বদলে আবার বেরিয়ে পড়লাম সময় মত সিঞ্জুকুর রেকর্ড শপে পৌছানোর জন্য। সেখানে ছয়টা থেকে সাড়ে দশটা কিছু রেকর্ড বিক্রি করলাম ঠিকই কিন্তু আসলে স্রেফ বসে বসে বাইরের বিচিত্র ধরনের মানুষ দেখলাম। অনেকগুলো পরিবার ছিল, আর প্রেমিক-প্রেমিকা। তারপর মাতাল আর মাস্তান ধরনের লোকজন। ছোট স্কার্ট পরা সুন্দর মেয়েরা আর দাড়িওয়ালা হিপ্পি। বার হোস্টেস আর কিছু মানুষ যাদের দেখে কিছু বোঝা যায় না। যখনই আমি কোন হার্ড রক বাজাই, হিপ্পি আর রাস্তার বাচ্চাগুলো বাইরে জড় হয়ে নাচতে শুরু করে তারপর পেইন্ট থিনার শুঁকে নেশা করে কিংবা কোন কিছু না করে চুপচাপ রাস্তায় বসে থাকে। তারপর যদি আমি টনি ব্যানেট বাজাই সাথে সাথে তারা উধাও হয়ে যায়।

আমার পাশের দোকানে ঘুমঘুম চোখের এক মধ্যবয়স্ক লোক সেক্স টয় বিক্রি করে। আমি কখনো ভাবিনি এসব জিনিস কেউ কেনে, কিন্তু লোকটার ব্যবসা মনে হয় ভালোই হয়। গলির মাথায় এক মাতাল ছাত্রকে দেখলাম বমি করতে। আরেক মাথায় একটা গেম সেন্টারে, কাছের এক হোটেলের বাবুর্চিকে দেখলাম বিরতির সময়ে টাকা বাজি ধরে বিংগো খেলতে। আজকের রাতে বন্ধ এমন এক দোকানের নিচে দেখলাম এক গম্ভির মুখো ভাসমান লোক শুয়ে আছে, নড়ছে না। মরা গোলাপি রঙের লিপস্টিক দেয়া এক মেয়ে যে কিনা জুনিয়র হাই-

স্কুলের বয়সের বেশি হবে না, এসে আমাকে বলল আমি 'রোলিং স্টোন্স'-এর *জাম্পিং জ্যাক ফ্ল্যাশ* বাজাতে পারবো কিনা। আমি ডিস্কটা খুঁজে বের করে তার জন্য বাজালাম। সে তালের সাথে কোমর দুলিয়ে দোকানের মধ্যে নাচতে নাচতে আমার কাছে সিগারেট চাইলো। আমি তাকে ম্যানেজারের সিগারেট দিলাম, তৃপ্তির সাথে ধোঁয়া ছেড়ে কোন ধন্যবাদ পর্যন্ত না দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল সে। প্রতি মিনিট পনের পরে আমি হয় অ্যাম্বুলেন্স না-হয় পুলিশের গাড়ির সাইরেন শুনতে পেলাম। স্যুট টাই পরা তিন মাতাল চাকুরিজীবি হাঁটতে হাঁটতে আসল। টেলিফোন বুথে থাকা এক লম্বা চুলের সুন্দরিকে চিৎকার করে বলছিল, "সেরকম পাছা রে!" আর হাসতে হাসতে পড়ে যাচ্ছিল।

যতই এসব দেখলাম, ততই আমার মাথা গুলিয়ে যেতে লাগল। অবাক হয়ে ভাবলাম এসব কি হচ্ছে, এসবের মানে কি?

ম্যানেজার ডিনার শেষ করে এসে আমাকে বলল, "জানো ওয়াতানাবে, কি হয়েছে? গত রাতের আগের রাতে আমি শেষ পর্যন্তও বুটিকের মালটাকে লাগাতে পেরেছি।" পাশের একটা বুটিকশপে কাজ করা এক মেয়ের উপর ওর নজর ছিল অনেকদিন থেকেই। প্রায়ই সে দোকান থেকে রেকর্ড নিয়ে মেয়েটাকে উপহার দিত।

"ভালো তো," আমি আগ্রহ দেখালাম না। কিন্তু সে আমাকে তার কাহিনীর প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি না বলে ছাড়ল না।

"তুমি যদি কোন মালকে লাগাতে চাও, তোমাকে যা করতে হবে আমার থেকে শিখে রাখো।" তৃপ্তির সুরে সে আমাকে বলতে লাগল। "প্রথমে তাকে কিছু উপহার দাও, তারপর তাকে মদ গিলিয়ে মাতাল করো। ভালোমত মাতাল করতে হবে। তারপর বিছানায় নিয়ে মনমত লাগাও। একদম সোজা। বুঝতে পেরেছো?"

জট পাকিয়ে যাওয়া মাথা নিয়ে আমি কমিউটার ট্রেনে উঠে ডরমে ফেরত আসলাম। পর্দা নামিয়ে দিয়ে, লাইট নিভিয়ে দিয়ে আমি টানটান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, মনে হচ্ছিল যেন নাওকো যে কোন মুহূর্তে হামাগুড়ি দিয়ে আমার কাছে চলে আসবে। চোখ বন্ধ করে আমি অনুভব করতে পারছিলাম আমার বুকে ওর স্তনের হালকা ঘর্ষণ, শুনতে পাচ্ছিলাম আমার কানে ওর ফিসফিস, আর অনুভব করছিলাম আমার হাতের ভেতর ওর শরীরের ভাঁজগুলো। অন্ধকারে আমি ফিরে গিয়েছিলাম ওর ছোট্ট দুনিয়ায়। ঘাসভূমির গন্ধ নাকে আসছিল, সেই সাথে রাতে বৃষ্টির শব্দ। আমি তার নগ্ন শরীরের কথা চিন্তা করলাম, চাঁদের আলোয় যেরকম দেখেছিলাম। আর বার্ড হাউজ পরিস্কার করার দৃশ্য, হলুদ

রেইন কোট পরে সব্জির পরিচর্যা করার দৃশ্য। উত্তেজিত অবস্থায় আমি নাওকোর কথা ভেবে মাস্টারবেট করলাম। এতে আমার মাথা পরিস্কার হল, কিন্তু ঘুমে কোন কাজ দিল না। আমি খুবই কাহিল ছিলাম, ঘুমের জন্য মারা যাচ্ছিলাম, কিন্তু ঘুম কোনভাবেই আসতে রাজি হল না।

বিছানা থেকে উঠে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, পতাকার পোলে পতাকা না থাকায় মনে হচ্ছিল বিশাল এক সাদা হাড্ডি অন্ধকার আকাশের দিকে উঠে গেছে। কি করছে নাওকো এখন? আমি ভাবলাম। অবশ্যই ঘুমিয়ে পড়ার কথা। নিজের অদ্ভুত ছোট পৃথিবীর অন্ধকারে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আমি আশা করলাম ঘুমের মধ্যে ওর যেন কোন দুঃস্বপ্ন দেখতে না হয়।

অধ্যায় ৭

পরেরদিন বৃহস্পতিবার সকালে শারীরিক শিক্ষা ক্লাসে আমি পঞ্চাশ মিটার পুলে কয়েকবার সাঁতরালাম। কঠিন ব্যায়াম আমার মাথা পরিস্কার করল আর খাওয়ার রুচিও ফিরে আসল। কাছাকাছি একটা খাওয়ার জায়গা থেকে পেট পুরে খেয়ে আমি লিটারেচার ডিপার্টমেন্টের লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছিলাম তখন মিদোরি কোবায়েসির সাথে দেখা হয়ে গেল। তার সাথে চশমা পরা একটা মেয়ে ছিল। কিন্তু যখন আমাকে দেখল, একা আমার দিকে এগিয়ে আসল সে।

"কই যাচ্ছো?"

"লিটারেচার লাইব্রেরিতে," বলল তাকে।

"ঐটা বাদ দিয়ে আমার সাথে লাঞ্চ করতে চল।"

"আমি তো মাত্র খেয়ে আসলাম।"

"তো কি হয়েছে? আবার খাবে।"

আমরা কাছাকাছি একটা ক্যাফেতে গিয়ে বসলাম। সে এক প্লেট কারি নিল, আর আমি এক কাপ কফি। ওর পরনে লম্বা হাতার সাদা শার্ট, উপরে মাছ আঁকা হলুদ উলের ভেস্ট, চিকন গোল্ড নেকলেস, আর একটা ডিজনি ঘড়ি। ওর মনে হল কারি খেতে খুব ভালো লাগছে, অবশ্য তিন গ্লাস পানি খেতে হল সাথে।

"কই ছিলে তুমি?" মিদোরি জিজ্ঞেস করল। "কতবার তোমাকে ফোন করেছি আমি ভুলেও গিয়েছি।"

"জরুরি কিছু বলার জন্য খুঁজছিলে?"

"নাহ, জরুরি কিছু না এমনি ফোন করেছিলাম।"

"আচ্ছা।"

"কি আচ্ছা?"

"কিছু না, এমনি বললাম," আমি বললাম। "আর কোথাও আগুন-টাগুন লাগেনি?"

"সেদিন অনেক মজা হয়েছিল না? খুব বেশি ক্ষয় ক্ষতি হয়নি, ধোঁয়া বেশি হয়েছিল খালি," মিদোরি আরেক গ্লাস পানি খেয়ে জোরে নিশ্বাস নিল, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল আমার মুখের দিকে। "অ্যাই, তোমার হয়েছে কি?" প্রশ্ন করল সে। "তোমাকে কেমন উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে দূরে তাকিয়ে আছো।"

"আমি ঠিকই আছি," বললাম তাকে। "ট্রিপে গিয়েছিলাম, এখনও কাহিল লাগছে আরকি।"

"তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ভুত দেখে এসেছো।"

"তাই নাকি?"

"বিকেলে তোমার কোন ক্লাস আছে?"

"জার্মান আর ধর্ম।"

"ফাঁকি দিতে পারবে?"

"জার্মান পারবো না, পরীক্ষা আছে আজকে।"

"শেষ কখন?"

"দু-টায়।"

"ঠিক আছে, এর পর আমার সাথে চল শহরে গিয়ে ড্রিঙ্ক করা যাক।"

"দুপুর দুইটায় ড্রিঙ্ক?"

"কেন, সমস্যা কি? ফর অ্যা চেঞ্জ। তোমাকে ভুতের মত লাগছে। চল আমার সাথে, ড্রিঙ্ক করিয়ে একটু জাতে আনা যাক তোমাকে।"

"ঠিক আছে, যাবো না হয়," আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম। "দু-টায় লিটারেচার বিল্ডিঙে দেখা হবে তাহলে।"

জার্মান ক্লাসের পরে আমরা সিঞ্জুকুর বাসে উঠে 'ডাগ' নামের একটা আন্ডারগ্রাউন্ড বারে গেলাম। কিনোকুনিয়া বুকস্টোরের পেছনে। আমরা ভদকা আর টনিক দিয়ে শুরু করলাম।

"আমি এখানে মাঝেমধ্যে আসি। তারা এখানে দুপুরে ড্রিঙ্ক দিতে কোন সমস্যা করে না।"

"তুমি কি প্রায়ই দুপুরে ড্রিঙ্ক করো?"

"মাঝেমধ্যে," মিদোরি বলল। "আমার কিছু ছোট ছোট সমস্যা আছে।"

"কি রকম?"

"এই ধরো পরিবার, বয়ফ্রেন্ড, অনিয়মিত পিরিয়ড, এইসব।"

"তাহলে আরেকটা ড্রিঙ্ক নাও।"

"নেবো তো।"

আমি ওয়েটারের দিকে হাত নাড়িয়ে আরও দুটো ভদকা আর টনিক অর্ডার দিলাম।

"মনে আছে তুমি কিভাবে সেই রবিবারে এসেছিলে? আমাকে চুমু খেয়েছিলে?" মিদোরি বলল, "আমি এ নিয়ে ভাবছিলাম। ভালো ছিল। সত্যি খুবই ভালো।"

"ভালো হলেই ভালো।"

"ভালো হলেই ভালো।" আমাকে ভেঙ্গাল সে "তোমার কথা বলার ভঙ্গি অদ্ভুত।"

"তাই নাকি।"

"যাহোক, আমি ভাবছিলাম সেই দিন কত্ত ভালো হত যদি সেদিন আমার জীবনের প্রথম চুমু হত। আমার জীবন ঘুরে যেত। আমি সত্যি সত্যি চাই ঐ চুমুটা আমার জীবনের প্রথম চুমু করতে। তাহলে বাকি জীবন আমি সেটা ভেবে পার করতে পারতাম। যেমন, না জানি ঐ ওয়াতানাবে ছেলেটার কি খবর, আমাকে যে লন্ড্রি ডেকে বসে প্রথম চুমু খেয়েছিল, তার বয়স এখন কত হবে? আটান্ন? ভালো হত না বলো?"

"হুম, অবশ্যই," আমি একটা পেস্তা বাদাম ভাঙতে ভাঙতে বললাম।

"ঐ তোমার সমস্যা কি? এরকম আউলায়ে আছো কেন? ঠিকমত উত্তর পর্যন্ত দিচ্ছো না।"

"আমি মনে হয় এখনও দুনিয়ার সাথে মেলাতে পারিনি," কিছুক্ষণ ভেবে বললাম। "আমি জানি না, আমার মনে হচ্ছে এটা আসল দুনিয়া নয়। এখানকার মানুষ, দৃশ্য কোনটাই কেন জানি আমার কাছে আসল মনে হচ্ছে না।"

মিদোরি বারে এক কঁনুইর উপর ভর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "জিম মরিসনের গানে এরকম কিছু একটা ছিল, আমি মোটামুটি নিশ্চিত।"

"*পিপল আর স্ট্রেঞ্জ হোয়েন ইউ আর অ্যা স্ট্রেঞ্জার।*"

"শান্তি" মিদোরি বলল।

"শান্তি" আমিও বললাম।

"তোমার আসলে আমার সাথে উরুগুয়ে যাওয়া উচিত," মিদোরি বলল। 'গার্লফ্রেন্ড, রবিবার, স্কুল সব ফেলে দাও।"

"প্রস্তাব খারাপ না," আমি হাসতে হাসতে বললাম।

"তোমার কি মনে হয় না এরকম হলে ভালো হত, সবার থেকে সবকিছু থেকে বিদায় নিয়ে এমন কোথাও পালিয়ে যাওয়া যেখানে সবাই অপরিচিত, কাউকে চেনো না। আমার মাঝে মাঝে এরকম করতে ইচ্ছে করে। ধরো তুমি আমাকে ধরে এরকম দূরে কোথাও নিয়ে গেলে। আমি তোমার জন্য একগাদা বিচ্ছু বাচ্চা পয়দা করবো। তারপর সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকবো। মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে থাকবো।"

আমি হাসতে হাসতে আমার তৃতীয় ভদকা আর টনিক শেষ করলাম।

"আমার মনে হয় তুমি বিচ্ছুমার্কা একগাদা বাচ্চা-কাচ্চার জন্য এখনো তৈরি নও।"

"না না, আমি খুবই উৎসাহি," বললাম তাকে, "আমি জানতে চাই তারা দেখতে কেমন হবে।"

"ব্যাপার না, তোমাকে চাইতে হবে না," মিদোরি বাদাম খেতে খেতে বলল। "আমাকে দেখো, দুপুরে বসে ড্রিংক করছি, আর যা মাথায় আসছে বলে ফেলছি, 'সব ফেলে কোথাও পালিয়ে যাব'–উরুগুয়ে যাওয়ার কোন মানে আছে? ওখানে আছে শুধু গাধার গোবর।"

"হয়তো সেটাই ঠিক।"

"সবজায়গায় গাধার গোবর। হাগু। এখানে হাগু সেখানে হাগু। পুরো পৃথিবীটাই গাধার হাগু। এই আমি এটা ভাঙতে পারছি না, তুমি নাও এটা," মিদোরি আমাকে একটা খোসাসহ বাদাম দিল। আমি কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে ওটা ফাটালাম। "কিন্তু যাহোক, গত রবিবার অনেক নিশ্চিন্তে কেটেছে! তোমার সাথে লন্ড্রির ছাদে গেলাম, আগুন দেখলাম, গান গাইলাম। আমি জানি না শেষ কবে এরকম নিশ্চিন্তে কাটিয়েছি। লোকজন সবসময় আমার উপর কিছু না কিছু চাপিয়ে দিতে চায়। যখনই আমাকে চোখে পড়ে, আমার কি করা উচিত তা নিয়ে বক্তৃতা দিতে থাকে। তুমি অন্তত আমার উপর কিছু চাপিয়ে দাও না।"

"চাপিয়ে দেয়ারমত ভালো করে তোমাকে চিনি না আমি।"

"তারমানে বলতে চাও, আমাকে ভালো করে চিনলে অন্যদের মত তুমিও আমার উপর সবকিছু চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে?"

"সম্ভাবনা আছে," আমি বললাম, "এই দুনিয়াতে লোকজন এভাবেই বাস করে, সবাই কারো না কারো উপরে কিছু না কিছু চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে।"

"তুমি এরকম করবে না। আমি এখনি বলতে পারি। চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপার-স্যাপারে আমি একজন বিশেষজ্ঞ। তুমি ওইধরনের নও। সেজন্যই তোমার সাথে আমি নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারি। তোমার কোন ধারনা আছে এই দুনিয়ায় কত মানুষ আছে যারা অন্যের উপর কিছু চাপিয়ে দিতে আর নিজের উপর অন্যের চাপ নিতে পছন্দ করে? হাজার হাজার। আর তারা এনিয়ে হইচইও করে, যেমন 'আমি ওকে জোর করেছি কাজটা করতে' 'তুমি জোরাজুরি করছো!' এরকমই তাদের পছন্দ। কিন্তু আমার এরকম পছন্দ নয়। আমি করি কারন আমাকে করতে হয়।"

"তুমি কিরকম অন্যদের উপর জোর খাটাও? আর লোকজনই বা তোমাকে কি নিয়ে চাপ দেয়?"

মিদোরি তার মুখে এক টুকরো বরফ নিয়ে কিছুক্ষণ চুষল।

"তুমি কি আমার সম্পর্কে জানতে আগ্রহি?" জানতে চাইলো সে।

"হ্যাঁ, বলা যেতে পারে।"

"আচ্ছা দেখো, আমি মাত্র তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি আমার সম্পর্কে জানতে আগ্রহি?' কি রকম উত্তর দিলে এটা?"

"হ্যাঁ, মিদোরি, তোমার সম্পর্কে আমি ভালোমত জানতে আগ্রহি," বললাম তাকে।

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি।"

"যদি এমন হয় যে, জানার পর তোমার চোখ সরিয়ে নিতে হয় আমার থেকে?"

"তুমি এতটাই খারাপ?"

"একদিক দিয়ে বলতে গেলে, হ্যাঁ," মিদোরি ভুরু কুঁচকে বলল। "আমার আরেকটা ড্রিংক লাগবে।"

আমি ওয়েটারকে ডেকে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিলাম। ততক্ষন মিদোরি বারে কঁনুই রেখে গালে হাত দিয়ে বসে থাকল। আমি চুপচাপ থেলানিয়াস মঙ্কের *হানিসাকল রোজ* শুনতে থাকলাম। আরও পাঁচ-ছয়জন কাস্টমার ছিল কিন্তু আমরাই একমাত্র যারা মদ খাচ্ছে। কফির ভারি গন্ধ ভেতরে অন্তরঙ্গ পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল।

"তুমি কি রবিবার ফ্রি আছো?" মিদোরি জানতে চাইলো।

"আমার মনে হয় তোমাকে আগেও বলেছি, আমি সবসময় রবিবারে ফ্রি থাকি। খালি ছয়টার পর কাজে যেতে হবে।"

"ঠিক আছে, তাহলে এই রবিবার তুমি আমার সাথে বেড়াতে পারবে?"

"অবশ্যই।"

"আমি তোমাকে রবিবার সকালে ডরম থেকে তুলে নেবো। যদিও সঠিক সময় বলতে পারছি না। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে," আমি বললাম, "কোন সমস্যা নেই।"

"আচ্ছা, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। তোমার কোন ধারনা আছে আমি এই মুহূর্তে কি করতে চাই?"

"বলতে পারছি না।"

"প্রথমত, আমি একটা বিশাল নরম এবং তুলতুলে বিছানায় শুতে চাই। সব রকম আরামের ব্যবস্থা থাকবে, প্রচুর মদ খেয়ে মাতাল হবো আর কোন গাধার গোবর আশেপাশে চাই না। চাই তুমি আমার পাশে শুয়ে থাকবে। তারপর ধীরে ধীরে তুমি আমার কাপড় খুলতে থাকবে। খুবই কোমলভাবে, ধরো একজন মা যেভাবে বাচ্চার জামা খোলে ঠিক সেভাবে।"

"হুমম..."

"আমি চুপচাপ পড়ে থাকবো আর আরাম করবো, তারপর হঠাৎ মনে হবে কি হচ্ছে এসব, চিৎকার করে তোমাকে বলবো, 'থামো, ওয়াতানাবে! বন্ধ করো এসব।' আরো বলবো, 'আমি সত্যি তোমাকে পছন্দ করি ওয়াতানাবে, কিন্তু আমার আরেকজনের সাথে সম্পর্ক আছে, এসব করতে পারবো না। আমি এসব ব্যাপারে খুব অনমনীয়, বিশ্বাস করো আর নাই করো। সো প্লিজ, থামো,' কিন্তু তুমি থামবে না।"

"কিন্তু আসলে আমি থামবো," বললাম তাকে।

"আমি জানি সেটা। এটা স্রেফ আমার ফ্যান্টাসি," মিদোরি বলল। "তারপর তুমি তোমার বিশেষ জিনিসটা বের করে আমাকে দেখালে। সোজা খাড়া করে। আমি সাথে সাথে চোখ ঢাকলাম, অবশ্য সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য হলেও দেখে ফেলেছিলাম। আর আমি বললাম, 'থামো! এসব কোরো না! এত বড় আর শক্ত জিনিস আমি চাই না!'"

"আমার জিনিস মোটেও বড় না, সাধারণ সাইজের।"

"ব্যাপার না, এটা একটা ফ্যান্টাসি। তারপর তুমি মুখ ভোঁতা করে থাকবে। আমার তোমার জন্য খারাপ লাগবে। তোমার মন ভালো করার চেষ্টা করবো আমি। 'ওলে দুঃক্কি বাবুটা আমাল।' "

"তুমি বলতে চাইছো তুমি এসব করতে চাও এখন?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

"হায় খোদা।"

পাঁচ রাউন্ড ভদকা আর টনিকের পর আমরা বার থেকে বের হলাম। আমি বিল দেয়ার চেষ্টা করলে মিদোরি আমার হাতে বাড়ি দিয়ে নিজের ব্যাগ থেকে নতুন চকচকে দশ হাজার ইয়েনের নোট বের করল।

"ইটস ওকে," বলল সে, "মাত্র বেতন পেয়েছি। আর আমি তোমাকে আমন্ত্রন জানিয়েছি। অবশ্য তুমি যদি কার্ডবহনকারি ফ্যাসিস্ট হও আর কোন মেয়ে তোমাকে ড্রিঙ্ক কিনে দিক তা না চাও তাহলে..."

"না না, আমার কোন সমস্যা নেই।"

"তাছাড়া আমি তোমাকে বিশেষ জিনিসটা ঢোকাতেও দিইনি।"

"কারন সেটা অনেক বড় আর শক্ত," আমি বললাম।

"ঠিক," মিদোরি বলল। "কারন সেটা অনেক বড় আর শক্ত।"

মিদোরি খানিকটা মাতাল, সিঁড়িতে একটা ধাপ ভুল করল, আরেকটু হলেই আমরা সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়তাম। যে ঘন মেঘ আকাশ কালো করে রেখেছিল তা আর নেই। শেষ বিকেলের মৃদু আলো শহরের রাস্তার উপর ছড়িয়ে আছে। আমি

আর মিদোরি রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটলাম। মিদোরি বলল সে একটা গাছে চড়তে চায়। দুর্ভাগ্যজনক যে সিঞ্জুকুতে চড়ার মত কোন গাছ নেই, আর সিঞ্জুকু ইম্পেরিয়াল গার্ডেনও তখন বন্ধ।

"খুব খারাপ," মিদোরি বলল। "আমি গাছে চড়তে ভালোবাসি।"

আমরা হাঁটতে থাকলাম আর উইন্ডো শপিং করলাম। আস্তে আস্তে রাস্তার দৃশ্য আমার কাছে আগের চেয়ে আসল, স্বাভাবিক মনে হতে লাগল।

"আমি খুশি যে তোমার সাথে বের হয়েছিলাম," বললাম তাকে। "আমার মনে হয় এখন এই দুনিয়ার সাথে আরেকটু মানিয়ে নিতে পারছি।"

মিদোরি একটু থেমে আমার দিকে তাকাল। "সত্যি কথা," বলল সে। "তোমার দৃষ্টি আগের চেয়ে ভালো মনে হচ্ছে। দেখলে? আমার সাথে ঘোরাঘুরি তোমার জন্য ভালো।"

"তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার," বললাম তাকে।

সাড়ে পাঁচটায় মিদোরি বলল তাকে বাড়ি যেতে হবে, ডিনার রান্না করতে হবে। আমি বললাম আমি তাহলে বাস নিয়ে ডরমে চলে যাবো।

"জানো, এখন আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে?" মিদোরি যাওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

"আমার কোন ধারনা নেই তুমি কি ভাবছো," আমি বললাম।

"আমি চাই তোমাকে আমাকে এখন জলদস্যুরা ধরে নিয়ে যাক। তারা আমাদেরকে নগ্ন করে মুখোমুখি দড়ি দিয়ে একজনের সাথে আরেকজনকে বেঁধে ফেলবে।"

"এরকম কিছু তারা কেন করবে?"

"কারন জলদস্যুরা পারভার্ট," সে বলল।

"এখানে আসলে তুমিই একমাত্র পারভার্ট," আমি বললাম।

"তারপর তারা আমাদেরকে আটকে রাখবে আর বলবে 'এক ঘন্টা পর তোমাদের সাগরে ফেলে দেয়া হবে। ততক্ষন তোমরা ভালো সময় কাটাও।' "

"তারপর?"

"তারপর আমরা এক ঘন্টা ভালো সময় কাটনোর চেষ্টা করবো, একজন আরেকজনের উপর মোচড়ামুচড়ি করতে করতে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে দিতে..."

"আর এসব এখন তোমার করতে ইচ্ছে করছে?"

"একদম তাই।"

"হায় খোদা," আমি মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম।

*

মিদোরি আমাকে রবিবার সকাল সাড়ে নয়টায় নিতে এল। আমি তখন মাত্র উঠেছি, মুখও ধুইনি। কেউ একজন আমার দরজায় ধাক্কা দিয়ে চিল্লিয়ে বলল, "অ্যাই ওয়াতানাবে, তোমার কাছে একটা মেয়ে এসেছে!" আমি নিচে নেমে লবিতে গিয়ে দেখি সেখানে একদম ছোট জিন্স স্কার্ট পরে পা ভাঁজ করে বসে মিদোরি হাই তুলছে। নাস্তা করতে যাওয়া প্রতিটি ছেলে সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের গতি ধীর হয়ে যাচ্ছে আর তার লম্বা সরু পায়ের দিকে তাকাচ্ছে। পাগুলো সত্যি চমৎকার।

"আমি কি বেশি আগে চলে আসলাম?" জিজ্ঞেস করল সে, "বাজি ধরে বলতে পারি তুমি মাত্র ঘুম থেকে উঠেছো।"

"আমাকে পনের মিনিট সময় দিতে পারবে? মুখ ধুয়ে শেভ করে আসছি।"

"অপেক্ষা করতে সমস্যা নেই কিন্তু সব লোকজন আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে।"

"এরকম ছোট স্কার্ট পরে ছেলেদের ডরমে এসে আর কি আশা করো? তারা তো তাকাবেই তোমার দিকে।"

"আচ্ছা, সমস্যা নেই, আমি আজকে কিউট একটা প্যান্টি পরেছি–একদম গোলাপি আর লেইসওয়ালা।"

"আরো খারাপ করেছো," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম আমি। আমার রুমে ফিরে গিয়ে যত দ্রুত সম্ভব মুখ ধুলাম আর শেভ করলাম। তারপর নীল রঙের একটা শার্ট আর ধূসর টুইড স্পোর্টস কোট পরে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে মিদোরিকে নিয়ে বের হলাম। ঠান্ডা ঘাম বের হচ্ছিল আমার।

"আচ্ছা, বলো তো ওয়াতানাবে," মিদোরি ডরম বিল্ডিংগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "এখানকার সব ছেলেই কি মাস্টারবেট করে?"

"সম্ভবত করে," বললাম তাকে।

"ঐ সময় কি ছেলেরা মেয়েদের কথা ভাবে?"

"তাই তো মনে হয়। আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে মাস্টারবেট করার সময় কেউ স্টক মার্কেট, ক্রিয়াপদের কাঠামো কিংবা সুয়েজ খাল নিয়ে চিন্তা করে কিনা। নাহ, আমি মোটামুটি নিশ্চিত সবাই মেয়েদের কথাই ভাবে।"

"সুয়েজ খালের কথা কেন বললে?"

"কথার কথা আর কি।"

"তারমানে সবাই যার যার মত বিশেষ কোন মেয়ের কথা ভাবে?"

"তোমার কি তোমার বয়ফ্রেন্ডকে এই প্রশ্ন করা উচিত না?" আমি বললাম। "রবিবার সকালে উঠে এখন আমাকে এসব ব্যাখ্যা করতে হবে?"

"আমি শুধুই কৌতূহলি," সে বলল। "তাছাড়া ওকে এইসব জিজ্ঞেস করলে ও ক্ষেপে যাবে। তার মতে মেয়েদের এসব ব্যাপারে প্রশ্ন করতে নেই।"

"খুবই স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনা, আমি বলবো।"

"কিন্তু আমি জানতে চাই। একদম নির্জলা কৌতূহল। তোমরা ছেলেরা কি মাস্টারবেটের সময় বিশেষ কোন মেয়ের কথা ভাবো?"

আমি প্রশ্ন এড়ানোর চেষ্টায় হাল ছেড়ে দিলাম। "আমি অন্তত ভাবি। অন্যদের কথা বলতে পারছি না।"

"তুমি কি কখনো করার সময় আমাকে কল্পনা করেছো? সত্যি করে বলো, আমি রাগ করবো না।"

"না, কখনোই না, সত্যিই বলছি," আমি সৎ উত্তরটাই দিলাম।

"কেন না? আমি কি যথেষ্ট আকর্ষণীয় নই?"

"উফ, তুমি অনেক আকর্ষণীয়, ঠিক আছে? তুমি অনেক কিউট। সেক্সি পোশাক তোমাকে অনেক ভালো মানায়।"

"তাহলে আমাকে নিয়ে কল্পনা করো না কেন?"

"কারন, প্রথমত আমি তোমাকে বন্ধু হিসেবে দেখি, তাই আমি তোমাকে আমার কোন সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসিতে ঢোকাতে চাই না, দ্বিতীয়ত..."

"তোমার একজন আছে যাকে নিয়ে তুমি কল্পনা করো।"

"ঠিক তাই," আমি বললাম।

"এসব ব্যাপার-স্যাপারে তুমি অনেক ভদ্র," মিদোরি বলল। "তোমার এই ব্যাপারটা আমি পছন্দ করি। তারপরেও তুমি আমাকে অল্পের জন্য হলেও কল্পনা করতে পারো না? আমি তোমার সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসিতে কিংবা দিবাস্বপ্ন যাই বলো না কেন, তাতে থাকতে চাই। তোমাকে বলছি কারন আমরা বন্ধু। আর কাউকে আমি কিভাবে এসব বলবো? আমি তো আর হেঁটে যেতে যেতে কাউকে বলতে পারি না, 'তুমি যখন আজকে রাতে মাস্টারবেট করবে, আমাকে নিয়ে কল্পনা করবে, প্লিজ?' তোমাকে বন্ধু ভাবি তাই তোমাকে অনুরোধ করছি। আর পরে আমাকে বলবে কিরকম ছিল ব্যাপারটা। মানে, তুমি কি কি করলে এইসব আরকি।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

"তুমি কিন্তু ভেতরে ঢোকাতে পারবে না। কারন আমরা বন্ধু, তাই না? যতক্ষণ না তুমি ভেতরে ঢোকাচ্ছো, তুমি যা খুশি করতে পারো, যে কোন কিছু কল্পনা করতে পারো।"

"আমি জানি না, আমি কখনো এত নিয়মনীতির মধ্যে মাস্টারবেট করেছি কিনা," বললাম তাকে।

"তুমি কি শুধু আমাকে নিয়ে কল্পনা করবে?"

"ঠিক আছে, আমি তোমাকে কল্পনা করবো।"

"ওয়াতানাবে, আমি চাই না তুমি আমাকে ভুল বোঝো, আমি হতাশ কিংবা নিম্ফম্যানিক নই। তোমাকে উত্তেজিত করতেও চাইছি নয়। আমি আসলে এই ব্যাপারে শুধুই আগ্রহি। আমি এইসব সম্পর্কে জানতে চাই। তুমি জানো আমি মেয়েদের স্কুলে বড় হয়েছি। আমি ছেলেদের সম্পর্কে জানতে চাই, তাদের শরীর কিভাবে কাজ করে বুঝতে চাই। মেয়েদের ম্যাগাজিন থেকে না, আসল কেস-স্টাডি থেকে।"

"কেস স্টাডি?" আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।

"আমি এসব সম্পর্কে যে জানতে চাই তা আমার বয়ফ্রেন্ড পছন্দ করে না। সে ক্ষেপে গিয়ে আমাকে নিম্ফো কিংবা অসুস্থ বলে গালি দেয়। সে এমনকি আমাকে ব্লোজব পর্যন্ত করতে দেয় না। এই আরেকটা জিনিস যা আমি জানার জন্য মারা যাচ্ছি।"

"হুম।"

"তুমি কি ব্লোজব করাতে ঘৃণা করো?"

"না, একদমই না, মোটেই ঘৃণা করি না।"

"তাহলে কি পছন্দ করো?"

"হ্যাঁ, বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা কি এ নিয়ে পরে কখনো কথা বলতে পারি? দেখো, আজকে কি সুন্দর রবিবারের সকাল, আমি মাস্টারবেশন আর ব্লোজব নিয়ে কথা বলে দিনটার বারোটা বাজাতে চাইছি না। এখন চল অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি। তোমার বয়ফ্রেন্ড কি আমাদের ভার্সিটিতেই পড়ে?"

"অবশ্যই না। সে পড়ে আরেকটা ভার্সিটিতে। আমাদের দেখা হয়েছিল হাই-স্কুলের ক্লাবের কাজের সময়। আমি ছিলাম মেয়েদের স্কুলে, সে ছিল ছেলেদের স্কুলে, তুমি জানো এসব ব্যাপার কি করে ঘটে, একসাথে কনসার্ট আর হাবিজাবি। পাশ করে বের হওয়ার পর আমরা সিরিয়াস হই। আচ্ছা ওয়াতানাবে?"

"কি?"

"তুমি কিন্তু একবার ইয়েটা করবে, মানে আমাকে কল্পনা করবে ওই সময়। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে বাবা, পরেরবার চেষ্টা করবো," আমি বললাম।

আমরা অচানোমিযু যাওয়ার কমিউটার ট্রেন নিলাম। সিঞ্জুকু স্টেশন থেকে পাতলা স্যান্ডউইচ কিনলাম, কারন সকালে নাস্তা করা হয়নি। কফির স্বাদ জঘন্য, মনে হচ্ছিল সিদ্ধ করা প্রিন্টারের কালি। রবিবার সকালের ট্রেন পরিবার আর প্রেমিক-প্রেমিকায় ভর্তি। সবাই কোথাও না কোথাও ঘুরতে যাচ্ছে। একইরকম জ্যাকেট পরা কিছু ছেলে বেসবল ব্যাট হাতে হল্লা করছিল। ট্রেনের অনেক মেয়েই ছোট স্কার্ট পরেছিল কিন্তু কারোরটাই মিদোরির মত এত ছোট নয়। মিদোরি মাঝে মাঝেই হ্যাঁচকা টান স্কার্ট নিচে নামানোর চেষ্টা করছিল। কিছু লোক ওর পায়ের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যে, আমারই অস্বস্তি লাগছিল। কিন্তু ওর মনে হল কোন অস্বস্তি লাগছে না।

"তুমি জানো আমার এখন কি করতে ইচ্ছে করছে?" ট্রেনে চড়ার দশ মিনিটের মধ্যে মিদোরি আমার কানে ফিসফিস করে বলল।

"কোন ধারনা নেই," বললাম তাকে। "কিন্তু দয়া করে এসব নিয়ে এখানে আলোচনা কোরো না, সবাই শুনতে পারবে।"

"খুব খারাপ, এটা অনেক বন্য ধরনের ছিল," মিদোরি মন খারাপ করে বলল।

"যাহোক, আমরা অচানোমিযু কেন যাচ্ছি?"

"আগে চল, গেলেই দেখতে পারবে।"

অচানোমিযু স্টেশনের আশেপাশে অনেক স্কুল, তাই রবিবার পুরো জায়গা জুনিয়র হাই আর হাই-স্কুলের ছেলেপেলেতে ভর্তি। সবাই ক্লাসে কিংবা পরীক্ষার জন্য যাচ্ছে। মিদোরি ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল। এক হাতে তার কাঁধের ব্যাগের স্ট্র্যাপ, আরেক হাত দিয়ে আমার হাত ধরা।

কোন সুযোগ না দিয়েই সে জিজ্ঞেস করে বসল, "আচ্ছা ওয়াতানাবে, তুমি কি ইংরেজির সাবজাঙ্কটিভ ক্রিয়াপদের বর্তমান এবং অতীতের মধ্যে পার্থক্যটা ব্যাখ্যা করতে পারবে?"

"আমার মনে হয় পারবো," বললাম তাকে।

"তাহলে আমাকে বল আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রয়োজনটা কি?"

"কিছুই না। এর সরাসরি কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু এটা তোমাকে কিছু সাধারণ ব্যাপার ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।"

মিদোরি কিছু সময় ধরে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল। "তুমি অসাধারন! আমার কাছে কখনো এমন মনে হয়নি। আমার সবসময় মনে হয়েছে এরকম ব্যাপার-স্যাপার, ধরো ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস, রসায়নের সংকেত সব কিছু অর্থহীন। পাছার ফোঁড়ার মত। তাই আমি সব সময় এসব এড়িয়ে চলেছি। এখন মনে হচ্ছে জীবনে বিশাল ভুল করলাম কিনা।"

"তুমি এসব এড়িয়ে চলেছো?"

"হ্যাঁ, আমার কাছে এসবের কোন অস্তিত্ব নেই। আমার কোন ধারনাই নেই 'সাইন' আর 'কোসাইন' কি জিনিস।"

"বলো কি! তুমি হাই-স্কুল থেকে পাশ করেছো কিভাবে? কলেজে ঢুকেছো কিভাবে?"

"বোকার মত কথা বোলো না," মিদোরি বলল। "কলেজের ভর্তি পরীক্ষার জন্য সব কিছু জানা লাগে না! তোমার দরকার শুধু খানিকটা অনুমান শক্তি। আমার অনুমান করার শক্তি বেশ ভালো। 'তিনটা উত্তর থেকে সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দাও,' আমি সাথে সাথে বুঝতে পারি কোনটা সঠিক।"

"আমার অনুমান শক্তি তোমার মত ভালো নয়। তাই আমাকে কিছুটা নিয়মবদ্ধভাবে চিন্তা করতে শিখতে হয়েছে। যেভাবে একটা কাক একটা ফাঁপা গাছে কাঁচের টুকরো জমা করে।"

"এতে কোন লাভ হয়?"

"কি জানি। এতে সম্ভবত কিছু কাজ করতে সুবিধা হয়।"

"কিরকম কাজ? উদাহরণ দাও।"

"আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা। ধরো, অনেকগুলো ভাষা শেখার ক্ষেত্রে।"

"কি রকম সুবিধা হয় তাতে?"

"নির্ভর করে কে কাজটা করছে তার উপর। কারো জন্য সুবিধা হয়, লাভ হয়, কারো হয় না। কিন্তু আসলে এটা একরকম প্রশিক্ষণ। কাজ হয় কি হয় না সেটা বিষয় না। যেরকম একটু আগে বললাম।"

"হুম," মিদোরি বলল। মনে হল কথাগুলো তার মনে ধরেছে। সে আমার হাত ধরে পাহাড় দিয়ে নামতে লাগল। "তুমি কি জানো ওয়াতানাবে, তুমি লোকজনকে খুব ভালো বোঝাতে পারো।"

"কি জানি," বললাম আমি।

"সত্যি বলছি। আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছি ইংরেজির সাবজাঙ্কটিভ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে কি লাভ, কেউ আমাকে ভালো কোন উত্তর দিতে পারেনি, তোমার মত পরিস্কার করে কেউ বলতে পারেনি। এমনি কি ইংরেজির শিক্ষকরাও না। তারা হয় হতভম্ব হয়ে গেছে, নয়ত রেগে গেছে, নয়ত হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। একটা গ্রহণযোগ্য উত্তর এর আগে কেউ দিতে পারেনি। যখন আমি প্রথম প্রশ্ন করেছিলাম, তখন যদি তোমার মত কেউ আমার আশেপাশে থাকতো আর এরকম ভালোভাবে ব্যাখ্যা দিত, তাহলে হয়ত আমি সংযোজকের ব্যাপারে আগ্রহি হতাম। ধ্যাত!"

"হুমম," আমি বললাম।

"তুমি কি কখনো *দাস ক্যাপিটাল* পড়েছো?"

"হ্যাঁ, পুরোটা না, সবার মত কিছু কিছু অংশ পড়েছি।"

"কিছু বুঝেছো?"

"কিছু অংশ বুঝেছি বাকি অংশ বুঝিনি। *দাস ক্যাপিটাল*'র মত বই পড়তে হলে তোমাকে কিছু আলাদা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমার মনে হয় আমি মার্ক্সিজমের উপর সাধারণ একটা ধারনা পেয়েছি।"

"তোমার কি মনে হয়, কলেজের নবীন একজন ছাত্র যে ওইসব বই পড়েনি, সে স্রেফ *দাস ক্যাপিটাল* পড়ে কিছু বুঝতে পারবে?"

"আমি বলবো তা প্রায় অসম্ভব।"

"জানো, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পর ফোক মিউজিক ক্লাবের সদস্য হয়েছিলাম। আমি গান গাইতে চাইছিলাম কিন্তু ক্লাবের সদস্যরা ছিল কিছু বড় বড় কথা বলা ভন্ড পোলাপান। ওদের কথা ভাবলেই আমার গা শিরশির করে। ওরা তোমাকে প্রথম কথা যেটা বলবে সেটা হল, ক্লাবের সদস্য হতে হলে তোমাকে মার্ক্স পড়তে হবে। 'এসব ভালো করে পড়ে তৈরি হয়ে এসো'–একজন বক্তৃতা দিচ্ছিল কিভাবে লোকগীতি গভীরভাবে সমাজ এবং চরমপন্থি আন্দোলনের সাথে জড়িত। তা যাহোক, আমি বাসায় গিয়ে যতটা সম্ভব পড়ার চেষ্টা করলাম, কিছুই বুঝলাম না। সংযোজকের চেয়েও খারাপ ছিল। আমি তিন পৃষ্ঠা পড়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি। সুতরাং একজন ভালো স্কাউটের মত পরের সপ্তাহের মিটিঙে গিয়ে বললাম আমি পড়েছি কিন্তু কিছু বুঝিনি। তখন থেকে তারা আমার সাথে এমন ব্যবহার শুরু করল যেন আমি একটা নির্বোধ। শ্রেণি সঙ্ঘাতের উপর আমার সেরকম কোন ধারনা ছিল না, তারা আমাকে বলল আমি সামাজিকভাবে পঙ্গু। আশ্চর্য! আমি শুধু তাদেরকে বললাম, আমি কিছু বুঝিনি আর তারা ভেবে নিলো আমি জঘন্য?"

"আহা," আমি বললাম।

"তাদের লোকদেখানি আলোচনা সভা ছিল ভয়াবহ। সবাই বড় বড় কথা বলতো আর ভান করত যেন খুব জানে কি হচ্ছে। কিন্তু আমি কিছু না বুঝলে প্রশ্ন করতাম। 'সাম্রাজ্যবাদি শোষণ বলতে আসলে তোমরা কি বোঝাতে চাইছো? এর সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কি কোনভাবে সংযোগ আছে?' 'শিক্ষা শিল্পভবন ধ্বংসের মানে কি এই, আমরা কলেজ থেকে পাশ করার পর কোন কোম্পানিতে কাজ করবো না?' এরকম হাবিজাবি আর কি। কিন্তু কেউ আমাকে কোন কিছু ব্যাখ্যা করতো না। ব্যাখ্যা তো দূরের কথা, তারা আমার উপর ক্ষেপে যেত। বিশ্বাস করতে পারো?"

"হুম পারছি," আমি বললাম।

"একটা ছেলে আমাকে চেঁচিয়ে বলল, 'বোকা গাধি কোথাকার, ব্রেইন ছাড়া এরকম কি করে চলিস?' ওতেই কাজ হল যতদূর মনে পড়ে। আমি ছেড়ে দেইনি। ঠিক আছে, আমি এত স্মার্ট না। কিন্তু আমি খেটে খাওয়া শ্রেণি। এই খেটে খাওয়া শ্রেণি দুনিয়া চালায়। আর এই খেটে খাওয়া শ্রেণিই শোষিত হয়। বড় বড় কথা বলে তুমি কি বিপ্লব বোঝাতে চাও যা খেটে খাওয়া মানুষ বোঝে না? কি ধরনের সামাজিক বিপ্লব সেটা? মানে, আমি অবশ্যই চাই দুনিয়া আরেকটু ভালো জায়গা হোক। কেউ যদি সত্যি শোষিত হয়, আমাদের সেটা অবশ্যই থামাতে হবে। আমি সেটা বিশ্বাস করি বলেই আমি প্রশ্ন করি। ঠিক কিনা বলো?"

"হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক।"

"সুতরাং তখন আমি বুঝতে পারলাম, এই লোকগুলো আসলে ভন্ড। তাদের চিন্তা আসলে কী করে বড় বড় কথা বলে নতুন মেয়েদের পটানো যায় আর তাদের স্কার্টের মধ্যে হাত ঢোকানো যায়। যখন তারা সিনিয়র হয়ে যায় তখন চুল ছোট করে কেটে হেলতে দুলতে মিতসুবিসি কিংবা আইবিএম অথবা ফুজি ব্যাঙ্কে যায় চাকরি করতে। তারা সুন্দর মেয়ে দেখে বিয়ে করে যারা কখনো মার্ক্স পড়েনি আর বাচ্চা-কাচ্চার বিচিত্র নাম রাখে যা শুনলে তোমার বমি এসে যাবে। শিক্ষা শিল্পভবন ধ্বংস করতে চায়? আমাকে হাসিও না! আর নতুন সদস্যরা একই রকম খারাপ। তারা কিছুই বোঝে না, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে তারা বুঝেছে আর আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। মিটিঙের পর তারা আমাকে বলে, 'বোকামি কোরো না, তুমি কিছু না বুঝলে হয়েছেটা কি? তারা যা বলে তার সাথে সায় দিয়ে যাও।' ওয়াতানাবে, আরও কিছু ব্যাপার আছে যাতে আমার মেজাজ আরও খারাপ হয়েছে, শুনতে চাও?"

"নিশ্চয়ই?"

"একদিন তারা গভীর রাতে রাজনৈতিক মিটিং ডেকেছে, মেয়েদেরকে বলল প্রত্যেকে বিশটা করে ভাতের বল তৈরি করে আনতে হবে রাতের খাবারের জন্য। বোঝো তাহলে, তারা আবার লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে কথা বলে! আমি ভাবলাম এবার একটু চুপ থাকা যাক, তাই আমিও ভালো মেয়ের মত বিশটা ভাতের বল নিয়ে হাজির হলাম। বাইরে খালি নরি আর উম্বসি ভেতরে দিয়ে বানিয়ে এনেছি। ভাবো আমার কাজের জন্য আমি কি পেয়েছি? লোকজন অভিযোগ করল আমার ভাতের বলের ভেতরে শুধু উম্বসি ছিল, সাথে আর কিছু আনিনি। অন্য মেয়েরা কড রো আর স্যামন, সাথে ভাজা ডিম এনেছে। আমি এত রেগে গিয়েছিলাম যে

কিছু বলতে পারিনি! বিশিষ্ট বিপ্লবীরা সবাই ভাতের বল নিয়ে হৈচৈ করছে। তাদের উচিত উম্বেসি আর নরি নিয়েই কৃতজ্ঞ থাকা। আর চিন্তা করা, ভারতে বাচ্চারা না খেয়ে মারা যাচ্ছে!"

আমি হেসে ফেললাম। "তাহলে তোমার ক্লাবের কি হল শেষ পর্যন্ত?"

"আমি জুনে ছেড়ে দিয়েছি, অনেক মেজাজ খারাপ হয়েছিল," মিদোরি বলল। "এই বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াগুলো আসলে সবাই ধান্দাবাজ। তারা ভয়ে ভয়ে থাকে কেউ বুঝে যাবে যে তারা কিছুই জানে না। তারা সবাই একই বই পড়ে আর একই শব্দ ছাড়ে। আর জন কল্ট্রানের গান শোনে, প্যাসলিনির সিনেমা দেখে। আর একে তুমি বলো বিপ্লব?"

"আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না, আমি সত্যিকারের বিপ্লব বলতে কিছুই দেখিনি।"

"যাহোক, সেটা যদি বিপ্লবের নমুনা হয়, তারা সেটা নিয়ে বসে থাকুক। তারা হয়ত ভাতের বলে উম্বসি দেয়ার জন্য আমাকে গুলি করবে। তোমাকে করতে পারে সাবজাঙ্কটিভ জানার কারনে।"

"হতে পারে।"

'বিশ্বাস করো আমি জানি আমি কি বলছি। আমি খেটেখাওয়া শ্রেণি। বিপ্লব হোক আর না হোক, কর্মজীবি শ্রেণি একই জায়গায়ই থাকবে, মারামারি করে মরবে। আর বিপ্লব কি? অবশ্যই সিটি হলের নাম বদল করা না? কিন্তু এই ছাগলগুলো সেটা জানে না–ওরা জানে খালি বড় বড় কথা বলতে। আচ্ছা বলো তো, ওয়াতানাবে, তুমি কোন আয়করের লোকজন দেখেছো?"

"কখনো না।"

"আমি দেখেছি। বহুবার। তারা এসে বড় সাজে আর বিশাল ফাঁপর নেয়। 'এই খতিয়ান কিসের?' 'আপনাদের রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা তো দূর্বল।' 'একে আপনি কি করে বাণিজ্যিক খরচ বলেন?' 'আমি আপনার সব রিসিট দেখতে চাই।' আর ওদিকে আমরা দৌড়াই। খাবারের সময় হলে আমরা তাদেরকে সুসি ডিলাক্স দেই বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমাকে বলি শোন, আমার বাবা কখনো দুই নাম্বারি করেনি। একদম সোজা তীরের মত সৎ। কিন্তু সেটা তুমি আয়করের লোককে বলে দেখো। সে গর্ত খুঁড়তেই থাকবে খুঁড়তেই থাকবে খুঁড়তেই থাকবে। 'আয় এখানে কম মনে হচ্ছে?' আয় তো কম হবেই টাকা না আসলে! আমার মনে হয় চিৎকার করি! 'যাদের কাছে টাকা আছে তাদের কাছে গিয়ে এসব করো!' তোমার কি মনে হয় বিপ্লব হলে এসো মানুষ বদলে যাবে?"

"মনে হয় না।"

"তাহলে আর কিছু আমার জানার দরকার নেই। কোন ফালতু বিপ্লবে আমি বিশ্বাস করি না। প্রেম হচ্ছে একমাত্র বিষয় যেটায় আমি বিশ্বাস করবো এখন থেকে।"

"শান্তি," আমি বললাম।

"শান্তি," মিদোরিও সায় দিয়ে বলল।

"তাহলে এখন আমরা কই যাচ্ছি?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"হাসপাতালে," সে বলল। "আমার বাবা সেখানে। আজকে আমার উপর দায়িত্ব পড়েছে তাকে সারাদিন দেখে রাখার।"

"তোমার বাবা?! তুমি না বলেছিলে সে উরুগুয়েতে!"

"ওটা মিথ্যা কথা ছিল," মিদোরি এমনভাবে বলল যেন কোন ব্যাপারই না। "সে সারাক্ষন উরুগুয়ে যাওয়া নিয়ে চিল্লাচিল্লি করে, কিন্তু কখনো যেতে পারেনি। সে এমনকি টোকিও থেকেও বাইরে যায়নি তেমন একটা।"

"কিরকম খারাপ অবস্থা তার?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"স্রেফ মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে," সে বলল।

আমরা আর কোন কথা না বলে এগুতে থাকলাম।

"আমি জানি কি অবস্থা। একই জিনিস আমার মায়েরও হয়েছিল। ব্রেইন টিউমার। ভাবতে পারো? মাত্র দুই বছর আগে মা ব্রেন টিউমারে মারা গেছে। এখন বাবার হয়েছে।"

ইউনিভার্সিটি হসপিটালের করিডরে তুমুল হাউকাউ। ছুটির দিন বলে দর্শনার্থীদের ভিড়। যেসব রোগিদের সাধারণ রোগ তারাও এর মধ্যে রয়েছে। আর হাসপাতালের পরিচিত গন্ধ তো আছেই জীবাণুনাশক আর দর্শনার্থীদের আনা ফুলের তোড়া, সাথে প্রস্রাব আর ম্যাট্রেস। সেই সাথে নার্সদের হিলের খটখট শব্দ।

একটা সেমি প্রাইভেট রুমে মিদোরির বাবাকে রাখা হয়েছিল। দরজার কাছের বেডে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন মারাত্মক আহত হওয়া ছোট কোন জন্তু। ছোটখাট একজন মানুষ। একদিকে কাত হয়ে নিস্তেজ পড়েছিলেন। ঝুলে পড়া বাম হাতে সুই দিয়ে নল লাগানো। গায়ে কোন মাংস নেই, শুধু চামড়া। মাথায় সাদা ব্যান্ডেজ করা। সাদা হাতগুলোতে অসংখ্য সুঁইয়ের ক্ষত। ইনজেকশন আর শিরায় নল লাগানো থেকে হয়েছে। তার আধখোলা চোখ শূন্যে কোথাও দৃষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে। আমরা রুমে ঢুকতেই চোখের গোলক আমাদের

দিকে ঘুরে দশ সেকেন্ডের মত থেকে আবার সেই শূন্যে ফিরে গেল।

ঐ চোখগুলো দেখেই বলে দেয়া যায় এই লোক আর বেশিদিন বাঁচবে না। তার শরীরে জীবনের কোন লক্ষণ নেই। চিহ্ন দেখে বোঝা যায় কোন এক কালে জীবন ছিল। তার শরীরের অবস্থা জীর্ণ পুরনো বাড়ির মত যার আসবাব সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে, এখন শুধু ধ্বংস করা বাকি। তার শুকনো ঠোঁটের আশেপাশে আগাছার মত কিছু কিছু মোচ দাঁড়ি বেরিয়ে আছে। আমি ভাবলাম, এই লোকের হয়ত অনেক জীবনী শক্তি বের হয়ে গেছে, কিন্তু মোচ দাঁড়ি বড় হওয়া বন্ধ হয়নি।

মিদোরি জানালার পাশের অন্য বেডের লোকটাকে হ্যালো বলল। সে হেসে মাথা নাড়াল, কথা বলার অবস্থায় নেই। কয়েকবার কাশিও দিল, তারপর বালিশের পাশে রাখা গ্লাস থেকে পানি খেয়ে ঘুরে শুয়ে পড়ল। মুখ জানালার দিকে। জানালা দিয়ে খালি একটা বিদ্যুতের খাম্বা আর তার দেখা যায়। এমনকি আকাশের মেঘও দেখা যায় না।

"আজকে কেমন লাগছে, বাবা?" বাবার কানের কাছে গিয়ে মিদোরি এমনভাবে বলল যেন মাইক্রোফোন টেস্টিং চলছে। "কি অবস্থা বাবা?"

ওর বাবা ঠোঁট নাড়লেন। "*ভালোহ নাহ্,*" বললেন তিনি। কথা ঠিক নয়, শব্দগুলো যেন তার গলার ভেতরের শুকনো বাতাস থেকে তৈরি হচ্ছে। "*মাথাহ।*"

"মাথাব্যথা করছে?" মিদোরি জিজ্ঞেস করল।

"*হাহ।*"

মনে হচ্ছে একসাথে দু অক্ষরের বেশি বলতে পারেন না।

"তা তো করবেই," সে বলল। "মাত্র তোমার মাথায় অপারেশন হয়েছে, ব্যথা তো হবেই। আরেকটু কষ্ট করতে হবে। ধৈর্য ধরো। আচ্ছা, এ হল আমার বন্ধু ওয়াতানাবে।"

"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম," বললাম আমি। মিদোরির বাবা তার ঠোঁট খুলে আবার বন্ধ করে ফেললেন।

মিদোরি বিছানার পায়ের কাছে রাখা টুলের দিকে ইশারা করল আমাকে বসতে। আমি গিয়ে টুলে বসলাম। মিদোরি তার বাবাকে পানি খাওয়াল আর জিজ্ঞেস করল সে কিছু খেতে চায় কিনা, ফল কিংবা জেলি।

"*নাহ্,*" তিনি বললেন। যখন মিদোরি জোরাজুরি করতে লাগল, তাকে কিছু খেতেই হবে, তখন কেবল বললেন, "*খেয়েছিহহহ।*"

বিছানার মাথার কাছের একটা নাইট টেবিলে পানির বোতল, গ্লাস, একটা ডিস আর একটা ছোট ঘড়ি রাখা। মিদোরি টেবিলের নিচ থেকে একটা কাগজের ব্যাগ বের করে তার থেকে কিছু পাজামা, অন্তর্বাস, আর অন্য জিনিস বের করে লকারে নিয়ে রাখল। ব্যাগের তলায় রোগির জন্য খাবার রাখা দুই থোকা আঙ্গুর, ফ্রুট জেলি আর তিনটা শসা।

"শসা?! শসা এখানে কেন?" মিদোরি প্রশ্ন করল। "আমার বোন কি ভাবছিল কে জানে। আমি তাকে ফোনে পরিস্কার করে বলে দিয়েছি কি কি লাগবে, শসার কোন 'শ' ও উচ্চারণ করিনি! তার কেনার কথা কিউই ফ্রুট।"

"হয়তো ভুল শুনেছে," আমি বললাম।

"হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু সে যদি একটু মাথা খাটাত তাহলে বুঝতে পারত শসার কোন দরকার থাকতে পারে না। মানে, হাসপাতালে একজন রোগি কি করে? বিছানায় শুয়ে কাঁচা শসা খায়? বাবা, তুমি কি শসা খেতে চাও?"

"*নাহহ,*" মিদোরির বাবা বললেন।

মিদোরি বিছানার মাথার কাছে বসে তার বাবাকে বাসার খবরাখবর বলতে লাগল। টিভির ছবি খারাপ হয়ে গিয়েছিল, মিস্ত্রি ডাকা হয়েছে; তাকাইডো থেকে ওদের আন্টি জানিয়েছে কয়েকদিনের মধ্যেই দেখতে আসবে; ওষুধের দোকানদার মি. মিয়াওয়াকি বাইক চালাতে গিয়ে পড়ে গেছে; ইত্যাদি। ওর বাবা গোঙানির মত শব্দ করে উত্তর দিচ্ছিল।

"তুমি নিশ্চিত তুমি কিছু খেতে চাও না?"

"*নাহহ,*" ওর বাবা বললেন।

"তুমি ওয়াতানাবে? আঙ্গুর খাবে?"

"না," আমি মানা করে দিলাম।

কয়েক মিনিট পর মিদোরি আমাকে টিভি রুমে নিয়ে গেল আর সোফায় বসে ধূমপান করতে লাগল। পায়জামা পরা তিনজন রোগিও সেখানে বসে ধূমপান করছে আর টিভিতে কোন একটা রাজনৈতিক অনুষ্ঠান দেখছে।

"অ্যাই," মিদোরি চোখ টিপে ফিসফিস করে বলল। "আমরা এখানে আসার পর থেকে ক্রাচওয়ালা বুড়োটা আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। ওই যে, নিল পাজামা পরা চশমাওয়ালাটা।"

"এরকম একটা স্কার্ট পরার পর আর কি আশা করতে পারো তুমি?"

"ভালো কিন্তু। আমি নিশ্চিত তারা সবাই খুব একঘেয়েমিতে আক্রান্ত। বিরক্তি এখন একটু কমবে হয়ত। উত্তেজনায় তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যেতে পারে।"

"আশা করছি উলটোটা হবে না।"

মিদোরি তার সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আসলে আমার বাবা কিন্তু খারাপ লোক না। আজেবাজে কথা বলার জন্য আমি তার উপর মাঝে মাঝে ক্ষেপে যাই, কিন্তু ভেতরে সে খুব সৎ একজন মানুষ আর আমার মাকে সত্যি সত্যি অনেক ভালোবাসত। সে যা যা করা সম্ভব নিজের মত সব কিছু করে জীবন পারো করেছে। হয়তো একটু দূর্বল প্রকৃতির, কিংবা হয়তো একদমই কোন ব্যবসা বুদ্ধি নেই, আর লোকজন হয়ত তাকে পছন্দও করে না। কিন্তু তারপরেও সে ওইসব চাপার জোরওয়ালা ঠগ আর মিথ্যুক লোকজনের চেয়ে অনেক গুণ ভালো। আমি আমার বাবার মতই ঘাউরা, যা বলি তা থেকে কোনভাবেই সরে আসি না, তাই আমাদের মধ্যে অনেক ঝগড়া হত কিন্তু সত্যি কথা হল বাবা আসলে খারাপ লোক না।"

মিদোরি এমনভাবে আমার হাত ধরলো, যেন কেউ রাস্তায় কিছু ফেলে গেছে আর সে তুলে নিয়েছে। আমার অর্ধেক হাত তার স্কার্টের উপর আর অর্ধেক তার পায়ের উপর। আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে।

"তোমাকে এরকম একটা জায়গায় আনার জন্য দুঃখিত। আরও কিছুক্ষণ আমার সাথে থাকলে রাগ করবে?"

"তুমি চাইলে সারাদিন থাকতে পারি," আমি বললাম। "পাঁচটা পর্যন্ত। তোমার সাথে সময় কাটাতে আমার ভালো লাগে। অবশ্য আর কিছু করারও নেই আমার।"

"তুমি রবিবারে এমনিতে কি করো?"

"লন্ড্রি করি, তারপর ইস্ত্রি করি।"

"মনে হচ্ছে তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ড সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে চাও না?"

"না, মনে হয়। ব্যাপারটা বেশ জটিল। আর আমি ঠিকমত বুঝিয়েও বলতে পারবো না।"

"ঠিক আছে, তোমাকে সবকিছু বোঝাতে হবে না," মিদোরি বলল। "আমার কি মনে হয় তা শুনতে চাও নাকি রাগ করবে?"

"না, বলো সমস্যা নেই। তোমার কল্পনা মজার কিছু হবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"আমার ধারনা সে একজন বিবাহিত মহিলা।"

"তাই?"

"হ্যাঁ, তার বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ হবে। সে সুন্দরি আর বড়লোক। সবসময় ওইসব দামি ফার কোট, চার্লস জর্ডান জুতা পরে, আর সিল্কের অন্তর্বাস। ওই মহিলা সেক্সের জন্য খুবই ক্ষুধার্ত থাকে, বিছানায় নোংরা জঘন্য জিনিসগুলো করতে পছন্দ করে। তোমরা ছুটির দিন ছাড়া অন্যদিনগুলোতে বিকেলে দেখা

করো, যৌন ক্ষুধা মেটাও। ছুটির দিনে তার স্বামী বাসায় থাকে বলে দেখা করতে পারো না। ঠিক বলেছি না?"

"খুবই ইন্টারেস্টিং।"

"সে চায় তুমি তার চোখ বেঁধে, হাত পা বেঁধে, সারা শরীরের প্রতিটা ইঞ্চি চেটে দাও। তারপর সে তোমাকে তার মধ্যে অদ্ভুত সব জিনিস ঢোকাতে বাধ্য করে। সে কন্টরসনিস্টের মত বিভিন্ন ভঙ্গি করে আর তুমি পোলারয়েড ক্যামেরা দিয়ে তার ছবি তোলো।"

"মজার ব্যাপার মনে হচ্ছে।"

"সে এসব করার জন্য সবসময় উন্মুখ হয়ে থাকে। যা যা কল্পনায় করা সম্ভব সব বাস্তবে করতে চায়। প্রতিদিন এসব নিয়ে ভাবে। তার অনেক অবসর সময় চিন্তা-ভাবনা করার জন্য। হুমম, এরপর ওয়াতানাবে আসলে আমরা এইটা করবো, কিংবা ঐটা। তুমি বিছানায় উঠলেই তার মাথা খারাপ হয়ে যায়, সব পজিশন ট্রাই করে আর প্রত্যেকটায় অন্তত তিনবার করে অরগাজম হয়। তারপর সে তোমাকে বলে, 'আমার শরীর খুব সেক্সি না? কচি মেয়েদের সাথে সেক্স করে তুমি আর মজা পাবে না। ওইসব কচি মেয়েরা তোমার জন্য এসব করবে? কি মজা না? কিন্তু তুমি তো এখনো কিছুই করলে না!' "

"আমার মনে হয় তুমি ইদানিং অনেক বেশি পর্নো মুভি দেখছো," আমি হাসতে হাসতে বললাম।

"তোমার তাই মনে হয়? আমিও এই নিয়ে একটু চিন্তায় আছি। পর্নো মুভি দেখতে আমার অনেক ভালো লাগে। আমাকে একদিন নিয়ে যাবে দেখাতে?"

"ঠিক আছে," আমি বললাম, "এরপর যেদিন তুমি ফ্রি থাকো সেদিন যাবো।"

"সত্যি? আমার তো আর তর সইছে না। চলো, একটা এসঅ্যান্ডএম'র শোতে যাই। চাবুক টাবুক থাকে যেগুলোতে। মেয়েকে সবার সামনে হিসু করতে বাধ্য করে। আমার ওইগুলো সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে।"

"আমরা যাবো সমস্যা নেই।"

"তুমি জানো পর্নো শোগুলোতে আমার সবচেয়ে বেশি কি ভালো লাগে?"

"আমি কোন কিছু ভাবতেও পারছি না।"

"যখন কোন সেক্সের দৃশ্য শুরু হয়, সবাই একসাথে ঢোক গেলে। গপ করে একটা শব্দ হয়," মিদোরি বলল। "ওই শব্দ শুনতে আমার খুব মজা লাগে! কি মিষ্টি শব্দ! গপ!"

হাসপাতালের রুমে ফিরে গিয়ে মিদোরি আবার তার বাবার সাথে একগাদা কথা বলল, সে হয় কিছু বলল না, না-হলে গোঙানির মত শব্দ করে উত্তর দিল। এগারোটার দিকে অন্য বেডের লোকটার স্ত্রী হাজির হলেন। তিনি তার স্বামীর পাজামা বদলে দিয়ে একটা ফল ছিলে খাওয়াতে লাগলেন। তার মুখ গোলাকার, কথাবার্তাও চমৎকার। মিদোরি আর তার মধ্যে হালকা কথা হল। একজন নার্স স্যালাইনের বোতল বদলে দিতে আসল, মিদোরি আর ওই মহিলার সাথে কথা বলল। আমি রুমের মধ্যে, জানালা দিয়ে বাইরে বিদ্যুতের খাম্বার দিকে তাকালাম। মাঝে মধ্যে চড়ুই এসে তারে বসে কিচির মিচির করছে। মিদোরি তার বাবার সাথে কথা বলতে থাকল। কপাল থেকে ঘাম মুছে দিল। টিস্যু দিল থুতু ফেলার জন্য। পাশের মহিলা আর নার্সের সাথে কথা বলল। মাঝে মাঝে আমার দিকে কথা ছুঁড়ে দিল। আর খেয়াল রাখলো স্যালাইন ঠিকমত চলছে কিনা।

সাড়ে এগারোটার দিকে ডাক্তার এল। মিদোরি আর আমি বাইরে বেরিয়ে করিডরে অপেক্ষা করলাম। ডাক্তার বেরিয়ে এলে মিদোরি জিজ্ঞেস করল তার বাবার অবস্থা কি রকম।

"মাত্র তো সার্জারি করা হয়েছে, পেইন কিলার দেয়া হয়েছে, উনি বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন।" ডাক্তার বলল। "আরও দু-তিনদিন পর সার্জারির রেজাল্ট নিয়ে বসব। যদি ভালো রেজাল্ট আসে তাহলে উনি সুস্থ হয়ে যাবেন, আর যদি ভালো না আসে তাহলে হয়তো অন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

"আপনারা নিশ্চয়ই উনার মাথা আবার কাটতে যাবেন না?"

"এখনি কিছু বলা যাচ্ছে না, সময় আসুক তখন দেখা যাবে," ডাক্তার বলল। "ওয়াও, সেইরকম একটা শর্ট স্কার্ট পরেছেন দেখি!"

"সুন্দর, তাই না?"

"সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার সময় কি করেন?" প্রশ্ন করলেন ডাক্তার।

"কিছুই না, যা হয় তা হতে দেই," মিদোরি কথাটা বলতেই ডাক্তারের পেছন থেকে নার্স মুখ টিপে হাসলো।

"অসাধারন। আপনি একদিন আসুন, আপনার মাথা কেটে দেখি ভেতরে কি অবস্থা। দয়া করে একটা অনুরোধ, হাসপাতালে এলিভেটর ব্যবহার করবেন। আমি নতুন রোগি দেখার মত অবস্থায় নেই। যা আছে যথেষ্টর চেয়েও বেশি।"

ডাক্তারের রাউন্ডের পর লাঞ্চটাইম। একজন নার্স একটা ট্রলি ঠেলে রুমে রুমে খাবার পৌছে দিচ্ছিল। মিদোরির বাবাকে দেয়া হল সুপ, ফল, কাঁটা ছাড়া

সিদ্ধ মাছ আর জেলি দেয়া সব্জি। মিদোরি খাট উঁচিয়ে তার বাবাকে বসাল আর চামচ দিয়ে সুপ খাওয়ালো।

পাঁচ-ছয় চামচ খাওয়ার পর মুখ সরিয়ে তিনি বললেন, "*আর নাহহ।*"

"তোমাকে অন্তত সুপটা শেষ করতে হবে," মিদোরি বলল।

"*পরেহহহ।*"

"তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না–তুমি ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করো না, না খেলে শক্তি ফিরে পাবে না," সে বলল। "বাথরুম ধরেনি এখনো?"

"*নাহহ,*" তিনি বললেন।

"চল ওয়াতানাবে, নিচের ক্যাফেটেরিয়াতে যাই।"

আমি গেলাম কিন্তু খাওয়ার রুচি ছিল না। ক্যাফেটেরিয়াতে ডাক্তার, নার্স আর দর্শনার্থীদের ভিড়। লাইন ধরে টেবিল চেয়ারে লোকজন গুহার মত হাঁ করে আছে। খাচ্ছে আর কথা বলছে। সবার কথা বলার বিষয় একটাই–অসুস্থতা, টানেলে কথা বলার মত প্রতিধ্বনি হচ্ছে। মাঝে মধ্যে মাইকে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে ডাক্তার আর নার্সদের উদ্দেশ্য করে। আমি একটা টেবিল দখলে রাখার জন্য বসে ছিলাম, মিদোরি গিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের ট্রেতে করে দুটো সেটমিল নিয়ে আসল। ক্রিম সস আর ক্রোকেট, পটেটো সালাদ, কুচিকুচি করা বাঁধাকপি, সিদ্ধ সবজি, ভাত আর মিসো সুপ। রোগিদের যেভাবে দেয়া হয় একইভাবে সাদা কাপে খাবারগুলো লাইন করে ট্রেতে রাখা। আমি অর্ধেক খেয়ে আর খেতে পারলাম না। মিদোরি মনে হল তৃপ্তি নিয়েই খেলো।

"তোমার খিদে নেই?" গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে প্রশ্ন করল সে।

"নাহ," আমি বললাম।

"হাসপাতালের পরিবেশের জন্য," সে বলল। ক্যাফেটেরিয়ার মধ্যে চোখ বোলাল। "যাদের এখানে অভ্যেস নেই তাদের এরকম সবসময়ই হয়। এখানের গন্ধ, শব্দ, বিচ্ছিরি বাতাস, রোগিদের চেহারা, বিরক্তি, অবসাদ, হতাশা, ব্যথা–সব মিলিয়ে এরকম হয়। পেটে ঢুকে খাওয়ার রুচি নষ্ট করে ফেলে। একবার অভ্যেস হয়ে গেলে তখন আর সমস্যা হয় না। তাছাড়া যদি ঠিকমত না খাও, রোগির যত্ন নিতে পারবে না। সত্যি। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আমাকে আমার দাদা, দাদি, মায়ের পর এখন বাবার দেখাশোনা করতে হচ্ছে। পরের খাবার কপালে জুটবে কিনা তার ঠিক নেই, তাই যখন পারো তখন ভালো করে খেয়ে নেয়াটা জরুরি।"

"বুঝলে," আমি বললাম।

"আত্মীয়রা কেউ দেখতে এলে তারা আমার সাথে এখানে খেতে আসে আর সবসময়ই তোমার মত তারা কেউই অর্ধেক খেয়ে আর খেতে পারে না। সবসময় বলে, 'বাহ মিদোরি তোমার তো খাওয়ার রুচি ভালো। আমার খাওয়ার রুচি নেই একদম।' অথচ এখানে রোগির যত্ন নিচ্ছে কে? আমি! তারা স্রেফ এসে সমবেদনা দেখায়। আমি বসে বসে গু, কফ-থুতু পরিষ্কার করি, শরীর মুছে দেই। আমাকে পঞ্চাশগুণ বেশি সমাবেদনা দেখানো উচিত। তা না, তারা খালি দেখে আমার খাওয়া আর বলে, 'তোমার তো খাওয়ার রুচি ভালো।' তারা আমাকে কি মনে করে? গাড়ি টানা গাধা? তাদের তো বয়স কম হয়নি, দুনিয়া কেমনে কাজ করে তাদের বোঝা উচিত। তারা এরকম বেকুব কেন? বড় বড় কথা বলা সহজ, গু সাফ করতে পারো কি পারো না সেটাই আসল। বুঝতে হবে, আমারও খারাপ লাগতে পারে, সবার মত আমিও হাঁপিয়ে উঠি। মাঝে মাঝে আমার এত খারাপ লাগে যে কান্না পায়। আর তোমাকে যদি দেখতে হয় যে একদল ডাক্তার একসাথে হয়ে একজনের মাথা কাটছে, যেখানে তার বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই। তারপর আবার জোড়া দিচ্ছে। এক জিনিস বারবার করছেই তো করছে। এদিকে প্রতিবার রোগির অবস্থা খালি খারাপের দিকেই যাচ্ছে, তখন কেমন লাগে বলো? টাকা-পয়সা পানির মত বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি না আগামি সাড়ে তিন বছর কলেজে যেতে পারবো কিনা। এভাবে চললে আমার বোনের বিয়ের খরচ বহন করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে।"

"তোমাকে এখানে সপ্তাহে কদিন আসতে হয়?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"সাধারণত চার দিন," মিদোরি বলল। "যদিও তারা বলে এখানে সার্বক্ষণিক নার্সিং সুবিধা আছে, কোন সন্দেহ নেই তাদের নার্সরাও ভালো, কিন্তু তাদের উপর চাপ অনেক বেশি। পরিবারের কাউকে না কাউকে এসে কাজ করতেই হয়। আমার বোন দোকান দেখে, আমার ক্লাস থাকে। তারপরেও সে সপ্তাহে তিনদিন আসে এখানে, আমি চার দিন। এর মধ্যে আমরা ডেটের জন্য অল্প কিছু সময় বের করি। বিশ্বাস করো, একদম সময় নেই কারো!"

"এত ব্যস্ত থাকলে তুমি আমার সাথে কিভাবে সময় কাটাও?"

"তোমার সাথে সময় কাটাতে ভালো লাগে আমার," মিদোরি প্লাস্টিকের কাপ নিয়ে খেলতে খেলতে বলল।

"যাও, কয়েক ঘন্টার জন্য ঘুরে আসো বাইরে থেকে," আমি বললাম। "আমি ততক্ষন তোমার বাবার দেখাশোনা করছি।"

"মানে? কেন?"

"তোমার হাসপাতাল থেকে ছুটি দরকার, নিজের জন্য কিছু সময় দরকার–কারো সাথে কথা বলার দরকার নেই, যাও গিয়ে মাথা পরিস্কার করে আস।"

মিদোরি এক মিনিট চিন্তা করে মাথা ঝাঁকাল। "হুমম ঠিকই বলেছো হয়তো। কিন্তু তুমি কি জানো কি করতে হবে? তুমি কিভাবে তার দেখাশোনা করবে?"

"এতক্ষন তো দেখলাম। মোটামুটি বোঝা হয়ে গেছে কি করতে হবে। স্যালাইনের লাইনের দিকে খেয়াল করতে হবে, পানি খাওয়াতে হবে, ঘাম মুছে দিতে হবে, আর থুতু কফ আসলে ফেলতে হবে। বিছানার নিচে বেড প্যান আছে। খিদে লাগলে, বাকি খাবার খাইয়ে দিতে পারবো। না বুঝলে নার্স তো আছেই।"

"আমার মনে হয় এতেই হবে," মিদোরি হেসে বলল। "আরেকটা ব্যাপার। তার মাথায় সমস্যা হলে হঠাৎ হঠাৎ আজব আজব জিনিসপত্র বলতে পারে–কেউ বুঝতে পারে না কী বলে। যা বলে বলুক চিন্তা করতে যেও না এ নিয়ে।"

"কোন সমস্যা নেই," আমি বললাম।

রুমে ফিরে এসে মিদোরি তার বাবাকে বলল তার কিছু কাজ আছে, একটু বাইরে যাচ্ছে, আমি ততক্ষন তার দেখাশোনা করবো। তিনি কোন কথা বললেন না। এর হয়ত কোন অর্থ নেই তার কাছে। তিনি স্রেফ শুয়ে থেকে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। চোখের পলক না পড়লে মনে হত বেঁচে নেই বা অজ্ঞান হয়ে গেছে হয়ত। তার চোখ লাল, অনেক মদ্যপান করলে যেমন হয়। আর প্রতিবার যখন জোরে করে নিশ্বাস নেন, নাক একটু ফুলে ওঠে। ওইটুকু বাদ দিলে তার একটা পেশিও নড়ছে না। মিদোরিকে উত্তর দেয়ার কোন চেষ্টাই করলেন না। আমি ভাবলাম না জানি কি চিন্তাভাবনা চলছে তার মধ্যে।

মিদোরি চলে যাওয়ার পর আমি ভাবলাম ওর বাবার সাথে কথা বলার চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু কি বলবো ভেবে পেলাম না। তাই চুপ করেই থাকলাম। একসময় তিনি চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি বিছানার মাথার কাছে টুলে বসে থাকলাম আর তার নাকের দিকে খেয়াল রাখলাম। আশা করলাম এরমধ্যে না মরে গেলেই হয়। আমার সামনে উনি মারা গেলে খুবই অদ্ভুত হবে ব্যাপারটা। কারন তার সাথে আমার জীবনে আজকেই মাত্র প্রথম দেখা, আর আমাদের মধ্যে একমাত্র মিদোরি হচ্ছে সংযোগ, যাকে কিনা আমি চিনি নাটকের ইতিহাস ক্লাস থেকে।

তিনি মরেননি অবশ্য। চুপ করে ঘুমাচ্ছিলেন খালি। তার মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছিলাম। নিশ্চিন্ত মনে পাশের বেডের রোগির স্ত্রীর সাথে কথাবার্তা বললাম। উনি ভাবলেন আমি বোধ হয় মিদোরির বয় ফ্রেন্ড, তাই খালি মিদোরির কথাই বলে গেলেন।

"খুবই চমৎকার মেয়ে," বললেন তিনি। "সুন্দর করে বাবার যত্ন নেয়। ওর মনটা অনেক বড়, আর নরম। তার উপর দেখতে তো খুবই সুন্দরি। ওর ঠিকমত যত্ন নিও। ছেড়ে যেতে দিও না। ওর মত আর কাউকে কিন্তু পাবে না।"

"আমি ওর ঠিকমত যত্ন নেবো, চিন্তা করবেন না," আশ্বস্ত করলাম মহিলাকে।

"আমার বাসায় একটা ছেলে আর একটা মেয়ে আছে। ছেলের বয়স সতের, মেয়ের একুশ। তারা কেউ হাসপাতালে আসার কথা চিন্তাই করে না। স্কুল ছুটি হওয়ামাত্র হয় তারা ডেটে যাচ্ছে, নাহলে সার্ফিং, নাহলে অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত। একদম বাজে। পকেট মানির জন্য আমাকে চাপাচাপি করবে আর টাকা পাওয়া মাত্র তাদের আর টিকিটাও দেখা যাবে না।"

দেড়টার দিকে মহিলা বাজার করার জন্য চলে গেলেন। দু-জন রোগিই গভীর ঘুমে। বিকেলের হালকা আলো জানালা দিয়ে রুমে ঢুকছিল। আমি মনে হচ্ছিল টুলে বসে ঝিমাতে ঝিমাতে পড়ে যেতে পারি। টেবিলে ফুলদানিতে রাখা সাদা আর হলুদ রঙের চন্দ্রমল্লিকা ঘোষণা দিচ্ছিল এখন হেমন্ত। মিদোরির বাবার লাঞ্চের না খাওয়া সিদ্ধ মাছের গন্ধ বাতাসে। বাইরে হলে নার্সরা খটখট করে হেঁটে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে চড়া সুরে। কখনো কখনো রুমে উঁকি দিয়ে ঘুমন্ত রোগিদের দেখছিল আর আমার দিকে হাসি ছুঁড়ে দিচ্ছিল। সাথে পড়ার জন্য কোন বই নিয়ে আসা উচিত ছিল। রুমে কোন ম্যাগাজিন বা খবরের কাগজ ছিল না যে পড়বো, স্রেফ দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলানো।

আমি নাওকোর কথা চিন্তা করলাম। তার নগ্ন দেহে শুধু ব্যারেট পরে দাঁড়িয়ে থাকা। তার কোমরের বাঁক আর নিচের অন্ধকার ছায়া। কেন সে নিজেকে আমার কাছে এরকমভাবে দেখাল? সে কি ঘুমের মধ্যে হাঁটছিল? নাকি স্রেফ আমার কল্পনা ছিল? অবশ্য যত সময় যাচ্ছে, যত সেই ছোট্ট দুনিয়া দূরে সরে যাচ্ছে, ততই নিজেকে আমি বুঝ দিচ্ছি, সব সত্যি ছিল। যদি নিজেকে বলি সব সত্যি ছিল, তাহলে আমার বিশ্বাস সব সত্যি ছিল। যদি নিজেকে বলি সব কল্পনা ছিল, তাহলে মনে হচ্ছিল সব কল্পনাই ছিল। এত পরিস্কার দেখেছি, কল্পনা হওয়া কঠিন, আবার সব মিলিয়ে এত সুন্দর যে, সত্যি হওয়াও কঠিন। নাওকোর নগ্ন দেহ আর চাঁদের আলো।

মিদোরির বাবা হঠাৎ ঘুম ভেঙে কাশতে লাগলেন, আমার দিবাস্বপ্নের ওখানেই সমাপ্তি হল। টিস্যুতে কফ ফেলতে সাহায্য করলাম তাকে, টাওয়েল দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছে দিলাম।

"পানি খাবেন?" জানতে চাইলাম আমি, যার উত্তর দিলেন উনি চার মিলিমিটারের মত মাথা নাড়িয়ে। আমি ছোট পানির বোতলে করে অল্প অল্প করে তাকে পানি খাওয়ালাম। তার শুকনো ঠোঁট, গলা কাঁপছিল। পানির পোকার মত করে উনি পুরো বোতলের পানি খেয়ে শেষ করলেন।

"আরও পানি খাবেন?" আমি প্রশ্ন করলাম। তিনি মনে হল কিছু বলার চেষ্টা করলেন, আমি তার কাছে কান নিয়ে গেলাম।

"আরহ্ লাগহবে নাহ্," শুষ্ক গলায় বললেন–তার গলা আগের চেয়েও শুষ্ক শোনাল।

"আপনার তো খিদে লাগার কথা কিছু খান?" তিনি হালকা মাথা নাড়িয়ে সায় দিলেন। মিদোরির মত আমি একইভাবে বিছানা উঠিয়ে ওনাকে বসালাম, চামচে করে জেলি দেয়া সবজি আর সিদ্ধ মাছ খাওয়ালাম। অর্ধেক খাবার খাওয়াতে অস্বাভাবিক লম্বা সময় লাগল। এক পর্যায়ে তিনি মাথা নেড়ে বোঝালেন আর না। তার নড়াচড়া প্রায় অদৃশ্য, একটু নড়তেই তার অনেক ব্যথা লাগছিল।

"ফল খাবেন?" আমি জানতে চাইলাম?

"*নাহহ,*" তিনি বললেন। আমি টাওয়েল দিয়ে তার ঠোঁটের কোণা মুছে দিলাম। থালা বাসন করিডরে রেখে আসার আগে বিছানা আবার নামিয়ে সমান করে দিলাম।

"খাবার কেমন ছিল?" জানতে চাইলাম।

"*পচাহ্,*" উনি উত্তর দিলেন।

"হ্যাঁ," আমি হেসে বললাম, "আমারও দেখে তাই মনে হচ্ছিল," মিদোরির বাবা মনে হল স্থির করতে পারছিলেন না চোখ খোলা রাখবেন নাকি বন্ধ করবেন। কোনটাই না করে তিনি সোজা আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমি ভাবলাম না জানি তিনি কি ভাবছেন আমাকে নিয়ে। তাকে দেখে মনে হল, মিদোরি যখন ছিল তার চেয়ে এখন আমার সাথে থাকতে তিনি স্বস্তি বোধ করছেন। অথবা উনি হয়ত আমাকে অন্য কেউ ভেবে ভুল করছেন কে জানে। কিংবা আমিই হয়তো এরকম উল্টাপাল্টা ভাবছি।

"আজকে বাইরে সুন্দর একটা দিন," আমি টুলে বসে বললাম। "হেমন্ত কাল, রবিবার, চমৎকার আবহাওয়া, যেখানেই যাবেন দেখবেন লোকজনের

ভিড়। বাইরে যাওয়ার চেয়ে ভেতরে আরাম করাই ভালো। ভিড় খুবই বিরক্তিকর। বাতাসও খারাপ। আমি রবিবার সাধারণত লন্ড্রি করি–সকালে সব কাপড়-চোপড় ধুয়ে ডরমের ছাদে নিয়ে শুঁকোতে দেই। আবার সূর্য ডোবার আগে নামিয়ে নিয়ে এসে ভালো করে ইস্ত্রি করে রাখি। ইস্ত্রি করতে আমার খারাপ লাগে না। ভাঁজ সমান করার মধ্যে অন্যরকম একটা সন্তুষ্টি আছে। কাজটা আমি করিও ভালোমতই। প্রথমদিকে পারতাম না অবশ্য। সবকিছুতে ভাঁজ ফেলে দিতাম। প্রায় একমাস করার পর বুঝেছি কিভাবে কি করতে হবে। তাই রবিবার হল আমার জন্য লন্ড্রি আর ইস্ত্রি করার দিন। আজকে পারলাম না অবশ্য, লন্ড্রির জন্য চমৎকার দিন ছিল। সমস্যা নেই, কালকে সকালে একটু আগে আগে উঠে করতে পারবো। চিন্তা করবেন না। আমার রবিবার কিছু করার থাকে না।

"কালকে সকালে উঠে কাপড় ধুয়ে শোঁকাতে দিয়ে আমি দশটার ক্লাসে যাবো। মিদোরির সাথে আমার যে ক্লাসটা আরকি, নাটকের ইতিহাস। আমি ইউরিপিডেসের উপর কাজ করছি। আপনার পরিচয় আছে ইউরিপিডিসের সাথে? উনি একজন প্রাচীন গ্রিক ব্যক্তিত্ব–বড় তিনজন গ্রিক ট্র্যাজেডির একজন। বাকি দু-জন হলেন একিলিস আর সফোকিলিস। উনি সম্ভবত মেসিডোনিয়াতে মারা গিয়েছিলেন কুকুরের কামড় খেয়ে। যদিও অনেকে এটা বিশ্বাস করে না। যাহোক, এই হল ইউরিপিডিস। আমার অবশ্য সফোকিলিসকে বেশি পছন্দ। আসলে বলা মুশকিল কে বেশি ভালো।

"তার নাটকের বৈশিষ্ট্য হল সব কিছু অনেক প্যাঁচানো, আর চরিত্রগুলো ফাঁদে আটকা থাকে। বোঝাতে পারছি? ধরুন, একদল লোক হাজির হল, তাদের নিজেরদের আলাদা আলাদা সমস্যা আছে, নিজস্ব অজুহাত আছে। যে যার মত করে ন্যায়ের কথা বলছে, সুখের পেছনে চরকির মত ঘুরছে। ফলাফল হল, কেউই কিছু করতে পারছে না। অবশ্যই, মানে আমি বলতে চাইছি, সবাই কি ন্যায়ের দেখা পায়, সুখের দেখা পায়? অসম্ভব হওয়ারই কথা। তারপর আপনার কি মনে হয়? কি হতে পারে? খুব সহজ–ঈশ্বর এসে হাজির হবেন কাহিনীর শেষে আর একজন একজন করে সবাইকে রাস্তা বাতলে দেবেন। 'তুমি ওদিকে যাও, তুমি এদিকে আসো, তুমি তার পিছে যাও, তুমি এখানে বসে থাকো,' এইসব আরকি। তার কাজ জোড়া দেয়া, ফলে কাহিনী খুব সুন্দরভাবে খাপে খাপে বসে যায়। এর একটা নাম আছে *ডিউস এক্স মেশিনা*। ইউরিপিডিসের প্রায় সব নাটকে এই *ডিউস এক্স মেশিনা* থাকবেই। সেই নিয়েই সমালোচকরা দু-ভাগ হয়ে বিতর্ক করে।"

"কিন্তু ভেবে দেখুন–যদি সত্যি আমাদের জীবনে ডিউস এক্স মেশিনা থাকতো কেমন হত? সবকিছু কত সহজ হয়ে যেত। আপনার যদি মনে হত কোথাও আটকে গেছেন, কোন এক ঈশ্বর উড়ে এসে আপনার সমস্যার সমাধান করে দিত। এর চেয়ে সহজ আর কি হতে পারে বলেন? যাইহোক, এই হল নাটকের ইতিহাস। এইসব জিনিস নিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছি।"

মিদোরির বাবা কিছু বললেন না, যতক্ষণ আমি কথা বললাম তিনি খোলা চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তার চোখ দেখে বোঝার উপায় নেই আমি যা বললাম তা বুঝলেন কিনা।

"শান্তি," আমি বললাম।

এত কথা বলে আমার খিদে পেয়ে গেল। সকালে তো কিছুই খাইনি বলা যায় আর দুপরে অর্ধেক খাওয়া হয়েছে। এখন খারাপ লাগছে কেন ঠিকমত খেলাম না। খারাপ লেগে অবশ্য কোন লাভ নেই। কেবিনেট খুলে দেখলাম খাওয়ার কিছু আছে কিনা। শুধু এক ক্যান নরি, কিছু ভিক্স কফ ক্যান্ডি। আর সয়া সস। সেই সাথে কাগজের ব্যাগে শসা আর আঙ্গুর।

"আমি শসাগুলো খাচ্ছি, আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না," আমি মিদোরির বাবাকে বললাম। উনি কোন উত্তর দিলেন না। আমি তিনটা শসা ধুয়ে একটা পিরিচে সয়া-সসে মাখিয়ে নিলাম। তারপর একটা শসা নরি দিয়ে জড়িয়ে সয়া সস লাগিয়ে কচকচ করে খেলাম।

"উমম, মজা!" মিদোরির বাবাকে বললাম। "একদম তাজা, কচি, কাঁচা কাঁচা গন্ধ। শসাগুলো খুবই ভালো। কিউই ফ্রুটের চেয়ে ভালো, কোন সন্দেহ নেই।"

আমি আরেকটা শসাও একইভাবে গলাধকরন করলাম। শসা খাওয়ার কচকচ শব্দ রুমে প্রতিধ্বনি তুলল। দুটো শসা খাওয়ার পর বিরতি নিয়ে হলে গিয়ে গ্যাস বারনারে পানি গরম করে এনে চা বানালাম।

"আপনি কি কিছু খেতে চান? পানি? জুস?" মিদোরির বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"*শসাহ,*" তিনি বললেন।

"দারুন," আমি হেসে বললাম। "নরি দিয়ে দেবো?"

সে হালকা মাথা নাড়াল। আমি আবার খাট বাঁকিয়ে উঠালাম। ছুরি দিয়ে শসার ছোট টুকরো করলাম যাতে উনি খেতে পারেন, তারপর নরি দিয়ে জড়িয়ে, টুথপিক লাগিয়ে সয়া-সসে ডুবিয়ে উনার মুখে দিলাম। চেহারার অভিব্যক্তিতে

প্রায় কোন বদল হল না, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ চিবিয়ে অবশেষে গিলে ফেললেন।

"কেমন? ভালো ছিল?"

"*ভালোহ,*" বললেন তিনি।

"খাবার মজা হলেই না ভালো," আমি বললাম। "এতে প্রমান হল যে আপনি বেঁচে আছেন"

উনি পুরো একটা শসা খেয়ে ফেললেন। খাওয়ার পর পানি খেতে চাইলে আমি বোতলে করে তাকে পানি খাওয়ালাম। কয়েক মিনিট পর উনি প্রস্রাব করতে চাইলেন, আমি প্রস্রাবের পাত্র বিছানার নিচ থেকে বের করে তার লিঙ্গের মুখে ধরলাম। বাথরুমে নিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করে আনলাম, তারপর খেয়ে শেষ করলাম আমার চা।

"কেমন লাগছে আপনার এখন?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"*আমারহ...মাথাহ।*"

"ব্যথা করছে?"

"*একটুহহ,*" হালকা ভুরু কুঁচকে বললেন

"ব্যথা করাটাই স্বাভাবিক, মাত্র অপারেশন হয়েছে না? আমার কখনো অপারেশন হয়নি তাই আমি জানি না কিরকম কষ্ট হচ্ছে আপনার।"

"*টিকেট,*" তিনি বললেন।

"টিকেট? কীসের টিকেট?"

"*মিদোরিহ,*" তিনি বললেন। "*টিকেট।*"

আমার কোন ধারনা নেই উনি কীসের কথা বলছেন, তাই চুপ করে থাকলাম। উনি নিজেও এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর আবার বললেন <প্লিহজ> চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকালেন। আমি বুঝতে পারছিলাম উনি আমাকে কিছু বলার চেষ্টা করছেন কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না কি হতে পারে।

<উএনো> তিনি বললেন। <মিদোরিহ>

"উএনো স্টেশন?"

উনি মাথা নাড়লেন।

আমি বোঝার চেষ্টা করলাম সব সূত্র থেকে কি হতে পারে। "টিকেট, মিদোরি, প্লিজ, উএনো স্টেশন।" কিন্তু কিছুই বুঝলাম না। আমার মনে হল তার মাথা বুঝি আউলে গেছে, কিন্তু তার দৃষ্টি এখন আগের থেকে পরিস্কার। উনি যে হাতে স্যালাইন দেয়া নেই সেটা তুলে আমার দিকে তাক করলেন। হাত যেভাবে

কাঁপছিল, তাতে বোঝা যাচ্ছিল অনেক কষ্ট করে তাকে এইটুকু তুলতে হয়েছে। আমি উঠে গিয়ে তার ভাঁজ পড়া জীর্ণ হাত ধরলাম।

উনি শক্তি সঞ্চয় করে বললেন, "*প্লিইইইজ।*"

"চিন্তা করবেন না," বললাম আমি। "আমি দেখছি টিকেট আর মিদোরির ব্যাপারটা।"

উনি হাত নামিয়ে চোখ বন্ধ করে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। তবুও আমি পরীক্ষা করে দেখলাম জীবিত আছেন কিনা। তারপর আবার গরম পানি আনতে গেলাম চা বানানোর জন্য। চা খেতে খেতে উপলব্ধি করলাম মৃত্যুপথযাত্রি এই ছোটখাট মানুষটির প্রতি আমার মনে কোথাও সহানুভূতির জায়গা তৈরি হয়েছে।

অন্য রোগিটির স্ত্রী কয়েক মিনিট পরেই ফিরে আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন সব ঠিক আছে কিনা। আমি জানালাম সব ঠিক আছে। তার স্বামী তখনও ঘুমাচ্ছিলেন। গভীর নিশ্বাস পড়ছিল।

মিদোরি তিনটার পর ফেরত আসল।

"আমি পার্কে চুপচাপ বসে ছিলাম," বলল সে। "যেরকম তুমি করতে বলেছিল। কারো সাথে কথা না বলে চুপচাপ মাথা খালি করলাম।"

"কেমন লাগছে?"

"আগের চেয়ে ভালো, থ্যাংকস। যদিও আমি এখনো ক্লান্ত, তাও আগের চেয়ে হালকা লাগছে। আমার মনে হয় আমি বুঝতে পারিনি কত বেশি ক্লান্ত ছিলাম।"

ওর বাবা ঘুমাচ্ছিলেন, তাই সেই মুহূর্তে আমাদের করার কিছু ছিল না। ভেন্ডিং মেশিন থেকে কফি কিনে টিভি রুমে গিয়ে বসলাম আমরা। মিদোরির অনুপস্থিতিতে কি কি হল তা জানালাম–তার বাবা ভালো ঘুমিয়েছিলেন, ঘুম থেকে উঠে লাঞ্চের বাকি খাবার খেয়েছেন, তারপর আমাকে শসা খেতে দেখে নিজেও খেতে চেয়েছেন। পুরো একটা শসা খেয়েছেন, প্রস্রাব করেছেন এরপর।"

"ওয়াতানাবে, তুমি একজন দারুন মানুষ," মিদোরি বলল। "আমরা তাকে কিছু খাওয়াতে গেলে পাগল হয়ে যাই, আর তুমি তাকে একটা পুরো শসা খাইয়ে ফেললে! দারুন ব্যাপার!"

"জানি না, মনে হয় আমাকে মজা করে খেতে দেখে তার ইচ্ছে হয়েছিল।"

"আমার মনে হয় তোমার আশেপাশে লোকজন সহজ হয়ে যায়।"

"হতেই পারে না," আমি হাসতে হাসতে বললাম "অনেক লোক দেখাতে পারবো যারা তোমাকে উল্টোটা বলবে আমার সম্পর্কে।"

"আমার বাবা সম্পর্কে তোমার কি ধারনা?"

"আমার তাকে পছন্দ হয়েছে। যদিও আমাদের মধ্যে সেভাবে কথা হয়নি। কিন্তু তাকে চমৎকার মানুষ মনে হল।"

"চুপচাপ ছিল?"

"পুরোই তো চুপচাপ।"

"এক সপ্তাহ আগে তোমার তার সাথে দেখা হওয়া উচিত ছিল। তখন উনি ভয়াবহ ছিলেন," মিদোরি মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল। "মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, হিংস্র হয়ে গিয়েছিলেন। আমার দিকে গ্লাস ছুঁড়ে মেরেছিলেন, আর অনেক আজেবাজে কথা বলেছেন-'কুত্তার বাচ্চা, মরিস না কেন তুই!' অসুস্থ হলে মানুষের কী যে হয়ে যায়। জানি না কেন অসুস্থ হলে মানুষের ব্যবহার জঘন্য হয়ে যায়। আমার মায়েরও একই অবস্থা হয়েছিল। জানো কি বলেছিল আমাকে? 'তুই আমার মেয়ে না, তোর চেহারাও আমি ঘেন্না করি!' এটা শোনার পর কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার পুরো দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। হয়ত ব্রেনের কোন অংশে চাপ পড়লে মানুষ এইসব জঘন্য কথা বলে। আমি এখানে বসে বসে তাদের জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছি, আর তারা আমাকে যাবতিয় আজেবাজে কথা বলে যাচ্ছে।"

"বুঝতে পারছি কি বলতে চাইছো," আমি বললাম। তারপর আমার মনে পড়ল মিদোরির বাবার বিড়বিড়।

"টিকেট? উএনো স্টেশন?" মিদোরি বলল, "এসবের মানে কি?"

"আর এরপর বললেন 'প্লিজ' আর 'মিদোরি।' "

"প্লিজ, মিদোরিকে দেখে রাখো?"

"কিংবা উনি হয়ত চাইছিলেন তুমি উএনো স্টেশনে গিয়ে টিকেট কাটো। চারটা শব্দ থেকে বোঝার উপায় নেই উনি আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন। উএনো স্টেশনের কোন অর্থ আছে তোমার কাছে?"

"হুমম, উএনো স্টেশন," মিদোরি একটু চিন্তা করল। "একমাত্র যেটা আমার মাথায় আসছে তা হল আমি দু-বার বাসা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। একবার থার্ড গ্রেডে, আরেকবার ফিফথ গ্রেডে। দুবারই আমি উএনো থেকে ট্রেনে চড়ে ফুকুসিমা গিয়েছিলাম। ক্যাশ রেজিস্টার থেকে টাকা নিয়ে টিকেট কেটেছিলাম। বাসার কেউ একজন আমার উপর রেগে গিয়েছিল, আমিও পাল্টা

রাগ দেখাতে চেয়েছিলাম। ফুকুসিমাতে আমার এক ফুপু থাকতেন, তাকে আমি বেশ পছন্দ করতাম। তাই পালিয়ে তার বাসায় চলে যাই। বাবা গিয়ে আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। আমাকে আনতে প্রায় একশ মাইল যেতে হয়েছিল তাকে। আসার সময় ট্রেনে আমরা বক্স লাঞ্চ খেয়েছিলাম। যখন ফেরত আসছিলাম, তখন বাবা আমাকে টুকটাক অনেক কিছু বলেছিলেন। আসলে কিছু কথা আর বেশিরভাগ সময়ই চুপ। যেমন ধরো ১৯২৩ সালের বড় ভূমিকম্প কিংবা যুদ্ধের সময়ের কথা। আমার জন্মের সময়ের কথা এটা। এমনিতে উনি এসব নিয়ে কখনো কথা বলেন না। এসব নিয়ে বলতে গিয়ে মনে পড়ল, ওই দু-বারই শুধু আমি আর বাবা ভালোমত লম্বা সময় ধরে কথা বলেছি। শুধু আমরা দু-জন। বিশ্বাস করতে পারো? ইতিহাসের অন্যতম বড় ভূমিকম্পের মাঝখানে পড়েও বাবা নাকি ভূমিকম্প টের পাননি!”

“যাহ! হতেই পারে না।”

“কিন্তু সত্যি! উনি ওই মুহূর্তে তার বাইকের কার্টে চড়ে কইসিকাওা যাচ্ছিলেন, কিছুই টের পাননি। যখন বাসায় ফিরলেন, আশেপাশের কোন বাসার ছাদ আস্ত নেই। তার পরিবারের সবাই পিলার জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। উনি নাকি তখনও বুঝতে পারেননি কি হয়েছে, প্রশ্ন করেছিলেন ‘এখানে কি ঝড় হয়েছে?’ এই হল আমার বাবার বিখ্যাত কান্টো ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা!” মিদোরি হাসল। “তার পুরনো দিনের সব কাহিনী এরকম। কোন নাটক নেই। সবকিছু কেন্দ্রের একটু বাইরে। তার গল্প শুনলে মনে হয় গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে জাপানে ইন্টারেস্টিং কিছু ঘটেনি। ১৯৩৬-এর যুবক সৈন্যদের ঘটনা, প্যাসিফিক ওয়ার, সেসব তাকে বললে, ‘ও আচ্ছা, তুমি বলার পর মনে হল এরকম কিছু ঘটেছিল হয়ত।’ আজব ব্যাপার-স্যাপার!

“তো যাহোক, ট্রেনে উনি আমাকে এইসব গল্প একটু আধটু বলেছিলেন যখন আমরা ফুকুসিমা থেকে উএনোতে ফিরছিলাম। সব শেষে তিনি বলতেন ‘তোমাকে যে-জন্য বলা, যেখানেই যাও, সব জায়গায় একই অবস্থা।’ এসব কথায় মুগ্ধ হওয়ার মত বয়স ছিল তখন আমার।”

“তাহলে এই হল তোমার বাবার উএনো স্টেশন নিয়ে গল্প?” আমি প্রশ্ন করলাম।

“হ্যাঁ,” বলল মিদোরি। “তুমি কখনো বাড়ি থেকে পালিয়েছো, ওয়াতানাবে?”

“কখনো না।”

“কেন?”

“কল্পনাশক্তির অভাব। আমার কখনো মাথায়ই আসেনি যে পালাতে হবে।”

“তুমি খুবই অদ্ভুত,” মিদোরি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

“তাই?”

“সত্যি তাই! এসব আমি ভালো বুঝতে পারি। স্বজ্ঞা। আচ্ছা বলো, তুমি তাকে কি উত্তর দিয়েছো?”

“আমি তো বুঝতেই পারিনি উনি কি বলতে চাইছিলেন। তাই বলেছি, চিন্তা করবেন না, আমি মিদোরি আর টিকেটের ব্যাপারটা দেখবো।”

“তুমি তাকে এ কথা দিয়েছ? তুমি তাকে বলেছো আমাকে দেখে রাখবে?” সে গম্ভির মুখ করে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

“ঠিক তা নয়,” আমি তার ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করলাম। “আমি জানতাম না উনি কি নিয়ে কথা বলছে না আর...”

“আরে ভয় পেও না, মজা করছিলাম খালি,” সে হেসে বলল, “তোমার এরকম ব্যাপার আমার ভালো লাগে।”

মিদোরি আর আমি কফি শেষ করে রুমে ফিরে গেলাম। ওর বাবা তখনও ঘুমে। কাছাকছি গেলে নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়। বিকেল যত বাড়তে লাগল, জানালার বাইরের আলো তত হালকা হতে লাগল। এক ঝাঁক পাখি এসে বিদ্যুতের তারে বসল আবার উড়ে গেল। মিদোরি আর আমি রুমের এক কোনায় বসে নিচুস্বরে গল্প করতে লাগলাম। সে আমার হাত দেখে ভবিষ্যৎবাণী করল একশ পাঁচ বছর পর্যন্ত বাঁচবো আমি, তিনবার বিয়ে করবো। অবশেষে মারা যাবো রোড অ্যাক্সিডেন্টে। খারাপ না, আমি বললাম।

চারটার কিছু পরে ওর বাবার ঘুম ভাঙলে মিদোরি তার পাশে বসে মুখ মুছিয়ে দিল, পানি খাওয়াল। মাথার ব্যথার কথা জানতে চাইলো। একজন নার্স এসে তাপমাত্রা মেপে প্রস্রাব কতবার হয়েছে রেকর্ড করল, স্যালাইনের নল পরীক্ষা করল ঠিক আছে কিনা। আমি টিভি রুমে গিয়ে কিছুক্ষণ ফুটবল খেলা দেখলাম।

পাঁচটায় আমি মিদোরিকে জানালাম আমাকে যেতে হবে। ওর বাবাকে বললাম, “আমাকে কাজে যেতে হবে এখন। আমি সাড়ে ছয়টা থেকে সিঞ্জুকুতে গানের রেকর্ড বিক্রি করি।”

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হালকা মাথা নাড়লেন।

“ওয়াতানাবে, জানি না কিভাবে বলা উচিত, কিন্তু আজকের সবকিছুর জন্য

তোমাকে ধন্যবাদ," মিদোরি আমাকে বিদায় দিতে লবিতে এসে বলল।

"আমি তেমন কিছুই করিনি," বললাম তাকে। "তোমার যদি সাহায্য লাগে আমি আগামি সপ্তাহেও আসতে পারি। তোমার বাবার সাথে আবার দেখা করলে আমার ভালোই লাগবে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, আমার তো ডরমে তেমন কিছু করার নেই, এখানে আসলে অন্তত শসা খাওয়া হবে।"

মিদোরি তার হাত ভাঁজ করে জুতোর হিল দিয়ে মেঝেতে মৃদু তাল দিতে লাগল। "তোমার সাথে আবার ড্রিঙ্ক করতে যেতে চাই," মাথা বাঁকিয়ে বলল সে।

"আর পর্নো মুভি দেখার কি হল?"

"আগে মুভি তারপর ড্রিঙ্ক। তারপর যত জঘন্য ব্যাপার আছে সবকিছু নিয়ে আমরা কথা বলবো, ঠিক আছে?"

"আমি মোটেও জঘন্য ব্যাপার নিয়ে কথা বলি না," প্রতিবাদ করে বললাম আমি। "ওটা তোমার কাজ।"

"যাহোক, আমরা ওইসব নিয়ে কথা বলবো আর প্লাস্টার করে বিছানায় যাবো।"

"তারপর কি হবে তুমি ভালো করেই জানো," আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "আমি করতে চাইবো, অথচ তুমি দেবে না।"

সে হাসতে লাগল।

"যাহোক," আমি বললাম। "আগামি রবিবার সকালে আমাকে আবার নিতে এসো, একসাথে আসবো হাসপাতালে।"

"আরেকটু বড় স্কার্ট পরবো নাকি এবার?"

"অবশ্যই," আমি বললাম।

যদিও পরের রবিবার আমি আর হাসপাতালে যেতে পারলাম না। কারন মিদোরির বাবা মারা গেলেন শুক্রবার সকালে। সে ভোর সাড়ে ছয়টায় ফোন করে আমাকে খবরটা জানাল। বেল বাজায় আমি বুঝলাম ফোন এসেছে, পাজামার উপর কারডিগান পরে দৌড়ে লবিতে গেলাম ফোন ধরতে। বাইরে নিঃশব্দে ঠান্ডা বৃষ্টি হচ্ছিল।

"কয়েক মিনিট আগে বাবা মারা গেছেন," মিদোরি আস্তে করে বলেছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম আমি কোন সাহায্য করতে পারি কিনা।

"থ্যাংকস," সে বলল। "সাহায্য লাগবে না। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা আছে আমাদের। আমি শুধু তোমাকে জানাতে ফোন করেছি।" ওর দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। "অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এসো না কিন্তু। আমার ভালো লাগে না এসব। তোমাকে ওখানে দেখতে চাই না।"

"বুঝতে পারছি," বললাম তাকে।

"তুমি আমাকে সত্যি একটা পর্নো মুভি দেখতে নিয়ে যাবে তো?"

"অবশ্যই নিয়ে যাবো।"

"জঘন্য দেখে একটায় নিয়ে যাবে।"

"আমি গবেষণা করে একটা খুঁজে বের করবো তোমার জন্য।"

"ঠিক আছে, তোমাকে পরে ফোন করবো," এ কথা বলে মিদোরি ফোন রেখে দিল।

এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল, কিন্তু মিদোরির কোন খবর নেই। কোন ফোন করেনি, ক্লাসেও আসেনি। আমি আশা করতে লাগলাম ডরমে গেলেই তার থেকে সংবাদ পাবো, কিন্তু না। এক রাতে আমি তাকে দেয়া কথা অনুযায়ি মাস্টারবেট করার চেষ্টা করলাম কিন্তু কাজ হল না। ওর বদলে নাওকোর কথা চিন্তা করে করার চেষ্টা করলাম, তাতেও কাজ হল না। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। আমি হাল ছেড়ে দিয়ে হুইস্কি গিলে দাঁত মেজে ঘুমোতে গেলাম।

রবিবার সকালে নাওকোকে চিঠি লিখতে বসলাম। মিদোরির বাবার কথা জানালাম ওকে।

'আমি আমার ক্লাসের একটা মেয়ের বাবাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে সেখানে তার সামনে বসে শসা খেয়েছিলাম। উনি শসা খাওয়ার কচকচ শব্দ শুনে শসা খেতে চাইলেন, তারপর আমার মতই কচকচ করে শসা খেলেন। পাঁচদিন পর মারা গেলেন উনি। আমার মাথায় এখনো তার কচকচ করে শসা খাওয়ার দৃশ্য একদম স্পষ্ট। মানুষ মারা যাওয়ার সময় অদ্ভুত সব স্মৃতি দিয়ে যায়।'

আমি লিখে চললাম :

'সকালে ঘুম ভাঙার পরেই আমি বিছানায় শুয়ে তোমার আর রেইকোর কথা ভাবি। বার্ড হাউজের ময়ুর, কবুতর, টিয়া, টার্কি আর খরগোশের কথাও ভাবি। আমার মনে আছে, সেদিন বৃষ্টির দিন সকালে তুমি আর রেইকো যে হলুদ রঙের রেইন কোট পরেছিলে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এসব কথা ভাবতে ভালো লাগে। আমার মনে হয় তুমি এসে আমার পাশে ঘুমালে ঘুম তাড়াতাড়ি হত। এরকম আসলেই হলে কি দারুন হত, তাই না?

'তোমাকে ছাড়া থাকতে আমার মাঝেমাঝে খুব খারাপ লাগে। কিন্তু আমি সব শক্তি জড়ো করে চলতে থাকি। সকালে উঠে দাঁত মেজে, শেভ করে, নাস্তা খেয়ে, পোশাক বদলে, ক্লাস করতে ভার্সিটিতে যাই। নিজেকে বলি-ঠিক আছে, আজকের দিনটা আরেকটা ভালো দিন হবে। আগে কখনো খেয়াল করিনি কিন্তু সবাই বলে আমি নাকি এখন নিজের সাথে অনেক কথা বলি। সম্ভবত সব দোষ এই বসন্তকালের।

'প্রতিদিন সকালে উঠে তোমার কথা ভাবি বলেই সারাদিন চলার শক্তি পাই। আমি জানি আমাকে ভালোমত চলতে হবে, ঠিক যেভাবে তুমি ওখানে চলছো।

'আজকে রবিবার, আজ আমার তেমন কোন কাজ নেই। রবিবার আমি পড়াশুনা করি না। কাপড় লন্ড্রি করে এখন রুমে এসে তোমাকে লিখছি। লেখা শেষ হলে খামে ভরে ডাকটিকিট লাগিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে আসবো। এরপর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত আমার আর কিছু করার নেই। আমি রবিবার পড়াশুনাও করি না। অন্যদিন ক্লাসের মাঝে লাইব্রেরিতে বসে যে পড়াশুনা করি তা-ই যথেষ্ট। রবিবারের জন্য কিছু ফেলে রাখি না। রবিবারের নির্জন, শান্তিপূর্ণ দুপুর, আর একাকিত্ব শুধু আমার জন্য। বই পড়ি আর গান শুনি। কখনো কখনো ভাবি আমরা যে টোকিওর রাস্তায় রবিবারে হাঁটতাম সেসব কথা। আমার বেশ ভালো মনে আছে তুমি হাঁটতে যাওয়ার সময় কি কি পোশাক পরতে। রবিবার দুপুরে সব পুরাতন দিনগুলো নিয়ে চিন্তা করি।

'রেইকোকে হাই দিও। ওর রাতে গিটার বাজানো অনেক মিস করি।'

চিঠি লেখা শেষ হলে কয়েক ব্লক দূরের ডাকবাক্সে ফেলে আসলাম আমি। কাছাকাছি এক বেকারি থেকে এগ স্যান্ডউইচ আর কোক কিনে লাঞ্চ সারলাম। কাছের খেলার মাঠে বসে লিটিল লিগ দেখলাম কিছুক্ষণ। হেমন্তর আকাশে নীল যেন অতিরিক্ত বেশি ছিল। পশ্চিম দিকে দুটো ধোঁয়ার লাইন উঠে গেছে পাশাপাশি সমান্তরালে চলা রেসিংকারের মত। একবার বল গড়িয়ে আমার পায়ে কাছে এলে আমি তুলে ছুঁড়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। টুপি পরা বাচ্চা খেলোয়াড়গুলো ভদ্রভাবে ধন্যবাদ জানাল। সব লিটিল লীগের মতই এটাতেও খেলার চেয়ে দৌড়াদৌড়ি বেশি।

বিকেলে ফিরে বই নিয়ে বসলেও মনোযোগ বসাতে পারছিলাম না। তার বদলে খেয়াল করলাম সিলিঙের দিকে তাকিয়ে মিদোরির কথা ভাবছি। ওর বাবা কি আসলেই আমাকে ওর দায়িত্ব নেয়ার কথা বলার চেষ্টা করছিলেন? আমার

কোনই ধারনা নেই তার মনের ভেতর কি চলছিল। সম্ভবত উনি আমাকে অন্য কেউ ভেবে ভুল করেছিলেন। যেহেতু শুক্রবার সকালে তিনি মারা গেছেন তাই ব্যাপার যাহোক না কেন, এখন আর জানার কোন উপায় নেই। ঠান্ডা বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। আমি ভাবলাম, মৃত্যুর পর তিনি আরো ছোট হয়ে গিয়েছিলেন কিনা। একদলা ছাই না হওয়া পর্যন্ত পুড়তে হবে তাকে। তিনি কি কি রেখে গেছেন? একটা বইয়ের দোকান আর দুটো মেয়ে। তাদের একজন অন্তত বেশ বড় রকমের অদ্ভুত। কি ধরণের জীবন এটা? আমি ভাবলাম। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তার কাটা মাথার ভেতরে আসলে কি চলছিল?

মিদোরির বাবাকে নিয়ে এরকম চিন্তা করে আমার মন এত ভার হয়ে ছিল যে, ছাদে গিয়ে কাপড় ভালোমত শুকানোর আগেই নামিয়ে নিয়ে আসলাম। তারপর সিঞ্জুকু গিয়ে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে পার করলাম সময়। রবিবার বলে ভালো ভিড় ছিল রাস্তায়। কিনকুনিয়া বুকস্টোরের ভেতর অফিস টাইমের ট্রেনের মত ভিড়। আমি ফকনারের *লাইট ইন আগস্ট* কিনে এক লাউড জ্যাজ ক্যাফে'তে হাজির হলাম। গরম, ঘন, জঘন্য স্বাদের কফি খেতে খেতে আর ওরনেট কোলম্যান শুনতে শুনতে বই পড়ে গেলাম। সাড়ে পাঁচটায় বই বন্ধ করে বাইরে গিয়ে ডিনার সারলাম। এরকম আর কত রবিবার আমার সামনে অপেক্ষা করছে কে জানে।

"নিস্তব্ধ, শান্তিপূর্ণ আর একাকি," জোরে জোরে নিজেকে বললাম আমি।

অধ্যায় ৮

সেই সপ্তাহের মাঝামাঝি গিয়ে আমি ভাঙা কাঁচে হাতের তালু কেটে ফেললাম। রেকর্ড সেলফের একটা কাঁচ ফাঁটা ছিল যে খেয়াল করিনি। যে পরিমান রক্ত বের হল আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। পুরো মেঝে লাল হয়ে গিয়েছিল। দোকানের ম্যানেজার তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে জোগাড় করে হাতের ক্ষত বেঁধে দিয়ে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ফোন দিল। বেশিরভাগ সময়ই সে কোন কাজের না, কিন্তু সেদিন ভালো কাজ দেখাল। ভাগ্য ভালো হাসপাতাল কাছেই ছিল। তোয়ালে রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছিল, ভেতর থেকে রক্ত গড়িয়ে টপটপ করে পড়ছিল। লোকজন একদিকে সরে গিয়ে জায়গা করে দিল আমাকে। তারা হয়ত ভেবেছিল মারামারি করতে গিয়ে আহত হয়েছি। আমি তেমন কোন ব্যথা বোধ করছিলাম না, খালি রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না।

ডাক্তার লোকটা ভালো দক্ষ ছিল। রক্তমাখা তোয়ালে সরিয়ে রক্ত বন্ধ করল, তারপর পরিস্কার করে, সেলাই করে দিল সে। বলল পরের দিন আবার আসতে। রেকর্ড শপে ফেরত গেলে ম্যানেজার আমাকে বলল আজকে আর কাজ করতে হবে না, বাসায় চলে যেতে। আমি ডরমে যাওয়ার বাসে উঠে সোজা নাগাসাওয়ার রুমে গেলাম। হাত কাটার উত্তেজনার পর আমার ইচ্ছে করছিল কারো সাথে কথা বলতে, আর নাগাসাওয়ার সাথে অনেকদিন দেখাও হয়নি।

ওকে রুমেই পেলাম, টিভিতে স্প্যানিশ অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে বিয়ার খাচ্ছিল। "ইয়াল্লা কি হয়েছে তোমার?" ব্যান্ডেজ দেখে বলল। আমি বললাম তেমন কিছু না হাত কেটে গেছে। সে বিয়ার সাধলেও না করলাম।

"একটু অপেক্ষা করো, এখনি অনুষ্ঠানটা শেষ হবে," নাগাসাওয়া স্প্যানিশ উচ্চারণ প্র্যাকটিস করার মাঝখানে বলল।

আমি পানি গরম করে টিব্যাগ দিয়ে চা বানালাম। একজন স্প্যানিশ মহিলা বাক্য উচ্চারণ করছে "আমার জীবনে এরকম বিচ্ছিরি বৃষ্টি দেখিনি! বার্সেলোনার অনেক ব্রিজ ভেসে গিয়েছিল।" নাগাসাওয়াও তার সাথে জোরে জোরে স্পানিসে উচ্চারণ করল। "কি ফালতু সব বাক্য!" বলল সে। "বেকুবগুলো অনুশীলনের জন্য খালি এইসব আজাইরা বাক্যগুলোই দেয়।"

অনুষ্ঠান শেষ হলে নাগাসাওয়া টিভি বন্ধ করে ছোট ফ্রিজ থেকে আরেকটা বিয়ার বের করল।

"তোমার কোন কাজে সমস্যা করছি না তো?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"আরে না। বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তুমি আসলেই বিয়ার খাবে না?"

"নাহ," বললাম তাকে।

"ও আচ্ছা, ভালো কথা। সেদিন রেজাল্ট দিয়েছে, আমি পাশ করেছি!"

"পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের পরীক্ষায়?"

"হ্যাঁ। আনুষ্ঠানিক নাম হল 'পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রথম শ্রেণির জনসেবা কর্মচারি নিয়োগ পরীক্ষা'...হাস্যকর!"

"কংগ্র্যাচুলেসন্স!" আমি বাম হাত দিয়ে হ্যান্ডসেইক করলাম।

"থ্যাংকস।"

"অবশ্য তুমি যে পাশ করেছো একদম অবাক হইনি।"

"আমিও না," নাগাসাওয়া হাসল। "কিন্তু রেজাল্ট পেয়ে দারুন লেগেছে।"

"যোগদানের পর তোমাকে বিদেশে কোথাও যেতে হবে, তাই না?"

"এখনই না, প্রথমে একবছর তারা ট্রেনিং দেবে, তারপর বাইরে পাঠাবে।"

আমি চায়ে চুমুক দিলাম, আর সে তৃপ্তিসহকারে বিয়ার পান করতে লাগল।

"যাওয়ার আগে তোমাকে এই ফ্রিজটা দিয়ে যাবো," বলল নাগাসাওয়া। "তোমার সমস্যা নেই তো এটা নিতে? বিয়ার রাখার জন্য দারুণ।"

"নাহ, কোন সমস্যা নেই, কিন্তু তোমার লাগবে না শিওর? তোমাকে তো কোন না কোন অ্যাপার্টমেন্টে বা কোথাও থাকতে হবে।"

"বোকার মত কথা বলো না! এখান থেকে বের হলে আমি বড় একটা ফ্রিজ কিনবো। জাকজমক করে বসবাস করবো। এই ইঁদুরের গর্তে চার বছর যথেষ্ট হয়েছে। এখানের কোন কিছু আমি আর আমার জীবনে দেখতে চাই না। তুমি এখানের যা চাও নিতে পারো–টিভি, থারম ফ্লাস্ক, রেডিও..."

"তোমার কোন কিছুই নিতে আমার কোন আপত্তি নেই," বললাম তাকে। ওর টেবিলে স্প্যানিশ শেখার বই দেখে আমি জানতে চাইলাম। "স্প্যানিশ শুরু করেছো?"

"হ্যাঁ, যত ভাষা জানা যায় তত ভালো। আমার এ ব্যাপারে দক্ষতা আছে। আমি নিজে নিজে প্রায় নিখুঁত ফ্রেঞ্চ শিখেছি। ভাষা হল খেলার মত। একটার জন্য নিয়ম শিখলে বাকি সবগুলো একইভাবে কাজ করে। মেয়েদের মত।"

"কি জ্ঞানী মার্কা কথা!" আমি বিদ্রুপের সুরে বললাম।

"যাইহোক! চল, একদিন বাইরে খেতে যাই।"

"মানে, নারী শিকারের জন্য?"

"না না, আসল ডিনারের জন্য। তুমি, আমি আর হাটসুমি। কোন একটা ভালো রেস্টুরেন্টে গিয়ে ডিনার করবো আমার নতুন চাকরির খুশিতে। বুড়ো বাবা খরচ দেবেন, সুতরাং দামি কোথাও যাওয়া যাবে।"

"শুধু তোমার আর হাটসুমির যাওয়া উচিত না?"

"না, তুমি থাকলেই বেশি ভালো, আমি সহজ বোধ করবো। হাটসুমিও।"

সর্বনাশ, আবারো সেই কিজুকি, আমি আর নাওকো একসাথে ঘোরার কাহিনী।

"আমি এমনিতেও রাতে হাটসুমির বাসায় থাকবো, তুমি শুধু আমাদের সাথে ডিনারে থাকলেই হল।"

"ঠিক আছে, তোমরা যদি চাও আমি থাকবো," বললাম তাকে। "যাহোক, হাটসুমিকে নিয়ে তোমার পরিকল্পনা কি? তুমি তো ট্রেনিঙে থাকবে, তারপর দেশের বাইরে যাবে, হয়তো কয়েক বছর দেশেও ফিরবে না। হাটসুমি কি করবে?"

"সেটা তার সমস্যা, আমার নয়।"

"মানে! বুঝলাম না?"

নাগাসাওয়া টেবিলে পা তুলে বিয়ারে চুমুক দিয়ে হাই তুলল।

"দেখো, বিয়ে করার কোন পরিকল্পনা আমার নেই। আমি হাটসুমিকে সেটা পরিস্কার বলেছি। সে যদি অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায়, করতে পারে। আমি তাকে বাঁধা দেবো না। সে যদি আমার জন্য অপেক্ষা করতে চায়, তা-ও করতে পারে। এই হল গিয়ে আমার কথা।"

"তোমাকে আসলে শক্ত ধোলাই দেয়া দরকার মনে হচ্ছে," বললাম তাকে।

"তোমার মনে হচ্ছে আমি খুবই জঘন্য ধরনের মানুষ, তাই না?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই।"

"দেখো, পৃথিবীটা খুবই নির্মম। আমি নিজে এই নিয়মগুলো তৈরি করিনি। প্রথম থেকেই এরকম ছিলাম। কখনো হাটসুমিকে মিথ্যা প্রলোভন দেখাইনি। সে সবসময়ই জানতো আমি জঘন্য প্রকৃতির মানুষ, সে সবসময়ই জানত তার যখন ইচ্ছে আমাকে ছেড়ে যেতে পারে।"

নাগাসাওয়া বিয়ার শেষ করে সিগারেট ধরালো।

"এমন কিছু কি আছে জীবনে যা নিয়ে তুমি ভয় পারো?" জানতে চাইলাম আমি।

"আরে, আমি পুরোপুরি বেকুব নই," নাগাসাওয়া বলল। "অবশ্যই মাঝে মাঝে ভয় পাই। কিন্তু সেজন্য আমি বাকি সবকিছুকে ছেড়ে দেই না। নিজের পুরোটা দিতে একশ ভাগ চেষ্টা করি। আমি যা চাই তা আমি নিয়েই ছাড়বো,

আর যা চাই না তা ফেলে দেবো। আমি এভাবেই চলি। যদি খারাপ কিছু ঘটে তখন থেমে আবার চিন্তা করে দেখি। যদি ভেবে দেখো তাহলে দেখবে, এরকম একটা নিষ্ঠুর সমাজ তোমার যোগ্যতার বারোটা বাজানোর জন্য যাবতিয় সবকিছু করবে।"

"আমার কাছে আত্মকেন্দ্রিক জীবনের মত শোনাচ্ছে," বললাম তাকে।

"হতে পারে, কিন্তু আমি এমন মানুষ না, যে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে আর আশা করবে কখন একটা ফল টুপ করে মুখের সামনে পড়বে। আমি আমার মত করে কঠোর পরিশ্রম করছি। তোমার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি পরিশ্রম করি আমি।"

"সেটা সম্ভবত সত্যি," সায় দিলাম আমি।

"চারপাশে তাকালে আমার অসুস্থ লাগে। মনে হয় এই গাধাগুলো কিছু করে না কেন? কিছু করে না কিন্তু পরচর্চা নিয়ে ঠিকই ব্যস্ত।"

নাগাসাওয়ার বলার মধ্যে ঘৃণার রেশ টের পেয়ে ওর দিকে তাকালাম। "আমার মনে হয় লোকজন পরিশ্রম করছে ঠিকই। তারা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। নাকি ভুল দেখছি আমি?"

"এটা কোন পরিশ্রম নয়। এটা স্রেফ শারীরিক শ্রম," নাগাসাওয়া বলল। 'কঠোর পরিশ্রম' বলতে আমি বোঝাচ্ছি নিজের পথ ঠিক করা আর অর্থপূর্ণ কাজ করা।"

"তারমানে, যখন চাকরির পরীক্ষা শেষ তখন স্প্যানিশ পড়া আর বাকি সবাইকে বলা যে তাদের পরিশ্রম করা উচিত।"

"অবশ্যই তাই। আমি আগামি বসন্তের মধ্যেই স্প্যানিশে দক্ষ হয়ে যাবো। সেই সাথে আমার ইংরেজি, জার্মান আর ফ্রেঞ্চও দখলে রয়েছে। ইটালিয়ানও প্রায় হয়ে গেছে। কঠোর পরিশ্রম না করলে এগুলো কি এমনি এমনি সম্ভব হয়েছে?"

নাগাসাওয়া সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল, আর আমি মিদোরির বাবার কথা ভাবলাম। এই মানুষটার হয়ত কখনো মাথায়ই আসেনি যে, টিভি দেখে স্প্যানিশ শিখতে হবে। এমন কি তিনি হয়তো কখনো চিন্তাও করেননি, কঠোর পরিশ্রম আর শারীরিক পরিশ্রম দুটো আলাদা ব্যাপার। তিনি হয়ত এত ব্যস্ত ছিলেন সবকিছু নিয়ে যে, এসব নিয়ে চিন্তা করার অলস সময় তার ছিল না–নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, ফুকুসিমাতে পালিয়ে যাওয়া মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে ব্যস্ত।

"তাহলে ডিনারের ব্যাপারটা কি হবে?" নাগাসাওয়া বলল। "আগামি শনিবার ঠিক আছে তোমার জন্য?"

"ঠিক আছে," আমি বললাম।

আযাবু'র পেছনের নির্জন রাস্তায় একটা জাকজমকপূর্ণ ফ্রেঞ্চ রেস্টুরেন্ট পছন্দ করল নাগাসাওয়া। ঢোকার মুখে সে তার নাম বলল আর আমাদের দু-জনকে একটা প্রাইভেট রুমে নিয়ে যাওয়া হল। ছোট রুমটার দেয়ালে পনেরটা প্রিন্ট ঝোলানো। হাটসুমির জন্য অপেক্ষা করার মাঝখানে নাগাসাওয়া আর আমি একটা সুস্বাদু ওয়াইন পান করলাম আর জোসেফ কনরাডের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করলাম। সে একটা দামি ধূসর রঙা স্যুট পরেছিল। আমি একটা সাধারণ নীল ব্লেজার।

হাটসুমি মিনিট পনেরর মধ্যেই চলে আসল। তার পরনে সুন্দর একটা গাঢ় নীল ড্রেস, যত্ন করে মেকাপ করা, স্বর্ণের কানের দুল, আর লাল জুতো। আমি ওর নীল ড্রেসের প্রশংসা করলে সে বলল এই রঙর নাম মিডনাইট ব্লু।

"কি দারুন অভিজাত রেস্টুরেন্ট!" হাটসুমি বলল।

"আমার বুড়ো বাপ টোকিওতে আসলে সবসময় এখানে খেতে আসে।" নাগাসাওয়া বলল। "আমি একবার তার সাথে এসেছিলাম এখানে। এরকম বড়লোকি জায়গা আমার তেমন পছন্দ নয়।"

"এরকম জায়গায় একবার দু-বার খেতে খারাপ লাগে না," হাটসুমি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কি মনে হয়?"

"আমিও একমত। যতক্ষণ না বিল আমাকে দিতে হচ্ছে।"

"বুড়োমিয়া সাধারণত এখানে তার রক্ষিতাকে নিয়ে আসে," নাগাসাওয়া বলল। "জানো না হয়তো, টোকিওতে তার একজন রক্ষিতা আছে।"

"সত্যি?" হাটসুমি বলল।

আমি যেন কিছু শুনিনি এমন ভাব করে ওয়াইনে চুমুক দিলাম।

একজন ওয়েটার এসে আমাদের অর্ডার নিল। অ্যাপেটাইজার আর সুপ ঠিক করার পর নাগাসাওয়া হাঁস অর্ডার করল, হাটসুমি আর আমি সিব্যাস মাছ অর্ডার করলাম। আস্তে ধীরে খাবার এল। আমরা মদ খেতে খেতে গল্প চালিয়ে গেলাম। নাগাসাওয়া তার পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের পরীক্ষা নিয়ে প্রথমে বলল যে, বেশির ভাগ পরীক্ষার্থীরা কতটা ফালতু ছিল। অবশ্য তার মতে কয়েকজন ভালো পরীক্ষার্থীও যে ছিল তা স্বীকার করল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তার কি মত, সমাজে ভালো আর ফালতুর অনুপাত কেমন, বেশি না কম।

"সমান," সে বলল। "অবশ্যই সমান সমান।"

ওয়াইনের প্রথম বোতল শেষ হয়ে গেলে নাগাসাওয়া দ্বিতীয় বোতল অর্ডার করে নিজের জন্য ডাবল স্কচ দিতে বলল।

হাটসুমি আমার জন্য একটা মেয়ের ব্যবস্থা করতে চায়। আমাদের দু-জনের কথা বলার চিরস্থায়ি একটা বিষয় হল এটা। সে আমাকে সবসময় একই ধরনের কথা বলে–"আমার ক্লাবে নতুন একটা কিউট মেয়ে এসেছে।" আর আমি পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজি।

"খুবই চমৎকার মেয়ে, আর খুবই কিউট। এর পরেরবার ওকে নিয়ে আসবো সাথে করে। তুমি কথা বলে দেখো। আমি নিশ্চিত তোমার পছন্দ হবে।"

"শুধু শুধু সময় নষ্ট, হাটসুমি," বললাম তাকে। "আমি তোমার স্কুলের মেয়েদের সাথে ঘোরাঘুরি করার মত নই। গরিব মানুষ। ওদের সাথে কথাই বলতে পারবো না।"

"বোকার মত কথা বলো না," সে বলল। "এই মেয়েটা খুবই সাধারণ, সাধাসিধে ধরনের।"

"আরে ধুর, ওয়াতানাবে," নাগাসাওয়া বলল। "একবার দেখা তো করো। তোমাকে তো কেউ তার সাথে শুতে বলছে না।"

"অবশ্যই না!" হাটসুমি বলল। "এই মেয়েটা ভার্জিন।"

"ঠিক তুমি যেমন ছিলে," নাগাসাওয়া বলল।

"একদম," হাটসুমি উজ্জ্বল হাসি দিয়ে বলল। "আমিও এরকম ছিলাম, কিন্তু সত্যি বলছি," সে আমাকে বলল, "আমাকে ওইসব ফালতু 'আমি গরিব'টাইপ কথাবার্তা বোলো না। এসবের কোন অর্থ নেই। এটা ঠিক সব ক্লাসে ওরকম কিছু অহংকারি মেয়ে থাকে। কিন্তু বাকিরা আমাদের মত সাধারণ মানুষ। আমরা সবাই স্কুলের ক্যাফেটেরিয়া তে আড়াইশ ইয়েনের লাঞ্চ খাই..."

"দাঁড়াও দাঁড়াও, এক মিনিট হাটসুমি," আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম। 'আমাদের স্কুলে তিন ধরনের লাঞ্চ আছে; এ, বি আর সি। এ লাঞ্চের দাম একশ বিশ ইয়েন, বি লাঞ্চের দাম একশ ইয়েন, আর সি লাঞ্চের দাম আশি ইয়েন। যাদের সামর্থ্য নেই তারা ষাট ইয়েন দিয়ে রামেন নুডুলস খায়। আমি যখন এ লাঞ্চ খাই সবাই আমার দিকে বাজে দৃষ্টিতে তাকায়। এরকম জায়গায় আমি পড়ি। তোমার কি এখনো মনে হয় তোমার স্কুলের মেয়েদের সাথে আমি কথা বলতে পারবো?"

হাটসুমি হাসি থামাতেই পারছিল না। "এত সস্তা খাবার!" বলল সে। "আমার তো ওখানে গিয়েই লাঞ্চ করা উচিত! যাহোক, সত্যি বলছি তরু, তুমি একজন চমৎকার মানুষ, আমার মনে হয় তোমার এই মেয়ের সাথে ভালো মিলবে। সে হয়ত একশ বিশ ইয়েনের লাঞ্চ পছন্দ করতে পারে।"

"কোনভাবেই সম্ভব না," হেসে বললাম আমি। "কেউ ওটা পছন্দ করার জন্য খায় না, খায় কারন তাদের অন্য কিছু খাওয়ার সামর্থ্য নেই।"

"যাইহোক, বইয়ের মলাট দেখে বই বিচার করা যায় না। এটা ঠিক যে আমরা মেয়েদের এই ভুংভাং স্কুলে পড়ি, কিন্তু আমাদের অনেকেই জীবন নিয়ে সিরিয়াসলি চিন্তা করে। সবাই স্পোর্টসকারওয়ালা বয়ফ্রেন্ড খোঁজে না।"

"তা আমার খুব জানা আছে," আমি বললাম।

"ওয়াতানাবের একজন গোপন বান্ধবি আছে। ও তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে," নাগাসাওয়া বলল। "কিন্তু সে ওই মেয়ের সম্পর্কে টুঁ শব্দ উচ্চারণ করে না। একদম ঠোঁট চেপে বসে থাকে। ধাঁধায় মোড়ানো হেঁয়ালি।"

"সত্যি নাকি? হাটসুমি আমাকে জিজ্ঞেস করল।

"সত্যি," বললাম তাকে। "কিন্তু এরমধ্যে কোন ধাঁধা হেয়ালি কিচ্ছু নেই। স্রেফ পরিস্থিতিটা জটিল ধরনের, ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।"

"ওহ, অবৈধ সম্পর্ক ধরনের কিছু নাকি? আমাকে বলতে পারো!"

আমি ওয়াইনে চুমুক দিয়ে উত্তর এড়িয়ে গেলাম।

"দেখেছো, বলেছি না?" নাগাসাওয়া তার তৃতীয় হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে বলল। "একদম ঠোঁট চাপা। এই লোক যখন ঠিক করে কিছু বলবে না, ওর পেট থেকে কিচ্ছু বের করা যাবে না।"

"কি খারাপ!" হাটসুমি এক টুকরো টেরিন কেটে মুখে দিল। "তুমি তাকে সাথে নিয়ে আসলে আমরা ডাবল ডেট করতে পারতাম।"

"হ্যাঁ, আর আমরা মাতাল হয়ে গার্লফ্রেন্ড অদল বদলও করতে পারতাম," নাগাসাওয়া বলল।

"এইসব বাজে কথা রাখো," হাটসুমি বলল।

"'বাজে কথা' আবার কি? ওয়াতানাবের আগ্রহ আছে তোমার প্রতি," নাগাসাওয়া বলল।

"আমি যা নিয়ে কথা বলছি তার সাথে তোমার কথার কোন সম্পর্ক নেই," হাটসুমি বিরক্ত হয়ে বলল। "ও এরকম লোক নয়। ও ভদ্র আর যত্নশীল। ওকে দেখলেই বোঝা যায়। তাই আমি ওর ঘটকালি করার চেষ্টা করছি।"

"অবশ্যই, সে খুবই ভদ্র। আমরা একবার মেয়ে অদল বদল করেছিলাম, অনেক আগের কথা। মনে আছে ওয়াতানাবে?" ধৈর্য হারিয়ে বলল নাগাসাওয়া, তারপর ঢক করে বাকি হুইস্কিটুকু গিলে ফেলে আরেকটা অর্ডার করল।

ছুরি আর কাঁটাচামচ রেখে ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছল হাটসুমি, আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে, "তরু, তুমি সত্যি সত্যি এমন করেছো?"

আমি বুঝতে পারছিলাম না কী বলবো, তাই কিছুই বললাম না।

"বলো ওকে," নাগাসাওয়া বলল। "সমস্যা কি?"

পুরো ব্যাপারটা জঘন্য রুপ নিচ্ছিল। মাতাল হলে নাগাসাওয়া কদর্য হয়ে যায়। আজ রাতে ওর বদমেজাজের শিকার হাটসুমি, আমি নই। এটা বুঝতে পেরে আমার এখানে বসে থাকা কঠিন হয়ে উঠল।

"আমি এই কাহিনীর আরও জানতে চাই," হাটসুমি বলল। "শুনে খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে!"

"আমরা মাতাল ছিলাম," বললাম তাকে।

"সেটা ঠিক আছে তরু, তোমাকে দোষারোপ করছি না। আমি শুধু চাই তুমি আমাকে বলো কি ঘটেছিল।"

"আমরা দু-জন সিবুয়াতে একটা বারে ড্রিঙ্ক করছিলাম, এক জোড়া মেয়ের সাথে আমাদের খাতির হল। তারা কোন একটা জুনিয়র কলেজের ছাত্রি, অনেক মেকআপও করেছিল। যাহোক, আমরা...মানে, একটা হোটেলে গেলাম...শুলাম। পাশাপাশি রুম ছিল আমাদের। অর্ধেক রাতে নাগাসাওয়া এসে আমার দরজায় ঠকঠক করে বলল আমাদের সঙ্গিনী অদল বদল করা উচিত। তো, আমি ওর রুমে গেলাম, সে আমার রুমে..."

"মেয়েরা কিছু মনে করেনি?"

"না, তারাও মাতাল ছিল।"

"যাহোক, সেটা করার একটা ভালো অজুহাত ছিল আমার কাছে," নাগাসাওয়া বলল।

"কি সেই 'একটা ভালো অজুহাত,' শুনি একটু?"

"হ্যাঁ, মেয়ে দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। একজন ছিল খুবই সুন্দরি, আরেকজন ছিল কুকুরের মত দেখতে। আমার কাছে ব্যাপারটা খুবই অন্যায় মনে হয়েছিল। আমি সুন্দরিটাকে পেয়েছিলাম আর ওয়াতানাবের কপালে জুটেছিল অন্যজন। সেজন্যই অদল বদল করেছিলাম। ঠিক বলেছি না, ওয়াতানাবে?"

"হ্যাঁ, মনে হয়," বললাম আমি। সত্যি বলতে কি, আমার অসুন্দরি মেয়েটাকেই ভালো লেগেছিল। চমৎকার মেয়ে ছিল, কথা বলতে ভালো লাগছিল। সেক্সের পর আমরা বিছানায় শুয়ে কথা বলছিলাম তখন নাগাসাওয়া এসে হাজির আর বলল অদল বদল করা উচিত। আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম তার কোন সমস্যা আছে কিনা, সে বলল আমরা চাইলে তার কোন সমস্যা নেই। সে হয়ত ভেবেছিল আমি সুন্দরিটাকে চাই।

"খুব মজা হয়েছিল?" আমার কাছে জানতে চাইলো হাটসুমি।

"অদল বদলের কথা বলছো?"

"না, পুরো ব্যাপারটা।"

"ঠিক সেরকম নয়। করার জন্য করা। এভাবে মেয়েদের সাথে ঘুমাতে যাওয়া তেমন মজার কিছু নয়।"

"তাহলে কেন করো?"

"আমার কারনে করে," নাগাসাওয়া বলল।

"আমি তরুকে প্রশ্ন করেছি," হাটসুমি নাগাসাওয়াকে বাধা দিয়ে বলল। "তুমি এরকম কেন করো তাহলে?"

"কারন মাঝে মাঝে আমার কোন মেয়ের সাথে ওসব করতে ইচ্ছে করে।"

"তুমি যদি কাউকে ভালোবেসে থাকো, তার সাথে ঘুমানোর কোন উপায় বের করতে পারো না?" হাটসুমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল।

"ব্যাপারটা অনেক জটিল।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হাটসুমি।

সে সময় দরজা খুলে গেল, খাবার চলে এসেছে। নাগাসাওয়ার জন্য হাঁসের রোস্ট আর আমাদের জন্য সিব্যাস মাছ। ওয়েটাররা আমাদের প্লেটে সদ্য রান্না করা সস ডোবানো সবজি রেখে আবার উধাও হয়ে গেল। আমরা তিনজন আবার একা। নাগাসাওয়া হাঁসের একটুকরো কেটে নিয়ে মজা করে খেলো। সাথে চলল হুইস্কি। আমি চামচ ভর্তি করে শাক নিলাম। শুধু হাটসুমি তার খাবার ছুঁল না।

"আমার কি মনে হয় জানো, তরু?" সে বলল, "তোমার অবস্থাটা কি রকম 'জটিল' আমার কোন ধারনা নেই, কিন্তু আমার মনে হয় তুমি আমাকে মাত্র যা বললে তা তোমার জন্য একদম ভালো হচ্ছে না। তুমি এরকম মানুষ না। তোমার কি মনে হয়?" সে তার হাত টেবিলে রেখে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকাল।

"আমার কয়েকবার এরকম মনে হয়েছে," বললাম তাকে।

"তাহলে বন্ধ করছো না কেন?"

"কারন আমার মাঝে মাঝে মানুষের শরীরের উষ্ণতার প্রয়োজন পড়ে," সত্যি কথাটাই বললাম। "মাঝে মাঝে যদি আমি একজন নারীর উষ্ণতা না পাই, আমার অনেক একাকি লাগে, সহ্য হয় না।"

"আচ্ছা, ঘটনা তাহলে যা দাঁড়াচ্ছে আমি তা সংক্ষেপে বলি," নাগাসাওয়া মাথা ঢোকাল। "ওয়াতানাবের একজন পছন্দের মেয়ে আছে কিন্তু কিছু জটিলতার কারনে তারা শুতে পারছে না। তাই সে 'সব সেক্সই তো সেক্স' বলে অন্য কারো কাছে তার যা প্রয়োজন সেটা মেটাচ্ছে। এতে অন্যায় কোথায়? ঠিকই তো আছে। সে নিশ্চয়ই সবসময় রুম বন্ধ করে হাত মারতে পারে না? নাকি পারে?"

"কিন্তু তরু, তুমি যদি কাউকে সত্যি সত্যি ভালোবেসে থাকো তোমার কি নিজেকে সংবরণ করা সম্ভব না?"

"হয়তো," আমি একটুকরো সিব্যাস ক্রিমে মাখিয়ে মুখে পুরলাম।

"তুমি ছেলেদের যৌন প্রয়োজন বুঝতে পারছো না," হাটসুমিকে বলল নাগাসাওয়া। "যেমন ধরো আমি, আমি তোমার সাথে তিনবছর ধরে আছি। এই তিনবছরে আমি আরও অনেক মেয়ের সাথে ঘুমিয়েছি। আমার তাদের কিচ্ছু মনে নেই। আমি তাদের নামও জানি না, চেহারাও মনে নেই। তাদের প্রত্যেকের সাথে শুধুমাত্র একবার করে শুয়েছি। দেখা করো আর লাগাও...ব্যাস, ওই পর্যন্তই। এতে অন্যায় কোথায়?"

"তোমার যে ব্যাপারটা আমার একদম সহ্য হয় না তা হল দাম্ভিকতা," হাটসুমি নরম সুরে বলল। "তুমি অন্য মেয়ের সাথে ঘুমাও কি ঘুমাও না সেটা বিষয় না। তোমার বোকামির জন্য আমি তোমার উপর কখনো রাগ করি না, করেছি বলো?"

"আমি কি বোকামি করি তা তুমি বলতেও পারবে না। এটা স্রেফ একটা খেলা। কেউ কষ্ট পায় না এতে।"

"আমি কষ্ট পাই," হাটসুমি বলল। "আমি কেন তোমার জন্য যথেষ্ট নই?"

নাগাসাওয়া কিছুক্ষণ চুপ থেকে হুইস্কির গ্লাস ঘোরাল। "এমন না যে তুমি আমার জন্য যথেষ্ট নও। সেটা আরেকটা বিষয়, অন্য প্রশ্ন। এটা স্রেফ আমার ভেতরের একটা ক্ষুধা। তোমাকে যদি কষ্ট দিয়ে থাকি সেজন্য আমি দুঃখিত। আমাকে আমার ক্ষুধা নিয়ে বাঁচতে হয়। আমি এরকমই লোক। এভাবেই আমি তৈরি। এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই, কেন বুঝছো না?"

অবশেষে হাটসুমি তার চামচ ছুরি হাতে নিয়ে মাছ খাওয়া শুরু করল। "তোমার খেলায় অন্তত তরুকে টেনে আনা উচিত হয়নি।"

"আমাদের মধ্যে অনেক মিল আছে কিন্তু। তরু আর আমার মধ্যে," নাগাসাওয়া বলল। "আমরা কেউই নিজেদের ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে আগ্রহি নই। এটা ঠিক যে আমি অহংকারি আর সে ওরকম নয়। কিন্তু আমরা কেউ কি ভাবি বা নিজেরা কি অনুভব করি তার বাইরে কোন কিছুতে আগ্রহি নই। আর তাই আমরা কিছু ব্যাপার নিয়ে এমনভাবে জড়াতে পারি যা আমাদেরকে অন্যদের থেকে দূরে ঠেলে দেয়। ওর এদিকটাই আমার পছন্দ। পার্থক্য স্রেফ, সে এখনো নিজের এদিকটা বুঝে উঠতে পারেনি, তাই সে দ্বিধা বোধ করে আর কষ্ট পায়।"

"কোন্ মানুষ দ্বিধা বোধ করে না, আর কষ্ট পায় না?" হাটসুমি জানতে চাইলো। "তুমি বলতে চাও তুমি এসব অনুভব করোনি?"

"অবশ্যই করেছি, কিন্তু আমি আমাকে এমন শৃঙ্খলায় ফেলেছি যে এইসব

অনুভূতি আমার কম। এমন কি একটা ইঁদুরও কম কষ্টদায়ক রাস্তা বেছে নেবে যদি তুমি তাকে যথেষ্ট শক দিতে পারো।"

"কিন্তু ইঁদুররা প্রেমে পড়ে না।"

"ইঁদুররা বলে প্রেমে পড়ে না!" নাগাসাওয়া আমার দিকে তাকাল। "দারুন খবর। পেছনে এখন মিউজিক চালানো দরকার–একটা ফুল অর্কেস্ট্রা সাথে দুটো হার্প আর..."

"আমার সাথে মজা কোরো না, আমি সিরিয়াস।"

"আমরা খাচ্ছি," নাগাসাওয়া বলল। "আর এখানে ওয়াতানাবে আছে। আমাদের উচিত হবে 'সিরিয়াস' কথাবার্তা অন্য সময়ের জন্য তুলে রাখা।"

"আমি চলে যেতে পারি তোমরা চাইলে," বললাম তাকে।

"না!" হাটসুমি বলল। "প্লিজ, থাকো। তুমি থাকলেই বরং ভালো হবে।"

"অন্তত ডেজার্ট খাও," নাগাসাওয়া বলল।

"আমার কোন সমস্যা নেই।"

আমরা তিনজন চুপচাপ খেতে লাগলাম। আমি আমার মাছ শেষ করলেও হাটসুমি তার মাছের অর্ধেক ফেলে রাখল। নাগাসাওয়া অনেক আগেই তার হাঁস শেষ করেছে, এখন হুইস্কিতে মনোযোগ তার।

"চমৎকার সিব্যাস ছিল," আমি গ্লাস তুলে বললাম। কিন্তু বাকিরা কেউ কিছু বলল না। গভীর গর্তে পাথর ফেললাম মনে হল।

ওয়েটাররা এসে আমাদের প্লেট নিয়ে গেল আর লেমন সরবেট, কফি দিয়ে গেল। নাগাসাওয়া তার কফি আর ডেজারট প্রায় ধরলই না, বরং সিগারেট ধরালো। হাটসুমি সরবেট এড়িয়ে গেল। "বিব্রতকর পরিবেশ," আমি মনে মনে ভাবলাম আর সরবেট, কফি দুটোই শেষ করলাম। হাটসুমি টেবিলের উপর রাখা তার হাতের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার অন্য সবকিছুর মত হাতও সুন্দর। আমি নাওকো আর রেইকোর কথা চিন্তা করলাম। তারা কি করছে এখন? নাওকো হয়তো সোফায় শুয়ে বই পড়ছে আর রেইকো গিটারে *নরওয়েজিয়ান* উড বাজাচ্ছে। আমার মনের মধ্যে হঠাৎ জোর ইচ্ছে হল তাদের ছোট রুমটিতে ফিরে যেতে। কি বালটা করছি আমি এখানে বসে বসে?

"আমার আর ওয়াতানাবের মধ্যে মিল হল, অন্যরা আমাদের না বুঝলেও আমাদের কিছু আসে যায় না," নাগাসাওয়া বলল। "সেই কারনেই আমরা অন্যদের থেকে আলাদা। অন্যরা চিন্তা করে তাদের আসেপাসের মানুষ তাদেরকে বুঝলো কিনা। কিন্তু আমি করি না, ওয়াতানাবেও করে না। আমরা থোরাই কেয়ার করি। আমরা আর অন্যরা আলাদা।"

"এটা কি সত্যি?" হাটসুমি আমাকে প্রশ্ন করল।

"মোটেই না," বললাম তাকে, "আমি এরকম কঠিন নই। কেউ আমাকে না বুঝলে আমার কিছু আসে যায় না এরকম মনে হয় না আমার। কিছু মানুষ আছে যাদের আমি বুঝতে চাই, আর চাই তারা আমাকে বুঝুক। ওদেরকে বাদ দিলে, আমার বলা উচিত আমি আসলে খানিকটা নিরাশ। আমি নাগাসাওয়ার সাথে একমত নই, মানুষ আমাকে বুঝলো কিনা তাতে আমার অবশ্যই আসে যায়।"

"আমি কিন্তু ঘুরিয়ে ঠিক একই কথা বললাম," নাগাসাওয়া বলল। "একই কথা! দেরি করে নাস্তা করা আর তাড়াতাড়ি লাঞ্চ করার মত ব্যাপার। একই সময়, একই খাবার, নাম আলাদা।"

এখন হাটসুমি নাগাসাওর সাথে কথা শুরু করল, "আমি তোমাকে বুঝি কিনা তাতে তোমার কিছু আসে যায় না, তাই না?"

"আমার মনে হয় তুমি বুঝতে পারছো না। 'ক' বুঝতে পারে 'খ'কে কারন সেটা বোঝার জন্য 'সময়'টা সঠিক ছিল। একারনে নয় যে, 'খ' চায় 'ক' তাকে বুঝুক।"

"তাহলে বলতে চাও, আমি যদি চাই কেউ আমাকে বুঝুক, ধরো তুমি, তাহলে সেটা আমার ভুল?"

"না, সেটা ভুল নয়," নাগাসাওয়া উত্তর দিল। "যদি তুমি মনে করো তুমি আমাকে বুঝতে চাও, তাহলে বেশির ভাগ মানুষ বলবে এর নাম প্রেম। আমার জীবনধারা অন্য মানুষের জীবনধারা থেকে আলাদা।"

"তাহলে তুমি বলতে চাইছো আমার প্রতি তোমার কোন প্রেম নেই, তাই না?"

"সেক্ষেত্রে আমার জীবনধারা আর তোমার..."

"জাহান্নামে যাক তোমার জীবনধারা!!" হাটসুমি চিৎকার করে বলল। সেই প্রথম আর শেষ আমি তাকে চিৎকার করতে দেখলাম।

নাগাসাওয়া টেবিলের বোতাম চাপলে ওয়েটার বিল নিয়ে আসল, ক্রেডিট কার্ড বের করে দিয়ে দিল সে।

"আমি দুঃখিত, ওয়াতানাবে," নাগাসাওয়া বলল। "আমি হাটসুমিকে বাসায় দিয়ে আসছি। তোমাকে একা একা ডরমে ফিরে যেতে হবে, সমস্যা নেই তো?"

"ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। চমৎকার খাবার ছিল," বললাম তাকে। কিন্তু কেউ কিছু বলল না আর।

ওয়েটার কার্ড নিয়ে এলে নাগাসাওয়া বিল ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে সাক্ষর করে দিল। আমরা তিনজন বাইরে গেলাম। নাগাসাওয়া ট্যাক্সি ডাকতে গেলে হাটসুমি তাকে থামাল।

"থ্যাংকস, কিন্তু আমি তোমার সাথে আজকে আর সময় কাটাতে চাই না। আমাকে বাসায় দিয়ে আসতে হবে না। ডিনারের জন্য ধন্যবাদ।"

"তোমার যেমন ইচ্ছে," নাগাসাওয়া বলল।

"আমি চাই তরু আমাকে বাসায় দিয়ে আসুক।"

"ঠিক আছে," নাগাসাওয়া বলল। "কিন্তু ওয়াতানাবে আমার মতই একজন। সে হয়ত চমৎকার মানুষ কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে-ও কাউকে ভালোবাসতে পারে না। সবসময় তার কিছু অংশ আলাদাই থাকে। ওর ওই ক্ষুধা কখনো যাবে না। বিশ্বাস করো আমি জানি আমি কি বলছি।"

আমি একটা ট্যাক্সি থামিয়ে হাটসুমিকে আগে ঢুকতে দিলাম। "যাহোক," নাগাসাওয়াকে বললাম, "চিন্তা কোরো না, আমি ওকে বাসায় পৌছে দিয়ে আসবো।"

"তোমাকে এই রকম ঝামেলায় ফেলার জন্য দুঃখিত," নাগাসাওয়া বলল। কিন্তু আমার মনে হল সে অন্যকিছু নিয়ে চিন্তা করছে।

টাক্সিতে ঢুকে হাটসুমিকে জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় যেতে চাও? ইবিসু?" ওর ফ্ল্যাট ইবিসুতে।

সে মাথা নাড়ল।

"ঠিক আছে, তাহলে ড্রিঙ্ক করতে যেতে চাও কোথাও?"

"হ্যাঁ," সায় দিল সে।

"শিবুয়া," ড্রাইভারকে বললাম।

হাটসুমি হাত ভাঁজ করে, চোখ বুজে সিটের কোনায় ডুবে থাকল। মাঝে মাঝে ট্যাক্সির ঝাকিতে ওর কানের স্বর্ণের দুল ঝকমক করে উঠছিল। ওর মিডনাইট ব্লু রঙের ড্রেস ট্যাক্সির আঁধারের সাথে মিশে গেছে। ওর সুন্দর সরু ঠোঁটগুলো কখনো কখনো কাঁপছে যেন নিজের সাথে কথা বলছিল সে। ওর দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারছিলাম কেন নাগাসাওয়া ওকে নিজের বিশেষ সঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিয়েছে। অনেক নারী ছিল যারা হাটসুমির চেয়ে সুন্দরি, নাগাসাওয়া তাদের যে কাউকে নিজের করে নিতে পারতো। কিন্তু হাটসুমির মধ্যে কিছু একটা ছিল যা বুকে কাঁপুনি তুলতে পারে। জোরপূর্বক এর থেকে কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। ওর গভীর থেকে এই ক্ষমতা বিচ্ছুরিত হত। আমি সিবুয়া যাওয়ার পুরো রাস্তায় ওকে খেয়াল করলাম আর কোন উত্তর ছাড়াই অবাক হয়ে ভাবলাম, আমি যে আবেগ অনুভব করছিলাম তা কি ছিল।

বছর বারো কিংবা ওরকম সময় পার হওয়ার পর একদিন সেই উত্তর খুঁজে পেলাম। আমি সান্টা ফেতে এসেছিলাম একজন চিত্রকরের সাক্ষাৎকার নিতে।

এলাকার একটা পিজ্জা পার্লারে বসেছিলাম। পিজ্জা খাচ্ছিলাম, সাথে বিয়ার, আর অসাধারন সুন্দর সূর্যাস্ত দেখছিলাম। লাল আলো সবকিছু শুষে নিয়েছিল–আমার হাত, প্লেট, টেবিল, পুরো দুনিয়া। মনে হচ্ছিল বিশেষ ধরনের কোন ফলের রস পড়েছে সবকিছুর উপর। এই অসাধারন সূর্যাস্ত দেখার মাঝখানে হঠাৎ হাটসুমির চেহারা ভেসে উঠল আমার মনে, সাথে সাথে আমি বুঝতে পেলাম সেই আবেগটা কি ছিল। যেন ছোটবেলার কোন আকাঙ্খার মত, যা কখনো ফুরায় না। আমি বহু বছর ধরে এরকম নিরীহ কিন্তু কষ্টদায়ক আকাঙ্খার কথা ভুলে ছিলাম, জানতামও না এরকম কিছু আমার মধ্যে বিরাজ করছিল। হাটসুমি সে রাতে আমার মধ্যে এমন কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছিল যা আমার মধ্যে সুপ্ত রয়ে গিয়েছিল। এখন যখন অর্থ বুঝতে পারলাম প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমি। সে একজন অসামান্য নারী ছিল। তার জন্য কিছু একটা করা উচিত ছিল কারো। তার পাশে থাকার জন্য যেকোন কিছু।

কিন্তু নাগাসাওয়া বা আমি কেউই তা করতে পারিনি। আরো অনেকের মত যাদেরকে চিনতাম, হাটসুমি তার জীবনের সেই পর্যায়ে পৌঁছে গেছিল আর মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। দুই বছর পর নাগাসাওয়া জার্মানি চলে যায় আর হাটসুমি বিয়ে করে ফেলে। তারও দু বছর পর সে একদিন ক্ষুর দিয়ে হাতের রগ কেটে আত্মহত্যা করে।

আমি খবরটা পেয়েছিলাম নাগাসাওয়ার কাছ থেকে। হ্যাঁ, নাগাসাওয়া আমাকে জানাল কি ঘটেছে। বন থেকে সে চিঠি পাঠাল, "হাটসুমির মৃত্যু আমার ভেতর কিছু একটা নিভিয়ে দিয়েছে। এমন কি ওর মৃত্যু আমার জন্যও অনেক কষ্টকর," আমি ওর চিঠি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। আর কখনো ওকে চিঠি লিখিনি।

হাটসুমি আর আমি একটা ছোট বারে গেলাম আর কয়েক দফা ড্রিংক করলাম। আমরা কেউই তেমন একটা কথা বলিনি। অনেক বছর ধরে বিবাহিত দম্পতির মত বোরড, একজন আরেকজনের মুখোমুখি হয়ে বসে থাকলাম, ড্রিঙ্ক করলাম আর বাদাম চাবালাম। ভিড় বাড়তে থাকলে কিছুক্ষণ হাঁটবো চিন্তা করে আমরা বেরিয়ে এলাম। হাটসুমি বিল দিতে চাচ্ছিল কিন্তু আমি জোর করে দিয়ে দিলাম যেহেতু ড্রিঙ্কের আইডিয়া আমার ছিল।

রাতের বাতাস বেশ ঠান্ডা ছিল। হাটসুমির পরনে ধূসর কারডিগান, আমার পাশে চুপচাপ হাঁটছিল সে। আমার মাথায় কোন বিশেষ গন্তব্য ছিল না। আমরা স্রেফ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমার হাত পকেটে ঢোকানো। আমার কাছে মনে হল নাওকোর সাথে হাঁটার মত।

"তুমি বলতে পারো এখানে কোথাও পুল খেলার জায়গা আছে কিনা?" হাটসুমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

"পুল?! তুমি পুল খেলতে পারো?"

"হ্যাঁ, বেশ ভালোই পারি, তুমি?"

"আমি ফোর বল খেলি। বেশি ভালো পারি না।"

"ঠিক আছে, চলো খেলি তাহলে।"

আমরা কাছাকাছি একটা পুল হল খুঁজে সেখানে গেলাম। একটা গলির ভেতর ছোট জায়গা। জায়গার পরিবেশের সাথে আমাদের দু-জনকে মানাচ্ছিল না একদম। হাটসুমি তার মেয়েলি ড্রেসে আর আমি নীল ব্লেজার, রেজিমেন্টাল টাই পরা। অবশ্য হাটসুমিকে দেখে মনে হল না মাথা ঘামাচ্ছে এ নিয়ে। সে ব্যাগ থেকে ব্যারেট বের করে পরল যাতে খেলার সময় চুলগুলো ঝামেলা না করে।

আমরা দুই রাউন্ড ফোর বল খেললাম। হাটসুমি নিজেকে যতটা ভালো খেলোয়াড় দাবি করেছিল, সে আসলেই ততটা ভালো। আর আমি আমার হাতের ভারি ব্যান্ডেজের জন্য ঠিকমত খেলতেই পারলাম না। সে একদম গুঁড়িয়ে দিল আমাকে।

"তুমি খুবই ভালো খেলো," প্রশংসা করলাম আমি।

"আমাকে দেখলে বোঝা যায় না সেটা এই তো?" হাসতে হাসতে শট রেডি করতে লাগল সে।

"কোত্থেকে এরকম খেলা শিখেছো?"

"আমার দাদার কাছে। বুড়ো খেলোয়াড়। তার বাড়িতে পুল টেবিল ছিল। আমি প্রথমে আমার ভাইয়ের সাথে মজা করে খেলতাম, পরে যখন বড় হলাম তখন দাদা আমাকে কিভাবে খেলতে হয় তা শিখিয়েছেন। চমৎকার মানুষ ছিলেন তিনি–সুদর্শন, স্টাইলিস। এখন বেঁচে নেই অবশ্য। তিনি সব সময় গল্প করতেন কিভাবে তার সাথে নিউ ইয়র্কে একবার ডিয়ানা ডারবিনের দেখা হয়েছিল।"

সে পরপর তিনটা ফেলল, চতুর্থটা ভুল করল। আমিও চাপাতে গিয়ে সহজ চাল ভুল করলাম।

"এটা তোমার ব্যান্ডেজের জন্য," সান্ত্বনা দিয়ে বলল সে।

"না, ভুলটা হয়েছে অনেকদিন খেলি না সে জন্য," আমি বললাম। "দু বছর পাঁচ মাস।"

"তুমি দিন তারিখ এত নিশ্চিত হয়ে কী করে বলছো?"

"কারন ঐদিন খেলার পর রাতে আমার বন্ধু মারা গিয়েছিল," আমি বললাম।

"তারপর থেকে পুল খেলা ছেড়ে দিয়েছো?"

"সেরকম কিছু না।" কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, "এরপর আর খেলার সুযোগ পাইনি, এই আর কি।"

"তোমার বন্ধু কিভাবে মারা গিয়েছিল?"

"ট্রাফিক অ্যাকসিডেন্ট," বললাম তাকে।

সে বেশ সিরিয়াস হয়ে আরো কিছু শট খেলল, ভালোমত কিউ বলের গতি আর নির্ভুলতার দিকে খেয়াল রেখে। ওকে এভাবে খেলতে দেখে–সাবধানতার সাথে চুল বেঁধে, কানের দুলের ঝলকানি, হালকা পা ফেলে হাঁটা, সুন্দর সরু আঙুলগুলো দিয়ে শট করা–আমার মনে হল এই নোংরা পুল পার্লার বদলে গিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ কোন খেলায় বদলে গেছে। আমি ওর সাথে আগে কখনো একা সময় কাটাইনি। আমার জন্য দারুন অভিজ্ঞতা ছিল। মনে হল যেন জীবনের নতুন উচ্চতায় উঠে গেছি। তিন নাম্বার খেলার শেষে সে যে আবার আমাকে একদম গুঁড়িয়ে দিল তা বলাই বাহুল্য। আমার ক্ষত খুলে গিয়ে রক্ত বের হতে লাগল, তাই আমরা খেলা বন্ধ করতে বাধ্য হলাম।

"আমি দুঃখিত," তাকে মনে হল সত্যি সত্যি উদ্বেগ প্রকাশ করছে, "আমার এই খেলার বুদ্ধি দেয়া একদম উচিত হয়নি।"

"ব্যাপার না। এমন কিছু কাটেনি, আর আমার খেলতে খুব ভালো লেগেছে, সত্যি বলছি।"

আমরা যখন পুল পার্লার থেকে বের হয়ে যাচ্ছি, পার্লারের মালিক যিনি এক শুকনো মহিলা, হাটসুমিকে বলল, "বোন, আপনার খেলার হাত দারুন।" হাটসুমি তাকে মিষ্টি হেসে ধন্যবাদ দিয়ে বিল পরিশোধ করল।

"ব্যথা করছে?" সে জিজ্ঞেস করল যখন আমরা বাইরে বের হলাম।

"তেমন একটা না।"

"তোমার কি মনে হচ্ছে সেলাই খুলে গেছে?"

"না, মনে হয় ঠিকই আছে।"

"আমার বাসায় চল, ব্যান্ডেজ বদলে দেবো। আমার কাছে জীবাণুনাশক আর যা যা দরকার সব আছে। বাসায় চল।"

আমি তাকে বললাম, এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সে জোর করল, সেলাই খুলে গেছে কিনা সেটা খুলে দেখা দরকার।

"নাকি আমার সাথে সময় কাটাতে তোমার ভালো লাগছে না? এজন্য তাড়াতাড়ি নিজের রুমে ফিরে যেতে চাইছো?" হেসে বলল সে।

"মোটেই না," আমি বললাম।

"তাহলে ঠিক আছে, চল। বেশি তো দূর না, হাঁটার রাস্তা।"

হাটসুমির অ্যাপার্টমেন্ট সিবুয়া থেকে ইবিসু'র দিকে পনের মিনিটের হাঁটা দূরত্বে। বিল্ডিংটা দেখতে কোনভাবে সুন্দর নয়, তবে ভদ্র ধরনের। ছোট সুন্দর লবি আর এলিভেটর। হাটসুমি আমাকে কিচেন টেবিলে বসিয়ে বেডরুমে গেল পোশাক বদলাতে। ফিরে আসল একটা প্রিন্সটন হুডওয়ালা সয়েট শার্ট আর সুতির স্লাক্স পরে–কানে কোন স্বর্ণের কানের দুল নেই আর। ফার্স্টএইড বক্স টেবিলে রেখে সে আমার ব্যান্ডেজ খুলল। পরীক্ষা করে দেখল সেলাই ঠিক আছে কিনা, তারপর ক্ষতের উপর একটু ডিসইনফেকট্যান্ট দিয়ে নতুন করে ব্যান্ডেজ করে দিল। একদম পেশাদারের মত করে করল কাজটা। "তুমি কি করে এত কিছু এত ভালোভাবে করতে পারো?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবির কাজ করতাম এক সময়। নার্সের মত আরকি। তখন শিখেছি।"

ব্যান্ডেজ করা শেষ হলে সে ফ্রিজ থেকে বিয়ারের দুটো ক্যান নিয়ে আসল। সে অর্ধেকটা খেলো, আমি আমারটা পুরো আর সাথে তার অর্ধেকটাও খেলাম। সে তার ক্লাবের মেয়েদের ছবি দেখাল। তার কথাই ঠিক, অনেকগুলো মেয়েই দেখতে কিউট।

"তোমার যখনই মনে হয় একজন গার্লফ্রেন্ড দরকার, আমার কাছে চলে এসো, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।"

"ইয়েস, ম্যাম।"

"আচ্ছা তরু, সত্যি করে বলো, তোমার মনে হচ্ছে আমি একজন বুড়িঘটক, তাই না?

"অনেকটা তাই," হেসে হেসে সত্যিটা বললাম। সে-ও হাসল। হাসলে তাকে সুন্দর দেখায়।

"আচ্ছা তরু, আমাকে আরেকটা জিনিস বলো, আমার আর নাগাসাওয়া সম্পর্কে তোমার কি ধারনা?"

"কি ধারনা মানে, কী বলতে চাও? কি নিয়ে ধারনা?"

"আমার এখন কি করা উচিত।"

"আমি কি মনে করি তাতে কিছু আসে যায় না," ঠান্ডা বিয়ারে জোরে চুমুক দিলাম।

"সমস্যা নেই। তুমি কি মনে করো সেটা বলো আমাকে।"

"আচ্ছা। তোমার জায়গায় আমি হলে তাকে ছেড়ে চলে যেতাম। এমন কাউকে খুঁজতাম যার চিন্তা-ভাবনা সাধারন মানুষের মত আর তার সাথে সুখে শান্তিতে বাস করতাম। এই লোকের সাথে সুখে থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই তোমার। সে যেভাবে জীবনযাপন করে তাতে তার মাথায় কখনো আসে না যে

তাকে সুখি হতে হবে বা কাউকে সুখি করতে হবে। ওর সাথে থাকলে তোমার স্রেফ জীবনটাই নষ্ট হবে। আমার কাছে এমনিতেও অবাক লাগছে ভেবে যে, তুমি কিভাবে তার সাথে তিন বছর পারো করেছো। যাহোক, আমি তাকে পছন্দ করি। ও মজার মানুষ, ওর অনেক দারুন গুণ আছে। ওর এমন সব ক্ষমতা আছে যার ধারেকাছে আমি কখনো যেতে পারবো না। কিন্তু সব কথার শেষ কথা হল ওর চিন্তা-ভাবনা আর ও যেভাবে জীবন যাপন করে তা সঠিক নয়। মাঝে মাঝে ওর সাথে কথা বলতে গিয়ে আমার মনে হয় আমি একই বৃত্তের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছি। যা করে সে খালি উপরে উঠছে, তা করতে গিয়ে আমি বৃত্তের মধ্যে আটকে গিয়েছি। নিজেকে তখন অনেক ফাঁকা মনে হয়! যাহোক, আমাদের চিন্তাধারা অনেক ভিন্ন ধরনের। বুঝতে পারছো কি বললাম?"

"বুঝলাম," ফ্রিজ থেকে আমার জন্য আরেকটা বিয়ার এনে দিল হাটসুমি।

"সেই সাথে, সে যদি পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে ঢোকে আর এক বছর ট্রেইনিং করে তাহলে তাকে বাইরে যেতে হবে। তুমি শেষ সময় কি করবে? তার জন্য অপেক্ষা করবে? তার কিন্তু বিয়ে করার কোন প্ল্যান নেই।"

"সেটাও আমি জানি।"

"তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই।"

"আচ্ছা," হাটসুমি বলল।

আমি আস্তে-ধীরে গ্লাসে বিয়ার ঢাললাম।

"জানো, আমরা যখন পুল খেলছিলাম, তখন আমার মাথায় হঠাৎ একটা চিন্তা আসল," আমি বললাম। "আমি আমার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। কিন্তু বড় হতে গিয়ে আমার কখনো মাথায় আসেনি যে, আমার ভাইবোনের প্রয়োজন আছে। আমি আমার একাকিত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু তখন মনে হল, তোমার মত একজন বড় বোন থাকলে ভালো হত–যে মেয়েলি কিন্তু মিডনাইট ব্লু ড্রেস আর স্বর্ণের কানের দুল পরে ফাটাফাটি পুল খেলতে পারে।"

হাটসুমি খুশির হাসি দিল। "গত এক বছরে আমার শোনা সবচেয়ে সুন্দর কথা এটা," বলল সে। "সত্যি বলছি।"

"আমি চাই," লাজুক সুরে বললাম, "তুমি সুখি হও। পাগলামি শোনালেও, তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি যে কারো সাথে সুখি হতে পারবে। কিভাবে তুমি নাগাসাওয়ার মত একজনের সাথে এসে জুটলে আমার মাথায় আসে না।"

"এরকম ব্যাপার আসলে হঠাৎ হয়ে যায়। কারোর কিছু করার থাকে না। আমার ক্ষেত্রেও এটা সত্যি। অবশ্য নাগাসাওয়া বলবে এটা পুরোপুরি আমার দায়িত্ব, তার নয়।"

"আমি নিশ্চিত সে বললে এরকমই বলবে।"

"যাহোক তরু, আমি পৃথিবীর সবচেয়ে স্মার্ট মেয়ে নই। আমি পুরনো ধাঁচের, বোকা ধরনের মেয়ে। আমি 'সমাজ' আর 'দায়িত্ব' নিয়ে হেলাফেলা করতে পারি না। আমি শুধু চাই বিয়ে করতে। আর একজন মানুষকে চাই যাকে আমি ভালোবাসব। প্রতি রাতে সে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে থাকবে। আর চাই একগাদা বাচ্চাকাচ্চা পয়দা করতে। আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। জীবন থেকে আর কিছু আমার চাওয়ার নেই।"

"নাগাসাওয়া তার জীবনে এরকম কিছুই চায় না।"

"মানুষ কিন্তু বদলায়। তোমার কি মনে হয়?" হাটসুমি প্রশ্ন করল।

"তুমি বলতে চাও তারা সমাজ থেকে দূরে গিয়ে পাছায় লাথি খেয়ে একসময় সোজা হয়?"

"হ্যাঁ, সে যদি আমার থেকে অনেকদিন দূরে থাকে তাহলে আমার প্রতি তার অনুভূতি বদলাতে পারে বলে মনে হয় না?"

"পারত যদি সে সাধারণ কেউ হত," আমি বললাম। "কিন্তু সে আলাদা। তার মনোবল খুবই শক্ত ধাঁচের–তুমি আমি ভাবতেও পারবো না। যত দিন যাচ্ছে সে আরও শক্তিশালী হচ্ছে। তার উপর কিছু ভেঙে পড়লে সে আরও শক্তি জড়ো করে। সে জ্যান্ত শামুক গিলে খাবে কিন্তু কারো জন্য পেছনে ফিরে যাবে না। এরকম একজন মানুষের থেকে তুমি কি করে কিছু আশা করো?"

"কিন্তু ওর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমার কোন উপায় নেই," হাটসুমি হাতে গাল রেখে বলল।

"তুমি তাকে এতটা ভালোবাস?"

"হ্যাঁ, বাসি," সে কোন ইতস্তত না করে উত্তর দিল।

"হায় রে," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম আমি। গ্লাস থেকে বিয়ারের শেষ চুমুক দিলাম। "কাউকে ভালোবাসতে পারা নিশ্চয়ই খুবই দারুন ব্যাপার।"

"বললাম তো আমি বোকা, পুরনো দিনের মেয়ে। আরেকটা বিয়ার খাবে?"

"না, ধন্যবাদ, আমাকে যেতে হবে। ব্যান্ডেজ আর বিয়ারের জন্য ধন্যবাদ।"

আমি যখন বের হয়ে যাওয়ার জন্য জুতো পরছিলাম তখন ফোন বাজল। হাটসুমি একবার আমার দিকে তাকিয়ে ফোনের দিকে তাকাল, তারপর আবার আমার দিকে। "গুড নাইট।" বের হতে হতে বললাম আমি। দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিলাম যখন তখন এক নজর দেখতে পেলাম হাটসুমি ফোনের রিসিভার তুলছে। সেটাই ছিল শেষবারের মত ওকে দেখা।

ডরমে ফিরলাম যখন সাড়ে এগারোটা বাজে। সোজা নাগাসাওয়ার রুমের দরজায় নক করলাম। দশ বার নক করার পর আমার মনে হল আজকে তো

শনিবারের রাত। শনিবার রাতে নাগাসাওয়ার বাইরে থাকার অনুমতি নেয়া আছে। সম্ভবত কোন আত্মীয়র বাসায় আছে।

রুমে ফিরে গেলাম। টাই খুললাম, প্যান্ট জ্যাকেট হ্যাঙ্গারে ঝুলালাম, পাজামা পরলাম, দাঁত ব্রাশ করলাম। মনে মনে ভাবলাম, ধুর না, কালকে আবারও রবিবার। মনে হচ্ছে প্রতি চারদিন পরপরই রবিবার চলে আসছে। আর দুই রবিবার পর আমার বয়স বিশ হবে। বিছানায় শুয়ে ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকলাম, অশুভ অনুভূতি ঘিরে ধরল আমাকে।

রবিবার সকালে ডেস্কে বসে কফি খেতে খেতে আর মাইল্‌স ডেভিসের পুরনো রেকর্ড শুনতে শুনতে নাওকোকে চিঠি লিখলাম। বাইরে হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল, ঘরের ভেতর ঠান্ডা। ট্রাংক থেকে গরম সোয়েটার বের করেছি, তাতে ন্যাপথোলিনের গন্ধ। জানালার উপরে একটা মোটা বিশাল সাইজের মাছি বসা, নড়াচড়া করছে না। বাতাস নেই বলে ফ্লাগ পোলে রাইজিং সান পতাকা লেপ্টে আছে রোমান সিনেটরের টোগার মত। একটা বাদামি রঙের হাড্ডিসার ভিতু কুকুর মাঠে ঘোরাঘুরি করছিল আর প্রত্যেকটা ফোঁটা ফুল থেকে গন্ধ শুঁকছিল। বুঝলাম না এরকম বৃষ্টির দিনে কেন একটা কুকুরকে ফুলের গন্ধ শুঁকে বেড়াতে হবে।

বিশাল একটা চিঠি লিখলাম। হাতের ক্ষত ব্যথা করলে কলম নামিয়ে রেখে জানালা দিয়ে মাঠের দিকে দেখছিলাম।

নাওকোকে শুরু করলাম এই বলে যে, কিভাবে রেকর্ড স্টোরে কাজ করতে গিয়ে বাজেভাবে হাত কেটে ফেলেছি। তারপর লিখলাম নাগাসাওয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের পরীক্ষায় পাশের খুশিতে হাটসুমি আর নাগাসাওয়ার সাথে ডিনার করা নিয়ে। আমি রেস্টুরেন্ট আর খাবারের বর্ণনা দিলাম। খাবার ভালো ছিল কিন্তু রেস্টুরেন্টের পরিবেশ কিছু কারনে বাজেভাবে বদলে গেছিল লিখলাম।

আমি একবার ভাবলাম হাটসুমির সাথে পুল খেলার সাথে কিজুকির মিলের কথা লেখা ঠিক হবে কিনা। পরে ভাবলাম লেখা উচিত। আমার মন চাইছিল লিখতে।

'সেদিন কিজুকির খেলা শেষ শটটার কথা আমার এখনো মনে আছে–যেদিন ও মারা গেল। কঠিন একটা শট ছিল, আমি আশা করিনি সে পারবে। কিন্তু শটটা একদম নিখুঁত ছিল। সাদা আর লাল বলগুলো প্রায় শব্দ ছাড়াই সবুজ টেবিলের উপর দিয়ে শেষ পয়েন্টের জন্য একে অপরের দিকে ছুটে গিয়েছিল। দারুন একটা শট ছিল, আমার স্মৃতিতে একদম স্পষ্ট এখনো। এরপর প্রায় আড়াই বছর আমি আর পুল খেলিনি।

'যে রাতে হাটসুমির সাথে পুল খেললাম, প্রথম গেমটা শেষ হওয়ার আগ

পর্যন্তও আমার মাথায় কিজুকির চিন্তা আসেনি। তারপর একদম ধাক্কার মত এসে লাগল। আমার সবসময় মনে হয়েছে পুল খেলতে গেলেই কিজুকির কথা মনে পড়বে। কিন্তু প্রথম গেমটা শেষ হওয়ার পর আমি ভেন্ডিং মেশিন থেকে পেপসি কিনে খাওয়া শুরু করার আগ পর্যন্তও কিজুকির কথা মনে ছিল না। ভেন্ডিং মেশিন কাজটা করেছে। আমরা যেখানে পুল খেলতাম সেখানে এরকম একটা ভেন্ডিং মেশিন ছিল আর আমরা খেলার ফলাফলের উপর পেপসি বাজি ধরতাম।

'আমি অনুতপ্ত বোধ করছিলাম যে কিজুকিকে আমার মনে পড়েনি, যেন আমি ওকে কোনভাবে ত্যাগ করেছি। রুমে ফিরে আসার পর আমার মনে হল ওই ঘটনার পর আড়াই বছর কেটে গেছে কিন্তু কিজুকির বয়স এখনও সতের। এর মানে এই না, আমার স্মৃতি ফিকে হয়ে গেছে। ওর মৃত্যু যা কিছু আমার মধ্যে বদলে দিয়েছিল তা এখনও স্পষ্ট আর উজ্জ্বল। এমনকি আগের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল। আমি যা বলতে চাইছি তা হল, খুব শিগগিরি আমার বয়স বিশ হবে। ষোল বা সতের বছর বয়সের সময় আমি আর কিজুকি যা যা একসাথে করেছি তার কিছু ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছে। কান্নাকাটি করে তা আর ফেরানো যাবে না। আমি এর চেয়ে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু তুমি মনে হয় বুঝতে পারবে আমি কি বলতে চাইছি। সত্যি বলতে কি, একমাত্র তুমিই আছো যে কিনা আমাকে বুঝতে পারতে।

'আমি এখন আগের চেয়েও অনেক বেশি তোমার কথা ভাবি। আজকে বৃষ্টি হচ্ছে। রবিবারে বৃষ্টি হলে আমার জন্য ঝামেলা হয়ে যায়। লন্ড্রিও করতে পারি না, ইস্ত্রিও করতে পারি না। বাইরে হাঁটতে যেতে পারি না, ছাদে শুয়ে থাকতে পারি না। একমাত্র যা করার আছে তা হল রেকর্ড প্লেয়ারে অটো রিপিট দিয়ে বার বার *কাইন্ড অব ব্লু* শোনা আর জানালা দিয়ে মাঠে বৃষ্টি পড়তে দেখা। তোমাকে আগে লিখেছি, রবিবার পড়াশুনা করি না। চিঠিটা অনেক বড় হয়ে গেল। এখন থামছি। ডাইনিং হলে যাচ্ছি লাঞ্চ করতে।

গুড বাই।'

অধ্যায় ৯

পরের লেকচারেও মিদোরির কোন চিহ্ন নেই। হল কি মেয়েটার? ওর সাথে সেইদিন টেলিফোনে কথা বলার পর দশ দিন পার হয়েছে গেছে। একবার ভেবেছিলাম ওকে ফোন করি, পরে ভাবলাম ঠিক হবে না। সে বলেছে সে নিজে ফোন করবে।

ঐ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে ডাইনিং হলে নাগাসাওয়ার সাথে দেখা হল। সে এক ট্রে ভর্তি খাবার নিয়ে আমার পাশে এসে বসে আমাদের পার্টি বরবাদ করার জন্য মাফ চাইলো।

"বাদ দাও তো," আমি বললাম, "আমার বরং চমৎকার ডিনারের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। অবশ্য আমি বলবো তোমার প্রথম চাকরির উদযাপন অনেক আজবভাবে হল।"

"তা আর বলতে," সে বলল।

আমরা কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে খেলাম।

"আমি হাটসুমির সাথে মিটমাট করে নিয়েছি," বলল সে।

"অবাক হইনি।"

"যতদূর মনে পড়ে আমি তোমার সাথেও খারাপ আচরণ করেছি।"

"হঠাৎ এত মাফ চাওয়া চাওইয়ি কিসের?" আমি প্রশ্ন করলাম, "তুমি কি অসুস্থ নাকি?"

"হতে পারে," হালকা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল সে। "হাটসুমি বলল তুমি নাকি তাকে বলেছো আমাকে ছেড়ে যেতে।"

"সেটাই একমাত্র উপায়," বললাম তাকে।

"হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি।" নাগাসাওয়া বলল।

"ও একজন চমৎকার মানুষ," আমি মিসো সুপ খেতে খেতে বললাম।

"জানি," সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "আমার জন্য একটু বেশিই চমৎকার।"

ঘুমাচ্ছিলাম। গভীর ঘুমের মধ্যে বেল বাজলে আমি ঘুমের মধ্যেই বুঝতে পারলাম ফোন এসেছে। ঘুম ভেঙে গেল আর আমি বোকার মত তাকিয়ে থাকলাম। মনে হচ্ছিল যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন ব্রেন ফুলে না যাওয়া পর্যন্ত আমার মাথা পানিতে ডুবে ছিল। ঘড়িতে সোয়া ছয়টা বাজে, কিন্তু সেটা ভোর না সন্ধ্যা

বুঝতে পারছিলাম না। আমার মনে পড়ছিল না আজকে কি বার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম ফ্লাগ পোলে পতাকা নেই। তারমানে সম্ভবত সন্ধ্যা। যাক, ফ্ল্যাগ পোল তাহলে কোন কাজে লাগল।

"হ্যালো, ওয়াতানাবে, তুমি কি এখন ফ্রি আছো?" মিদোরি জিজ্ঞেস করল।

"জানি না, আজকে কি বার?"

"শুক্রবার।"

"ভোর না সন্ধ্যা?"

"অবশ্যই সন্ধ্যা! কি সব আজব প্রশ্ন করো! দাঁড়াও, দেখে বলি। হ্যাঁ, সন্ধ্যা ছয়টা আঠারো মিনিট।"

তারমানে আসলেই সন্ধ্যা। মনে পড়ল আমি বিছানায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাথা কাজ করা শুরু করল। শুক্রবার রাতে আমার রেকর্ড স্টোরে কাজ থাকে না। "হ্যাঁ, ফ্রি আছি। তুমি কোথায়?"

"উএনো স্টেশন। আমার সাথে সিঞ্জুকুতে দেখা করো? এখনি বের হচ্ছি আমি।"

আমরা একটা সময় আর জায়গা ঠিক করে ফোন রাখলাম।

বারে ঢুকে দেখি মিদোরি কাউন্টারের শেষ মাথায় ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে আছে। একটা অজস্র ভাঁজওয়ালা পুরুষদের সাদা বলকান কোট পরা, সাথে পাতলা হলুদ সোয়েটার, আর নিল জিন্স। এক হাতে দুইটা ব্রেসলেট পরে ছিল।

"কি ড্রিঙ্ক নিয়েছো তুমি?" জানতে চাইলাম আমি।

"টম কলিন্স।"

আমি হুইস্কি আর সোডা অর্ডার করার পর খেয়াল করলাম মিদোরির পায়ের কাছে একটা বিশাল সুটকেস।

"ট্রিপে গিয়েছিলাম," বলল সে। "মাত্র ফেরত আসলাম।"

"কোথায় গিয়েছিলে?"

"নারার দক্ষিনে আর আমরির উত্তরে।"

"একই ট্রিপে?"

"বোকার মত কথা বোলো না। আমি পাগল হতে পারি কিন্তু এক সাথে উত্তর আর দক্ষিনে যেতে পারি না। বয়ফ্রেন্ডের সাথে নারা'তে গিয়েছিলাম তারপর আমরি'তে গিয়েছি একা একা।"

আমি আমার হুইস্কি আর সোডাতে চুমুক দিয়ে মিদোরির মুখ থেকে তার সিগারেট নিয়ে মারলবরো সিগারেটটা ধরালাম। "তোমার নিশ্চয়ই ভয়াবহ সময় গেছে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-টিয়া নিয়ে।"

“নাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারটা সহজ ছিল। আমাদের অনেক প্র্যাকটিস করা ছিল। তুমি স্রেফ একটা কালো কিমোনো পরে ভদ্র মেয়ের মত বসে থাকবে ব্যাস, বাকি সবাই যা করার করে দেবে–আঙ্কেল, প্রতিবেশী, এরা আরকি। তারা সাকি আনবে, সুসি অর্ডার করবে, সান্ত্বনাদায়ক কথাবার্তা বলবে, কান্নাকাটি চলবে, স্মরণচিহ্ন ভাগাভাগি হবে। পিস অফ কেক। পুরো ব্যাপারটা পিকনিকের মত। দিনের পর দিন আমি যে নার্সিং করেছি তার তুলনায় এটা পিকনিক। আমি আর আমার বোন একদম কাঠখোট্টা হয়ে গেছি। আমরা এমনকি কাঁদতেও পারিনি। আমাদের কোন কান্না বাকি ছিল না। লোকজন ফিসফাস করছিল, ‘এই মেয়েগুলো বরফের মত কঠিন।’ আমরা তখন ঠিক করলাম আমরা কোনভাবেই কাঁদবো না। আমরা দু বোন এরকমই। আমি জানি আমরা চাইলে মিছেমিছি কান্না দেখাতে পারতাম, কিন্তু সেরকম কোন কিছু আমরা কখনো করবো না। কুত্তারবাচ্চা সব! ওরা যত আমাদেরকে চাইছিল কাঁদতে দেখতে আমরা তত মনস্থির করেছি কাঁদব না। তাদেরকে কোন তৃপ্তি পেতে দেবো না। আমি আর বোন এমনিতে আলাদা, কিন্তু এরকম কোন ব্যাপার হলে আমরা এক রকম হয়ে যাই।”

মিদোরি হাত নাড়িয়ে ওয়েটারকে আরেকটা টম কলিন্স আর বাদাম অর্ডার করল। হাত নাড়ানোয় কর্কশ ধ্বনি তুলল ওর ব্রেসলেট।

“তারপর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান শেষ হলে সবাই যার যার বাসায় গেল। আমরা দু-জন সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত বসে বসে সাকি খেলাম। ঐ বড় হাফ গ্যালনের এক বোতল শেষ করে আরেক বোতলেরও অর্ধেক গিললাম। আর পুরোটা সময় সবাইকে গালাগালি করলাম–ঐ লোকটা গাধা, ঐটার মাথায় গোবর, ঐ লোক দেখতে ঘেয়ো কুত্তার মত, আরেকজন দেখতে শুয়োরের মত, অমুকে ভন্ড, তমুকে বাটপার। তুমি ভাবতেও পারবে না এসব করতে কিরকম ভালো লেগেছিল আমাদের!”

“কল্পনা করতে পারছি।”

“তারপর দু-জন জড়াজড়ি করে ঘুমাতে গেলাম–দু-জনেই ঠান্ডায় জমে শেষ। আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুমালাম। ফোন-টোন বেজেছিল সম্ভবত, বাজুক। আমরা মরার মত পড়ে থাকলাম। তারপর এক সময় উঠে সুসি অর্ডার দিলাম আর আলোচনা করলাম কি করা যায়। ঠিক করলাম কিছুদিনের জন্য দোকান বন্ধ করে নিজেদের মত করে জীবন উপভোগ করবো। গত কয়েক মাস মরার মত খেটেছি, আমাদের একটু ছুটি দরকার। আমার বোন তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঘোরাঘুরি করতে চায়, তাই আমিও ভাবলাম আমারটাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করি

আর পাগলের মত লাগাই," মিদোরি মুখ চেপে কান চুলকাল। "উপস্, সরি।"

"সমস্যা নেই," আমি বললাম, "তারপর? তুমি নারা গেলে?"

"হ্যাঁ, জায়গাটা আমার সবসময়ই ভালো লেগেছে। মঠগুলো, হরিণের পার্ক।"

"আর পাগলের মত সেক্স করলে?"

"না, একদমই না। একবারও না," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে। "যেই মুহূর্তে আমরা হোটেলে ঢুকে রুমে ব্যাগ রাখলাম, আমার পিরিয়ড শুরু হল। একদম বন্যার মত।"

আমি হাসি থামাতে পারলাম না।

"আরে, মোটেও কোন হাসির ব্যাপার না। এবার এক সপ্তাহ আগেই শুরু হয়ে গেল! আমি তো দুঃখে কেঁদেই ফেললাম। আমার মনে হয় ধকলের কারনে এমন হয়েছে। আমার বয়ফ্রেন্ড তো খেপেই গেল। সে কথায় কথায় রেগে যায়। যদিও দোষ আমার না। আমি তো আমার পিরিয়ড চাইনি। আর পিরিয়ডের সময় আমার মেজাজ খুবই খারাপ থাকে। প্রথম একদিন দুইদিন আমি কিছুই করতে চাই না। তোমাকে তখন আমার থেকে একশ হাত দূরে থাকতে হবে।"

"আমি দূরেই থাকবো কিন্তু বুঝবো কী করে?" জানতে চাইলাম।

"ঠিক আছে, এরপর থেকে আমার পিরিয়ড শুরু হলে আমি কিছুদিন হ্যাট পরে থাকবো। লাল হ্যাট। তাহলে বুঝতে পারবে," হাসতে হাসতে বলল সে। "আমাকে যদি রাস্তায় দেখো লাল হ্যাট পরে হাঁটছি, কথা বলার চেষ্টাও কোরো না। স্রেফ অন্যদিকে পালিয়ে যেও।"

"ভালো। অন্য মেয়েরাও যদি এমন করত," আমি বললাম, "যইহোক, নারা'তে কি করলে তাহলে?"

"আর কি করবো? হরিণ কে খাওয়ালাম আর সব জায়গা হেঁটে বেড়ালাম। জঘন্য ব্যাপার হল, আমরা মাঝে কঠিন ঝগড়া করলাম। তারপর ফেরত আসার পর থেকে তার সাথে আমার আর দেখা হয়নি। আমি কিছুদিন নিজে নিজে ঘুরে বেড়ালাম, তারপর ঠিক করলাম একা একা একটা ভালো ট্রিপে যাবো। তাই গেলাম আমরিতে। হিরসাকিতে এক ফ্রেন্ডের ওখানে দু-রাত থাকলাম, তারপর সব জায়গা ঘুরে বেড়ালাম–সিমোকিতা, টাপ্পি, এরকম অনেক জায়গায়। সুন্দর জায়গা। আমি একবার ওই জায়গার জন্য ম্যাপ ব্রশিয়ার বানিয়েছিলাম। কখনো গেছো ওদিকে?"

"কখনো না।"

"যাহোক," মিদোরি বলল, টম কলিন্সে চুমুক দিয়ে বাদামের খোসা ভাঙতে

ভাঙতে। "পুরোটা সময় আমি একা একা ঘুরলাম, আর তোমার কথা ভাবছিলাম। তুমি সাথে থাকলে কত মজা হত।"

"কি বলো?"

"কি বলো মানে?" মিদোরি শূন্য চোখে আমার দিকে তাকাল, "কি বলো মানে কি?"

"কি বলো মানে কি বলো। আমার কথা ভাবছিলে কেন?"

"কারন হয়তো আমি তোমাকে পছন্দ করি সেজন্য ভাবছিলাম! আর কেন ভাববো? কে আছে এমন কারো সঙ্গ পাওয়ার কথা ভাবে যাকে সে পছন্দ করে না?"

"কিন্তু তোমার তো বয়ফ্রেন্ড আছে," আমি বললাম, "তোমার আমার কথা ভাবার প্রয়োজন নেই।" আস্তে করে হুইস্কি আর সোডাতে চুমুক দিলাম।

"এর মানে বলতে চাও, আমার বয়ফ্রেন্ড থাকলে আমি তোমার কথা ভাবতে পারবো না?"

"না...সেরকম না, মানে খালি.."

"শোন ওয়াতানাবে, আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন," মিদোরি আমার দিকে আঙুল তাক করে বলল। "আমি তোমাকে সাবধান করছি, গত মাসের পুরো যন্ত্রণা আমার মধ্যে জমে আছে, যে কোন সময় ফেঁটে বেরিয়ে যেতে পারে। তাই যা বলবে সাবধানে বলো। এরকম কথা আরেকবার বলবে, আমি এই জায়গায় কেঁদে বন্যা বানিয়ে ফেলবো। আমি একবার শুরু করলে সারা রাত চালাতে পারি। তার জন্য তুমি তৈরি? আমি একদম পশুর মত কাঁদতে পারি, কোথায় আছি আমার কিচ্ছু আসে যায় না। ফাজলামি করছি না।"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে চুপ থাকলাম। দ্বিতীয় হুইস্কি আর সোডা অর্ডার দিলাম, কয়েকটা পেস্তা বাদাম মুখে দিলাম। সেইকারের শব্দ, বরফ বানানোর মেশিনের তৈরি শব্দ আর গ্লাসের টুংটাং আওাজের মধ্যে দিয়ে কোথা থেকে যেন সারাহ ভনের গাওয়া পুরনো ধাঁচের প্রেমের গান ভেসে আসছিল।

"ট্যাম্পুনের ঘটনার পর থেকে আমার আর আমার বয়ফ্রেন্ডের মধ্যে ব্যাপার-স্যাপার ঠিক নেই।"

"ট্যাম্পুনের ঘটনাটা কি?"

"এক মাস আগে আমি ওর সাথে ড্রিঙ্ক করতে গিয়েছিলাম, ওর কিছু বন্ধুও ছিল আমাদের সাথে। আমি তাদেরকে একটা গল্প বলেছিলাম যে, আমাদের এক প্রতিবেশী মহিলা একবার এমন হাঁচি দিয়েছিল, তার ট্যাম্পুন ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মজার ঘটনা না, বলো?"

"খুবই মজার!" আমি হাসতে হাসতে বললাম।

"হ্যাঁ, অন্যরা যারা ছিল তারাও সেরকমই মনে করেছিল। কিন্তু সে ক্ষেপে গিয়ে বলল আমার এরকম নোংরা বিষয় নিয়ে কথা বলা উচিত না। একদম লুথা কিসিমের লোক!"

"ওয়াও।"

"এমনিতে সে একজন দারুণ মানুষ, কিন্তু এসব ব্যাপারে খুবই সংকীর্ণ মনের," মিদোরি বলল। "যেমন ধরো আমি সাদা আন্ডারওয়্যার ছাড়া আর কোন রঙের কিছু পরলে সে ক্ষেপে যায়। তোমার কি মনে হয় না এইসব সংকীর্ণ মনের লক্ষণ?"

"হয়তো," আমি বললাম, "কিন্তু পুরোটাই যার যার পছন্দের ব্যাপার।" আমার অবাক লাগল ভেবে যে, এরকম একটা লোক মিদোরির মত মেয়েকে গার্লফ্রেন্ড হিসেবে চায়, কিন্তু মিদোরিকে কিছু বললাম না।

"তো, তুমি কি করছিলে," জানতে চাইলো সে।

"কিছুই না। সবসময় যা করি," তাকে বললাম, কিন্তু তারপরই আমার মনে পড়ল মিদোরিকে দেয়া কথামত তাকে কল্পনা করে মাস্টারবেট করার চেষ্টা করেছিলাম। ওকে নিচু গলায় বললাম সেটা যাতে আশেপাশে কেউ শুনতে না পায়।

মিদোরির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আঙুল মটকাল শব্দ করে। "কেমন হল ব্যাপারটা? ভালো ছিল?"

"নাহ, অর্ধেক গিয়ে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আর করিনি।"

"মানে, বলতে চাও নেতিয়ে গিয়েছিল?"

"একদম।"

"ধ্যাত," বিরক্ত হয়ে বলল সে। "নিজেকে বিরক্ত হতে দেয়া চলবে না। সেক্সি কিছু ভাবো। যাও, তোমাকে অনুমতি দিলাম। আচ্ছা, এক কাজ করা যেতে পারে! পরেরবার আমি ফোনে কথা বলবো তোমার সাথে, 'ওহ্ দারুন! অনেক ভালো লাগছে...ওহ্! বেশ লাগছে, থামো! বেরিয়ে গেল আমার...ওহ্! এরকম কোরো না আমার সাথে!' এরকম কথা বলবো তোমার সাথে আর তুমি ওদিকে হাত চালিয়ে যাবে।"

"ডরমের ফোনটা লবিতে, বড় দরজার কাছে। লোকজন সব সময় যাওয়া আসে করে ওখান দিয়ে," বললাম তাকে, "ডরমের প্রধান আমাকে খালি হাতে খুন করবে যদি দেখে ওখানে দাঁড়িয়ে মাস্টারবেট করছি।"

"খুব খারাপ।"

"বাদ দাও। আমি আরেকবার দেখি চেষ্টা করবো আমার মত করে।"

"নিজের সেরাটা চিন্তা কোরো," মিদোরি বলল।

"ঠিক আছে।"

"আমার মনে হয় দোষটা আমার। আমি হয়তো যথেষ্ট সেক্সি নই...শারীরিক দিক দিয়ে।"

"সেরকম কিছু না," ওকে আশ্বাস দিলাম, "পুরোটাই কল্পনার ব্যাপার।"

"তুমি জানো," সে বলল, "আমার পেছনটা অনেক স্পর্শকাতর। আঙুলের হালকা ছোঁয়া দিলে উমমম..."

"মাথায় থাকল ব্যাপারটা।"

"আচ্ছা, আমরা এখন একটা পর্নো মুভি দেখতে যাই না কেন?" মিদোরি প্রস্তাব করল, "নোংরা, এস অ্যান্ড এম ধরনের একটা।"

আমরা বার থেকে একটা ইল শপে গেলাম। তারপর সেখান থেকে গেলাম সিঞ্জুকুর সবচেয়ে মন্দা চলা থিয়েটারগুলোর একটায় যেখানে এক টিকিটে তিনটা এডাল্ট মুভি চলে। একমাত্র জায়গা যেটা আমরা কোন খবরের কাগজে পেলাম সেখানে এস এন্ড এম জিনিসপত্র চলে। হলের ভেতর বলার অযোগ্য রকমের বাজে গন্ধ। আমরা ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। এস অ্যান্ড এম জিনিসপত্র মাত্র শুরু হয়েছে। কাহিনী হল, একজন সেক্রেটারি আর তার হাই-স্কুলে পড়ুয়া বোনকে একদল লোক অপহরন করেছে, টর্চারের ভয় দেখানো হচ্ছে। ছোট বোনকে রেপ করা হবে এই ভয় দেখিয়ে বড় বোনকে জঘন্য সব কাজ করতে বলা হচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই বড় বোনকে একজন মর্ষকামিতে পরিণত হতে দেখা গেল। ছোট বোনও এইসব কাজ কারবার দেখে উত্তেজিত হয়ে গেল। খুবই ফালতু আর একই জিনিস বার বার হচ্ছে, আমি কিছুক্ষনেই বিরক্ত হয়ে গেলাম।

"আমি ছোট বোনটা হলে এত সহজে পাগল হতাম না," মিদোরি বলল। "আমি দেখে যেতে থাকতাম।"

"তাতে কোন সন্দেহ নেই," বললাম তাকে।

"যাহোক, তোমার কি মনে হয় না একজন স্কুল পড়ুয়া মেয়ে হিসেবে তার নিপলগুলো একটু বেশি কালো? তাও আবার একজন ভার্জিন?"

"একদম ঠিক বলেছো।"

মিদোরি স্ক্রিনের দিকে আঠার মত তাকিয়ে থাকল। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম কাউকে এরকম মনোযোগের সাথে পর্নো মুভি দেখতে দেখে। টিকিটের টাকা উসুল। সে তার চিন্তা-ভাবনা আমার কাছে নিয়মিতভাবে পেশ করতে থাকল।

"বাপ রে, দেখো কি জিনিস!" কিংবা "একসাথে তিনজন! মেয়েটাকে তো ছিঁড়েই ফেলবে!" অথবা "আমি এরকম জিনিস কারো সাথে করে দেখতে চাই, ওয়াতানাবে।" মুভির চেয়ে মিদোরিকে দেখেই বেশি মজা পাচ্ছিলাম আমি।

বিরতির সময় আলো জ্বলে উঠলে আমি খেয়াল করলাম পুরো হলে আর কোন মেয়ে নেই। একজন আমাদের কাছে বসে ছিল, সম্ভবত ছাত্র। মিদোরিকে দেখে সিট বদলে দূরে গিয়ে বসল।

"আচ্ছা, আমাকে বলো তো ওয়াতানাবে, এরকম জিনিস দেখলে কি তোমার ওটা দাঁড়িয়ে যায়?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই, কখনো কখনো," আমি বললাম, "এর জন্যই তো এরা এসব মুভি বানায়।"

"তারমানে তুমি বলছো, যখনই এরকম দৃশ্য শুরু হয়, হলে প্রত্যেকটা লোকের ওই জিনিস দাঁড়িয়ে যায়? ত্রিশ-চল্লিশ জনের সবার জিনিস একসাথে দাঁড়িয়ে আছে? ভাবলে খুবই আজব লাগে, তাই না?"

"তুমি বলার পর এখন সেরকম আজবই লাগছে।"

দ্বিতীয় মুভিটা একটু সাধারণ ধরনের পর্নো কাহিনী। এর অর্থ হল আগেরটার চেয়েও বিরক্তিকর। প্রচুর ওরাল সেক্সের দৃশ্য। আর প্রতিবার তারা ফেলাসিও বা কানিলিঙ্গাস কিংবা সিক্সটি নাইন করতে গেলে ভয়াবহ সব চটচট শব্দ আর সাউন্ড এফেক্ট দিয়ে হল ফাটিয়ে দিচ্ছিল। এসব শুনে আমার মনে হচ্ছিল, এ কোন আজব গ্রহে এসে পড়লাম।

"এসব শব্দ কার মাথা থেকে আসে আমার কৌতূহল হচ্ছে," মিদোরিকে বললাম আমি।

"আমার তো দারুন লাগছে!" বলল সে।

যোনিতে লিঙ্গ ঢোকা আর বের হওয়ারও শব্দ আছে সেখানে। আমার কোন ধারনাই ছিল না এরকম কোন শব্দ বাস্তবে থাকতে পারে। লোকটা ভারি শ্বাস ফেলছিল, মেয়েটা ওইসব গতানুগতিক শব্দ করে যাচ্ছিল, "আহ্, খুব ভালো লাগছে!" কিংবা "আরও! আরও!!" সেই সাথে মোচড় খাচ্ছিল। এমনকি খাট কাঁপার ক্যাঁচকোঁচ শব্দও হচ্ছিল। এই দৃশ্য চলতেই থাকল চলতেই থাকল। মিদোরি প্রথম দিকে মজা পাচ্ছিল। পরে মনে হল সেও বিরক্ত হয়ে গেল একই জিনিস দেখে। বলল, চল আমরা যাই।

আমরা বাইরে বেরিয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। এই প্রথম আমার মনে হল সিঞ্জুকুর বাতাস কোন জায়গার ভেতরের বাতাসের চেয়ে স্বাস্থ্যকর।

"ভালোই মজা হল," মিদোরি বলল, "পরে আরেকদিন আমরা আবার দেখবো, কি বলো।"

"আবার কি দেখার আছে? তারা তো একই জিনিসই বার বার করে," আমি বললাম।

"এছাড়া আর কি করবে? আমরাও তো একই জিনিস বার বার করি।"

কথায় যুক্তি আছে।

আমরা আরেকটা বারে গিয়ে ড্রিঙ্ক অর্ডার করে আরো হুইস্কি গিললাম, মিদোরি তিনটা কি চারটা ককটেল খেলো। আবার বের হয়ে গাছে উঠতে চাইলো সে।

"এখানে আশেপাশে কোন গাছ নেই," আমি বললাম, "থাকলেও উঠতে পারতে না, তুমি যথেষ্ট মাতাল।"

"তুমি সবসময় বিচক্ষনের মত কথা বলো আর মজা নষ্ট করো। আমি মাতাল কারন আমি চেয়েছি মাতাল হতে। এতে দোষ কোথায়? আর মাতাল হলেও আমি গাছে উঠতে পারবো। সবচেয়ে উঁচু গাছটার মাথায় উঠে সবার উপর প্রস্রাব করে দেবো।"

"তোমার কি বাথরুম ধরেছে নাকি?"

"হুম।"

আমি মিদোরিকে সিঞ্জুকু স্টেশনের পে-টয়লেটে নিয়ে গিয়ে স্লটে কয়েন ফেলে ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর সন্ধ্যার খবরের কাগজ কিনে কাছে দাঁড়িয়ে পড়তে থাকলাম আর অপেক্ষা করতে লাগলাম ওর বেরিয়ে আসার জন্য। কিন্তু সে বের হল না। পনের মিনিট পর আমার চিন্তা হতে লাগল। যখন ভাবলাম গিয়ে খোঁজ নেবো তখন সে শুকনো মুখ করে বেরিয়ে আসল।

"সরি," বলল সে। "টয়লেটে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"তুমি ঠিক আছো তো?" আমি আমার কোট ওর কাঁধে পরিয়ে দিলাম।

"মনে হয় না।"

"আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিচ্ছি। তোমার বাসায় গিয়ে লম্বা একটা গোসল দিয়ে ঘুম দেয়া উচিত। তুমি খুব ক্লান্ত।"

"না, বাসায় যাবো না। কি হবে ওখানে গিয়ে? কেউ তো নেই। এরকম জায়গায় একা একা ঘুমাতে পারবো না আমি।"

"দারুন!" আমি বললাম, "তাহলে কি করবে?"

"চল, কোন একটা লাভ হোটেলে যাই। আমি তোমার কোলে মাথা রেখে সারা রাত মরার মত ঘুমাবো। তারপর সকালে কোথাও নাস্তা করে একসাথে ক্লাসে যাবো।"

"তুমি আগে থেকেই এটা পরিকল্পনা করেছিলে, তাই না? সেজন্যই আমাকে ফোন করেছো।"

"অবশ্যই।"

"তোমার উচিত ছিল তোমার বয়ফ্রেন্ডকে ফোন করা, আমাকে নয়। এসবের জন্যই দুনিয়াতে বয়ফ্রেন্ডরা আছে।"

"কিন্তু আমি তো তোমার সাথে থাকতে চাই।"

"তুমি আমার সাথে থাকতে পারবে না," বললাম আমি। "প্রথমত, আমাকে মাঝরাতের আগে ডরমে ফিরে যেতে হবে। তা নাহলে কারফিউতে পড়বো। একবার এরকম পড়েছিলাম, অনেক টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আমি যদি কোন মেয়ের সাথে বিছানায় যাই, তার সাথে সেক্স করার জন্যই যাবো। আমি চাই না পাশে শুয়ে থেকে নিজেকে আটকে রাখতে। ফাজলামি করছি না, আমি হয়তো তোমার সাথে জোর করে ফেলতে পারি।"

"তারমানে তুমি আমাকে আঘাত করবে, হাত বেঁধে পেছন থেকে রেপ করবে?"

"ধ্যাত, আমি সিরিয়াস।"

"কিন্তু আমি খুব একা! আমি কারো সাথে থাকতে চাই! আমি জানি তোমার উপর জোর করছি। এমন সব আবদার করছি যার বদলে তোমাকে কিছুই দিতে পারবো না। যা মাথায় আসছে বলে ফেলছি। তোমাকে রুম থেকে টেনে বের করে আমাকে সব জায়গায় নিয়ে যেতে বলছি। কিন্তু একমাত্র তুমিই আছো যার সাথে আমি এমন কাজ করতে পারি! আমি কখনো আর কারো সাথে মনমত কিছু করতে পারিনি, এই বিশ বছরের জীবনে কখনো না। আমার বাবা-মা আমার দিকে কখনো বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেয়নি। আর আমার বয়ফ্রেন্ড, সে একদমই সে ধরণের মানুষ না। আমার মত করে কিছু করতে চাইলেই সে রেগে যায়। ফলে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। তুমিই একমাত্র যাকে আমি এসব কথা বলতে পারি। আর আমি সত্যি অনেক অনেক অনেক ক্লান্ত। আমি চাই কেউ আমাকে বলুক সে আমাকে কতটা পছন্দ করে আর আমি কতটা সুন্দরি। এসব শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়তে চাই। এটুকুই শুধু চাই আমি। তারপর ঘুম থেকে যখন উঠবো তখন আমার মধ্যে পুরো শক্তি থাকবে। তোমাকে আর কখনো এসব আজাইরা আবদার করে বিরক্ত করবো না। কথা দিচ্ছি। ভালো মেয়ে হয়ে যাবো।"

"বুঝতে পারছি কিন্তু সত্যি বলছি আমার কিছু করার নেই।"

"ওহ্ প্লিজ! তাহলে আমি কিন্তু এখানে মাটিতে বসে কান্না শুরু করবো।

সারারাত ধরে কাঁদবো। যেই লোক আমার সাথে প্রথম কথা বলতে আসবে তার সাথে বিছানায় যাবো।”

কি আর করা। আমি ডরমে ফোন করে নাগাসাওয়াকে চাইলাম। সে ফোন ধরলে আমি বললাম সে এমন ব্যবস্থা করতে পারে কিনা যেন মনে হয় আমি রাতে ডরমে ফেরত এসেছি। একটা মেয়ের সাথে আটকে গিয়েছি, সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলাম।

“ঠিক আছে,” সে বলল, “উপযুক্ত কারন বটে। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হবো। তোমার নাম ট্যাগ বদলে ‘ইন’ করে দেবো, চিন্তা কোরো না। যত সময় লাগে নিতে পারো। সকালে আমার রুমের জানালা দিয়ে ঢুকে যেও।”

“থ্যাংকস, তোমার সাহায্য পাওনা থাকল,” বলে ফোন কেটে দিলাম।

“সব ঠিক?” মিদোরি জানতে চাইলো।

“বলা যায়,” আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

“দারুন, চল ডিস্কোতে যাওয়া যাক। এখনো রাত বেশি হয়নি।”

“দাঁড়াও দাঁড়াও, একটু আগে না বললে তুমি খুব ক্লান্ত।”

‘ডিস্কোর মত কোন কিছু হলে আমি ঠিক আছি।”

“হায় খোদা!” বললাম আমি।

তার কথাই ঠিক। আমরা একটা ডিস্কোতে গেলাম। নাচতে শুরু করলে তার শক্তি উচ্ছ্বাস ফেরত আসতে থাকল। দুইটা হুইস্কি আর কোক খেলো সে। ঘেমে না যাওয়া পর্যন্ত নাচতে থাকল।

“কি দারুন মজা!” খুশিতে বলে উঠল। আমরা বিরতি নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলাম। “কত বছর এরকম নাচিনি। আমার মনে হয় তুমি যখন নাচো তোমার শরীরের নড়াচড়ার সাথে আত্মার মুক্তি ঘটে।”

“আমি বলবো তোমার আত্মা সবসময়ই মুক্ত।”

“মোটেও না,” হেসে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল সে। “যাহোক, এখন একটু ভালো লাগছে, প্রচন্ড খিদেও লেগেছে। চল, পিজ্জা খাওয়া যাক।”

আমি ওকে আমার চেনা একটা পিজ্জা হাউজে নিয়ে গিয়ে বিয়ার আর আঞ্চভি পিজ্জা অর্ডার করলাম। আমার তেমন খিদে ছিল না, বারো স্লাইসের মাত্র চার স্লাইস খেলাম। বাকিটা শেষ করল মিদোরি।

“তুমি দেখি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেছো,” আমি বললাম, “একটু আগেও তোমার পা কাঁপছিল আর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।”

“কারন আমি আমার স্বার্থপর আবদার কারো উপর চাপাতে পেরেছি,” সে

বলল। "তুমি আমাকে অসুস্থতা থেকে বের করে এনেছো। এই পিজ্জাটা দারুন!"

"আচ্ছা, সত্যি বাসায় কেউ নেই?'

"সত্যি। আমার বোন তার বন্ধুর বাসায় আছে। ওর ভুতের ভয় আছে। আমি না থাকলে সে একা বাড়িতে ঘুমাতে পারে না।"

"তাহলে ফালতু লাভ হোটেলের চিন্তা বাদ দাও। এরকম জায়গায় গেলে তোমার নিজেকে সস্তা মনে হবে। চল, তোমার বাসায়ই যাই। আমার জন্য আলাদা বিছানা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করতে পারবে?"

মিদোরি মিনিটখানেক ভেবে মাথা ঝাঁকাল। "ঠিক আছে, চল বাসাতেই থাকি গিয়ে।"

আমরা ইয়ামানোতে লাইন ধরে অতসুকা গেলাম। কোবায়েসি বুকস্টোরের বন্ধ মেটাল শাটার তুললাম। শাটারে কাগজ লাগিয়ে লেখা ছিল : 'সাময়িকভাবে বন্ধ।' অন্ধকার দোকানের মধ্যে পুরনো কাগজের গন্ধ। অনেক ম্যাগাজিনের বান্ডেল পড়ে আছে ফেরত যাবার জন্য। আগের বারের ঠান্ডা অনুভূতি আমার আরেকটু বাড়ল। নদীর ঘাটের পরিত্যক্ত জায়গার মত লাগছে দেখতে।

"তোমাদের আবার দোকান চালু করার ইচ্ছে নেই?" জানতে চাইলাম আমি।

"নাহ, আমরা ভাবছি এটা বিক্রি করে দেবো," মিদোরি বলল। "টাকা ভাগ করে আমরা কারো 'আশ্রয়' ছাড়া আমাদের মত আলাদা আলাদা থাকবো। আমার বোন আগামি বছর বিয়ে করছে, আমার আরো তিন বছর স্কুল আছে। আমাদের এইটুকুর জন্য অনেক টাকা দরকার। আমি আমার পার্টটাইম চাকরি চালিয়ে যাবো। এই জায়গা বিক্রি করে দিয়ে আপাতত বোনের সাথে একটা অ্যাপার্টমেন্টে উঠে যাবো।"

"কেউ এ জায়গা কিনবে মনে হয়?"

"কিনবে সম্ভবত। আমি একজনকে চিনি যে সুতার দোকান দিতে চায়। আমাকে কিছুদিন আগে জিজ্ঞেস করেছিল যে বিক্রি করতে চাই কিনা। বেচারা বাবা, কত কষ্ট করল এই জায়গার জন্য। অল্প অল্প করে লোনের টাকা দিয়ে জায়গাটা নিল অথচ শেষ কিছুই থাকল না। সব কিছু নদীর মত ভেসে গেল।"

"তুমি তো ছিলে," আমি বললাম।

"আমি?!" হাসতে হাসতে বলল মিদোরি, তারপর গভীর করে নিঃশ্বাস ফেলল। "চল উপরে যাই, এখানে অনেক ঠান্ডা।"

উপরে গিয়ে সে আমাকে রান্নাঘরের টেবিলে বসাল, গরম পানি দিয়ে গোসল

করতে গেল সে। আমি ততক্ষনে কেটলিতে পানি বসিয়ে চা বানালাম। গোসলের পর আমরা টেবিলে মুখোমুখি বসে চা খেলাম। হাতের উপর থুতনি রেখে সে আমার দিকে দীর্ঘ সময় গভীরভাবে তাকিয়ে থাকল। ঘড়ির টিকটিক শব্দ, ফ্রিজের একটানা হুম শব্দ, মাঝে মাঝে থারমোস্টাটের চালু আর বন্ধ হওয়ার শব্দে ছাড়া আর কোন শব্দ হচ্ছিল না। ঘড়ি বলছিল মাঝরাত দ্রুত এগিয়ে আসছে।

"জানো ওয়াতানাবে, তোমাকে ভালো করে দেখে বুঝলাম তোমার চেহারাটা বেশ ইন্টারেস্টিং।"

"তাই?" আমি একটু আহত বোধ করলাম।

"আমার সাথে সুন্দর চেহারা যায়," সে বলল, "আর তোমার চেহারা...যতই দেখছি ততই মনে হচ্ছে, 'ওকে দিয়ে হবে।'"

"আমারও," বললাম আমি, "মাঝে মাঝে আমি যখন নিজের কথা ভাবি তখন বলি 'জাহান্নামে যাক সবকিছু, আমাকে দিয়ে হবে।'"

"আরে, আমি কিন্তু বাজে অর্থে বলিনি। মনের কথা আমি ঠিকমত শব্দে প্রকাশ করতে পারি না। তাই লোকজন ভুল বোঝে আমাকে। আমি তোমাকে বলার চেষ্টা করছি যে, তোমাকে আমার ভালো লাগে। আগে বলেছি কখনো এই কথা?"

"বলেছো," আমি বললাম।

"মানে বলতে চাই, আমি একমাত্র মেয়ে না যার ছেলেদের বুঝতে সমস্যা হয়। কিন্তু আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি, প্রতিবার একটু একটু করে।"

মিদোরি এক বাক্স মারলবোরো নিয়ে এসে একটা ধরালো। "তুমি যখন শূন্য থেকে শুরু করছো, তোমার শেখার তখন অনেক বাকি।"

"অবাক হচ্ছি না।"

"ওহ্হো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম! তুমি কি বাবার জন্য ধুপকাঠি জ্বালাতে চাও?"

আমি মিদোরির পেছন পেছন বুদ্ধ মূর্তি রাখা রুমে গেলাম, ওর বাবার ছবির সামনে ধুপকাঠি জ্বলিয়ে আর হাত জোড় করলাম।

"জানো, আমি সেদিন কি করেছি?" মিদোরি বলল। "আমি বাবার ছবির সামনে নগ্ন হয়ে বসেছিলাম। সব কাপড় খুলে আমার শরীর তাকে ভালোভাবে দেখতে দিয়েছি। ইয়োগার মত করে বসেছিলাম। তারপর 'এই যে বাবা, এইগুলো আমার স্তন, আর এইটা আমার যোনি।' "

"কী অদ্ভুত! এরকম কেন করতে গেলে?" অবাক হলাম খুব।

"জানি না, আমার মনে হচ্ছিল দেখাই। মানে, আমার অর্ধেক তো তার বীর্য থেকে এসেছে, তাই না? কেন দেখাবো না? 'এই যে তোমার বানানো মেয়ে।' আমি আসলে তখন একটু মাতাল ছিলাম। সেজন্যই বোধ হয়।"

"হতে পারে।"

"আমার বোন রুমে ঢুকে মাথা ঘুরিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। বাবার স্মৃতি ছবির সামনে আমি নগ্ন হয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছি। আমার মনে হয় সবাই অবাক হত।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

"আমি তাকে ব্যাখ্যা দিলাম কেন এরকম করলাম আর বললাম, 'মোমো (বোনের নাম মোমো) এসো, তোমার কাপড় খুলে রেখে আমার পাশে বস আর তাকে দেখতে দাও, কিন্তু সে করল না। ও শকড হয়ে চলে গেল। একদম রক্ষণশীল ধরনের।"

"অন্য কথায় বললে সে আসলে নরমাল," আমি বললাম।

"ওয়াতানাবে, আমাকে বলো তো, আমার বাবা সম্পর্কে তোমার কি ধারনা?"

"নতুন পরিচিত কারো সাথে আমি সুবিধা করতে পারি না, কিন্তু তার সাথে একা থাকতে আমার খারাপ লাগেনি। আমার সহজই লেগেছে। আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলেছি।"

"অনেক কিছু কি নিয়ে?"

"যেমন, ইউরিপিডিস," আমি বললাম।

মিদোরি জোর হাসিতে ফেঁটে পড়ল। "তুমি পাগল নাকি! কেউ মাত্র পরিচিত হওয়া একজন মৃত্যুপথযাত্রির সাথে ইউরিপিডিস নিয়ে কথা বলে না!"

"আচ্ছা, কেউ তো তারা বাবার স্মৃতি ছবির সামনেও নগ্ন অবস্থায় পা ছড়িয়ে বসে থাকে না!"

মিদোরি মুখ টিপে হাসতে হাসতে মূর্তির ঘন্টা বাজাল। "গুডনাইট বাবা। আমরা এখন মজা করবো, তুমি কোন চিন্তা কোর না, ঘুমাও। এখন তো আর কষ্ট হচ্ছে না, নাকি? তুমি তো এখন আর বেঁচে নেই, তাই না? আমি নিশ্চিত তোমার কষ্ট হচ্ছে না। আর যদি কষ্ট হয় ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করো গিয়ে। তাদের গিয়ে বলো তারা অনেক নিষ্ঠুর। আশা করি মায়ের সাথে তোমার দেখা হয়েছে আর তোমরা সেক্স করেছো। তোমাকে বাথরুম করানোর সময় তোমার জিনিস দেখেছি, বেশ ভালো! সুতরাং ভালোমত করতে থাকো। গুডনাইট।"

গোসলের পর পোশাক বদলে মিদোরির বাবার পাজামা পরলাম। একটু

ছোট কিন্তু কিছু না পরার থেকে ভালো। মিদোরি মূর্তির রুমে একটা ম্যাট্রেস বিছিয়ে দিল আমার জন্য।

"এখানে ঘুমাতে ভয় লাগবে না তোমার?" সে জানতে চাইলো।

"মোটেই না, আমি তো খারাপ কিছু করিনি," হেসে বললাম আমি।

"কিন্তু তুমি আমার সাথে থাকবে আর আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকবে আমার ঘুম না আসা পর্যন্তও, ঠিক কিনা?"

"ঠিক," আমি বললাম।

মিদোরির বিছানাটা ছোট, ওকে জড়িয়ে ধরে আমি পড়ে যাচ্ছিলাম প্রায়। ওর নাক আমার বুকে, হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে আছে। আমার ডান হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে আছি আর বাম হাত দিয়ে খাট থেকে পড়ে যাওয়া ঠেকাচ্ছি। এধরনের পরিস্থিতিতে যৌন উত্তেজনা হওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমার নাক ওর মাথায়, ওর ছোট ছোট চুলের কারনে নাকে সুড়সুড়ি লাগছিল আমার।

"ধুর, কিছু বলো?" মিদোরি আমার বুকে মুখ ঢুকিয়ে বলল।

"কি শুনতে চাও?"

"যে কোন কিছু, আমার ভালো লাগবে এরকম কিছু।"

"তুমি অনেক কিউট," আমি বলল...

"মিদোরি," সে বলল, "আমার নাম বলতে হবে।"

"মিদোরি তুমি অনেক কিউট।"

"অনেক কিউট মানে কি?"

"এত কিউট যে পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, সাগর শুকিয়ে যাবে।"

মিদোরি তার মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। "তোমার কথা বলার মধ্যে আজব একটা ভঙ্গি আছে।"

"তোমার কথা শুনে আমার মন দূর্বল হয়ে যাচ্ছে, টের পাচ্ছি," হাসতে হাসতে বললাম আমি।

"আরো সুন্দর কিছু বলো।"

"মিদোরি আমি তোমাকে সত্যি পছন্দ করি। অনেক পছন্দ করি।"

"অনেক মানে কতটুকু?"

"বসন্ত ভাল্লুকের মত," আমি বললাম।

"বসন্ত ভাল্লুক?" মিদোরি আবার তাকাল, "এর মানে কি? বসন্ত ভাল্লুক কি জিনিস?"

"ধরো বসন্তকালে তুমি একা একা মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছো। তখন দেখতে পেলে একটা সুন্দর ছোট্ট ভাল্লুকের বাচ্চা, গায়ে ভেলভেটের মত

তুলতুলে লোম, চকচকে ছোট্ট চোখ, টুকটুক করে হেঁটে যাচ্ছে। তোমাকে দেখে বলল 'হাই ছোট্ট মেয়ে, আমার সাথে ডিগবাজি খেলবে?' তো তারপর তুমি আর ভাল্লুকের বাচ্চা সারাদিন একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে ঘাসে ঢাকা নরম পাহাড়ে ডিগবাজি খেলে। মজার ব্যাপার না?"

"হ্যাঁ, খুবই মজার।"

"আমি তোমাকে ততটুকু পছন্দ করি।"

"আমার শোনা সবচেয়ে সুন্দর কথা ছিল এটা," মিদোরি আমার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল। "তুমি যদি আমাকে এরকম পছন্দ করো, তাহলে আমি যা বলি তা করবে আমার জন্য? রাগ করবে না তো?"

"না, অবশ্যই রাগ করবো না।"

"আর তুমি সব সময় আমার দেখাশোনা করবে?"

"অবশ্যই করবো," আমি ওর ছোট, ছেলেদের মত চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম। "চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"কিন্তু আমার যে ভয় লাগে," বলল সে।

আমি ওকে ধরে থাকলাম, কিছুক্ষনের মধ্যে ওর কাঁধ ওঠা নামা করতে লাগল। ওর ঘুমের মধ্যে নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। পিছলিয়ে বিছানা থেকে নেমে রান্নাঘরে গিয়ে বিয়ার খেলাম আমি। ঘুম আসছিল না, ভাবলাম একটা বই পড়া যাক, কিন্তু পড়ার মত কিছু পেলাম না। মিদোরির রুমে গিয়ে দেখবো কিনা ভাবলাম, তারপর ভাবলাম ওর ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

বিয়ার খেতে খেতে হঠাৎ উপলব্ধি করলাম, আরে এটাই তো একটা বইয়ের দোকান। সিঁড়ি বেয়ে নিচে গেলাম, আলো জ্বালিয়ে পেপারব্যাক বইয়ের শেলফে দেখতে লাগলাম। আকর্ষণীয় কিছু পেলাম না। অনেক বইই আমার আগে পড়া। অবশ্য স্রেফ পড়ার জন্য কিছু পড়া দরকার। আমি হ্যারম্যান হেসের *বিনিথ দ্য হুইল*-এর একটা রঙচটা বই বেছে নিলাম। সম্ভবত অনেকদিন থেকে বিক্রির অপেক্ষায় ঝুলছে দোকানে। ক্যাশ রেজিস্টারে দাম রাখলাম। কোবায়েসি বুকস্টোরের ভার কমানোর জন্য আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

রান্নাঘরের টেবিলে বসে বিয়ার খেতে খেতে *বিনিথ দ্য হুইল* পড়লাম। মিড স্কুলে ঢোকার পর আমি বইটা প্রথম পড়েছিলাম। আর এখন, আট বছর পর একই বই পড়ছি একজন মেয়ের রান্না ঘরে বসে, তার মৃত বাবার ছোট পাজামা পরে। কী আজব। এসব আজব ব্যাপার না ঘটলে হয়ত আমি কখনো *বিনিথ দ্য হুইল* আবার পড়তে বসতাম না।

বইয়ের কাহিনী পুরনো, কিন্তু বইটা খারাপ না। গভীর রাতে আমি বন্ধ

বইয়ের দোকানে বসে আস্তে ধীরে পড়ে চললাম, এক লাইনের পর আরেক লাইন করে। রান্নাঘরের শেলফে একটা ধুলো পড়া ব্র্যান্ডির বোতল রাখা ছিল। একটা কফি কাপে অল্প ঢেলে চুমুক দিলাম। ভেতরটা উষ্ণ হয়ে উঠলেও ঘুম আসল না।

তিনটা বাজার একটু আগে মিদোরির রুমে উঁকি দিলাম। সে গভীর ঘুমে মগ্ন। নিশ্চয়ই অনেক ক্লান্ত ছিল। কয়েক ব্লক দূরের দোকানের থেকে আসা আলো জানালায় পড়ে মনে হচ্ছিল চাঁদের আলোর মত। মিদোরি আলোর দিকে পেছন ফিরে শুয়েছিল। এমনভাবে শুয়েছিল মনে হচ্ছিল বরফে জমে গেছে। কান কাছাকাছি নিতেই আমি ওর শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পেলাম। সে ঠিক তার বাবার মত করেই ঘুমাচ্ছে।

ঘোরাঘুরির সঙ্গি সুটকেসটা ওর বিছানার কাছে রাখা। সাদা কোটটা চেয়ারের পেছনে ঝুলানো। ওর ডেস্ক সুন্দর করে গুছানো। ডেস্কের সামনের দেয়ালে একটা স্নুপি ক্যালেন্ডার টাঙানো। পর্দা সরিয়ে আমি বাইরে তাকালাম, চারপাশ একদম সুনসান, শুধু দোকানগুলো দাঁড়িয়ে আছে। সব দোকান বন্ধ, শাটার নামানো, লিকারের স্টোরের সামনে রাখা ভেন্ডিং মেশিনগুলো মনে হচ্ছে অপেক্ষা করছে ভোরের জন্য। দূর থেকে মাঝে মাঝে ট্রাকের চাকার শব্দ ভেসে আসছিল। রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে আরেকটু ব্র্যান্ডি খেয়ে *বিনিথ দ্য হুইল*-এ মন দিলাম।

বই যখন শেষ হল তখন আকাশ পরিস্কার হওয়া শুরু করেছে। আমি ইনস্ট্যান্ট কফি বানিয়ে টেবিলে রাখা নোট পেপার আর বলপয়েন্ট কলম দিয়ে মিদোরির জন্য চিরকুট লিখলাম 'আমি তোমার ব্র্যান্ডি কিছুটা খেয়েছি, আর এক কপি *বিনিথ দ্য হুইল* কিনেছি। ভোর হয়ে গেছে, ডরমে ফিরে যাচ্ছি, গুডবাই।' তারপর একটু ইতস্তত করে লিখলাম, 'তুমি যখন ঘুমাও তোমাকে অনেক কিউট দেখায়।' এরপর কফি কাপ ধুয়ে, রান্নাঘরের আলো নিভিয়ে, নিচে গেলাম। সাবধানে শব্দ না করে শাটার তুলে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম আমি। ভয় পাচ্ছিলাম প্রতিবেশীরা আমাকে দেখে চোর-টোর সন্দেহ করে কিনা, কিন্তু ভোর সাড়ে পাঁচটায় রাস্তায় কেউই ছিল না। বাড়িগুলোর ছাদে খালি কিছু কাক ছিল। আমি মিদোরির জানালার গোলাপি পর্দার দিকে একবার ফিরে তাকালাম, রাস্তায় স্ট্রিটকার থামালাম, লাইনের শেষ পর্যন্ত গিয়ে বাকিটা হেঁটে ডরমে ফিরলাম। মাঝপথে একটা দোকান খোলা পেয়ে ভাত, মিসো সুপ, সব্জির আচার আর ডিম ভাজা দিয়ে নাস্তা করে নিলাম। ডরমের পেছনে গিয়ে নাগাসাওয়ার জানালায় টোকা দিতেই ও জানালা খুলে আমাকে ঢুকতে দিল।

"কফি চলবে?" বলল সে।

"নাহ্।"

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার রুমে গেলাম, দাঁত ব্রাশ করলাম, পোশাক বদলালাম, তারপর চাদরের নিচে গিয়ে চোখ বুজলাম। শেষ পর্যন্ত স্বপ্নহীন গভীর ঘুম এসে আমার কাছে ধরা দিল।

*

প্রতি সপ্তাহে নাওকোকে চিঠি লিখি, সে মাঝে মাঝে উত্তর দেয়। ওর কোন চিঠিই বেশি বড় হয় না। নভেম্বরের ঠাণ্ডা সকাল সন্ধ্যার কথা ওর চিঠিতে জানতে পারলাম।

'হেমন্তর শুরুর দিকে তুমি টোকিওতে ফিরে গিয়েছিলে। তাই অনেকদিন আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার ভেতর যে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে তা তোমাকে মিস করার কারনে নাকি ঋতু বদলের জন্য। রেইকো আর আমি সবসময় তোমাকে নিয়ে কথা বলি। সে আমাকে বলেছে যেন অবশ্যই ওর তরফ থেকে তোমাকে হাই বলি। সে সবসময় আমার প্রতি যত্নশীল। আমার মনে হয় না এখন আমি যে অবস্থায় আছি তা সম্ভব হত যদি না ও আমার সাথে থাকতো। আমার যখন একা লাগে তখন আমি কান্না করি। রেইকো বলে, আমি যে কাঁদতে পারছি এটা ভালো লক্ষণ। কিন্তু একাকিত্ব অনেক কষ্ট দেয়। রাতে যখন আমার একা লাগে, লোকজন অন্ধকারের ভেতর থেকে আমার সাথে কথা বলে। রাতের বেলা বাতাসে গাছ যেরকম শব্দ করে সেভাবে তারা আমার সাথে কথা বলে। কিজুকি, আমার বোন, তারাও আমার সাথে কথা বলে। তারাও একাকি, তারা কাউকে চায় কথা বলার জন্য।

'যখন একা লাগে আর অনেক কষ্ট হয় তখন আমি মাঝে মাঝে তোমার পুরনো চিঠিগুলো আবার পড়ি। বাইরের অনেক ব্যাপার এমনিতে আমাকে বিভ্রান্ত করে দেয়, কিন্তু তোমার চমৎকার বর্ণনায় বাইরের দুনিয়া আমাকে মুক্তি দেয়। অদ্ভুত লাগে! এরকম কেন লাগে আমার? আমি বার বার পড়ি, রেইকোও পড়ে। তারপর আমরা এইসব নিয়ে কথা বলি। অই মিদোরির বাবার অংশটা আমার খুব ভালো লেগেছে। তোমার চিঠির জন্য আমরা প্রতি সপ্তাহে অপেক্ষা করি। এরকম একটা জায়গায় তোমার চিঠি আমাদের কাছে বিনোদনের মত। হ্যাঁ, একদম বিনোদনের মত।

'আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করি কাজের ফাঁকে প্রতি সপ্তাহে তোমাকে

লেখার জন্য সময় বের করতে। কিন্তু খালি সাদা কাগজ দেখলে আমার বিষন্ন লাগে। এই চিঠিটা লিখতেও নিজের সাথে আমার অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। রেইকো আমাকে ধমক দিচ্ছে, কেন তোমার চিঠির উত্তর লিখছি না। আমাকে ভুল বুঝো না, তোমাকে বলার জন্য আমার কাছে হাজার হাজার গল্প জমে আছে। কিন্তু কিছু লিখতে যাওয়া আমার জন্য কঠিন। তাই চিঠি লিখতে আমার কষ্ট হয়।

'মিদোরির কথা শুনে মনে হল খুবই ইন্টারেস্টিং মেয়েমানুষ। তোমার চিঠি পড়ে আমার মনে হল সে হয়তো তোমাকে ভালোবাসে। যখন রেইকোকে বললাম এটা, সে বলল, 'অবশ্যই সে ভালোবাসে! আমিও ওয়াতানাবেকে ভালোবাসি!' আমরা প্রতিদিন মাশরুম তুলছি আর চেস্টনাট জড় করছি, আর প্রতিদিন খাচ্ছি। প্রতিদিন মানে প্রতিদিন। ভাতের সাথে চেস্টনাট, ভাতের সাথে মাতসুতাকে মাশরুম। খেতে খুবই মজা, তাই বিরক্ত হচ্ছি না। রেইকো অবশ্যই বেশি খেতে পারে না। ও খালি একটার পর একটা সিগারেট খায়। পাখি আর খরগোসগুলো ভালো আছে।

গুডবাই।'

আমার বিশতম জন্মদিনের তিনদিন পর নাওকোর থেকে একটা প্যাকেজ পেলাম। ভেতরে ওয়াইন রঙের একটা ক্রুনেক সোয়েটার আর চিঠি।

'হ্যাপি বার্থডে! আশা করি তোমার বিশতম বছর আনন্দের হবে। আমার নিজের বিশতম বছর মনে হচ্ছে আমার মতই বাজেভাবে শেষ হবে। কিন্তু আমি খুশি হবো যদি তোমারটা সুখি হয় আমারটার সাথে। সত্যি। আমি আর রেইকো এই সোয়েটারের অর্ধেকটা করে বুনেছি। একা একা নিজে করলে আগামি ভালেন্টাইন্স ডে-র আগে শেষ হত না। ভালো অর্ধেকটা রেইকোর করা, খারাপ অর্ধেকটা আমার। রেইকোর যা করে খুব ভালোভাবে করে, ওকে কাজ করতে দেখলে নিজের উপর ঘৃণা হয় আমার। আমি কোন কাজ ভালোমত পারি না।

গুডবাই, ভালো থেকো।'

প্যাকেজের সাথে রেইকোরও একটা ছোট চিঠি ছিল।

'কেমন আছো তুমি? তোমার জন্য নাওকো হয়তো সুখের পাহাড়, আমার কাছে ও স্রেফ একটা বোকা বাচ্চামেয়ে। তারপরেও তোমার জন্মদিনের আগে আমরা এই সোয়েটারটা শেষ করতে পেরেছি। সুন্দর হয়েছে কি? আমরা নিজেরা রঙ আর স্টাইল পছন্দ করেছি। হ্যাপি বার্থডে।'

অধ্যায় ১০

১৯৬৯-এর কথা ভাবলে আমার মাথায় যা আসে তা হল জলাভূমি–একটা গভীর, থকথকে জলাভূমি। প্রতিবার পা বাড়াতে গেলে যেন আমার জুতো চেপে ধরে। কাদার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। সামনে, পেছনে, সবদিকে অন্তহীন জলাভূমির অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

ইতস্তত পা ফেলতে থাকি আর সময় জোরে এগিয়ে যায়। আমার আশেপাশের মানুষ সামনে চলে যায়, আমি পেছনে পড়ে যাই। কাদার সাথে যুদ্ধ করতে থাকি। আমার চারপাশের দুনিয়া তখন বিশাল সব পরিবর্তনের সম্মুখীন। আরও অনেকের মত জন কোলট্রেনকে মৃত্যু কাছে টেনে নিয়েছে। লোকজন গলা ফাটাচ্ছে এই বলে যে সামনে বিপ্লবি পরিবর্তন আসছে–সবসময়ই ওসব সামনেই থাকতে শুনি, সামনের পথের বাঁকে। কিন্তু অদল বদল যা হল তা স্রেফ দ্বিমাত্রিক মঞ্চে। পেছনে কিছু নেই, কোন অর্থ নেই। আমি উপরে না তাকিয়ে প্রতিদিন পা টেনে টেনে হেঁটে চলি, চোখ সামনের অন্তহীন জলাভূমিতে রেখে। ডান পা ফেলি, বাম পা তুলি, আবার বাম পা ফেলি, ডান পা তুলি। কখনো বুঝতে পারি না আমার অবস্থান কোথায়, কখনো বুঝতে পারি না আমি সঠিক দিকে যাচ্ছি কিনা। শুধু জানি আমাকে এগিয়ে যেতে হবে, প্রতিবার এক পা এক পা করে।

আমার বয়স বিশ হল, হেমন্ত গড়িয়ে শীতে পড়ল, কিন্তু জীবনে বলার মত কোন পরিবর্তন আসল না। উত্তেজনাহীন একঘেয়ে জীবন। আমি ক্লাসে যাই, সপ্তাহে তিন রাত রেকর্ড স্টোরে কাজ করি, যখন তখন *দ্য গ্রেট গ্যাটসবি* পড়ি, রবিবার আসলে জামাকাপড় ধুই আর নাওকোকে চিঠি লিখি। মাঝে মধ্যে মিদোরির সাথে বাইরে খেতে যাই কিংবা মুভি দেখতে যাই, চিড়িয়াখানায় যাই। পরিকল্পনামতই ওদের কোবায়েসি বুকস্টোর বিক্রি হয়েছিল। মিদোরি আর তার বোন, একটু ভালো এলাকায় মিগাদানির কাছে দুই বেডরুমের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছিল। মিদোরি বলেছে তার বোনের বিয়ে হয়ে গেলে ওখান থেকে সরে গিয়ে নিজের বাসা নেবে। এরমধ্যে সে তাদের নতুন অ্যাপার্টমেন্টে দাওয়াত করে লাঞ্চ খাইয়েছে। সূর্যের আলো ভালোমত পাওয়া যায় সেখানে। মিদোরি মনে হল আগের কোবায়েসি বুকস্টোরের বাসার তুলনায় নতুন জায়গায় থাকতে বেশি মজা পাচ্ছে।

মাঝেমধ্যে নাগাসাওয়া প্রস্তাব দেয় আমাদের শিকারের সন্ধানে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমি প্রতিবারই কোন না কোন অজুহাত বের করে ফেলি না যাওয়ার জন্য। ঝামেলা আর বাড়াতে চাইনি। এমন না যে আমি মেয়েদের সাথে এই শোওয়ার পরিকল্পনা পছন্দ করি না। কিন্তু তা করতে হলে যে, বিশাল ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়-শহরে গিয়ে ড্রিঙ্ক করতে হবে, সঠিক ধরনের মেয়ে খুঁজতে হবে, তাদের সাথে কথা বলে পটাতে হবে, হোটেলে নিয়ে যেতে হবে-এত ঝামেলা নিতে ইচ্ছে করে না আর। নাগাসাওয়ার প্রশংসা না করে উপায় নেই, সে ধৈর্য না হারিয়ে এখনো শিকারের জন্য এত ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যায়। হতে পারে হাটসুমির কথাগুলো আমার উপর কোন প্রভাব ফেলেছিল। আমি হয়তো আরও বেশি সুখি হতে পারবো যদি নাম না জানা, বোকা মেয়েগুলোর সাথে না ঘুমিয়ে বরং নাওকোর কথা বেশি বেশি চিন্তা করি। সেই ঘাসভূমিতে নাওকোর হাতে স্পর্শ আর সেই উত্তেজনা আমার মনে এখনো স্পষ্ট।

ডিসেম্বরের শুরুতে আমি নাওকোকে চিঠি লিখে জানতে চাইলাম যদি শীতের ছুটিতে আমি ওকে দেখতে আসতে চাই কোন সমস্যা আছে কিনা? উত্তর দিল রেইকো। বলল ওরা খুব খুশি হবে যদি আমি যাই। সে ব্যাখ্যা করল নাওকোর লিখতে সমস্যা হচ্ছে তাই ওর বদলে সে উত্তর দিচ্ছে। আমি যেন এমন না মনে করি যে, নাওকো খারাপ আছে, দুশ্চিন্তার কোন কারন নেই। এই জিনিসগুলো ঢেউয়ের মত ফিরে ফিরে আসে।

ছুটি চলে আসলে আমি আমার জিনিসপত্র ন্যাপস্যাকে ভরে স্নো বুট পরলাম, তারপর বেরিয়ে পড়লাম কিয়োটোর উদ্দেশে। পাগল ডাক্তার ঠিকই বলেছিল। শীতে বরফে ঢাকা পর্বতশ্রেণি খুবই সুন্দর লাগে দেখতে। গতবারের মতই আমি দুইরাত নাওকো আর রেইকোর সাথে অ্যাপার্টমেন্টে কাটালাম, আর তিনদিন সকালে ওদের সাথে আগের মতই কাজে সাহায্য করলাম। সূর্যাস্তের পর রেইকো ওর গিটার বাজাতে বসতো, আমরা তিনজন একসাথে বসে গল্প করতাম। এবার পিকনিকে না গিয়ে আমরা ক্রস কান্ট্রি স্কিইং-এ গেলাম। বনের ভেতর দিয়ে এক ঘন্টার মত স্কিইং আমাদের ঘামিয়ে ফেলল। আমরা স্টাফ আর অন্যদেরকে বরফ সরাতেও সাহায্য করলাম। ডিনারের সময় ডাক্তার মিয়াটা হঠাৎ হাজির হত আমাদের টেবিলে আর লেকচার দিত কেন মানুষের মাঝের আঙুল অন্য আঙুলের চেয়ে লম্বা, অথচ পায়ের ক্ষেত্রে কেন উল্টো হয়। দারোয়ান ওমুরা, আবারো আমাকে টোকিওর শুকরের মাংসের কাহিনী সোনাল। রেইকোর জন্য কিছু রেকর্ড নিয়ে গিয়েছিলাম গিফট হিসেবে, সেগুলো খুবই পছন্দ করল। সেখান থেকে কিছু গান গিটারে তুলেও ফেলল সে।

নাওকো গতবারের চেয়ে এবার বেশি চুপচাপ ছিল। যখন আমরা তিনজন একসাথে হতাম, সে সোফায় বসে হাসত, কথা প্রায় বলতই না। রেইকো কথা বলে সেটা পুষিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল। "কোন চিন্তা কোরো না।" আমাকে নাওকো বলেছিল। "এরকম আগেও হয়েছে আমার, নতুন নয়। নিজে কিছু বলার চেয়ে তোমাদের দু-জনের কথা শুনতেই আমার বেশি ভালো লাগছে।"

রেইকো টুকিটাকি কিছু কাজের জন্য অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে গেল যাতে নাওকো আর আমি একসাথে 'সময়' কাটাতে পারি।

আমি ওর গলায়, কাঁধে, বুকে চুমু খেয়ে দিচ্ছিলাম, সে আগেরবারের মত তার হাত দিয়ে আমার উত্তেজনা প্রশমন করল। এরপর তাকে কোলে নিয়ে জড়িয়ে ধরে আমি বলেছিলাম, গত দুমাস কিভাবে তার স্পর্শ আমাকে সঙ্গ দিয়েছে, আর আমি কিভাবে তার কথা ভেবে মাস্টারবেট করেছি।

"তুমি কারো সাথে শুতে যাওনি?" নাওকো প্রশ্ন করল।

"একবারও না," বললাম তাকে।

"আচ্ছা, তাহলে তোমার স্মৃতিতে আমি বিশেষ কিছু যোগ করতে চাই," সে নিচে সরে গিয়ে আমার লিঙ্গতে ঠোঁট লাগাল। ঠোঁট আর জিহবার নড়াচড়ার সাথে তার লম্বা সোজা চুল আমার পেটের উপর গড়াগড়ি খেতে লাগল যতক্ষণ না আমি দ্বিতীয়বারের মত বীর্যপাত করলাম।

"তোমার কি মনে হয় তোমার স্মৃতিতে এটা থাকবে?" জানতে চাইলো সে।

"অবশ্যই," আমি বললাম, "চাইলেও কখনো ভুলতে পারবো না।"

আমি তাকে শক্ত করে ধরে তার প্যান্টির মধ্যে হাত ঢুকালাম, কিন্তু সেখানটা শুকনো হয়ে ছিল। নাওকো মাথা নাড়িয়ে আমার হাত বের করে আনল। আমরা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকলাম, কোন কথা বললাম না।

"আমি ভাবছি শিক্ষাবর্ষ শেষ হলে ডরম থেকে বের হয়ে অ্যাপার্টমেন্ট নেবো," বললাম। "ডরমে যথেষ্ট থেকেছি। আমি যদি পার্টটাইম কাজ চালিয়ে যাই তাহলে আমার খরচ সহজেই বহন করতে পারবো। আগেও বলেছিলাম তোমাকে, তুমি কি টোকিও এসে আমার সাথে থাকতে পারবে?"

"ওহ্ তরু, আমি খুব খুশি তুমি আমাকে নিয়ে এরকম কিছু চাইছো। অনেক ধন্যবাদ।"

"এমন না যে, আমি মনে করছি এই জায়গাটা খারাপ," বললাম তাকে। "জায়গাটা নিরিবিলি, আশেপাশের সব কিছু সুন্দর, আর রেইকো একজন চমৎকার মানুষ। কিন্তু এ জায়গা বেশিদিন থাকার জন্য নয়। আমার মনে হয় এখানে যত বেশি থাকবে কারো ছেড়ে যেতে তত বেশি সমস্যা হবে।"

উত্তর দেয়ার বদলে নাওকো বাইরে তাকিয়ে থাকল। জানালার বাইরে বরফ ছাড়া কিছুই ছিল না দেখার মত। বরফের মত মেঘগুলো আকাশ থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় ঝুলছে, মেঘ আর মাটির বরফের মধ্যে পার্থক্য খুব কমই ছিল।

"সমস্যা নেই, সময় নাও, ভেবে দেখো," আমি বললাম, "যাহোক না কেন, আমি মার্চের শেষে বাসা নেবো। তোমার যখন ইচ্ছে আমার কাছে আসতে পারো।"

নাওকো মাথা ঝাঁকাল। আমি তাকে সাবধানে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলাম যেন কোন কাঁচের সৃষ্টিকর্ম ধরেছি। সে তার হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। আমি নগ্ন ছিলাম, আর তার পরনে ছিলে শুধুই একটা সাদা প্যানটি। তার শরীর এত সুন্দর ছিল যে আমি সারাদিন তাকিয়ে থাকতে পারতাম।

"আমার কেন কোন যৌন উত্তেজনা হয় না?" নাওকো ফিসফিস করে বলল, "শুধু ওই একবারই হয়েছিল। আমার বিশতম জন্মদিনে, এপ্রিলে। যে রাতে তুমি আমাকে তোমার বুকে টেনে নিয়েছিলে। বলো তো কি সমস্যা আমার?"

"আমি নিশ্চিত, এটা স্রেফ একটা মানসিক সমস্যা। সময় দাও, ঠিক হয়ে যাবে, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই।"

"আমার সব সমস্যাই তো মানসিক সমস্যা," নাওকো বলল। "যদি আমি আর কখনো সুস্থ না হই? যদি আমি জীবনে আর কখনো সেক্স না করতে পারি? তুমি কি তখনও আমাকে একইভাবে ভালোবাসবে? আমার হাত আর ঠোঁট কি তোমার জন্য যথেষ্ট? নাকি তুমি অন্য মেয়েদের সাথে শুতে যাবে?"

"আমি সবসময় আশাবাদি," বললাম তাকে।

নাওকো বিছানায় বসে তার টিশার্ট পরল, এর উপর ফ্লানেলের শার্ট, তারপর জিন্স। আমিও আমার জামাকাপড় পরলাম।

"আমি এ নিয়ে চিন্তা করবো," নাওকো বলল। "আর তুমিও চিন্তা করো।"

"ঠিক আছে, আর ঠোঁটের কথা বললে, তুমি যা করলে তা এক কথায় আসাধারন।"

নাওকো একটু আরক্তিম হয়ে হাসল, "কিজুকিও এমন বলতো।"

"ওর আমার পছন্দ আর মতামত প্রায় একই রকম ছিল," হেসে বললাম আমি।

তারপর আমরা রান্নাঘরের টেবিলে বসে কফি খেতে খেতে পুরনো দিন নিয়ে স্মৃতিচারণ করলাম। সে কিজুকিকে নিয়ে অনেক কথা বলছিল। সাবধানে শব্দ বেছে বেছে থেমে থেমে বলছিল। বাইরে এই তুষারপাত হচ্ছে, এই বন্ধ, আবার এই শুরু। আমি যে তিনদিন ওখানে ছিলাম, আকাশ একবারও পরিস্কার ছিল না। "আমার মনে হয় আমি আবার মার্চে এখানে আসবো।" যাওয়ার আগে

বললাম। আর কোট পরা অবস্থায় ওকে শেষ একবার জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমু খেলাম। সে আমাকে বলল, "গুডবাই।"

*

১৯৭০। শুনতে একদম নতুন লাগে–নতুন বছর এসের আমার টিনএজের সমাপ্তি টেনে দিল। আমি এখন নতুন জলাভূমিতে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি। ফাইনাল পরীক্ষা ছিল সামনে, মোটামুটি সহজেই পারো করে গিয়েছি। কারো যদি তেমন কোন কাজ না থাকে আর সব সময় ক্লাসে থাকার পেছনে ব্যয় করে, তাহলে ফাইনালে পাশ করতে তেমন কোন পড়াশোনা লাগে না।

ডরমে কিছু ঝামেলা হয়েছিল অবশ্য। রাজনীতির সাথে জড়িত কিছু ছাত্র তাদের রুমে হেলমেট আর লোহার পাইপ লুকিয়ে রেখেছিল। ডরমের প্রধানের ছানা-পোনা কয়েকজনের সাথে তাদের ঝামেলা হয়েছিল, যার ফলাফল হল দু-জন আহত আর ছয় জন ডরম থেকে বহিষ্কার। এই গ্যাঞ্জামের রেশ অনেকদিন পর্যন্ত ছিল, প্রায় প্রতিদিনই ছোটখাট মারামারি হত। ডরমের পরিবেশ বেশ ঝামেলাপূর্ণ ছিল, ছেলেপেলের স্নায়ু সহ্যের সীমা পার করার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। আমি নিজেই এক মাস্তানের কাছে মার খেতে যাচ্ছিলাম যদি না নাগাসাওয়া মাঝখানে ঢুকে পরিস্থিতি সামাল দিত। যাহোক না কেন, আমার তখন এমনিতেও এই জাহান্নাম ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছিল।

পরীক্ষার ঝামেলা শেষ হলে আমি অ্যাপার্টমেন্ট খোঁজা শুরু করে দিয়েছিলাম। প্রায় সপ্তাহখানেক খোঁজার পর কিচিজোজির শহরতলীতে একটা যুতসই জায়গা খুঁজে পেলাম। জায়গাটা যাওয়া আসার জন্য সুবিধার নয়, কিন্তু এটা একটা পুরো আলাদা বাড়ি। প্রথমে হয়ত বাগান করার জিনিসপত্র রাখার ঘর ছিল। একটা বড় জায়গার কোনায় দাঁড়িয়ে আছে ঘরটা, বেশ বড় কিন্তু আগাছাপুরন একটা বাগান দিয়ে মূল বাড়ি থেকে আলাদা করা। বাড়িওয়ালা মূল দরজা ব্যবহার করবে, আমি ব্যবহার করবো পেছনের দরজা। যার ফলে প্রাইভেসি বজায় রাখা সহজ হবে। ঘরটায় ছিল বেশ বড় সাইজের একটা রুম, একটা ছোট রান্নাঘর আর বাথরুম, একটা কল্পনাতিত রকমের বড় স্টোরেজ ক্লজিট। ঘরের সাথে বাগানের দিকে মুখ করা বারান্দা। চমৎকার এক বয়স্ক দম্পতি ঘরটা বাজার দরের চেয়ে বেশ কমে আমাকে ভাড়া দিয়েছে এই শর্তে যে পরের বছর তাদের নাতি টোকিওতে এলে উঠে যেতে হবে। তারা আমাকে আশ্বাস দিয়েছে আমি যেভাবে খুশি থাকতে পারি, তাদের কোন চাহিদা নেই।

জিনিসপত্র সরাতে নাগাসাওয়া আমাকে সাহায্য করল। সে কোত্থেকে একটা

হালকা ট্রাক জোগাড় করল জিনিসপত্র নেয়ার জন্য। যেমন কথা দিয়েছিল, সে আমাকে তার ফ্রিজ, টিভি, বিশাল সাইজের থার্মোফ্লাস্কটা সাথে দিয়ে দিল। ওর হয়ত আর দরকার নেই, কিন্তু আমার প্রয়োজনের জন্য ওগুলো একদম ঠিক আছে। ও নিজেও দুদিন পর মিতা পাড়ায় একটা অ্যাপার্টমেন্টে উঠে যাচ্ছিল।

"আমার মনে হয় অনেকদিন আমাদের আর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই," সে যাওয়ার আগে আমাকে বলল। "ভালো থেকো, আমি নিশ্চিত কয়েক বছর পরে কোন না কোন আজব জায়গায় আমাদের আবার দেখা হবে।"

"আমি এখনি সেদিনের জন্য অপেক্ষা করছি," বললাম তাকে।

"আর আমরা যেবার মেয়ে অদল বদল করেছিলাম? বাজে দেখতে মেয়েটা আসলে ভালো ছিল অন্যটার তুলনায়।"

"একদম ঠিক," আমি হাসতে হাসতে বললাম, "যাহোক, হাটসুমির দিকে খেয়াল রেখো। ওর মত ভালো কাউকে পাওয়া সহজ নয়। আর ওকে দেখে যতটা মনে হয় ও আসলে ভেতরে ততটা শক্ত নয়।"

"আমি জানি," মাথা ঝাঁকাল সে, "তাই আমি আশা করছিলাম আমি যখন চলে যাবো তুমি ওর দায়িত্ব নেবে। তোমরা দু-জন একসাথে ভালো জোড়া হবে।"

"ফাজলামি কোরো না!" বললাম আমি।

"আচ্ছা, আর ফাজলামি করবো না," নাগাসাওয়া বলল। "যাহোক, সুখি হও। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তোমার সামনে খারাপি আছে। অবশ্য তুমি যেরকম ঘাড় তেড়া কুকুর, আমি নিশ্চিত, তুমি সামাল দিতে পারবে। কিছু না মনে করলে একটা পরামর্শ দেই?"

"নিশ্চয়ই, কি পরামর্শ?"

"নিজের জন্য কখনো দুঃখবোধ করবে না, সেটা শুধু ভোদাইরা করে।"

"ঠিক আছে, মাথায় থাকলো," বললাম তাকে। আমরা হাত মিলিয়ে আলাদা আলাদা রাস্তা ধরলাম। সে তার নতুন পৃথিবীতে, আমি আমার জলাভূমিতে।

বাসা বদলানোর তিনদিন পর আমি নাওকোকে চিঠি লিখলাম। নতুন বাসার বর্ণনা দিলাম তাকে। আরও জানালাম ডরমের গাধাগুলোর থেকে সরে এসে কতটা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। এখন নতুনভাবে আমার জীবন শুরু করতে পারবো।

"আমার জানালা দিয়ে একটা বিশাল উঠোনের মত জায়গা দেখা যায় যেখানে আশেপাশের সব বিড়াল ঘুরতে আসে। বিড়ালের বিশাল একটা দল। তারা একসাথে সূর্যের আলোতে শুয়ে তাপ পোহায়। আমার মনে হয় না তারা আমাকে এখানে থাকতে দেখে খুশি হয়েছে, কিন্তু আমি যখন পুরনো এক টুকরো

পনির বের করে তাদের সামনে রাখলাম, কয়েকটা বিড়াল উঠে এসে শুঁকে দেখল। মনে হয় তাদের সাথে আমার শিগগিরি বন্ধুত্ব হয়ে যেতে পারে। ওদের মধ্যে একটা ডোরাকাটা ছেলে বিড়াল আছে যার অর্ধেক কান নেই। খুবই আজব ব্যাপার যে বিড়ালটার সাথে আমাদের ডরম প্রধানের চেহারার অনেক মিল। ওকে দেখলেই মনে হয় যে কোন দিন সকালে পতাকা ওড়াতে শুরু করবে।

আমার স্কুল এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। কিন্তু একবার মেজরের ক্লাস শুরু হলে সকালে কোন ক্লাস থাকবে না আমার সুতরাং সমস্যা হবে না। বরং ট্রেনে বসে বই পড়া যাবে, আরো ভালো হল। এখন আমাকে যা করতে হবে তাহল এখানে কোন একটা সহজ ধরনের কাজ খুঁজে বের করতে হবে যেটা আমি সপ্তাহে তিন বা চারদিন করতে পারবো। তাহলে আবার কর্মব্যস্ত জীবনে ফিরে যেতে পারবো।

আমি তোমাকে কোন তাড়া দিতে চাই না, কিন্তু আমার মনে হয় নতুন কিছু শুরু করার জন্য এপ্রিল খুব ভালো সময়। আমাদের একসাথে বসবাস শুরু করার জন্য অই সময়টাই সবচেয়ে ভালো হবে। তুমিও পড়াশোনা শুরু করতে পারো যদি ভালো মনে করো। আর আমাদের যদি একসাথে থাকতে সমস্যা মনে হয় কোন কারনে, তাহলে পারার মধ্যে তোমার জন্য কোন অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেয়া যাবে। আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সবসময় একে অপরের কাছাকাছি থাকা। বসন্তই হতে হবে এমন কোন কথা নেই, তুমি যদি মনে করো গ্রীষ্মে হলে ভালো হয়, আমার জন্যও তাহলে গ্রীষ্ম ভালো। আমাকে জানিয়ো তোমার কি মনে হয়, ঠিক আছে?

আমি ভাবছি একটু বেশি সময় কাজের পেছনে খরচ করবো। বাসা বদলানোর খরচ সামলানোর জন্য। একা থাকতে হলে আমার জিনিসপত্র কিনতে বেশ খরচ করতে হবে : থালাবাসন, হাড়ি-পাতিল এসবের জন্য আরকি। আমি মার্চে ফ্রি আছি আর অবশ্যই তোমাকে তখন দেখতে আসবো আবার। আমাকে জানিও কোন তারিখে আসলে ভালো হয় তোমার জন্য। আমি তখন কিয়োটো ট্রিপের প্ল্যান করবো। তোমাকে দেখার আর চিঠির উত্তর পাওয়ার অপেক্ষায় থাকলাম।"

এরপরের কয়েকদিন আমি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকলাম। কিচিজোজির বাজার থেকে সব কিনলাম বাসায় নিজের জন্য রান্না শুরু করলাম। কাছের এক কাঠের দোকান থেকে তক্তা কিনে এনে নিজে নিজে একটা ডেস্কও বানালাম। ডেস্কে বসে পড়াশুনা করি, খাওয়া দাওয়া করি। কিছু সেলফও বানালাম মশলা রাখার জন্য। একটা সাদা বিড়াল আমাকে বেশ পছন্দ করে

ফেলল, বয়স সম্ভবত ছয় মাস হবে। আমার ঘরে এসে খাওয়া-দাওয়া করতে লাগল। আমি ওর নাম দিলাম সিগাল।

ঘর মোটামুটি গোছানো হয়ে গেলে শহরে গিয়ে এক রঙমিস্ত্রির অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে অস্থায়ি চাকরি নিলাম। কাজ করলাম দুই সপ্তাহের মত। টাকা-পয়সা ভালোই দিল, কিন্তু কাজটা আমাকে মেরে ফেলল প্রায়। রঙের গন্ধে মাথা ঘোরাতো। প্রতিদিন কাজের পর রাতের খাবার খেতাম সস্তা কোন হোটেলে গিয়ে। বিয়ার খেয়ে খাবার গলা দিয়ে নামাতাম। বাসায় গিয়ে বিড়ালের সাথে খেলতাম, তারপর মরার মত ঘুমাতাম। ততদিন পর্যন্ত নাওকোর থেকে কোন উত্তর এল না।

একদিন রঙে মাখামাখি অবস্থায় হঠাৎ মিদোরির কথা মাথায় আসল। প্রায় তিন সপ্তাহ তার সাথে যোগাযোগ নেই। আমি তাকে জানাতে ভুলে গিয়েছি যে, বাসা বদল করেছি। আমি খালি একবার তাকে বলেছিলাম বাসা নেয়ার কথা ভাবছি আর সে বলেছিল, "তাই নাকি?।" এরপর আর তার সাথে কথা হয়নি।

ফোন বুথে ঢুকে মিদোরির অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করলাম। এক মহিলা ধরলো, সম্ভবত ওর বোন। আমার নাম বললাম, সে বলল, "এক মিনিট," কিন্তু মিদোরি ফোন ধরল না।

তারপর ওর বোন বা যেই হোক, সে আবার ফোন ধরে বলল, "মিদোরি বলেছে সে তোমার উপর রেগে আছে, কথা বলতে চায় না। তুমি নাকি বাসা বদল করেছো আর ওকে কিছু জানাওনি? কোথায় উধাও হয়ে গেছো আর ওকে বলোনি কোথায় যাচ্ছো? ভালো করেছো, এখন ও সাজ্ঘাতিক রেগে আছে। ও একবার রেগে গেলে শেষ। ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মত হয়ে যায়।"

"তুমি কি ওকে ফোনটা দেবে একবার? আমি ওকে বুঝিয়ে বলতাম।"

"সে বলছে সে তোমার অজুহাত শুনতে চায় না।"

"তাহলে তোমাকে বলি? তোমার জন্য ঝামেলা বাড়াতে চাই না, কিন্তু তুমি শুনে ওকে বলতে পারবে কি হয়েছে?"

"আমি পারবো না! তোমাকেই একাজ করতে হবে। কি ধরনের পুরুষ তুমি? তোমার দায়িত্ব এটা, তুমি নিজে গিয়ে ওকে বোঝাও। ভুল কোরো না আবার।"

আমি ওকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিলাম। মিদোরির রেগে থাকার যথেষ্ট কারন আছে, আমি ওকে দোষ দিতে পারি না। বাসা বদল, গোছগাছ, আর অতিরিক্ত টাকার জন্য কাজ করতে গিয়ে ওর কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছি। এমনকি নাওকোর কথাও আমার মাথায় আসেনি। আমার জন্য এরকম নতুন কিছু নয়। আমি কোন কাজে জড়িয়ে গেলে বাকি সব কিছু ভুলে যাই।

কিন্তু আমি যখন চিন্তা করলাম মিদোরির জায়গায় আমার সাথে এমন হলে কি হত, ও যদি বাসা বদলিয়ে না জানাত আর তিন সপ্তাহ খোঁজ থাকতো না তখন আমি নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট পেতাম। এটা ঠিক যে আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা নই, কিন্তু আমরা যেভাবে একজন আরেকজনের কাছে মন খুলে কথা বলি তা অনেক প্রেমিক-প্রেমিকাও করে না। এসব ভেবে অনেক অনুতপ্ত হলাম। যে আমাকে অনেক পছন্দ করে তার মনে এরকম ক্ষত সৃষ্টি করাটা বিশাল রকমের অন্যায়। অনিচ্ছাকৃত হলেও।

কাজ থেকে ফিরেই নতুন ডেস্কে বসে মিদোরিকে চিঠি লিখলাম। তাকে খোলাখুলি লিখলাম আমার কেমন লাগছে। কোন অজুহাত না দিয়ে আমার উদাসিনতার জন্য সোজা ক্ষমা চাইলাম। 'আমি তোমাকে মিস করছি,' লিখলাম আমি। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার সাথে দেখা করতে চাই। আমার নতুন বাড়ি তোমাকে দেখাতে চাই। প্লিজ আমাকে লিখে জানাও।'

চিঠিটা স্পেশাল ডেলিভারিতে পাঠিয়ে দিলাম।

কোন উত্তর আসল না।

এভাবেই এক অদ্ভুত বসন্তকালের শুরু হল। আমি পুরো ছুটি পারো করলাম চিঠির অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে। কোন ট্রিপে যাইনি, বাবা-মাকে দেখতে বাড়ি যাইনি। কোন পার্টটাইম চাকরি নেইনি কারন যদি নাওকো কোন তারিখ জানিয়ে চিঠি পাঠায়, চাকরি ছেড়ে যাওয়া সমস্যা হবে তখন। বিকেলগুলো আমি কিচিজোজির বাজার এলাকায় ঘুরে পারো করলাম। এক টিকিটে দুই সিনেমা দেখলাম কিংবা জ্যাজ কফি শপে বসে বই পড়লাম। প্রায় কারো সাথে দেখা করলাম না, কথা বললাম না। আর প্রতি সপ্তাহে নাওকোকে চিঠি লিখে গেলাম। চিঠিতে বললাম না, আমি তার উত্তরের অপেক্ষা করছি। ওকে কোন চাপ দিতে চাইনি। ওকে আমার রঙের কাজের কথা বললাম, সিগালের কথা বললাম, বাগানের পিচ ফলের কথা বললাম, তফু বিক্রি করা এক চমৎকার বুড়ি মহিলার কথা বললাম, এলাকার হোটেলের নোংরা বুড়ির কথা বললাম, নিজের রান্নার কথা বললাম। কিন্তু তারপরেও সে কোন চিঠি পাঠাল না।

বই পড়তে পড়তে কিংবা গান শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেলে আমি বাগানে কিছু সময় কাজ করতাম। বাড়িওয়ালার থেকে জিনিসপত্র এনে আগাছা পরিস্কার করলাম, ঝোপগুলো ছেঁটে দিলাম। উঠোনটা সুন্দর করতে তেমন একটা কষ্ট করতে হল না। একদিন বাড়িওয়ালা আমাকে চা খাওয়ার দাওয়াত দিল, আমরা মূল বাড়ির বারান্দায় বসে চা আর রাইস ক্রাকার খেতে খেতে গল্প করলাম। অবসর গ্রহনের পর তিনি একটা বীমা কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছিলেন, সেটাও পরে ছেড়ে দিয়েছেন বলে জানালেন। এত বছর কাজ করে এখন একটু

আরাম করতে চান। এই বাড়ি আর জমি তার পরিবারের কাছে আছে অনেক বছর ধরে। তার ছেলেমেয়েরা সবাই বড় আর স্বাবলম্বি এখন। কোন কাজ না করে তিনি এখন আরামে শেষ জীবন কাটাতে পারেন। তাই তিনি আর তার স্ত্রী এখন একসাথে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

"দারুন তো," বললাম আমি।

"আসলে দারুন না," সে বলল। "ঘোরাঘুরি করতে মজা লাগে না। এর চেয়ে কাজ করা ভালো।"

ভালো কোন মালি পাওয়া যাচ্ছিল না বলে তিনি বাগানটাকে ছেড়ে দিয়েছেন বন-জঙ্গল হওয়ার জন্য। নিজেও কাজ করতে পারছিলেন না কারন তার আবার অ্যালার্জি আছে। ঘাস কাটলে হাঁচি শুরু হয়।

চা খাওয়া শেষ হলে তিনি আমাকে নিয়ে গিয়ে ছোট একটা ছাউনির মত গুদাম ঘর দেখালেন আর বললেন ভেতরের জিনিসপত্রগুলো চাইলে আমি আমার ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারি। আর বাগানের জন্য ধন্যবাদ জানালেন। "আমাদের এসব জিনিসের আর দরকার হয় না, তাই যা খুশি নিতে পারো," বললেন তিনি।

গুদাম ঘরের ভেতর হাজার ধরনের জিনিসপত্র ভর্তি–একটা পুরনো কাঠের তৈরি বাথটাব, বাচ্চাদের সুইমিং পুল, বেজবল ব্যাট, পুরনো একটা মোটর সাইকেল, ছোট সাইজের ডাইনিং টেবিল আর দুটো চেয়ার, একটা আয়না আর একটা পুরনো গিটার। "আপনার অসুবিধা না হলে আমি কিছু জিনিস ধার নিতে চাই," বললাম তাকে।

"যা খুশি নাও," তিনি আবারো বললেন।

আমি একদিন পুরো ব্যয় করলাম মোটর সাইকেলের পেছনে। মরিচা তুলে বেয়ারিঙে তেল দিলাম, চাকায় বাতাস ভরে গিয়ারও ঠিক করলাম, নতুন গিয়ার লাগালাম রিপেয়ার শপে নিয়ে। কাজ যখন শেষ হল তখন মোটর সাইকেলের চেহারা পুরোপুরি বদলে গেল। টেবিলটার উপর জমা পুরু ধুলোর স্তর পরিস্কার করে নতুন করে বার্নিশ দিলাম। গিটারের তার বদলালাম আর এক জায়গায় খুলে গেছিল সেখানে নতুন করে আঠা দিয়ে আবার জোড়া দিলাম। টিউনিংয়ের স্ক্রুগুলো থেকে মরিচা তুলে নতুন করে টিউন করলাম ওটা। তারপরেও তেমন উন্নতি হল না কিন্তু টিউনে রাখা গেল। খেয়াল হল, হাই-স্কুলের পরে আমি আর গিটার হাতে নেইনি। বারান্দায় বসে 'দ্য ড্রিফটারস'-এর *আপ অন দ্য রুফ* বাজানোর চেষ্টা করলাম আমার মত করে, অবাক হয়ে গেলাম যে, কর্ডগুলো প্রায় সবই মনে আছে দেখে।

এরপর বাতিল কাঠের তক্তা দিয়ে একটা চিঠির বাক্স বানালাম। ওটাকে লাল রঙ করে নিজের নাম লিখে লাগিয়ে দিলাম দরজার বাইরে। এপ্রিলে তিন তারিখ পর্যন্ত একটা চিঠি আসল, ডরম থেকে পাঠানো হয়েছে। হাই-স্কুলের পুণর্মিলনি এমন অনুষ্ঠান যেখানে আর জীবনে যেতে চাই না। ওই ক্লাসেই কিজুকির সাথে ছিলাম আমি। চিঠিটা ছুঁড়ে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিলাম।

এপ্রিলের চার তারিখে চিঠির বাক্সে আরেকটা চিঠি পেলাম, খামের পেছনে 'রেইকো ইসিডা' লেখা। আমি কাঁচি দিয়ে সাবধানে সুন্দর করে খাম কেটে চিঠিটা বের করলাম আর বারান্দায় বসে পড়তে লাগলাম। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল ভালো কোন সংবাদ হবে না, আর তাই হল।

'আমাকে ওর জায়গায় উত্তর দিতে বলা হয়েছে তোমাকে। কিন্তু যতবার আমি ওকে বলেছি তোমাকে উত্তরের অপেক্ষায় রাখাটা ভুল, ততবারই সে আমাকে বলেছে এটা তার খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার, সে নিজে তোমাকে চিঠি লিখে জানাবে। তাই আমি আগে চিঠি লিখিনি। আমি দুঃখিত, আশা করি আমাকে ক্ষমা করবে।

'আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই খুব কঠিন একটা মাস পারো করেছো উত্তরের অপেক্ষা করে। কিন্তু বিশ্বাস করো, নাওকোর জন্যও মাসটা কঠিন ছিল। আশা করি তুমি বুঝতে পারবে নাওকোকে কিসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, ওর অবস্থা এখন ভালো নয়। তোমাকে সত্যি কথাটাই বলছি। সে তার মত করে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে উঠে দাঁড়ানোর কিন্তু এখন পর্যন্ত ফলাফল সুবিধার নয়।

'পেছনে তাকালে আমি এখন বুঝতে পারি ওর সমস্যার প্রথম লক্ষণ ছিল চিঠি লেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা। এটা হয়েছে নভেম্বরের শেষে কিংবা ডিসেম্বরের প্রথম দিকে। তারপর সে দৈব কথা শোনা শুরু করল। যখনই সে চিঠি লিখতে যায়, কারা নাকি তার সাথে কথা বলতে থাকে, যে কারনে সে লিখতে পারে না। তারা তার শব্দ বাছাইয়ে বাঁধা দেয়। তোমার দ্বিতীয়বার আসা পর্যন্ত ব্যাপারটা ততটা খারাপ ছিল না, তাই আমিও তেমন গুরুত্ব দেইনি। এখানে আমাদের সবারই কমবেশি এধরনের লক্ষণ বৃত্তের মত ঘুরে ঘুরে বার বার আসে। যাহোক, তুমি যাওয়ার পর ওর সমস্যা সিরিয়াস হয়ে গেল। ওর এখন সাধারণ কথাবার্তা বলতেও সমস্যা হচ্ছে। সে বলার জন্য সঠিক শব্দটা বাছাই করতে পারে না, যার ফলে বিভ্রান্তিতে পড়ে–বিভ্রান্তি এবং ভীতি। পাশাপাশি অদৃশ্য কথাবার্তা ব্যাপারটা আরো খারাপ করে তুলছে।

'আমরা বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রতিদিন সেশন করছি। নাওকো, ডাক্তার, আর আমি একসাথে বসে কথা বলি, বের করার চেষ্টা করি ওর ঠিক কোন অংশে সমস্যাটা হচ্ছে। আমি বুদ্ধি দিয়েছি, তুমি থাকলে ভালো হতে পারে। ডাক্তারও

একমত কিন্তু নাওকো চাইছে না। আমি তোমাকে তার না করার কারন বলি–'আমি চাই তার সাথে দেখা হওয়ার আগেই আমার ভেতর থেকে এসব সমস্যা বেরিয়ে যাক।' সেটা কোন সমস্যা না, আমি তাকে বলেছি, সমস্যা হল তাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করা। আমি তাকে জোর করেছি কিন্তু সে মানতে রাজি নয়।

'আমার মনে হয় আমি তোমাকে একবার বলেছি, এটা কোন বিশেষ হাসপাতাল নয়। আমাদের এখানে মেডিকেল স্পেশালিস্ট আছে তা ঠিক, আর তারা ঠিকমত চিকিৎসাও দেয়। কিন্তু ইন্টেসিভ কেয়ার অন্য জিনিস। এই জায়গার উদ্দেশ্য হল এমন পরিবেশ তৈরি করা যেখানে রোগি নিজেই নিজেকে সুস্থ করে তুলতে পারে, আর সেখানে সত্যি কথা বলতে মেডিকেল চিকিৎসা অন্তর্ভুক্ত নয়। এর মানে, যদি নাওকোর অবস্থা আরো খারাপ হয় তাহলে তারা হয়ত ওকে অন্য কোন হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হবে। যতই আমাদের কষ্ট লাগুক এটা করতে হবে আমাদের। বলাবাহুল্য সে এখানে আর ফেরত আসতে পারবে না তখন, হয়তো সে সেখানে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে যে তার আর হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজনই পড়বে না কখনো। ঘটনা যাহোক না কেন, আমরা আমাদের মত করে চেষ্টা করে যাচ্ছি, নাওকোও তার মত করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তোমার জন্য উচিত হবে তার সুস্থতা কামনা করা আর চিঠি লেখা চালিয়ে যাওয়া।'

চিঠির তারিখ দেয়া মার্চ একত্রিশ। চিঠি পড়া শেষ হলে আমি বারান্দায় বসে থাকলাম। বাগানে চোখ বুলালাম। বাগান এখন বসন্তের মত সতেজ। একটা পুরনো চেরি গাছ আছে, খুব শিগগিরি ফুল ফুঁটবে। হালকা বাতাস হচ্ছিল, দিনের আলো অদ্ভুত ঘোলা ধরনের, সবকিছু ধোঁয়াটে দেখাচ্ছিল চোখে। সিগাল আশেপাশে ঘুরাঘুরি করল, বারান্দায় রাখা কাঠে বোর্ডগুলো আঁচড়াল, তারপর আমার পাশে এসে ঘুমিয়ে পড়ল চুপচাপ।

আমি বুঝছিলাম আমার কিছু সিরিয়াস চিন্তাভাবনার প্রয়োজন, কিন্তু কিভাবে করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সত্যি বলতে চিন্তা ছাড়া আর সবকিছু করতে আমি রাজি ছিলাম। একটা সময় আসবে যখন চিন্তা না করে উপায় থাকবে না, তখন আমি বড় করে সময় নিয়ে চিন্তা করবো, কিন্তু এখন না, এখন করতে চাই না।

আমি সারাদিন পিলারে হেলান দিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে আর সিগালের গায়ে হাত বুলিয়ে কাটিয়ে দিলাম। নিজেকে পুরোপুরি শূন্য লাগছিল। বিকেল গভীর হলে সূর্যাস্ত এগিয়ে আসল, নীলচে ছায়ায় ঢেকে গেল বাগান। সিগাল

উধাও হয়ে গেলেও আমি চেরি গাছের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বসন্তের অন্ধকারে গাছটাকে মাংসের মত দেখায়। যেন চামড়া ফেঁটে বের হয়ে আসা ক্ষত। বাগান থেকে পচা মাংসের গন্ধ ভেসে আসছিল। ঠিক তখন আমার নাওকোর শরীরের কথা মনে পড়ল। আমার সামনে অন্ধকারে নাওকোর শুয়ে থাকা সুন্দর শরীর। সে শরীর থেকে অজস্র কুঁড়ি বের হচ্ছে। সবুজ রঙের কুঁড়ি। অদৃশ্য বাতাসে দুলছে। আমি ভাবলাম এরকম একটা সুন্দর শরীরকেই কেন অসুস্থ হতে হবে? কেন তারা সবাই নাওকোকে মুক্তি দিচ্ছে না?

আমি ভেতরে গিয়ে পর্দা টেনে দিলাম। কিন্তু ঘরের ভেতরেও বসন্তের গন্ধ থেকে মুক্তি নেই। মাটি থেকে ছাদ পর্যন্ত সবকিছুতে গন্ধ। কিন্তু আমার মনে যে গন্ধ এসেছে সেটা হল পচাগলা দুর্গন্ধ। পর্দার পেছন থেকে বসন্তের প্রতি আমার তীব্র ঘৃণা হতে লাগল। ঘৃণা হতে লাগল বসন্ত আমার ভেতর যা জমা করেছে তার জন্য, যে ব্যথা সৃষ্টি করেছে তার জন্য। আমি কখনো আমার জীবনে এত প্রবলভাবে কোনকিছু ঘৃণা করিনি।

পরবর্তি তিনদিন আমি যেন টানা সাগরের তল দিয়ে হাঁটলাম। লোকজন আমাকে কি বলছে আমার কানে ঢুকছিল না, আমার কথাও তারা কিছু বুঝছিল না। আমার সারা শরীর নিজের মধ্যে সিটিয়ে গিয়েছিল, আমার আর বাইরের পৃথিবীর মধ্যে সমস্যা সংযোগ যেন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। তারা আমাকে ছুঁতে পারছিল না, আমিও তাদের ছুঁতে পারছিলাম না। আমি পুরোপুরি অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। যতক্ষণ সেভাবে ছিলাম তারা কোনভাবে আমার কাছে পৌঁছুতে পারেনি।

দেয়ালে ঠেশ দিয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ক্ষুধা বোধ হলে হাতের কিছু যা পেয়েছি মুখে দিয়েছি, পানি গিলেছি, দুঃখ আমাকে শুইয়ে ফেলল। হুইস্কি গিলে হারিয়ে গিয়েছি। গোসল করিনি, শেভ করিনি। এভাবে তিনদিন পার হল।

এপ্রিলের ছয় তারিখ মিদোরির চিঠি আসল। সে আমাকে দশ তারিখে ক্লাসের রেজিস্ট্রেশনের সময় ক্যাম্পাসে তার সাথে দেখা করতে বলেছে, তারপর লাঞ্চ।

'আমি যতক্ষণ পেরেছি তোমাকে না লেখার চেষ্টা করেছি। এখন আমরা সমানে সমান। চল, দেখা করি। স্বীকার করতে হচ্ছে আমিও তোমাকে মিস করেছি।'

আমি ওর চিঠি বার বার পড়লাম, পর পর চারবার। কিন্তু তা-ও বলতে পারবো না সে কী বলতে চেয়েছে। এর মানে কি? আমার ব্রেইন ঘোলা হয়ে

ছিল। এক বাক্যের সাথে আরেক বাক্যর সংযোগ বুঝতে পারছিলাম না। ওর সাথে দেখা করা আর রেজিস্ট্রেশন করা কিভাবে সমানে সমান হয়? আমার সাথে লাঞ্চ করতে চেয়েছে কেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমার মন ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল, ভেজা মাটির ভেতর গাছের বীজের মত। কিন্তু যেভাবেই হোক আমি তা কাটিয়ে উঠলাম। আর নাগাসাওয়ার সে কথাগুলো মনে পড়লো : *নিজের জন্য কখনো দুঃখ বোধ করবে না, সেটা শুধু ভোদাইরা করে।*

"ঠিক আছে নাগাসাওয়া, মানলাম," বুঝতে পারলাম চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালাম।

কয়েক সপ্তাহে প্রথম লন্ড্রি করলাম আমি, পাবলিক গোসলখানায় গিয়ে গোসল করে শেভ করলাম। বাসাটাও পরিস্কার করলাম। খাবারের জন্য বাজার করে রান্না করলাম, ক্ষুধার্ত সিগালকে খাইয়ে বিয়ার পান করলাম। ত্রিশ মিনিট ব্যায়াম করলাম সবশেষে। শেভ করতে গিয়ে টের পেলাম মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখ বের হয়ে এসেছে। নিজেকেই চিনতে পারছিলাম না আমি আয়নায় দেখে।

পরদিন সকালে মোটরসাইকেলে করে অনেকক্ষণ ঘুরলাম আমি। বাসায় লাঞ্চের পর রেইকোর চিঠিটা আবারো পড়লাম। তারপর সিরিয়াসলি চিন্তা করলাম আমি এরপর কী করবো আমি। রেইকোর চিঠি আমাকে কঠিনভাবে আঘাত করেছে কারন বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম নাওকো সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। নাওকো আমাকে নিজেই বলেছিল, "তোমার যতটুকু মনে হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ আমার অসুস্থতা, এর শিকড় অনেক গভীরে।" আর রেইকো আমাকে সাবধানও করেছিল, কী হবে তা কেউ বলতে পারে না। তারপরেও নাওকোকে দু-বার দেখার পর আমার মনে হয়েছিল সে ঠিক হয়ে যাবে। আমি ভেবে নিয়েছিলাম তার একমাত্র সমস্যা হচ্ছে বাইরের দুনিয়ায় ফিরে আসার সাহসের অভাব, একবার যদি সে এখানে আসতে পারে তাহলে আমরা দু-জন একসাথে সব ঠিক করে ফেলতে পারবো।

রেইকোর চিঠি আমার অনুমানের উপর তৈরি স্বপ্নের প্রাসাদ ভেঙে গুড়োগুড়ো করে দিয়েছে। আবার দাঁড়াতে হলে আমাকে কিছু একটা করতে হবে। মনে হচ্ছে নাওকোর সুস্থ হতে অনেকদিন লাগতে পারে। এমনো হতে পারে যে, তার আত্মবিশ্বাস যা বাকি আছে তাও হারিয়ে ফেলতে পারে, আরো দূর্বল হয়ে পড়তে পারে সে। আমাকে এই নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। যতই শক্তিশালী আমি হই না কেন, সব সমস্যার সমাধান আমার হাতে নেই। এটুকুই আমি জানি। আমার আর কিছু করার নেই। আমি শুধু পারি নিজের মনকে শক্ত রেখে তার সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করতে।

কিজুকি, তোমার মত আমি নই। আমি বাঁচার সিদ্ধান্ত নিয়েছি–ভালোভাবে বাঁচবো। হয়তো তোমার জন্য ব্যাপারটা কঠিন ছিল। জাহান্নামে যাক সেসব, আমার জন্যও জীবন কঠিন। অনেক কঠিন। আর সবকিছুর কারন তুমি নিজে আত্মহত্যা করেছো, নাওকোকে একা রেখে গেছো। কিন্তু আমি সেটা কখনোই করবো না। আমি কখনো ওর থেকে মুখ সরিয়ে নেবো না। প্রথমত, কারন আমি ওকে ভালোবাসি, আর আমি ওর চেয়ে বেশি শক্তিশালী। আমি আরও শক্তিশালী হতেই থাকবো। আমি এখন আর টিনেজার নই, পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষ। আমার দায়িত্ববোধ রয়েছে। এখনকার আমি আর আমরা যখন একসাথে চলতাম সে সময়ের আমি এক নই। আমার বয়স এখন বিশ। আমাকে বেঁচে থাকার মূল্য দিয়ে চলতে হবে।

"ইয়াল্লা! ওয়াতানাবে, তোমার কি হয়েছে?" মিদোরি জিজ্ঞেস করল। "তোমার গায়ে তো দেখি খালি হাড্ডি আর চামড়া!"

"অতটা খারাপ অবস্থা নাকি?"

"বাজি ধরে বলতে পারি তোমার ওই বিবাহিত বান্ধবি তোমার এই অবস্থা করেছে।"

আমি হেসে মাথা নাড়লাম, "অক্টোবরের শুরু থেকে কোন মেয়ের সাথে শুইনি।"

"কী! হতেই পারে না। ছয় মাসের কথা হচ্ছে এখানে!"

"যা বললাম শুনলে তো।"

"তাহলে এভাবে ওজন হারালে কিভাবে?"

"বয়স বেড়েছে তাই," বললাম তাকে।

মিদোরি আমার কাঁধে হাত রেখে ভুরু কুঁচকে আমার চোখের দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত পর হেসে বলল, "সত্যি তাই তো! কিছু একটা অন্যরকম লাগছে। তুমি বদলে গেছো।"

"বললাম তো বয়স বেড়েছে। আমি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ এখন।"

"যেভাবে তোমার ব্রেন কাজ করে, অসাধারন," মুগ্ধ গলায় বলল সে। "চল, খেতে যাই। ক্ষুধায় মারা যাচ্ছি আমি।"

আমরা সাহিত্য ভবনের পেছনে একটা ছোট রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমি আর ও একই স্পেশাল লাঞ্চ অর্ডার করলাম।

"আচ্ছা ওয়াতানাবে, তুমি কি আমার উপর রেগে আছো?"

"কিসের জন্য?"

"সমান সমান হওয়ার জন্য তোমার ফোন ধরিনি, উত্তর দেইনি সেজন্য।

তোমার কি মনে হয় আমার এমন করা উচিত হয়নি? কারন তুমি তো ক্ষমা চেয়েছিলে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু দোষ তো আমার, আমিই শুরু করেছিলাম এটা। এভাবেই তো হওয়া উচিত।"

"আমার বোন বলে আমার এরকম করা ঠিক হয়নি। তোমাকে ক্ষমা না করাটা নাকি একদম বাচ্চাদের মত কাজ হয়েছে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু তোমার তো ভালো লেগেছে করে, তাই না? মানে, সমান সমান হতে পেরে?"

"হ্যাঁ, তা ঠিক।"

"তাহলে ঠিক আছে, সমস্যা নেই।"

"তুমি ক্ষমা করে দিচ্ছো আমাকে, তাই না?" মিদোরি বলল। "কিন্তু ওয়াতানাবে আমাকে সত্যি সত্যি বলো, তুমি আসলেই ছয় মাস সেক্স করোনি?"

"একবারও না।"

"তারমানে আমাকে যখন বিছানায় নিয়ে ঘুম পাড়িয়েছিলে তখন করতে চাচ্ছিলে।"

"হয়তো।"

"কিন্তু তুমি করোনি, নাকি করেছো?"

"দেখো, তুমি এখন আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। বেস্ট ফ্রেন্ড," আমি বললাম, "আমি তোমাকে হারাতে চাই না।"

"তুমি জানো, তুমি যদি তখন আমাকে জোর করতে আমি কিছুই করতে পারতাম না, অনেক ক্লান্ত ছিলাম।"

"কিন্তু আমারটা অনেক বড় আর শক্ত," বললাম তাকে।

মিদোরি হেসে আমার হাতের উপর হাত রাখল। "সে রাতে তার একটু আগে, আমি ঠিক করেছিলাম তোমাকে বিশ্বাস করবো। একদম একশ ভাগ বিশ্বাস। তাই আমি একদম শান্তিমত ঘুমাতে পেরেছিলাম। আমি জানতাম আমার কোন ক্ষতি হবে না, তুমি থাকলে আমি সুরক্ষিত। আমি একদম মরার মত ঘুমিয়েছি, তাই না?"

"আসলেই মরার মত ঘুমিয়েছিলে।"

লাঞ্চ খেতে খেতে আমরা একজন আরেকজনকে নিজেদের ক্লাসের রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেখালাম। দেখা গেল আমরা দু-জন দুটো একই কোর্স নিয়েছি। তারমানে ওর সাথে সপ্তাহে অন্তত দু-বার আমার দেখা হচ্ছে। মিদোরি তার বাসার অবস্থা বলল। অনেকদিন পর্যন্ত সে আর তার বোন অ্যাপার্টমেন্ট

জীবনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনি–কারন জীবন এখন অনেক সহজ, সে বলল। আগে তারা প্রতিদিন সবসময় দৌড়ের থাকত, সেবা করত অসুস্থ মানুষদের, সামলাতে হত বইয়ের দোকান, একটা থেকে আরেকটা কাজ বের হত।

"অবশেষে আমরা খাপ খাওয়াতে পারছি," সে বলল। "এভাবেই আমাদের সবসময় বসবাস করার কথা ছিল–অন্যদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার কথা ছিল না। প্রথমে আমরা অনেক নার্ভাস ছিলাম, মনে হচ্ছিল মেঝে থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে ভেসে যাচ্ছি। বাস্তব মনে হচ্ছিল না এ জীবনটাকে। যেন জীবন এরকম বাস্তব হতে পারে না কখনো। আমরা চিন্তায় ছিলাম কখন আবার ঝামেলা শুরু হয়।"

"একদল দুশ্চিন্তাকারি," আমি হেসে বললাম।

"আসলে জীবন তো এতদিন পর্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল আমাদের প্রতি," মিদোরি বলল। "যাহোক, এখন সব ঠিক। আমাদের যা যা পাওনা ছিল সব উসুল করবো এখন।"

"অবশ্যই করবে," আমি বললাম, "আচ্ছা আমাকে বলো, তোমার বোন এখন কি করছে?"

"ওর এক বন্ধু টুকটাক জিনিসপত্রের একটা দোকান দিয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে। আমার বোন সপ্তাহে তিনদিন কাজ করে সেখানে। অন্যসময় সে রান্না শেখে, বাগদত্তার সাথে ডেটে যায়, মুভি দেখতে যায়। সোজা কথা, জীবন উপভোগ করছে।"

মিদোরি তারপর আমার নতুন জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলো। আমি তাকে বাড়ির বর্ণনা দিলাম, বাগান, বিড়াল, সিগাল, আর আমার বাড়িওয়ালার।

"তুমি উপভোগ করছো নিজের জীবন?" জানতে চাইলো সে।

"বলা যায়," বললাম তাকে।

"আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা বাদ দাও," মিদোরি বলল।

"হ্যাঁ, আর এখন এমনিতেও বসন্তকাল।"

"আর তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডের বোনা একটা সুন্দর সোয়েটার পরেছো।"

একটু ধাক্কা খেলাম। চট করে আমার ওয়াইন রঙের সোয়েটারের দিকে তাকালাম। "তুমি কি করে জানলে?"

"তুমি সৎ তাই লুকাতে জানো না," মিদোরি বলল। "আমি আন্দাজে বলেছি অবশ্যই! যাহোক, আসল কথা বলো, কি সমস্যা তোমার?"

"জানি না, মনে হয় উদ্যম একটু কমে গেছে।"

"সবসময় মনে রাখবে, জীবন হল বিস্কিটের ডিব্বার মত।"

আমি কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে ওর দিকে তাকালাম। "হতে পারে হয়তো আমি স্মার্ট নই সেজন্য, কিন্তু মাঝে মাঝে আমি বুঝতে পারি না তুমি কিসের কথা বলছো।"

"তুমি নিশ্চয়ই জানো বিস্কিটের ডিব্বায় কিভাবে বিস্কিট সাজানো থাকে? কিছু বিস্কিট তোমার ভালো লাগে কিছু লাগে না। যেগুলো ভালো লাগে সেগুলো তুমি খেয়ে ফেলো আর যেগুলো ভালো লাগে না সেগুলো রেখে দাও। যখন খারাপ কিছু ঘটে আমি তখন সবসময় একথা ভাবি। 'সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।' জীবন হল বিস্কিটের ডিব্বা।"

"আমার মনে হয় তুমি এটাকে দর্শন বলতে পারো।"

"তা ঠিক কিন্তু আমি এটা শিখেছি অভিজ্ঞতা থেকে।"

আমরা যখন কফি খাচ্ছিলাম তখন দুটো মেয়ে আসল। মিদোরি মনে হল তাদেরকে স্কুল থেকে চেনে। তারা নিজেদের রেজিস্ট্রেশন কার্ডগুলো নিয়ে তুলনা করল, কয়েক হাজার বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কথা বলল। "জার্মান কোর্সে কি গ্রেড পেয়েছো?" "অমুক আর তমুক ক্যাম্পাসের গ্যাঞ্জামে আহত হয়েছে," "দারুন জুতো তো? কোত্থেকে কিনেছো?" আমি এসবের অর্ধেক শুনলাম, মনে হচ্ছিল দুনিয়ার ওপর প্রান্ত থেকে তাদের কথাগুলো ভেসে আসছিল। কফি খেতে খেতে দোকানের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। জানালার পাশে ছোট একটা গ্লাসে এনিমোন ফুল রাখা। বাইরে বসন্তকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ দৃশ্য। নতুন বছর পুরাতন হতে চলেছে : আকাশ থেকে কুয়াশা ঝুলে আছে, চেরি ফুটছে, নতুন ছাত্র-ছাত্রিরা (তাদেরকে দেখেই চেনা যায়) হাতভর্তি করে নতুন বই নিয়ে চলছে। আমি একটু হারিয়ে গেলাম, নাওকোর কথা ভাবলাম, ও এবছর স্কুলে ফিরতে পারল না।

ওই দুই মেয়ে তাদের টেবিলে ফিরে গেলে মিদোরি আর আমি আশেপাশে হাঁটতে বের হলাম। কিছু পুরনো বইয়ের দোকানে ঘুরলাম আমরা, বইটইও কিনলাম। আরেকটা কফি শপে গিয়ে আরেক কাপ কফি খেলাম, গেমস সেন্টারে পিনবল খেললাম, পার্কের বেঞ্চে বসে কথা বললাম–কিংবা বলা যায়, মিদোরি কথা বলল আর আমি হু-হ্যাঁ করে গেলাম কেবল। যখন সে বলল তার পিপাসা লেগেছে একটা ক্যান্ডি স্টোর থেকে দৌড়ে দুটো কোলা কিনে আনলাম আমি। ফিরে এসে দেখি একটা কাগজে বল পয়েন্ট কলম দিয়ে কী জানি হিজিবিজি আঁকছে সে।

"কি এটা?" জানতে চাইলাম।

"কিছু না," সে বলল।

সাড়ে তিনটা বাজলে সে বলল, "আমাকে এখন যেতে হবে, আমার বোনের সাথে জিঞ্জাতে দেখা করার কথা।"

আমরা সাবওয়ে স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে তারপর দু-জন দুদিকে চলে গেলাম। যাওয়ার আগে মিদোরি তার কাগজটা চার ভাঁজ করে আমার পকেটে ভরে দিয়ে গেল। "বাসায় গিয়ে পড়বে," বলল সে। কিন্তু আমি ট্রেনে বসেই পড়লাম।

'তুমি যখন ড্রিঙ্ক কিনতে গেছো তখন আমি এই চিঠি লিখছি। এই প্রথম কাউকে চিঠি লিখলাম যে কিনা একই বেঞ্চে আমার পাশেই বসে আছে। কিন্তু আমার মনে হল একমাত্র এভাবেই আমি তোমার মনের ভেতর ঢুকতে পারবো। কারন আমি যা বলছিলাম তার কোন কিছুই তোমার কানে ঢুকছিল না আসলে, ঠিক কিনা?

তুমি কি জানো তুমি আজকে আমার সাথে খুব খারাপ একটা কাজ করেছো? তুমি খেয়াল করোনি, আমার চুলের স্টাইল বদল হয়েছে। করেছো খেয়াল? আমি এর পেছনে অনেক সময় ব্যয় করেছি, চুল বেড়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা করেছি, শেষ পর্যন্ত গত সপ্তাহে গিয়ে একটা স্টাইলে আনতে পেরেছি যেটাকে মেয়েলি বলা যেতে পারে, অথচ তুমি তাকিয়েও দেখলে না। আমাকে দেখতে ভালোই লাগছে মনে হয়, তাই ভেবেছিলাম এতদিন পর আমাকে দেখে তুমি একটু ধাক্কা খাবে, তুমি কিছুই খেয়াল করলে না। তোমার কি মনে হয় না ব্যাপারটা খারাপ হল? আমি বাজি ধরে বলতে পারি আজকে আমি কি পরেছিলাম তুমি বলতে পারবে না। আমি একজন মেয়ে! তোমার মাথায় কি চিন্তা খেলা করে আমি জানি না, তুমি আমার দিকে একটু ভালো করে তাকাতে পারতে! স্রেফ একটু বলতে পারতে, "বাহ্, তোমার চুলের স্টাইলটা কিউট হয়েছে তো!" শুধু এটুকু বললেই যাবতিয় ভাবনায় ডুবে থাকার পরেও আমি তোমার সবকিছু মাফ করে দিতাম।

'সেজন্যই তোমাকে একটা মিথ্যা বলতে যাচ্ছি। আমি মোটেও আমার বোনের সাথে দেখা করতে জিঞ্জা যাচ্ছি না। ভেবেছিলাম তোমার বাসায় রাতে থাকবো। আমি এমন কি সাথে করে পাজামাও নিয়ে এসেছিলাম। সত্যি বলছি। আমার ব্যাগের মধ্যে পাজামা আর টুথব্রাশ আছে। কী বেকুব আমি! তুমি আমাকে তোমার নতুন বাসা দেখতে যেতেও বলোনি আর আমি থাকার জন্য চলে এসেছি। জাহান্নামে যাক সব। আর ভালো কথা, তুমি নিশ্চয়ই একা থাকতে চাইছো, সুতরাং আমি তোমাকে একা থাকতে দিচ্ছি। যা খুশি করো, বসে বসে তোমার প্রেমিকার কথা ভাবতে থাকো।

কিন্তু আমাকে ভুল বোঝো না। আমি তোমার উপর বেশি রেগে নেই। আমার স্রেফ মন খারাপ। আমার যখন সমস্যা চলছিল, তখন তুমি আমার জন্য কত কি করেছো। আর এখন তোমার খারাপ দিন যাচ্ছে অথচ আমি কিছুই করতে পারছি না। তুমি নিজের ছোট্ট পৃথিবীতে নিজেকে বন্দি করে রেখেছো, আমি দরজায় নক করতে চাইছিলাম, তুমি একবার তাকিয়ে আবার ফিরে গেছো ভেতরে।

'আচ্ছা, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ড্রিঙ্ক নিয়ে ফেরত আসছো, চিন্তায় মগ্ন হয়ে হাঁটছো তুমি। আমি আবারো ভেবেছিলাম তুমি ভুল বুঝতে পারবে, কিন্তু না, তুমি বসে বসে কোলা গিলেছো। শেষ বারের মত আশা করছিলাম তুমি খেয়াল করবে আর বলবে, "বাহ্, তোমার চুলের স্টাইল বদলিয়েছো দেখি!" তুমি যদি একবার বলতে তাহলে আমি এই চিঠি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম, বলতাম, "চল, তোমার বাসায় যাই। আমি তোমাকে রাতে রান্না করে খাওয়াবো, তারপর জড়াজড়ি করে বিছানায় যাবো দু-জনে।" কিন্তু তুমি লোহার মত শক্ত হয়ে থাকলে।

গুডবাই।

বিঃ দ্রঃ দয়া করে ক্লাসে দেখা হলে আমার সাথে কথা বলার চেষ্টা কোরো না।'

আমি কিচিজোজি নেমে স্টেশন থেকে মিদোরির অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করলাম, কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। কিছু করতে না পেরে আশেপাশে ঘোরাঘুরি করলাম পার্টটাইম চাকরির জন্য, যাতে ক্লাস শুরু হলে করতে পারি। আমি শনিবার আর রবিবার পুরো ফ্রি। আর সোম, বুধ, বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার পর কাজ করতে পারবো। আমার সময়ের সাথে মিলিয়ে কাজ পাওয়া কঠিন। আশা ছেড়ে দিয়ে বাসায় ফিরে গেলাম। ডিনারের জন্য বাজার করতে গিয়ে মিদোরিকে ফোন করলাম আবার। তার বোন বলল সে বাসায় ফেরেনি এখনো, তার কোন ধারনাও নেই কখন ফিরবে সে। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিলাম আমি।

খাওয়ার পর মিদোরিকে চিঠি লেখার চেষ্টা করলাম, মিথ্যে অজুহাত চলে আসছিল দেখে বাদ দিয়ে বরং নাওকোকে লিখলাম আমি।

এখানে বসন্ত, জানালাম তাকে। নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে। ওকে বললাম, আমি ওকে মিস করছি, অপেক্ষা করছি কবে আবার তার সাথে দেখা হবে, কথা হবে।

'যাহোক,' আমি বললাম, 'আমি ঠিক করেছি আমি শক্ত থাকবো। যতটুকু বলতে পারি, আমি তা করবোই।

'আরো একটা ব্যাপার আছে। হয়তো পুরোটাই আমার খেয়াল, তোমার কিছু আসে যায় কিনা জানি না, আমি আর কারো সাথে সেক্স করছি না। এর কারন, আমি চাই না শেষবার তুমি আমাকে যেভাবে স্পর্শ করেছিলে তা ভুলে যেতে। তুমি যতটা ভাবো তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য সেটার আমার কাছে। আমি সবসময় সেদিনের কথা ভাবি।'

খামে চিঠি ভরে, ডাকটিকিট লাগিয়ে ডেস্কের উপর রাখলাম চিঠিটা। অনেকক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। অন্য সময়ের চেয়ে এবারের চিঠিটা বেশ ছোট, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল নাওকো এভাবেই আমাকে ভালো বুঝতে পারবে। গ্লাসে দেড় ইঞ্চি হুইস্কি ঢেলে দু চুমুক পান করে ঘুমাতে গেলাম।

পরেরদিন আমি কিচিজোজি স্টেশনের কাছে একটা কাজ জোগাড় করলাম যেটা শনিবার আর রবিবার করতে পারবো। একটা ছোট ধরনের ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের কাজ। তেমন কোন শর্ত ছিল না, লাঞ্চ আর যাতায়াতের সুবিধা দেবে। রাতের শিফটের কেউ সোমবার, বুধবার, আর বৃহস্পতিবার ছুটি নিলে (যা প্রায়ই হত) তাদের জায়গায় কাজ করতে পারবো। কাজটা আমার জন্য যুতসই ছিল। ম্যানেজার আমাকে বলল, আমি যদি তিন মাস থাকি তাহলে বেতন বাড়িয়ে দেবে। তারা চাচ্ছিল আমি শনিবার থেকেই কাজ শুরু করি। সিঞ্জুকুর রেকর্ডস্টোরের ভাঁড়টার থেকে এই ম্যানেজার অনেক ভদ্রলোক।

মিদোরির অ্যাপার্টমেন্টে আরেকবার ফোন করলে আবারও তার বোনই ধরলো। মিদোরি কালকের পর আর বাসায় ফেরেনি। তাকে খুব ক্লান্ত শোনাল। এখন তার দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার কোন ধারনা আছে সে কোথায় যেতে পারে? আমি শুধু জানতাম, মিদোরির ব্যাগে পাজামা আর টুথব্রাশ ছিল।

বুধবার মিদোরিকে ক্লাসে দেখলাম। সে গাঢ় সবুজ রঙের সোয়েটার আর কালো সানগ্লাস পরেছিল। সে একদম শেষের সারিতে বসে চশমা পরা এক মেয়ের সাথে কথা বলছে, যাকে আগে দেখেছি। আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম ক্লাসের পরে ওর সাথে কথা বলতে চাই। চশমা পরা মেয়েটা প্রথমে আমার দিকে তাকাল, তারপর মিদোরি দিকে। ওর চুলের স্টাইল সত্যি আগের চেয়ে মেয়েলি ধরনের ছিল।

"আমার একজনের সাথে দেখা করার কথা আছে," অন্যদিকে তাকিয়ে বলল সে।

"আমি বেশি সময় নেবো না," বললাম তাকে। "মাত্র পাঁচ মিনিট।"

মিদোরি তার সানগ্লাস সরিয়ে সরু চোখে তাকাল আমার দিকে। মনে হল যেন অনেক দূরের কোন ভুতুরে বাড়ি দেখছে।

"আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই না সরি," সে বলল।

সাথের চশমা পরা মেয়েটা আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যার অর্থ সে তোমার সাথে কথা বলতে চায় না সুতরাং ভাগো।

আমি লেকচার শোনার জন্য (টেনেসি উইলিয়াম্‌সের সাহিত্যকর্ম এবং আমেরিকান সাহিত্যে এর অবস্থান) প্রথম সারির একদম ডান কনার সিটে গিয়ে বসলাম। ক্লাস শেষ হতেই পেছনে তাকিয়ে দেখি মিদোরি উধাও হয়ে গেছে।

এপ্রিল মাসটা খুব একাকি কাটলো। এপ্রিলে আমার আশেপাশে যেদিকে তাকাই দেখি সবাই হাসিখুশি। লোকজন তাদের কোট ছুঁড়ে ফেলে রোদে বসে একজন আরেকজনের সাথে সময় কাটায়–কথা বলে, ক্যাঁচ ক্যাঁচ খেলে, হাত ধরে থাকে। শুধু আমি আমার মত ছিলাম। নাওকো, মিদোরি, নাগাসাওয়া, ওদের সবাই আমার থেকে দূরে। আমার এমনকি "গুড মর্নিং" কিংবা "দিনটা সুন্দর হোক" বলার কেউ নেই। স্টর্ম ট্রুপারকে মিস করি। পুরো একমাস এইরকম আশাহীনভাবে একা একা কাটালাম। কয়েকবার মিদোরির সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেও প্রতিবার তার থেকে একই উত্তর পেলাম, "আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই না এখন।" ওর গলার সুর থেকে বোঝা যেত ও মন থেকে বলছে কথাগুলো। সে সব সময় চশমা পরা মেয়েটার সাথে থাকতো। একটা লম্বা, ছোট চুলের ছেলের সাথেও দেখেছি কয়েকবার। ছেলেটার পা অনেক লম্বা আর সবসময় সাদা বাস্কেটবল শু পরে থাকতো।

এপ্রিল শেষে মে এলো, এপ্রিলের চেয়েও খারাপ ছিল মে। সন্ধ্যার পর আমার বুক কাঁপত। সন্ধ্যার হালকা আলোয় বাতাসে ম্যাগনোলিয়ার হালকা সুবাস পাওয়া যেত। কোন সতর্কতা ছাড়াই আমার বুক কাঁপত, তীব্র ব্যথা করত। আমি চোখে বন্ধ করে ঠোঁট কামড়ে অপেক্ষা করতাম কখন শেষ হবে। একসময় শেষ হত, কিন্তু ধীরে ধীরে, অনেক সময় নিয়ে। পেছনে একটা হালকা ব্যথা রেখে যেত।

সেসব সময়ে আমি নাওকোকে লিখতে বসতাম। ওর কাছে আমার চিঠিতে আমি শুধু সুন্দর জিনিসগুলোর কথা লিখতাম। ঘাসের গন্ধ, বসন্তের বাতাসের হালকা চুমু, চাঁদের আলো, কি মুভি দেখেছি সেটা, কোন গানটা ভালো লেগেছে, যে বইটা আমার ভালো লেগেছে সেটা। চিঠি লিখতে আমার ভালো লাগত, আর লেখার পর পড়ে দেখতাম কি লিখেছি। আমার মনে হত, আমি যে দুনিয়ায় বাস করছি তা কত সুন্দর। এরকম প্রচুর চিঠি লিখেছি আমি কিন্তু নাওকো বা রেইকোর কোন চিঠি দেয়নি।

যে রেস্টুরেন্টে আমি কাজ করতাম সেখানে আমার বয়সি এক ছাত্রের সাথে

খাতির হল কিছুটা, নাম ইতোহ। সে ছিল আর্ট কলেজের তৈলচিত্রের ছাত্র। অনেক সময় লেগেছিল আমার সাথে খাতির হতে। কিন্তু একসময় আমরা কাজের পর একসাথে বারে যেতে শুরু করলাম আর যাবতিয় বিষয় নিয়ে কথা বলতে লাগলাম। সে-ও পড়তে আর গান শুনতে পছন্দ করত। আমরা মূলত বই আর রেকর্ড নিয়েই আলাপ করতাম। সে ছিল শুকনো, সুদর্শন, মাথায় ছোট ছোট চুল। আর্টের অন্য ছাত্রদের তুলনায় পরিস্কার জামাকাপড় পরতো। সে বেশি কথা বলতো না কিন্তু নিজের পছন্দের ব্যাপারে তার পরিস্কার বক্তব্য থাকতো। ফ্রেঞ্চ উপন্যাস পছন্দ করত সে। বিশেষ করে জর্জ বাতাইয়া আর বরিস ভিয়ার লেখা। মিউজিকের ক্ষেত্রে, তার পছন্দ ছিল মোজার্ট আর রাভেল। আর আমার মত সে-ও একজন বন্ধু খুঁজছিল যার সাথে এসব নিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

ইতোহ একবার আমাকে তার অ্যাপার্টমেন্টে দাওয়াত দিয়েছিল। ওর বাসা খুঁজে পাওয়া আমার বাসার মত কঠিন ছিল না। ইনোকাসিরা পার্কের পেছনে একতলায় একটা অদ্ভুত অ্যাপার্টমেন্ট ছিল ওর। রুম ভর্তি পেইন্টিঙের জিনিসপত্র আর ক্যানভাস। আমি তার কাজ দেখতে চাইলে সে ভীষণ বিব্রত বোধ করছিল। কাঠের চুলায় মাছ পুড়িয়ে আর ওর বাবার কাছ থেকে চুরি করা সিভাস রিগাল দিয়ে ডিনার করলাম আমরা। সাথে রবার্ট কাসাদিসাসের মোজার্ট পিয়ানো কনসার্ট উপভোগ করলাম।

ইতোহর বাড়ি নাগাসাকিতে। সেখানে তার একজন গার্লফ্রেন্ড ছিল যার সাথে বাড়িতে গেলে ঘুমাত। কিন্তু এখন তার সাথে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না।

"জানোই তো মেয়েরা কেমন হয়," বলল সে, "বয়স বিশ-একুশ হলেই হঠাৎ তাদের মাথায় ভুত চাপে। তারা বাস্তব জীবন নিয়ে চিন্তা শুরু করে দেয়। আর এমন যখন শুরু হয় তখন প্রেম-ভালোবাসা তাদের কাছে পানসে লাগে। এখন যখন আমি তাকে দেখতে যাই, সাধারনত সেক্সের পর সে প্রশ্ন করবেই, 'পাশ করার পর তোমার পরিকল্পনা কি?' "

"আসলেই, পাশ করার পর তোমার পরিকল্পনা কি?" আমি জানতে চাইলাম।

মাছ চাবাতে চাবাতে সে মাথা নাড়ল, "কি করার আছে? আমি করি অয়েল-পেইন্টিং! এইসব নিয়ে ভাবলে কেউ অয়েল-পেইন্টিংয়ে মেজর করতে পারত না। ভাত খাওয়ার জন্য কেউ এসব করে না। তো তার বক্তব্য হচ্ছে, কেন আমি নাগাসাকিতে ফিরে গিয়ে আর্টের শিক্ষক হই না? তার নিজের ইচ্ছে ইংরেজির শিক্ষিকা হওয়ার।"

"তুমি আর এখন ওর জন্য পাগল নও, তাই না?"

"বলতে পারো," ইতোহ স্বীকার করল। "কোন্ শালা আর্টের শিক্ষক হতে চায়? আমি আমার সারাজীবন মিডল স্কুলের বান্দরগুলোকে আঁকা শিখিয়ে পার করতে রাজি নই।"

"সেটা অন্য কারন," বললাম তাকে। "তোমার কি মনে হয় না তোমার উচিত ওর সাথে সম্পর্ক ভেঙে দেয়া? দু-জনের জন্যই ভালো হয় এটা।"

"অবশ্যই উচিত। কিন্তু আমি জানি না কিভাবে তাকে কথাটা বলবো। সে আমার সাথে সারাজীবন কাটানোর প্ল্যান করে বসে আছে। কিভাবে তাকে গিয়ে বলি, 'আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত, কারন তোমাকে আমার আর পছন্দ হচ্ছে না?' "

আমরা বরফ ছাড়া সোজা সিভাস খেলাম। মাছ শেষ হয়ে গেলে কিছু শসা আর শাক কেটে মিসোতে ডুবিয়ে খেলাম আমরা। শসায় কামড় দিতে শব্দ হওয়ায় মিদোরির বাবার কথা মনে হল। আবারও উপলব্ধি করলাম মিদোরি ছাড়া আমার জীবন কেমন পানসে হয়ে গেছে। আর এই চিন্তা করে আমার মেজাজও খারাপ হয়ে গেল। ওর উপস্থিতি যে আমার জীবনে কবে কখন বিশাল কিছু হয়ে গেল টের পাইনি আগে।

"তোমার কোন গার্লফ্রেন্ড আছে?"

"আছে," আমি বলে একটু থামলাম, তারপর বললাম "কিন্তু তার সাথে এখন থাকতে পারছি না।"

"কিন্তু তোমার তো একজন আরেকজনকে বুঝতে পারো তাই না?"

"আমার তো মনে হয় পারি। নাহলে কি লাভ?" মুখ টিপে হাসলাম আমি।

ইতোহ চাপা সুরে মোজার্টের মহত্ত্ব নিয়ে কথা বলল। সে মোজার্টের একদম ভেতর-বাইরে সব চেনে। একজন গ্রামের ছেলে যেমন করে পাহাড়ের রাস্তা চেনে। ওর বাবা মিউজিক পছন্দ করতেন, তাই সে একদম ছোট্ট থেকে মিউজিক শুনে বড় হয়েছে। আমি ক্লাসিক্যাল মিউজিক সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না, কিন্তু এখন এই মোজার্টের কনসার্ট শুনতে শুনতে আর ইতোহর স্মার্ট, আন্তরিক মন্তব্য ("ঐযে ওই অংশটা," "এই অংশটা কেমন?") শুনতে শুনতে, অনেকদিন পর আমার মন কিছুটা শান্ত হয়ে এল। আমরা ইনোকাশিরা পার্কের উপর ঝুলে থাকা বাকা চাঁদ দেখতে দেখতে শেষবিন্দু পর্যন্তও সিভাস রিগাল গিললাম। দারুন হুইস্কি।

ইতোহ তার বাসায় রাতে থেকে যেতে বলল, কিন্তু আমি তাকে বললাম, আমার কিছু কাজ আছে। হুইস্কির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে নয়টার দিকে বেরিয়ে পড়লাম। বাসায় ফেরার পথে পাবলিক ফোন থেকে মিদোরিকে কল করলাম আবার। আমাকে অবাক করে দিয়ে সে ফোন ধরলো।

"সরি, আমি এই মুহূর্তে তোমার সাথে কথা বলতে চাই না।"

"আমি জানি, আমি জানি। কিন্তু আমি চাই না আমাদের সম্পর্ক এভাবে শেষ হয়ে যাক, আমার অল্প কয়েকজন বন্ধুর একজন তুমি, তোমার সাথে দেখা না হওয়া আমার জন্য কষ্টদায়ক। এটুকু অন্তত আমাকে বলো, কবে আমি তোমার সাথে কথা বলতে পারবো?"

"যখন আমার মনে হবে তোমার সাথে কথা বলতে চাইছি তখন," সে বলল।

"কেমন আছো তুমি?"

"ভালো," কথাটা বলেই ফোন রেখে দিল সে।

মে মাসের মাঝামাঝি রেইকোর চিঠি এল।

'নিয়মিত চিঠি লেখার জন্য ধন্যবাদ। নাওকো তোমার চিঠি পড়তে ভালোবাসে। আমিও। আশা করছি আমি পড়ি বলে তুমি রাগ করো না, নাকি?

দুঃখিত তোমাকে অনেকদিন চিঠি দিতে পারিনি। সত্যি বলতে, আমি কিছুটা ক্লান্ত বোধ করছি, আর দেয়ার মত ভালো কোন খবর আমার কাছে নেই। নাওকোর অবস্থা ভালো না। ওর মা এসেছেন কোবে থেকে। আমরা চারজন–আমি, নাওকো, নাওকোর মা আর ডাক্তার–অনেকক্ষণ আলোচনা করেছি এবং সবাই একমত হয়েছি যে, নাওকোকে কোন সত্যিকারের হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেয়া হবে, তারপর অবস্থা ভালো হলে সে আবার এখানে ফিরে আসতে পারে। পুরোটাই নির্ভর করে সেখানে ফলাফল কি হবে তার উপর। নাওকো এখানেই থাকতে চায়, এখানেই সে ভালো হওয়ার চেষ্টা করতে চায়। আমি জানি আমি ওকে অনেক মিস করবো, আর অনেক দুশ্চিন্তা হবে। কিন্তু বাস্তবতা হল ওকে এখানে নিয়ন্ত্রনে রাখা ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছে। বেশিরভাগ সময় সে ঠিকই থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে তার আবেগ ভয়াবহ অস্থির হয়ে পড়ে। তখন ওকে চোখে চোখে রাখতে হয় সবসময়। বলা অসম্ভব তখন সে কি করে ফেলে। যখন সে ওইসব কণ্ঠ শুনতে পায়, তখন একদম চুপ হয়ে যায় আর নিজের মধ্যে গুটিয়ে ফেলে।

'সেজন্যই আমি মনে করি নাওকোর জন্য ভালো হবে সঠিক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে থেরাপি নেয়া। বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু এর বেশি কিছু করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আগেও তোমাকে বলেছি, আবারো বলছি, এরকম সময়ে ধৈর্যধারণ খুবই জরুরি। আশা না হারিয়ে, জড়িয়ে যাওয়া সব সূতো ধীরে ধীরে একটা একটা করে ছোটাতে হবে। ওর অবস্থা যতই নিরাশাজনক হোক না কেন আমাদেরকে ঝুলে যাওয়া সূতোটা আজকে হোক কালকে হোক খুঁজে বের

করতেই হবে। তুমি যদি গভীর অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে পড়ো তাহলে সবচেয়ে ভালো যা করতে পারো তা হল শক্ত করে বসে অন্ধকারের সাথে চোখ সইয়ে নেয়া।

'এ চিঠি তুমি যখন হাতে পাবে ততদিনে নাওকোকে অন্য হাসপাতালে সরিয়ে নেয়ার কথা। সরি, সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্তও তোমাকে জানাতে পারিনি। কিন্তু কাজ করতে হয়েছে অনেক দ্রুত। নতুন হাসপাতালটা সত্যি খুব ভালো জায়গা। সেখানের ডাক্তাররাও ভালো। আমি তোমাকে ঠিকানা পাঠাচ্ছি, নাওকোকে ওখানে চিঠি পাঠিও। তারা আমাকে নাওকোর উন্নতির খবর নিয়মিত জানাবে, আমি কিছু জানলেই তোমাকে জানাবো। আশা করছি ভালো সংবাদ দিতে পারবো। আমি জানি পুরো ব্যাপারটা তোমার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে, কিন্তু আশা হারিয়ো না। এখানে নাওকো না থাকলেও আমাকে মাঝেমধ্যে চিঠি লেখো।

গুডবাই।"

আমি সে বসন্তে প্রচুর চিঠি লিখলাম। প্রতি সপ্তাহে নাওকোকে একবার, রেইকোকে অনেকগুলো, আরও অনেকগুলো লিখলাম মিদোরিকে। ক্লাসে বসে বাসায় সিগালকে কোলে নিয়ে ডেস্কে বসে কাজের বিরতির ফাঁকে ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে বসে চিঠিটা লিখলাম। যেন চিঠি লিখে আমার ভাঙা জীবন জোড়া দিচ্ছি।'

মিদোরিকে লিখলাম, 'এপ্রিল আর মে মাস খুব কষ্টদায়ক ছিল, একাকিত্বে কেটেছে কারন তোমার সাথে কথা হয়নি। আমি কখনো বুঝিনি বসন্তকাল এরকম একাকি আর কষ্টদায়ক হতে পারে। এরকম একটা বসন্তের চেয়ে তিনটা ফেব্রুয়ারি ভালো। আমি জানি অনেক দেরি হয়ে গেছে বলতে, কিন্তু তোমার চুলের নতুন স্টাইলে তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। একদম কিউট। আমি এখন একটা ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে কাজ করছি। বাবুর্চি আমাকে দারুন স্প্যাগেটি রান্না শিখিয়েছে। তোমাকে শিগগিরি রান্না করে খাওয়াতে চাই।"

প্রতিদিন ক্লাসে গেলাম, সপ্তাহে দু-বার কি তিনবার রেস্টুরেন্টে কাজ করলাম আমি, ইতোহ্‌র সাথে আলাপ করলাম মিউজিক আর বই নিয়ে, বরিস ভিয়ার বই ধার নিয়ে পড়লাম, চিঠি লিখলাম, সিগালের সাথে খেললাম, স্প্যাগেটি বানালাম, কাজ করলাম বাগানে, মাস্টারবেট করলাম নাওকোর কথা কল্পনা করে, হলে গিয়ে অনেকগুলো মুভি দেখলাম।

মিদোরি যখন আবার আমার সাথে কথা বলা শুরু করল ততদিনে জুনের অর্ধেক পেরিয়ে গেছে। দুমাস ধরে আমাদের মধ্যে একটা শব্দও বিনিময় হয়নি।

একদিন লেকচার শেষে সে আমার পাশে এসে বসল। হাতের উপর গাল রেখে বসে থাকলেও কিছু বলল না। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল–একদম বর্ষাকালের বৃষ্টি। কোন বাতাস নেই, ঝরঝর বৃষ্টি, সবকিছু ধুয়ে যাচ্ছিল। ছাত্র-ছাত্রিরা বের হয়ে যাওয়ার পরও সে বসে রইল কোন কথা বলল না। তারপর জিন্সের পকেট থেকে মার্লবোরো বের করে ঠোঁটে রাখল আর আমার হাতে ম্যাচ দিল। আমি একটা ম্যাচ জ্বালিয়ে ওর সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। আমার মুখের উপর ধোঁয়া ছাড়ল মিদোরি।

"আমার চুলের স্টাইল কেমন?" জিজ্ঞেস করল সে।

"দারুন।"

"কতোটা দারুন?"

"দুনিয়ার প্রত্যেকটা বনের প্রত্যেকটা গাছকে শুইয়ে দেয়ার মত দারুন।"

"সত্যি তাই মনে হয়?"

"সত্যি তাই মনে হচ্ছে।"

সে আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার ডানহাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। ওর হাত ধরলাম আমি। যতটা না স্বস্তি বোধ করছিলাম, ওকে তার চেয়েও ভালো দেখাল। মেঝেতে ছাই ফেলে উঠে দাঁড়াল সে।

"চল, কিছু খাই, ক্ষুধায় মারা যাচ্ছি," বলল এবার।

"কোথায় যেতে চাও?" জানতে চাইলাম আমি।

"নিহনবাশিতে। তাকাশিমায়া ডিপার্টমেন্ট স্টোর রেস্টুরেন্ট।"

"এত জায়গা থাকতে ওখানে কেন?"

"মাঝে মাঝে ওখানে যেতে ভালো লাগে, তাই। "

সুতরাং আমরা সাবওয়ে করে নিহনবাশি গেলাম। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে বলে হয়ত জায়গাটা পুরো খালি ছিল। বিশাল গুহার মত দেখতে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বৃষ্টির গন্ধে ভরে ছিল। কাস্টমার নেই বলে সব কর্মিরা কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে বসে আছে। মিদোরি আর আমি বেজমেন্টে গেলাম, অনেকক্ষণ প্লাস্টিক ফুড বাছাবাছি করে দু-জনেই ঠিক করলাম লাঞ্চ, গ্রিল করা মাছ, আচার, টেম্পুরা আর তেরিয়াকি চিকেন।

"শেষ কবে এরকম ডিপার্টমেন্ট স্টোর রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করেছি মনে পড়ছে না।" সাদা কাপে গ্রিন টি খেতে খেতে ভাবলাম। এই সাদা কাপগুলো শুধুমাত্র কোন ডিপার্টমেন্ট স্টোর রেস্টুরেন্টেই পাওয়া সম্ভব।

"আমার এরকম কিছু করতে ভালো লাগে," মিদোরি বলল। "এরকম করলে মনে হয় একটা কাজের কাজ কিছু করেছি। সম্ভবত ছোটবেলার কথা মনে

পড়ে যায়। আমার বাবা-মা আমাকে প্রায় কখনোই ডিপার্টমেন্ট স্টোরে নিয়ে যায়নি বলা যায়।"

"আর আমার ধারনা আমার বাবা মা অইটাই বেশি করেছে। আমার মা ডিপার্টমেন্ট স্টোর বলতে পাগল ছিল।"

"ভাগ্যবান!"

"কী যে বলো, আমি কখনো ডিপার্টমেন্ট স্টোরে যেতে পছন্দ করতাম না।"

"ন, আমি বলতে চাইছিলাম, তুমি ভাগ্যবান যে, তারা তোমাকে সবজায়গায় নিয়ে যেত।"

"উপায় ছিল না, আমি একমাত্র সন্তান ছিলাম," বললাম তাকে।

"আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার স্বপ্ন ছিল কবে আমি বড় হয়ে একা একা ডিপার্টমেন্ট স্টোরে যাবো, ইচ্ছেমত যা চাই খাবো। কি ফালতু স্বপ্ন ছিল! এরকম জায়গায় বসে একা একা ভাত খাওয়ার মধ্যে কোন মজা আছে? খাবারও মজার না, আর সবসময় ভিড়, জিনিসপত্র দিয়ে ভরা আর শব্দ তো আছেই। তারপরেও আমি মাঝে মাঝে এখানে আসার কথা ভাবি।"

"আমি গত দুমাস একদম একা কাটিয়েছি," বললাম তাকে।

"হ্যাঁ, জানি, তুমি চিঠিতে বলেছো," মিদোরি সাদামাটাভাবে বলল। "চল, খাওয়া যাক। খাওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না এখন।"

আমরা আমাদের অর্ধেক চাঁদের মত লাঞ্চ বক্সের আলাদা আলাদা খোপ থেকে সবগুলো আইটেম খেয়ে শেষ করলাম। বাটি থেকে ক্লিয়ার সুপ, আর সাদা কাপে গ্রিন টি খেলাম। লাঞ্চের পর মিদোরি সিগারেট ধরালো। ধূমপান শেষ হলে কোন কথা না বলে ছাতা নিয়ে সে উঠে দাঁড়ালে আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

"এখন কোথায় যাবে?" জানতে চাইলাম।

"অবশ্যই ছাদে। একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোর রেস্টুরেন্টে লাঞ্চের পর আর কি কাজ।"

বৃষ্টির কারনে ছাদে কেউ ছিল না, পেট সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্টে কোন লোক ছিল না, কিওস্কগুলোতে আর বাচ্চাদের খেলার রাইডগুলোর টিকেট বুথে শাটার নামানো ছিল। আমরা ছাতা মাথায় দিয়ে ভেজা কাঠের ঘোড়া, গার্ডেন চেয়ার আর স্টলগুলোর মধ্যে দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে লাগলাম। আমার অবাক লাগল, টোকিও শহরের মাঝখানে এরকম একটা ফাঁকা জায়গা আছে। মিদোরি টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে চাচ্ছিল, আমি একটা কয়েন ঢুকিয়ে ওর মাথায় ছাতা ধরলাম, আইপিসে চোখ রেখে চারপাশ দেখতে লাগল সে।

ছাদের এক দিকে বাচ্চাদের খেলার সরঞ্জামে ভর্তি। আমি আর মিদোরি

প্লাটফর্মের মত একটা জায়গায় পাশাপাশি বসে বৃষ্টি দেখতে লাগলাম।

"তো বলো কী বলার আছে," মিদোরি বলল। "আমি জানি আমাকে বলার অনেক কিছু আছে তোমার।"

"আমি কোন অজুহাত দিতে চাই না," বললাম তাকে, "আমার তখন মন অনেক বিষন্ন ছিল, মাথা কাজ করছিল না। কোন কিছু ঠিকমত ধরতে পারছিলাম না। কিন্তু একটা জিনিস পরিস্কার বুঝতে পেরেছি, যখন তোমার দেখা পাচ্ছিলাম না। আমি বুঝতে পেরেছি এতদিন বেঁচে ছিলাম কারন তুমি আমার জীবনে ছিলে। তোমাকে যখন হারিয়েছি, কষ্ট আর একাকিত্ব আমাকে খেয়ে ফেলেছে।

"তোমার কোন ধারনা আছে তোমাকে ছাড়া আমার জীবন কতটা একা আর কষ্টে কেটেছে গত দুটো মাস?"

ও আমাকে পুরোপুরি দূর্বল অবস্থায় ফেলে দিল। "না," বললাম আমি। "আমার তা কখনো মাথায় আসেনি। আমি ভেবেছি তুমি আমার উপর ক্ষেপে আছো তাই দেখা করতে চাওনি।"

"তুমি এরকম গাধা কেন? অবশ্যই আমি তোমার সাথে দেখা করতে চেয়েছি! আমি তোমাকে বলেছি, তোমাকে কতটা পছন্দ করি! আমি যখন কাউকে পছন্দ করি এত সহজে মনের দরজা খুলি না, আর খুললে বন্ধও করতে পারি না। আমার সম্পর্কে এতটুকু ধারনা নেই তোমার?"

"হ্যাঁ, তা আছে কিন্তু.."

"সেজন্যই তোমার উপর রেগে ছিলাম। আমি তোমাকে উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছি। কতদিন পর আমাদের দেখা হল আর তুমি কিনা সারাক্ষন এক মেয়ের কথা ভাবছো, আমার দিকে তাকিয়েও দেখোনি! কেন রাগ করবো না তোমার উপর? ওগুলো বাদই দিলাম, আমার অনেকদিন থেকেই মনে হচ্ছিল তোমার থেকে কিছুদিন দূরে থাকা উচিত। কিছু ব্যাপার পরিস্কারভাবে চিন্তা করা উচিত।"

"সেই ব্যাপারগুলো কি?"

"আমাদের সম্পর্ক, আবার কি। অবস্থা এমন হয়ে গেছিল যে, আমি আমার বয়ফ্রেন্ডের থেকে তোমার সান্নিধ্য বেশি পছন্দ করছিলাম। মানে, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হতে পারে? এটা তো জটিলও। আমি তাকে এখনো পছন্দ করি। সে একটু আত্মকেন্দ্রিক, সংকীর্ণ মনের অধিকারি আর ফ্যাসিস্ট ধরনের, কিন্তু তার অনেক ভালো গুনও আছে, সে প্রথম লোক যার প্রতি আমি সিরিয়াস হয়েছিলাম। আর তুমি, হ্যাঁ, তুমিও আমার কাছে স্পেশাল। তোমার সাথে যখন থাকি আমি অনুভব করি কিছু একটা ঠিকভাবে চলছে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তোমাকে পছন্দ করি। তোমাকে হারাতে চাই না। দিশেহারা হয়ে

গিয়েছিলাম সব কিছু নিয়ে, তাই সোজা ওর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি কি করবো। সে আমাকে বলল তোমার সাথে দেখা করা বন্ধ করতে। বলল, যদি তোমার সাথে দেখা করি তাহলে ওর সাথে সম্পর্ক ভেঙে দিতে। ব্রেকাপ করতে।"

"তো, তুমি কি করলে?"

"আর কি? ব্রেকাপ করলাম," মিদোরি একটা মার্লবোরো দিল মুখে, হাত দিয়ে ঢেকে আগুন ধরিয়ে টান দিল।

"কেন?"

"কেন?!" চিৎকার করে বলল সে। "তুমি কি পাগল? তুমি ইংরেজির সাবজাঙ্কটিভ বোঝো, ত্রিকোনমিতি বোঝো, মার্ক্স বোঝো, আর এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না? আবার প্রশ্ন করছো? আমি তোমাকে তার চেয়ে বেশি পছন্দ করি সেজন্যে। ভালো হত যদি আরও সুদর্শন কারো প্রেমে পড়তে পারতাম, কিন্তু পারিনি। আমি প্রেমে পড়েছি তোমার!"

আমি কথা বলার চেষ্টা করলাম কিন্তু গলা দিয়ে কিছু বের হল না।

মিদোরি সিগারেটটা পানিতে ছুঁড়ে ফেলল। "তুমি দয়া করে এরকম চেহারা করা বন্ধ করবে? আমি কিন্তু কেঁদে ফেলবো। চিন্তা কোরো না। আমি জানি তুমি অন্য কাউকে ভালোবাস। তোমার কাছ থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশাও করছি না। কিন্তু আমাকে অন্তত একবার জড়িয়ে ধরতে পারো? এই দু-মাস আমার জন্য অনেক কঠিন কেটেছে।"

আমি ছাতা খুললাম, গেমসের জায়গাটার পেছনে গেলাম দু-জনে। আমাদের শরীর একসাথে লেগে গেল, তারপর মিলিত হল ঠোঁটগুলো। ওর জিন্সের জ্যাকেট আর চুল থেকে বৃষ্টির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। মেয়েদের শরীর এত নরম আর উষ্ণ কেন? আমি আমার বুকে ওর স্ফীত স্তনের চাপ টের পাচ্ছিলাম কাপড়ের উপর দিয়েই। কতদিন আমার কারোর সাথে শারীরিক সম্পর্ক হয়নি?

"শেষ যেদিন তোমার সাথে দেখা হয়েছিল, সে রাতে আমি ওর সাথে কথা বলেছি, ব্রেকাপ করেছি," মিদোরি বলল।

"আমি তোমাকে ভালোবাসি," বললাম ওকে। "একদম মন থেকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে আবার হারিয়ে যেতে দিতে চাই না। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। আমার হাত-পা বাঁধা।"

"ওই মেয়েটার জন্য?"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম।

"ওর সাথে শুয়েছো তুমি?"

"একবার। এক বছর আগে।"

"আর এরপর দেখা হয়নি ওর সাথে?"

"দুবার দেখা হয়েছে, কিন্তু আমরা কিছু করিনি।"

"কেন? সে তোমাকে ভালোবাসে না?"

"সেটা বলা কঠিন," আমি বললাম, "ব্যাপারটা অনেক জটিল। অনেক কিছু পেঁচিয়ে গেছে। আর অনেকদিন থেকে চলছে এমন সমস্যা। আমি জানি না কি হচ্ছে এখন। সে-ও জানে না। আমি শুধু জানি, একজন মানুষ হিসেবে আমার কিছু দায়িত্ব রয়েছে, আমি তা কোনভাবে এড়িয়ে যেতে পারি না। অন্তত এই মুহূর্তে আমি এরকম অনুভব করছি। সে যদি আমাকে ভালো না-ও বাসে তারপরও।"

"আমি তোমাকে সরাসরি একটা কথা বলি, ওয়াতানাবে," মিদোরি আমার ঘাড়ে গাল রেখে বলল। "আমি বাস্তব, জীবন্ত একজন মানুষ। শিরার ভেতর দিয়ে রক্ত চলছে এতটাই জীবন্ত। তুমি আমাকে বুকে ধরে রেখেছ আর আমি তোমাকে বলছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি যা বলবে তা করার জন্য আমি তৈরি। আমার কথাবার্তা একটু পাগলামি মনে হতে পারে কিন্তু আমি একজন ভালো মানুষ, আর সৎ। কঠোর পরিশ্রম করি, দেখতে খানিকটা কিউটও। আমার বুক সুন্দর, ভালো রান্না পারি। আমার বাবা আমাকে একটা ট্রাস্ট ফান্ড দিয়ে গেছে। মানে, আমি ফেলনা নই। তুমি আমাকে গ্রহণ না করলে কেউ না কেউ করবে।"

"আমার সময় প্রয়োজন," বললাম তাকে। "আমার চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য কিছু সময় লাগবে। আমি দুঃখিত এর বেশি আর কিছু বলার নেই এই মুহূর্তে।"

"ঠিক আছে কিন্তু তুমি তো আমাকে মন থেকে ভালোবাস, তাই না? আর তুমি তো আমাকে আবার হারাতে চাও না, ঠিক বললাম কিনা?"

"হ্যাঁ, আমি বলেছি আর আমি এটা বিশ্বাস করি।"

মিদোরি আমাকে ছেড়ে দাঁড়াল। মুখে হাসি। "ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করবো। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমাকে যখন গ্রহণ করবে, শুধুই আমাকে গ্রহণ করতে হবে। আর তুমি যখন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে, শুধুই আমার কথা চিন্তা করবে। পরিস্কার?"

"পরিস্কার।"

"তুমি আমার সাথে কি করবে তা নিয়ে আমার কিছু আসে যায় না কিন্তু যাই কোরো আমাকে কষ্ট দিও না। আমার জীবনে আমি ইতিমধ্যে যথেষ্ট কষ্ট

পেয়েছি। যথেষ্টর চেয়েও বেশি। আমি এখন শুধু সুখি হতে চাই।"

আমি ওকে কাছে টেনে মুখে চুমু খেলাম।

"দয়া করে ফালতু ছাতাটা ফেলে দিয়ে দু-হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরো–শক্ত করে ধরো!" বলল সে।

"কিন্তু আমরা তো ভিজে যাবো!"

"তাতে কি? এসব চিন্তা না করে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো! আমি পুরো দু-মাস এরজন্য অপেক্ষা করেছি!"

আমি ছাতা ফেলে দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। কোন শব্দ না করে বৃষ্টি একটানা পড়েই চলল। আমাদের চুল ভিজে গেল, অশ্রুর মত নেমে গেল গাল বেয়ে।

"ছাদের নিচে ফিরে গেলে কেমন হয়?" বললাম তাকে।

"এরচেয়ে আমার বাসায় চল। ওখানে কেউ নেই। এভাবে থাকলে আমাদের ঠান্ডা লেগে যাবে।"

"তা ঠিক।"

"মনে হচ্ছে আমরা নদীতে সাঁতার কেটে আসলাম," মিদোরি হেসে বলল। "কি দারুন অনুভূতি!"

লিনেনের জিনিসপত্রের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা বড় সাইজের টাওয়েল কিনে বাথরুমে গিয়ে মাথা মুছলাম। সাবওয়ে চড়ে মিয়োগাদানিতে ওর অ্যাপার্টমেন্টে গেলাম আমরা। প্রথমে গোসল করলাম আমি, তারপর মিদোরি। আমার কাপড়-চোপড় শুঁকোতে দিয়ে বাথরোব পরে থাকলাম। মিদোরি পোশাক বদলে পোলো শার্ট আর স্কার্ট পরল। তারপর কিচেন টেবিলে বসে কফি খেলাম দু-জন।

"তোমার সম্পর্কে বলো আমাকে," সে বলল।

"আমার সম্পর্কে কি জানতে চাও?"

"উমম, জানি না, তুমি কি কি ঘৃণা করো?"

"মুরগি...ভিডি। আর যেসব নাপিত বেশি কথা বলে।"

"আর?"

"একাকি এপ্রিলের রাত, টেলিফোনের লেইসওয়ালা কাভার।"

"আর কি?"

আমি মাথা নাড়লাম। "আর কিছু মাথায় আসছে না।"

"আমার বয়ফ্রেন্ড–বলা উচিত আমার প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ড–আমার সবকিছু ঘৃণা করত। যেমন ধরো আমি ছোট স্কার্ট পরলে সমস্যা, ধূমপান করলে সমস্যা, মাতাল হলেও সমস্যা, আজেবাজে কিছু বললে তো বিরাট সমস্যা। কিংবা ওর

বন্ধুদের সমালোচনা করলেও সমস্যা। তাই যদি আমার কোন কিছু তোমার মনে হয় তোমার পছন্দ না, আমাকে বলতে পারো, আমি ঠিক করার চেষ্টা করবো।"

"এরকম কিছু আমি পাইনি," কিছুক্ষণ ভেবে বললাম। "নাহ, এরকম কিছু নেই।"

"সত্যি?"

"তুমি যেসব পোশাক পরো সব আমার ভালো লাগে, তুমি যা করো সবই আমার ভালো লাগে। তুমি যেভাবে হাঁট তা আমার ভালো লাগে। তুমি মাতাল হলেও আমার ভালো লাগে। তোমার সবকিছুই ভালো লাগে।"

"তারমানে তুমি বলতে চাইছো, আমি যেরকম আছি সেটা স্বাভাবিক? সব ঠিক আছে আমার?"

"আমি জানি না তোমার কি বদলানো উচিত। তারমানে, যা আছে ঠিকই আছে মনে হয়।"

"তুমি আমাকে কতটুকু ভালোবাস?" মিদোরি প্রশ্ন করল।

"পৃথিবীর সব বাঘ মাখনের মত গলিয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট," আমি বললাম।

"হুম," মনে হল সন্তুষ্ট সে। "আমাকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরবে?"

ওর বিছানায় গেলাম, জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকলাম আমরা। বৃষ্টি শুনতে শুনতে চুমু খেলাম। তারপর সবকিছু নিয়ে কথা বললাম আমরা। মহাবিশ্বর সৃষ্টি থেকে শুরু করে কে কতটা শক্ত, সিদ্ধ ডিম পছন্দ করি, সব।

"আমার জানতে ইচ্ছে করে বৃষ্টির দিন পিঁপড়ারা কি করে?" মিদোরি প্রশ্ন করল।

"কোন ধারনা নেই," বললাম তাকে। "ওরা কঠোর পরিশ্রমী। সম্ভবত এরকম দিনে তারা ঘর সাফ করে কিংবা হয়ত গুদামঘর সাজায়।"

"তারা যদি কঠোর পরিশ্রমই করে তাহলে তাদের পরিবর্তন হয় না কেন? একইরকম দেখছি সেই কবে থেকে।"

"জানি না," আমি বললাম। "হয়ত বানরের সাথে তুলনা করলে তাদের শারীরিক গঠন পরিবর্তনের উপযোগি নয়।"

"ওয়াতানাবে, তুমি দেখি অনেক কিছুই জানো না। আমি ভেবেছিলাম দুনিয়ার সবকিছু তোমার জানা।"

"দুনিয়া অনেক বড়।"

"উঁচু পর্বত, গভীর সমুদ্র," বলল মিদোরি। সে আমার বাথরোবের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পুরুষাঙ্গ হাতে নিয়ে ঢোক গিলে বলল, "নাহ্ ওয়াতানাবে, ঠাট্টা

বাদ, লাভ নেই এসব করে। আমি এই বিশাল শক্ত জিনিসটা কিছুতেই আমার ভেতর নিতে পারবো না।"

"মজা করছো?" দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি।

"হ্যাঁ," খিলখিল করে হাসল সে। "চিন্তা কোরো না, একদম ঠিক আছে। আমি একবার দেখি? রাগ করবে না তো?"

"যত খুশি দেখতে পারো।"

মিদোরি বাথরোবের নিচে মাথা ঢুকিয়ে দিল। হাতে নিয়ে মেপে দেখল ওটা। তারপর মাথা বের করে আমাকে বলল, "দারুন, আমার পছন্দ হয়েছে! বাড়িয়ে বলছি না, সত্যি চমৎকার।"

"ধন্যবাদ," বললাম তাকে।

"কিন্তু আসলেই ওয়াতানাবে, তোমার সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার সাথে সেক্স করতে চাও না। নাকি চাও?"

"তোমার সাথে সেক্স করতে চাই না তা নয়," বললাম আমি, "আসলে পাগল হয়ে আছি সেক্সের জন্য। কিন্তু সেটা করা ঠিক হবে না এখন।"

"তুমি খুব জেদি। তোমার জায়গায় আমি হলে আগে করতাম পরে ভাবতাম কী হবে না হবে।"

"তুমি এরকম করতে?"

"নাহ, চাপা মারলাম," আস্তে করে বলল মিদোরি। "আমিও হয়ত করতাম না। তোমার এসব আমি ভালোবাসি।"

"কতটুকু ভালোবাস তুমি আমাকে?" জানতে চাইলাম আমি। সে কোন উত্তর না দিয়ে আমার উপর চেপে আসল। আমার বুকে চুমু খেতে লাগল অবিরাম। হাত দিয়ে আমার লিঙ্গ ধরে নাড়াতে লাগল। প্রথম যে পার্থক্য আমার মাথায় আসল, তা হল ওর আর নাওকোর নাড়ানোর মধ্যে পার্থক্য আছে। দু-জনেই শান্ত আর সুন্দরভাবে করেছে কিন্তু তারপরেও কোথায় যেন একটা পার্থক্য ঠিকই টের পাচ্ছি। দু-জনের কাছে অভিজ্ঞতা দু-রকমের।

"এই ওয়াতানাবে, আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুমি ওই মেয়ের কথা ভাবছো।"

"মোটেই না," মিথ্যা বললাম তাকে।

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"সত্যি হলে ভালো, না-হলে আমি ক্ষেপে যেতাম।"

"আমি অন্য কারো কথা ভাবতে পারছি না এখন।"

"আমার বুক ছুঁয়ে দেখতে চাও? অথবা নিচে...ওখানে?" মিদোরি বলল।

"কি বললে এটা! অবশ্যই চাই, কিন্তু ঠিক হবে না। সব কিছু একসাথে করলে আমার জন্য একবারে বেশি বেশি হয়ে যাবে।"

মিদোরি মাথা ঝাঁকাল, প্যান্টি খুলে আমার লিঙ্গর মাথাটা ধরলো। "তুমি এর উপর বীর্য ফেলতে পারো," বলল সে।

"কিন্তু তাহলে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে তো।"

"তুমি থামবে দয়া করে? আমি কিন্তু কেঁদে ফেলবো," মিদোরি এমনভাবে বলল যেন এখনই কেঁদে ফেলবে। "আমাকে স্রেফ ধুতে হবে। নিজেকে ধরে রেখো না, করে ফেলো। বেশি চিন্তা হলে আমাকে একসেট নতুন প্যান্টি কিনে দিও। নাকি আমার প্যান্টি বলে তোমার করতে সমস্যা হচ্ছে?"

"মোটেও না," আমি বললাম।

"ঠিক আছে তাহলে এখানে ফেলো, ছেড়ে দাও নিজেকে, খালি করে দাও তোমার সঞ্চয়।"

শেষ হওয়ার পর মিদোরি আমার বীর্য মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। "বাপ্‌রে! অনেক তো!"

"বেশি নাকি?"

"আরে নাহ, ঠিকই আছে, বোকা ছেলে," হেসে বলল সে, তারপর আমাকে চুমু খেল।

সন্ধ্যায় মিদোরি পাড়ার বাজার থেকে নিজে বাজার করে ডিনার রান্না করল। আমরা রান্নাঘরের টেবিলে বসে ভাত, টেম্পুরা আর মটরশুঁটি খেলাম। সাথে বিয়ার।

"বেশি বেশি খাও আর বীর্য বানাও," বলল সে। "তারপর আমি সেগুলো নিজ হাতে বের করে দেবো।"

"অনেক ধন্যবাদ," আমি বললাম।

"কিভাবে ছেলে মানুষের বীর্য বের করতে হয়, সে বিষয়ে সব কৌশল আমি জানি। বুকস্টোরের মেয়েদের ম্যাগাজিন থেকে শিখেছি। ওরা একবার বিশেষ সংখ্যা বের করেছিল মেয়েদের জন্য। কোন কারনে সেক্স করতে না পারলে কিংবা গর্ভবতি থাকলে স্বামীকে কিভাবে অন্য মেয়ের থেকে দূরে রাখতে হবে তা ছিল এই বিশেষ সংখ্যার বিষয়-বস্তু। হাজার রকম উপায় আছে। পরীক্ষা করে দেখতে চাও?"

"সেজন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না," বললাম তাকে।

মিদোরিকে গুডবাই জানিয়ে স্টেশনে গিয়ে খবরের কাগজ কিনলাম। কিন্তু ট্রেনে খবরের কাগজ খুলে বুঝতে পারলাম পড়ার কোন ইচ্ছে নেই। আর যা

পড়ছিলাম তাও বুঝতে পারছিলাম না কি লিখেছে। আমি স্রেফ ছাপা কাগজটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম আর চিন্তা করছিলাম কি হচ্ছে আমার সাথে, কি করে আমার দুনিয়া, চারপাশ বদলে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল একটু পর পর সবকিছু কাঁপছে। আমি একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করলাম। আজকের দিনে আমি যা করেছি তা নিয়ে আমার মধ্যে একবিন্দুও অনুশোচনা নেই। আমি জানতাম আমাকে যদি সুযোগ দেয়া হয় আজকের দিনটা আবার ঢেলে সাজানোর, আমি একই জিনিস আবার করবো। মিদোরিকে বৃষ্টির মধ্যে বুকে ধরে থাকবো, ওর সাথে ভিজবো, ওকে বিছানায় আমার লিঙ্গ ধরতে দেবো। কোন সন্দেহ নেই এসব আবার করবো। মিদোরিকে ভালোবাসি। আমি খুশি যে সে ফিরে এসেছে আমার কাছে। আমরা দু-জন দু-জনকে বুঝতে পারবো। মিদোরি নিজে যেমন বলেছে, সে বাস্তব, সত্যিকারের মানুষ যার শিরার মধ্য দিয়ে রক্ত বয়ে যাচ্ছে। আর সে তার উষ্ণ শরীর আমার বুকে চেপে রেখেছিল। নিজেকে সামলে রাখতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। ইচ্ছে করছিল ওকে নগ্ন করে ওর খোলা শরীরের উষ্ণতায় ডুবে যাই। আমি কোনভাবেই ওকে আমার লিঙ্গ ধরে নাড়াতে বাঁধা দিতে পারতাম না। আমি চেয়েছিলাম সে করুক, সে-ও তাই চেয়েছিল। আমরা একে অপরকে ভালোবেসেছি। এরকম একটা ব্যাপার কে থামাতে পারত? সত্যি আমি মিদোরিকে ভালোবেসেছি। এখনকার জন্য আমার এটুকু জানাই যথেষ্ট। আমি পরিণাম এড়ানোর জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করেছি।

সমস্যা হল, আমি এসব নাওকোকে বোঝাতে পারবো না। যে কোন সময়েই বোঝাতে কঠিন হত কিন্তু নাওকোর এখনকার অবস্থায় কোনভাবেই তাকে বলা সম্ভব না যে, আমি আরেকটা মেয়ের প্রেমে পড়েছি। তাছাড়া আমি নাওকোকেও ভালোবাসি। যেভাবেই জটিল বা বাঁকানো হোক না কেন আমি তাকে ভালোবাসি। আমার মনের ভেতর কোন এক অংশে এখনো একটা বড় জায়গা নাওকোর দখলেই আছে।

একটা জিনিস আমি যা করতে পারি তাহলে রেইকোকে সবকিছু জানাতে পারি। বাসার গিয়ে বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে আমি সারাদিনের ঘটনা মাথার ভেতর সাজালাম। তারপর ডেস্কে গিয়ে চিঠি লিখলাম। 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তোমাকে এরকম একটা চিঠি লিখতে' শুরুটা করলাম এভাবে। তারপর মিদোরির সাথে আমার সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে জানালাম আজকে সারাদিনে কি হয়েছে।

'আমি সবসময় নাওকোকে ভালোবেসে এসেছি, এখনো বাসি। কিন্তু আমার মিদোরির মধ্যে যে সম্পর্ক তার একটা চূড়ান্ত নিস্পত্তির প্রয়োজন এখন। এর উপর নির্ভর করছে আমার ভবিষ্যৎ। নাওকোর জন্য আমি যে আবেগ অনুভব

করি তা হল শান্ত, স্বচ্ছ ভালোবাসা। কিন্তু মিদোরির ক্ষেত্রে অনুভূতি পুরোপুরি ভিন্ন। এই আবেগ নিজের মত করে চলতে পারে, দম নিতে পারে, বাঁচতে পারে, আমাকে মূল থেকে নাড়াতে পারে। আমি জানি না আমি কি করবো, আমি খুবই বিভ্রান্ত। কোন অজুহাত বানাচ্ছি না নিজের জন্য, আমি মনে করি এখন পর্যন্ত আমি সৎভাবে বেঁচে এসেছি। কখনো মিথ্যেকে প্রশ্রয় দেইনি, কাউকে কখনো কষ্ট দিতে চাইনি। তারপরেও আমি এই গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছি। কেন? তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আমি জানি না আমার কি করা উচিত। তুমি কি বলতে পারো রেইকো? তুমি একমাত্র মানুষ যার কাছে আমি পরামর্শ পেতে পারি।"

আমি সে রাতেই স্পেশাল ডেলিভারিতে চিঠি পাঠিয়ে দিলাম।

পাঁচদিন পর রেইকোর উত্তর আসল। তারিখ দেয়া জুনের সতের।

'ভালো খবর দিয়ে শুরু করি। সবার ধারনার চেয়ে অনেক দ্রুত নাওকোর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। আমি ওর সাথে ফোনে কথা বলেছি, সে স্পষ্ট করে কথা বলেছে আমার সাথে। সে হয়তো খুব তাড়াতাড়ি এখানে ফিরে আসতে পারে।

এখন তোমার ব্যাপারে আসা যাক। আমার মনে হয় তুমি সবকিছু অনেক সিরিয়াসলি নিচ্ছো। একজনকে ভালোবাসতে পারা খুবই সুন্দর একটা ব্যাপার। আর সেই ভালোবাসা যদি আন্তরিকতাপূর্ণ হয় তাহলে গোলকধাঁধায় পড়ার কোন প্রশ্নই আসে না। তোমার নিজের উপর আস্থা বাড়াতে হবে।

তোমার জন্য আমার পরামর্শ খুবই সহজ সরল। প্রথমত, তুমি যদি এই মিদোরির প্রতি জোরালোভাবে আকৃষ্ট হয়ে থাকো, খুবই স্বাভাবিক যে, তুমি তার প্রেমে পড়বে। এর পরিণতি ভালোও হতে পারে খারাপও হতে পারে। কিন্তু প্রেম ভালোবাসা এরকমই। তুমি যখন প্রেমে পড়বে, সহজ উপায় হচ্ছে প্রেমে ডুব দেয়া। আমি তাই মনে করি। এটাও একরকম আন্তরিকতার ব্যাপার।

দ্বিতীয়ত, মিদোরির সাথে তুমি সেক্স করবে কি করবে না সেটা পুরোপুরি তোমার ব্যাপার, তোমাকেই এর উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। এখানে আমার কিছু বলার নেই। মিদোরির সাথে কথা বলে তোমার যেটা ভালো মনে হয় সেটাই কোরো।

তৃতীয়ত, এসব কোন কিছুই নাওকোকে জানিও না। যদি কখনো এমন পরিস্থিতি হয় যে, ওকে জানানো প্রয়োজন তখন না-হয় আমি কোন একটা উপায় ভেবে বের করবো। আপাতত চুপ থাকো। ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও।

চতুর্থত, যেটা আমি বলতে চাই সেটা হল, নাওকোর শক্তির বিশাল একটা উৎস হলে তুমি। তোমার যদি ওর প্রতি কোন আবেগ না-ও থাকে তাহলেও তুমি ওর জন্য অনেক কিছু করতে পারো। সবকিছু নিয়ে বেশি বেশি সিরিয়াস হয়ে

পড়ার দরকার নেই। আমরা সবাই (আমরা সবাই বলতে আমি বুঝিয়েছি, যারা স্বাভাবিক মানুষ, আর যারা তা নয়) কমবেশি ত্রুটিপূর্ণ। আমরা বাসও করি একটি ত্রুটিপূর্ণ দুনিয়ায়। ব্যাঙ্কে যেভাবে নিখুঁত হিসেব হয় সেভাবে আমরা জীবন যাপন করি না। কিংবা সবকিছু আমরা স্কেল-কম্পাস দিয়ে লাইন টেনে কোণ মেপে করি না। ঠিক কিনা বলো?

আমার নিজের অনুভূতি হল, শুনে মনে হচ্ছে মিদোরি একটা চমৎকার মেয়ে। আমি স্রেফ তোমার চিঠি পড়েই বুঝতে পারছি কেন তুমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছো। আমি এটাও বুঝি কেন তুমি নাওকোর প্রতি আকৃষ্ট। এরমধ্যে কোন পাপ নেই। আমাদের বিশাল দুনিয়ায় এরকম অহরহ ঘটছে। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম–একটা সুন্দর দিনে, সুন্দর লেকে নৌকা ভ্রমনে বের হয়ে চিন্তা করা যে, আকাশ আর লেক দুটোই সুন্দর। সুতরাং মাথা খারাপ কোরো না। যা হওয়ার হবে। তুমি যতই না করার চেষ্টা করো না কেন, কিছু মানুষ কষ্ট পাবেই যখন তাদের কষ্ট পাওয়ার সময় হবে। জীবন এরকমই। আমি জানি আমার কথা ভাষণের মত শোনাচ্ছে, কিন্তু এখনই সময় তোমাকে এভাবে বাঁচতে শিখতে হবে। তুমি চেষ্টা করতে পারো দুনিয়াকে তোমার মত করে চালাতে। যদি পাগলা গারদে না যেতে চাও তাহলে তোমার মন আরেকটু খুলতে হবে আর জীবনের স্রোতে নিজেকে ছেড়ে দিতে হবে। আমি একজন শক্তিহীন ত্রুটিপূর্ণ মানুষ, তারপরেও আমার অনেক সময় মনে হয় জীবন কত সুন্দর! সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো! সুতরাং যা করছো তা বাদ দাও আর সুখি হতে শেখো। সুখি হওয়ার জন্য কাজ করো।

বলা বাহুল্য, তোমার আর নাওকোর সুন্দর সমাপ্তি হবে না ভাবতে আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু কোনটা ভালো কে বলতে পারে? সেজন্যই যেখানে সুখের দেখা পাবে, খপ করে গিয়ে ধরবে। অন্যদের নিয়ে বেশি চিন্তা করবে না। আমার অভিজ্ঞতা বলে আমাদের জীবনে এরকম সুযোগ দু-তিনবারের বেশি আসে না। যদি তুমি এ সুযোগগুলো হারাও, পরে সারা জীবন আফসোস করে কাটাতে হবে।

আমি প্রতিদিন গিটার বাজাচ্ছি। এখন তো আর কেউ নেই যাকে শোনাবো। বাজানো অর্থহীন মনে হচ্ছে। বৃষ্টিময় অন্ধকার রাতও আমার পছন্দ নয়। আশা করছি কোন একদিন আবার একই রুমে বসে আঙুর খেতে খেতে তোমার আর নাওকোর সামনে গিটার বাজাতে পারবো।

ততদিন পর্যন্ত..

– রেইকো ইসিদা'

অধ্যায় ১১

নাওকোর মৃত্যুর পরেও রেইকো আমাকে কয়েকবার চিঠি লিখেছিল। সে বলেছিল, আমার কোন দোষ ছিল না। কারোরই কোন দোষ ছিল না। বৃষ্টির জন্য যেমন কাউকে দোষ দেয়া যায় না অনেকটা সেরকম ব্যাপার। কিন্তু আমি তার চিঠির কোন উত্তর দেইনি। কি বলার ছিল আমার? বললেই বা কী হত? নাওকোর আর কোন অস্তিত্ব নেই এ দুনিয়ায়। সে এখন স্রেফ এক মুঠো ছাই মাত্র।

আগস্টের শেষের দিকে কোবেতে নাওকোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হল। সব শেষ হওয়ার পর আমি টোকিও ফিরে এসে আমার বাড়িওয়ালাকে বললাম কিছুদিন বাইরে থাকবো। ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টে আমার বসকে বললাম আমি আর কাজে ফিরছি না। মিদোরিকে চিরকুট লিখলাম : আমি এখনো কিছু বলতে পারছি না, আশা করছি সে আমার জন্য আরেকটু অপেক্ষা করবে। পরবর্তি তিনদিন মুভি থিয়েটারে কাটালাম। টোকিওর সব মুভি দেখা শেষ হয়ে গেলে আমি আমার ন্যাপস্যাক নিয়ে, ব্যাঙ্ক থেকে সব টাকা তুলে সিঞ্জুকু স্টেশনে গিয়ে শহর থেকে প্রথম যে এক্সপ্রেস ট্রেন বের হচ্ছিল তাতে চড়ে বসলাম।

কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম এখন আর মনে করতে পারছি না। যদিও জায়গার দৃশ্য, শব্দ, আর গন্ধ আমার পরিস্কার মনে আছে। খালি জায়গার নাম মনে নেই কোন জায়গার পর কোন জায়গায় গিয়েছি তা-ও মনে নেই। একটার পর একটা শহর পার হয়েছেছি, হয় ট্রেনে চড়ে, না-হয় বাসে করে, না-হয় ট্রাকে হিচহাইকিং করে। খালি পার্কিংলটে, ট্রেন স্টেশনে, পার্কে, নদীর তীরে কিংবা সাগরের তীরে স্লিপিং ব্যাগে ঘুমিয়েছি। এমনকি একবার এক থানার এক কোণায়, আরেকবার এক কবরস্থানেও ঘুমিয়েছি। কোথায় ঘুমাচ্ছি সেটা সমস্যা ছিল না, যতক্ষণ লোকজন থেকে দূরে ছিলাম ভালো ছিলাম। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গেলে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে ঢুকে সস্তা হুইস্কি গিলেছি, মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। ভালো শহরগুলোতে লোকজন আমাকে খাবার দিয়েছে, মশা কয়েল দিয়েছে, আর খারাপ শহরগুলোতে লোকজন পুলিশ ডেকে পার্ক থেকে বের করে দিয়েছে। আমার কাছে কোনটারই কোন পার্থক্য ছিল না। আমি শুধু চেয়েছিলাম অচেনা কোথাও ঘুমাতে।

টাকা কমে এলে কিছুদিন শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছি যা প্রয়োজন তা জোগাড় করার জন্য। সবসময়ই কোন না কোন কাজ ছিল। আমি স্রেফ এক শহর থেকে আরেক শহর ছুটে বেরিয়েছি, কোন গন্তব্য মাথায় ছিল না। দুনিয়া অনেক বড়। অনেক আজব আজব জিনিস আর অদ্ভুত মানুষে ভর্তি। একবার মিদোরিকে ফোন করলাম কারন ওর গলা শুনতে ইচ্ছে করছিল খুব।

"ক্লাস শুরু হয়েছে সেই কবে, জানো সেটা?" বলল সে। "অনেক কোর্স ইতিমধ্যে পেপারস চাচ্ছে। তুমি করছোটা কি? তুমি কি জানো পুরো তিন সপ্তাহ তোমার কোন খবর নেই? কোথায় তুমি? কি করছো?"

"সরি, কিন্তু আমি এখন টোকিওতে ফিরতে পারছি না।"

"এটুকুই তুমি আমাকে বলবে?"

'এর বেশি আপাতত কিছু বলতে পারছি না। সম্ভবত অক্টোবরে..."

মিদোরি আর কিছু না বলে ফোন রেখে দিল।

আমি আমার যাত্রা চালিয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে সস্তা ধরনের হোটেলে উঠে গোসল করতাম, শেভ করতাম। আয়নায় নিজের চেহারা ভয়াবহ দেখাত। সূর্যের আলোয় আমার চামড়া পুড়ে গিয়েছিল, চোখ বেরিয়ে এসেছিল, হাড্ডিসার মুখে ভাঁজ আর দাগ পড়েছিল। আমাকে দেখে মনে হতে পারে হামাগুড়ি দিয়ে গুহা থেকে বের হয়ে এসেছি। কিন্তু তারপরেও মানুষটা আমিই ছিলাম।

সেই সময়ে আমি সমুদ্র তীর ধরে টোকিও থেকে যত দূরে সম্ভব সরে যাচ্ছিলাম। সম্ভবত ততোতোরি কিংবা হিওগো এর উত্তর তীরের দিকে কোথাও। সমুদ্র তীর ধরে হাঁটা সহজ। সবসময়ই বালিতে ঘুমানোর মত ভালো জায়গা খুঁজে পাওয়া যায়। পানিতে ভেসে আসা কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো যায় আর এলাকার জেলেদের থেকে শুকনো মাছ কিনে পুড়িয়ে খাওয়া যায়। তারপর আমি হুইস্কি খেতে খেতে নাওকোর কথা ভাবতাম, সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শুনতাম। আমার ভাবতে অদ্ভুত লাগত যে, সে আর বেঁচে নেই, এই পৃথিবীর অংশ নয় সে। আমার হজম হত না ব্যাপারটা। বিশ্বাস হতে চাইত না সত্যটা। আমি ওর কফিনে পেরেক গাঁথতে শুনেছি কিন্তু তাও বিশ্বাস করতে পারিনি সে আর ফিরবে না।

না, তার ছবি আমার স্মৃতিতে একদম পরিস্কার। আমি এখনো পরিস্কার দেখতে পাই সে আমার লিঙ্গ মুখে নিচ্ছে, তার চুল আছড়ে পড়ছে আমার পেটের উপরে। আমি তার উষ্ণতা এখনো অনুভব করি, তার শ্বাস ফেলা অনুভব করি আর অনুভব করি সেই অসহায় মুহূর্ত যখন বীর্য ত্যাগ করা ছাড়া আমার কিছু

করার ছিল না। আমার মনে সবকিছু এমনভাবে ভেসে আসতো যেন মাত্র পাঁচ মিনিট আগেই সব ঘটেছে। আমার মনে হত নাওকো এখনো আমার পাশেই আছে, চাইলেই তাকে ছোঁয়া যাবে। কিন্তু না সে আর সেখানে নেই, তার শরীর আর এ পৃথিবীতে নেই।

রাতে যখন ঘুম আসতো না, নাওকোর ছবি আমার মনে ফিরে ফিরে আসতো। থামানোর কোন উপায় ছিল না। ওর অনেক স্মৃতি আমার ভেতর জমে আছে, কোনভাবে একটা মুক্তি পেলে বাকিগুলোও অন্তহীন স্রোতের বেরিয়ে আসতো। বৃষ্টির দিনে হলুদ রেইন কোট পরে ওর বার্ড হাউজ পরিস্কার করার দৃশ্য, পাখির খাবারের ব্যাগ বহন করা, জন্মদিনের কেক, কেঁদে আমার শার্ট ভিজিয়ে ফেলা (সেদিনও বৃষ্টি হচ্ছিল), শীতকালে উটের লোমের কোট পড়ে আমার পাশাপাশি হাঁটা, যে ব্যারেট তা সবসময় পরে থাকতো সেটা হাত দিয়ে ছোঁয়া, ওর পরিস্কার গভীর দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকা, সোফায় বসে থাকা, নিল নাইটগাউন পরে পা ভাঁজ করে হাঁটুতে গাল রেখে বসে থাকার দৃশ্য।

স্মৃতিগুলো যেন একটার পর একটা ঢেউয়ের মত এসে আমার উপর আছড়ে পড়তো। ভাসিয়ে নিয়ে যেত নতুন কোন অদ্ভুত স্থানে যেখানে আমি একজন মৃত মানুষ নিয়ে বাস করছিলাম। সেখানে নাওকো জীবিত ছিল, আমি তার সাথে কথা বলতে পারতাম, তাকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করতে পারতাম। মৃত্যুর সেখানে কোন সমাপ্তি হিসেবে ছিল না। জীবনের অনেকগুলো অংশের একটা ছিল মৃত্যু। নাওকো মৃত্যু ভেতরে নিয়ে সেখানে জীবিত ছিল। আর সে আমাকে বলতো "চিন্তা কোরো না, এ তো শুধু মৃত্যু। তোমাকে বিরক্ত করার সুযোগ দিও না একে।"

আমি সেই অদ্ভুত জায়গায় কোন দুঃখ বোধ করতাম না। মৃত্যু ছিল মৃত্যু, নাওকো ছিল নাওকো। "সমস্যা কি?" সে হেসে আমাকে প্রশ্ন করত। "আমি তো আছি, তাই না?" তার পরিচিত অঙ্গভঙ্গি আমার মনকে শান্ত করে তুলত। "মৃত্যু যদি এমন হয়," আমি নিজেকে বললাম, "তাহলে মৃত্যু খারাপ কি।" "তা সত্যি," নাওকো বলল। "মৃত্যু এমন কিছু নয়। মৃত্যু স্রেফ মৃত্যু। এখানে সব কিছু সহজ আমার জন্য।" অন্ধকারে আছড়ে পড়া ঢেউ আর আমার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাওকো কথা বলতো।

একসময় স্রোতে থেমে যেত, আর আমি সমুদ্র সৈকতে একা পড়ে থাকতাম। অসহায়, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, কষ্ট আমাকে গভীর অন্ধকারে

জড়িয়ে ধরত যতক্ষণ পর্যন্ত না কাঁদতে পারতাম। যতটা না কাঁদতাম তারচেয়ে মনে হত ঘামের মত অশ্রু বের হচ্ছে।

কিজুকির মৃত্যু থেকে আমি একটা জিনিস শিখেছি, আর আমি বিশ্বাস করি এটা একটা দর্শনের মত আমার অংশ হয়ে গেছে : "মৃত্যু জীবনের বিপরীত কিছু নয় বরং জীবনের স্বাভাবিক একটি অংশ।"

বেঁচে থেকে আমরা মৃত্যু প্রতিপালন করি। জীবনের অনেকগুলো সত্যের মধ্যে এটা একটা। নাওকোর মৃত্যু থেকে আমি যা শিখেছি তা হল প্রিয়জন হারানোর কষ্ট কোন সত্য ঢাকতে পারে না। কোন সত্য নয়, কোন আন্তরিকতা নয়, কোন শক্তি নয়, কোন অনুগ্রহ নয়, কেউ পারে না তা ঢাকতে। আমরা যা করতে পারি তা হল, শেষ পর্যন্ত দেখা আর এর থেকে শিক্ষা নেয়া। কিন্তু আমাদের শিক্ষা পরের কষ্টের জন্য কোন সাহায্য করবে না। রাতের ঢেউ আর বাতাসের শব্দ শুনতে শুনতে আমি দিনের পর দিন এইসব চিন্তায় নিজেকে কেন্দ্রিভুত করছিলাম। পিঠে ন্যাপ্সাক, চুলে বালি, আমি ক্রমশ পশ্চিমে সরে যাচ্ছিলাম, হুইস্কি, পানি আর রুটি খেয়ে জীবন ধারন করছিলাম।

এক ঝড়ো বাতাসের সন্ধ্যায়, আমি স্লিপিং ব্যাগ জড়িয়ে পরিত্যক্ত এক জাহাজের পাশে শুয়ে কাঁদছিলাম, এক তরুন জেলে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সে আমাকে সিগারেট সাধল, আমি নিলাম। গত একবছরের মধ্যে প্রথম ধূমপান। সে জানতে চাইলো আমি কেন কাঁদছি। আমি কিছু না ভেবে বলে ফেললাম যে আমার মা মারা গেছে। কষ্ট সহ্য করতে পারিনি তাই রাস্তায় নেমে এসেছি। সে গভীর সমবেদনা জানিয়ে তার বাসা থেকে বড় এক বোতল সাকি আর দুটো গ্লাস নিয়ে আসল।

বাতাসে ধূলো উড়ছিল আর আমরা সেখানে বসে সাকি খাচ্ছিলাম। সে বলল সে তার মাকে হারিয়েছে ষোল বছর বয়সে। তার মায়ের স্বাস্থ্য ভালো ছিল না কিন্তু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করতে হত তাকে। আমি তার গল্প অর্ধেক শুনলাম, সাকি গিললাম আর হু-হ্যাঁ শব্দ করে মাঝে মাঝে সায় দিলাম। আমার মনে হচ্ছিল অন্য দুনিয়ার গল্প শুনছি। কি বলছে এই লোক? ভাবতে ভাবতে আমি হঠাৎ ক্ষেপে গেলাম, অনেক রাগ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল গলা টিপে দেই ব্যাটার। তোর মাকে কে পাত্তা দেয়? আমি হারিয়েছি নাওকোকে! তার সুন্দর দেহ এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে! তোর মায়ের গল্প আমাকে কেন শোনাচ্ছিস?!

কিন্তু যেভাবে রাগ এসেছিল সেভাবেই চলে গেল। আমি চোখ বন্ধ করে জেলের অন্তহীন গল্প আধা আধা শুনছিলাম। একসময় আমাকে সে জিজ্ঞেস করল কিছু খেয়েছি কিনা। না, আমি বললাম, তবে আমার ব্যাগে রুটি, পনির, একটা টমেটো আর এক পিস চকলেট আছে। দুপুরে কি খেয়েছি সে জিজ্ঞেস করল। রুটি, পনির, টমেটো আর চকলেট, উত্তর দিলাম আমি। "এখানে অপেক্ষা করো," সে বলে দৌড়ে গেল। আমি তাকে থামানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু সে অন্ধকারে হারিয়ে গেল পেছনে না তাকিয়ে।

আমার যা করার ছিল তা হল সাকি চালিয়ে যাওয়া। তীরের বালি ফুটানো বাজির পোড়া কাগজে ভর্তি ছিল। পাগলে মত চিৎকার করে স্রোত এসে আছড়ে পড়ছিল তীরে। একটা হাড় জিরজিরে কুকুর লেজ নারতে নারতে আসল, আমার ছোট ক্যাম্প ফায়ারের আশেপাশে শুঁকল খাওয়ার কিছু আছে কিনা তারপর আবার উধাও হয়ে গেল।

আধঘন্টা পর সেই তরুন জেলে আবার ফিরে আসল। হাতে দুই বাক্স সুসি আর সাকির নতুন একটা বোতল। আমাকে বলল উপরের বাক্স থেকে খেতে কারন সেটায় মাছ আছে, নিচের বাক্সে খালি নরি রোল আর ভাজা তফু, সেগুলো কালকে পর্যন্ত নষ্ট হবে না। সে আমাদের গ্লাসগুলোতে নতুন বোতল থেকে সাকি ঢাললো। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপরের বাক্স থেকে সব খেয়ে ফেললাম, যদিও আমাদের দু-জনের জন্য যথেষ্ট খাবার ছিল সেটায়। সাকি খেয়ে যতটা মাতাল হওয়া সম্ভব আমরা হলাম, তারপর সে আমাকে ঘুমানোর জায়গা দেয়ার প্রস্তাব দিল কিন্তু আমি বললাম, এখানে একা ঘুমাতেই আমার ভালো লাগবে। চলে যাওয়ার আগে সে তার পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা পাঁচ হাজার ইয়েনের নোট বের করে আমার শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

"নাও," সে বলল, "ভালো কিছু কিনে খেও, তোমাকে ভয়াবহ দেখাচ্ছে।"

আমি তাকে বললাম সে আমার জন্য যথেষ্ট করেছে, তারপর আবার টাকা নিতে পারবো না আমি, কিন্তু সে ফেরত নিতে প্রত্যাখ্যান করল।

"টাকা নয়," সে বলল, "বলতে পারো এটা আমার অনুভূতি। বেশি চিন্তা কোরো না, রেখে দাও।"

রেখে দেয়া ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না, তাকে ধন্যবাদ জানালাম।

সে চলে যাওয়ার পর আমার হঠাৎ পুরনো গার্লফ্রেন্ডের কথা মনে পড়ে গেল

আমার, যার সাথে আমি প্রথম শুয়েছিলাম হাই-স্কুলের তৃতীয় বর্ষে থাকতে। তার সাথে আমি কত বাজে আচরন করেছি ভেবে গায়ে কাঁটা দিল। আমি কি কখনো ভেবেছি তার আবেগ তার অনুভূতি নিয়ে কিংবা তাকে আমি যে কষ্ট দিয়েছি তা নিয়ে? সে একটা মিষ্টি-লক্ষ্মি মেয়ে ছিল, কিন্তু আমি তা আমার স্বাভাবিক পাওনা হিসেবে নিয়েছি, তাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় একবারের জায়গায় দুবার ভেবে দেখিনি। কি করছে সে এখন? সে কি আমাকে মাফ করতে পেরেছে?

তীব্র বমি ভাব হল আমার, পুরনো জাহাজের পাশে গিয়ে বমি করলাম। অতিরিক্ত সাকির কারনে মাথা দপদপ করছিল, জেলেকে মিথ্যা বলার জন্য আর তার টাকা নেয়ার জন্য খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল এখনই টোকিও ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে আমার। এভাবে সারাজীবন চলতে পারবো না। আমি স্লিপিং ব্যাগ ন্যাপস্যাকে ভরে পিঠে নিয়ে হেঁটে কাছের রেল স্টেশনে গেলাম। টিকেট কাউন্টারের লোকটাকে বললাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টোকিও পৌছাতে চাই। সে শিডিউল দেখে বলল আমি যদি রাতে ট্রেন বদল করি তাহলে সকালের মধ্যে ওসাকা পর্যন্ত পৌছাতে পারবো, তারপর সেখান থেকে বুলেট-ট্রেন নিতে হবে। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে জেলের দেয়া পাঁচ হাজার ইয়েনের নোটটা ভেঙে টিকেট কাটলাম। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে খবরের কাগজ কিনলাম আমি। পত্রিকায় তারিখ দেখি ২রা অক্টোবর, ১৯৭০। তারমানে আমি পুরো এক মাস ধরে ঘুরছি। বুঝতে পারলাম আমাকে আসল দুনিয়ায় ফিরে যেতে হবে।

এক মাসের ঘোরাঘুরি আমার আত্মাকে খুব বেশি হালকা করতে মপারেনি কিংবা নাওকোর মৃত্যুর ধাক্কাটাকেও প্রশন করতে পারেনি। যেভাবে টোকিও ফেলে গিয়েছিলাম প্রায় সে অবস্থাতেই ফিরে এলাম। মিদোরিকে ফোন করার সাহস হচ্ছিল না আমার। কি বলতে পারতাম আমি ওকে? কিভাবে শুরু করতাম? "সব শেষ, তুমি আমি এখন সুখে শান্তিতে বাস করতে পারবো?" না, প্রশ্নই উঠে না। যেভাবেই আমি সাজাই না কেন, সত্য একই থাকে। নাওকো বেঁচে নেই আর মিদোরি এখনো বেঁচে আছে। নাওকো এখন একদলা ছাই, অন্যদিকে মিদোরি রক্ত মাংসের জ্যান্ত একজন মানুষ।

নিজের অপবিত্রতা আমাকে পরাস্ত করে ফেলেছিল। টোকিওতে ফিরে আসলেও কয়েকদিন আমি কিছুই করিনি দরজা বন্ধ করে বসে থাকা ছাড়া। জীবিত বাদ দিয়ে মৃতের স্মৃতি ধরে বসে ছিলাম। নাওকোর জন্য যে জায়গা করেছিলাম তা গুঁড়িয়ে গেছে। আসবাব পড়ে আছে, জানালায় ধূলো। আমি

এসব জায়গায় প্রতিদিন সময় কাটালাম, কিজুকির কথা ভাবলাম : শেষ পর্যন্ত তুমি নাওকোকে নিজের করে নিলে।

আবিষ্কার করলাম আমি তাকে এ কথা বলছি।

শুরুতে তো সে তোমারই ছিল। এখন সে তার জায়গা ফিরে পেয়েছে। কিন্তু এই দুনিয়ায়, এই ত্রুটিপূর্ণ দুনিয়ায়, আমি আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব নাওকোর জন্য, সব করেছি। আমি চেষ্টা করেছি আমাদের জন্য নতুন জীবন তৈরি করার। বাদ দাও নাওকো, তাকে তোমার কাছে দিয়ে দিচ্ছি। শেষ পর্যন্ত সে তো তোমাকেই বেছে নিয়েছে, তাই না। তার মনের গহীন বনে সে নিজেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। একসময় তুমি আমার একটা অংশ মৃতের দুনিয়ায় টেনে নিয়ে গিয়েছিলে এখন নাওকো আরেকটা অংশ টেনে নিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমি বোধহয় জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক–একটা বিশাল, শূন্য জাদুঘর, যেখানে কেউ আসে না অথচ আমি নিজের জন্য এর দেখাশোনা করি।

টোকিও ফেরার চারদিন পর রেইকোর চিঠি পেলাম। স্পেশাল ডেলিভারি। ছোট একটা নোট 'তোমার সাথে অনেকদিন ধরে যোগাযোগের চেষ্টা করছি পাচ্ছি না, আমি চিন্তায় আছি। দয়া করে আমাকে ফোন কোরো। সকাল নয়টা কিংবা রাত নয়টা। আমি ফোনের কাছে বসে থাকবো।'

আমি সেদিন রাত নয়টায় ফোন করলাম। এক রিং হতেই ধরলো রেইকো।

"তুমি ঠিক আছো তো?" জানতে চাইলো সে।

"মোটামুটি আছি আর কি," বললাম তাকে।

"আমি যদি তোমাকে পরশুদিন দেখতে আসি সমস্যা আছে?"

"দেখতে আসি মানে? এখানে, টোকিওতে?"

"হ্যাঁ, টোকিওতে। তোমার সাথে অনেক কথা আছে আমার।"

"তুমি ওই জায়গা ছেড়ে যাচ্ছো?"

"তোমাকে দেখতে আসলে তো ছাড়তেই হবে, নাকি? যাহোক, এমনিতেও এ জায়গা ছাড়ার সময় হয়েছে আমার। কম তো থাকলাম না, আট বছর। এর বেশি থাকলে আমার পচন ধরবে।"

আমি কোন কথা বলতে পারছিলাম না। একটু চুপ করে থেকে রেইকো বলল, "আমি পরশুর তিনটা বিশের ট্রেনে আসবো। তুমি কি আমার সাথে স্টেশনে দেখা করতে পারবে? তোমার কি আমার চেহারা মনে আছে? নাকি নাওকোর মৃত্যুর পর আমার প্রতি আর আগ্রহ নেই?"

"মোটেই না," বললাম তাকে। "পরশু তিনটা বিশে দেখা হবে।"

"তোমার যদি আমাকে চিনতে কষ্ট হয়, খেয়াল রেখো গিটার কেস হাতে থাকবে আমার। এরকম গিটারওয়ালা বুড়ি মহিলা আজকাল আর খুব বেশি দেখা যাবার কথা নয়।"

সত্যি বলতে ভিড়ের মধ্যে রেইকোকে খুঁজে পেতে কোন সমস্যাই হয়নি। তার পরনে ছিল ছেলেদের টুইড জ্যাকেট, সাদা শ্লাক্স আর লাল স্নিকারস। তার চুল বরাবরের মত ঝোপ হয়ে ছিল কিন্তু আগের চেয়ে ছোট করে কাটা। সে আমাকে দেখামাত্র বড় একটা হাসি দিল, আমি নিজেও খেয়াল করলাম, আমি হাসছি। ওর সুটকেসটা হাতে নিয়ে ওর পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম লোকাল ট্রেন ওঠার জন্য।

"এই ওয়াতানাবে, তোমার চেহারার এই ভয়াবহ অবস্থা কতদিন ধরে? নাকি এটা টোকিওর নতুন স্টাইল?"

"আমি বেশ কিছুদিন বাইরে ঘোরাঘুরি করেছি, আর পুরোটা সময় হাবিজাবি খেয়েছি," বললাম তাকে। "তোমার বুলেট-ট্রেন কেমন লাগল?"

"জঘন্য!" বলল সে। "জানালা খোলা যায় না কিছু না। আমি প্লাটফর্মের ফেরিওয়ালার থেকে বক্স লাঞ্চ কিনতে চেয়েছিলাম।"

"তুমি কি জানো তারা এখন ট্রেনেই খাবার বিক্রি করে।"

"হ্যাঁ, আজাইরা দামি প্লাস্টিকের স্যান্ডউইচ বিক্রি করে। একটা ক্ষুধার্ত ঘোড়াও ওসব ছুঁয়ে দেখবে না। আমার সবসময় গোতেনবা স্টেশনের বক্সলাঞ্চ ভালো লাগত।"

"অনেক আগের কথা সেটা, বুলেট-ট্রেন আসার আগে।"

"আমিও অনেক আগের সময়ের মানুষ, বুলেট ট্রেনেরও আগের।"

কিচিজোজি যাওয়ার পথে রেইকো কৌতূহলি পর্যটকের মত ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে থাকল।

"আট বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে?" জানতে চাইলাম আমি।

"তোমার কোন ধারনা নেই আমার এখন কেমন লাগছে। তাই না, ওয়াতানাবে?"

"না, নেই।"

"আমার ভয় লাগছে," সে বলল, "অনেক ভয়, পাগল হয়ে যেতে পারি। আমি জানি না আমি কী করবো অথচ এতদূর চলে এসেছি," সে একটু দম নিল।

"কিন্তু পাগলের মত ছুটে যাওয়া মনে হয় ভালোই, কি বলো?"

আমি হেসে ওর হাত ধরলাম, "চিন্তা কোরো না, তোমার কিছু হবে না, নিজের শক্তিতে তুমি এতদূর এসেছো।"

"ওই জায়গা থেকে বের হতে আমার নিজের শক্তির প্রয়োজন ছিল না," রেইকো বলল। "তোমার আর নাওকোর জন্য পেরেছি। ওখানে নাওকো ছাড়া থাকতে পারছিলাম না। আর এখানে এসেছি তোমার সাথে কথা বলতে। এরকম কিছু না হলে হয়ত সারাজীবন ওখানেই কাটিয়ে দিতাম।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"এখন তুমি কি করবে?" রেইকোকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"আসিকাওয়া যাবো," বলল সে। "হোক্কাইডর বনের ভেতর! আমার কলেজের এক পুরনো বন্ধু ওখানে একটা মিউজিক স্কুল চালায়, দু-তিন বছর ধরে সে আমাকে বলছিল তাকে গিয়ে সাহায্য করার জন্য। আমি তাকে বলেছিলাম জায়গাটা আমার জন্য অনেক ঠান্ডা। মানে, মাত্র আমি আমার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছি আর এখন কিনা আসিকাওয়া যেতে হবে? এরকম একটা জায়গায় যেতে কারোরই আগ্রহ থাকার কথা না–মাটির মধ্যে গর্তর মত একটা জায়গা।"

"মোটেও তেমন বাজে জায়গা না," হাসতে হাসতে বললাম। "আমি গিয়েছি ওখানে। ছোট শহর কিন্তু খারাপ না। অন্যরকম একটা নিজস্ব পরিবেশ আছে সেখানে।"

"তোমার তাই ধারনা?"

"অবশ্যই টোকিওতে থাকার চেয়ে ভালো জায়গা।"

"তাহলে ভালো," সে বলল, "আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই অবশ্য। জিনিসপত্রও ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওয়াতানাবে আমাকে কথা দাও, আমাকে দেখতে যাবে আসিকাওয়াতে।"

"নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু এখনই যেতে হবে নাকি? কিছুদিন টোকিওতে থাকতে পারবে না?"

"আমি এখানে কয়েকদিন থাকতে চাই যদি সম্ভব হয়। তোমার সাথে থাকা যাবে? আমি কোন ঝামেলা করবো না।"

"কোন সমস্যা নেই," আমি বললাম, "আমার বিশাল একটা ক্লজিট আছে, স্লিপিং ব্যাগে করে আরামসে ঘুমাতে পারবো সেখানে।"

“না না...কি বলো, সেটা করতে পারি না আমি।”

“না, বিশ্বাস করো, সত্যি বিশাল ক্রজিট।”

রেইকো পা দিয়ে গিটার কেসে তাল তুলল। “আসিকাওয়া যাওয়ার আগে আমাকে একটু খাপ খাইয়ে নিতে হবে সবকিছুর সাথে। এই দুনিয়ার সাথে আমি অভ্যস্ত নই। অনেক কিছুই আমি বুঝতে পারছি না, নার্ভাস লাগছে। আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো? তুমি ছাড়া আর কেউ নেই যার কাছে সাহায্য চাইতে পারি।”

“তোমার জন্য সব কিছু করতে রাজি আমি,” বললাম তাকে।

“আশা করছি তোমার রাস্তায় কোন সমস্যা সৃষ্টি করছি না আমি,” সে বলল।

“আমার কোন রাস্তা নেই যে তুমি সমস্যা করবে,” বললাম তাকে।

সে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল কিন্তু কিছু বলল না।

বাকি রাস্তা ট্রেনে বা বাসে আমাদের প্রায় কথা হলই না। টোকিও কতটা বদলে গেছে, রেইকোর মিউজিক কলেজে পড়ার সময়ের কথা, আর আমার আসিকাওয়া ট্রিপ নিয়ে দু-একটা কথা হল কেবল। কিন্তু নাওকোর ব্যাপারে কোন কথা হল না। প্রায় দশ মাস পর রেইকোকে দেখলাম কিন্তু ওর পাশে হাঁটতে গিয়ে আমার নিজেকে শান্ত লাগল, অদ্ভুত স্বস্তি বোধ করলাম। পরিচিত অনুভূতি আমার মনে হল। টোকিওর রাস্তায় নাওকোর সাথে হাঁটার সময় এরকম লাগত। আর নাওকো আর আমার যেমন মৃত কিজুকি ছিল, রেইকো আর আমার আছে মৃত নাওকো। এইসব চিন্তার কারনে আমার মুখে কোন কথা আসছিল না। রেইকো কিছুক্ষণ কথা চালিয়ে গেল। পরে সে যখন দেখল আমি কিছু বলছি না সে-ও চুপ করে গেল। বাসে আমরা কোন কথাই বললাম না।

সেদিন ছিল হেমন্তের শুরুর দিকের এক বিকেল। পরিস্কার আর স্পষ্ট আলো, জেমন্টা ছিল এক বছর আগে যখন আমি নাওকোকে দেখতে কিয়োটো গিয়েছিলাম। হাড়ের মত সরু সাদা মেঘ আর খোলা আকাশ। বাতাসের গন্ধ, আলোর রঙ, ঘাসের ছোট ছোট ফুল, শব্দের প্রতিধ্বনি আমাকে যেন বলছে হেমন্ত আবার ফিরে এসেছে। সেই সাথে আমার আর মৃতের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে চলেছে। কিজুকি এখনো সতের আর নাওকো একুশ। সবসময় তারা এমনটাই থাকবে।

বাস থেকে নেমে চারপাশে তাকিয়ে রেইকো বলল, “এরকম জায়গায় আসতে পেরে বাঁচলাম।”

"কারন এখানে কিছু নেই," আমি বললাম।

আমি পেছনের গেট দিয়ে বাগানের ভেতর আমার বাসায় নিয়ে আসলাম রেইকোকে। সে যা দেখে তাতেই মুগ্ধ হয়ে যায়।

"দারুন তো! এইসব শেল্‌ফ আর ডেস্ক তুমি নিজে বানিয়েছো?"

"হ্যাঁ," আমি চা ঢালতে ঢালতে বললাম।

"তোমার হাতের কাজ খুবই ভালো। আর তোমার বাসাও বেশ পরিস্কার!"

"স্টর্ম ট্রুপারের প্রভাব," বললাম তাকে। "সে আমাকে শূচিবায়ুগ্রস্ত করে ফেলেছে। বাড়িওয়ালা অবশ্য অভিযোগ করেছে না।"

"ওহ্, তোমার বাড়িওয়ালা! তার সাথে পরিচিত হতে হবে। বাগানের ওই পাশে থাকে তাই না?"

"তার সাথে পরিচিত হতে হবে কেন?"

"কেন মানে কি? তোমার বাসায় একজন অদ্ভুত বয়স্ক মহিলা উঠে এসে থাকা শুরু করেছে, গিটার বাজাচ্ছে, তোমার বাড়িওয়ালার মনে হবে না ঘটনা কি? তারচেয়ে ঠিকভাবে জানানোই ভালো হবে। আমি এমনকি তার জন্য এক বাক্স মিষ্টিও এনেছি চায়ের সাথে খাওয়ার জন্য।"

"খুব চালাক তো তুমি," আমি বললাম।

"বয়সের সাথে বুদ্ধিও বাড়ে। আমি তাকে বলবো, আমি তোমার খালা হই। কিয়েটো থেকে এসেছে তোমাকে দেখতে। তুমি আবার অন্যকিছু বলে ফেলো না। এইসব ব্যাপারে বয়সের পার্থক্য খুব কাজে আসে, কেউ সন্দেহ করে না।"

রেইকো তার ব্যাগ থেকে মিষ্টির বক্স বের করে বাড়িওয়ালার সাথে দেখা করতে গেল। আমি বারান্দায় বসে আরেক কাপ চা খেলাম আর বিড়ালের সাথে খেললাম। মিনিট বিশেক পরে ফিরে এসে ব্যাগ থেকে এক টিন রাইস ক্রেকার বের করে আমাকে বলল আমার জন্য উপহার।

"এতক্ষণ কি নিয়ে এত কথা বললে তুমি?" ক্রেকার চাবাতে চাবাতে জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"তোমাকে নিয়ে কথা বললাম আর কি," রেইকো বলল। বিড়ালটাকে কোলে তুলে মুখের সাথে ঘষল সে। "উনি বললেন তুমি একজন ভদ্র ছেলে। সিরিয়াস ছাত্র।"

"তুমি নিশ্চিত উনি আমার কথাই বলছিলেন তো?"

"কোন সন্দেহ নেই, উনি তোমার কথাই বলছিলেন," হাসতে হাসতে বলল

রেইকো। তারপর ও আমার গিটার খেয়াল করল। হাতে নিয়ে টিউন ঠিক করে আন্টোনিও কার্লোস জবিমের *দেজাফিনাদো* বাজাল। অনেক মাস পরে রেইকোর বাজানো শুনলাম, আগের মতই ভালো লাগল।

"তুমি গিটার প্র্যাকটিস করো?" জানতে চাইলো সে।

"এটা আসলে বাড়িওয়ালার গুদামে পড়েছিল, আমি এনে ঠিক করে দু একবার বাজিয়েছি, ওইটুকুই।"

"আমি তোমাকে পরে লেসন দেবো তাহলে। একদম ফ্রি," গিটার নামিয়ে রেখে টুইড জ্যাকেটটা খুলল রেইকোর। বারান্দার পিলারে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরালো। ওর পরনে ছোট হাতার মাদ্রাস শার্ট।

"সুন্দর শার্ট, তাই না?" জানতে চাইলো সে।

"হ্যাঁ," বললাম আমি। শার্টটা আসলেই সুন্দর। উপরে সুন্দর প্যাটার্ন করা।

"শার্টটা নাওকোর," রেইকো বলল। "বাজি ধরে বলতে পারি তুমি জানতে না আমাদের সাইজ একই। অন্তত প্রথম সে যখন স্যানিটরিয়ামে আসে তখন। এরপর ওর ওজন একটু বেড়েছিল, কিন্তু তারপর আমরা মোটামুটি একই সাইজের সব কিছু পরতাম : ব্লাউজ, স্লাক্স, জুতো, হ্যাট। একমাত্র ব্রা আমাদের এক হত না। আমার বুকে কিচ্ছু নেই বলা যায়। তো, আমরা সবসময় একজন আরেকজনের জামাকাপড় পরতাম। বলা যায় যৌথ মালিকানা ধরনের ছিল।"

এখন সে বলার পর আমি খেয়াল করলাম রেইকোর শারীরিক গঠন প্রায় নাওকোর মতই। ওর মুখ আর চিকন হাত-পায়ের জন্য আমার সবসময় মনে হয়েছে সে নাওকোর চেয়ে চিকন আর খাটো।

"জ্যাকেট আর প্যান্টও ওর," রেইকো বলল। "সবকিছুই ওর। ওর পোশাক আমাকে পরতে দেখে কি তোমার বিরক্ত লাগছে?"

"একদমই না। আমি নিশ্চিত ওর পোশাক তুমি পরছো জানলে সে খুশিই হত।"

"ব্যাপারটা অদ্ভুত," আঙুল মটকিয়ে বলল রেইকো। "নাওকো কোন দলিল বা সেরকম কিছু রেখে যায়নি। কিন্তু এক লাইনের এক মেমো লিখে রেখে গেছে তার ডেস্কে। 'আমার সব জামা কাপড় রেইকোকে দিয়ে দিও'...হাস্যকর কাজ না? সে যখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন জামাকাপড় নিয়ে কেন ভাবছিল? জামাকাপড়ের কথা কে চিন্তা করে? তার নিশ্চয়ই আরও হাজারটা চিন্তা ছিল লেখার জন্য।"

"মনে হয় না," আমি বললাম।

রেইকো কিছু একটা ভাবতে ভাবতে সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে হারিয়ে গেল। তারপর বলল, "তুমি মনে হয় পুরো ঘটনাটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জানতে চাও।"

"হ্যাঁ, চাই," বললাম আমি। "প্লিজ, সব খুলে বলো আমাকে।"

ওসাকার হাসপাতালের টেস্ট রেজাল্ট বলছিল নাওকোর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে কিন্তু তাকে বেশি সময় সেখানে থাকতে হবে যাতে তারা ওর ভবিষ্যতের ভালোর জন্য ইন্টেন্সিভ থেরাপি দিতে পারে। আগস্টের দিকে আমি যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম তোমাকে সেখানে এসব বলেছি।"

"হ্যাঁ, চিঠিতে পড়েছিলাম সেসব।"

"তারপর আগস্টের চব্বিশ তারিখে নাওকোর মা আমাকে ফোন করে বললেন নাওকো যদি আমাকে দেখতে স্যানাটরিয়ামে আসে তাহলে কোন সমস্যা আছে কিনা। নাওকো এসে তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে চায় আর যেহেতু অনেকদিন আমার সাথে দেখা হবে না তাই আমার সাথেও লম্বা কথা বলতে চায়। হয়ত এক রাত থাকতে পারে অ্যাপার্টমেন্টে। আমি জানালাম কোন সমস্যা নেই। আমিও ওকে দেখতে চাই, কথা বলতে চাই। তো, পরের দিন পঁচিশ তারিখে নাওকো আর ওর মা আসল একটা ট্যাক্সি নিয়ে। আমরা তিনজন একসাথে গল্প করতে করতে নাওকোর জিনিসপত্র গোছালাম। সেদিন বিকেলে নাওকো ওর মা কে বলল বাসায় চলে যেতে, সে এখানে ঠিক আছে। তো একটা ট্যাক্সি ডেকে এনে ওর মা চলে গেল। আমরা কোন দুশ্চিন্তা করিনি কারন নাওকোকে ফুরফুরে লাগছিল। বরং ও আসার আগ পর্যন্ত আমি চিন্তিত ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম ও ম্লান আর বিষন্ন হয়ে থাকবে। কারন আমি জানি এসব হাসপাতালে টেস্ট আর থেরাপি কিরকম হয়, একদম ধরাশায়ি করে ফেলবে তোমাকে। সে দেখা করতে পারবে কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু ওর দিকে একবার তাকিয়েই আমি বুঝতে পারলাম সে ঠিক আছে। ওর স্বাস্থ্য অনেক ভালো দেখাচ্ছিল, হাসিখুশি ছিল, মজা করছিল, আগে আমরা ওকে যেমন দেখেছি। সে বিউটি পার্লারে গিয়েছিল, সেখান থেকে করা নতুন চুলের স্টাইল দেখাল। তাই আমি ভাবলাম ওর মা না থাকলেও চিন্তার কিছু নেই। নাওকো বলল এইবার সে হাসপাতালের ডাক্তারদের সাহায্যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে, আমি বললাম এরচেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। তারপর আমরা দু-জন

হাঁটতে গেলাম, সারাক্ষন কথা বললাম, বিশেষ করে ভবিষ্যৎ নিয়ে। নাওকো বলল সে চায় আমরা দু-জনেই স্যানাটরিয়াম থেকে বের হয়ে কোথাও একসাথে লিভ টুগেদার করবো।"

"লিভ টুগেদার? তুমি আর নাওকো?"

"হ্যাঁ," রেইকো শ্রাগ করল। "আমি বললাম শুনতে ভালো লাগছে কিন্তু ওয়াতানাবের কি হবে? সে বলল, 'চিন্তা কোরো না, ওকে আমি বুঝিয়ে বলবো।' এই তো। তারপর সে কথা বলল কোথায় আমরা থাকবো, কি করবো এইসব ব্যাপার নিয়ে। এরপর আমরা বার্ড হাউজে গিয়ে পাখি নিয়ে খেললাম।"

আমি ফ্রিজ থেকে বিয়ার বের করে খুললাম। রেইকো আরেকটা সিগারেট ধরালো। বিড়ালটা ওর কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

"মেয়েটা সব নিজে নিজে ভেবে ঠিক করে রেখেছিল। সেজন্যই ওকে এত সতেজ দেখাচ্ছিল। তার মন ভারমুক্ত ছিল। সে জানত সে ঠিক কি করতে যাচ্ছিল। ওর জিনিসপত্র গোছান শেষ হলে যা যা অপ্রয়োজনীয় সব একটা ড্রামে আমরা পুড়িয়ে ফেলছিলাম। একটা নোটবুকে ও ডায়েরি লিখত, সব চিঠি সেটার ভেতর রাখত। তোমার চিঠিগুলোও। আমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লেগেছিল, আমি ওকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম এসব কেন পোড়াচ্ছে। মানে, তোমার চিঠির ব্যাপারে সে কিরকম যত্নশীল ছিল সেটা তো আমি জানি। নিরাপদ জায়গায় ওগুলো রাখত আর বার বার বের করে পড়তো। সে বলল 'আমি আমার অতীতের সব কিছু থেকে মুক্তি চাই, যাতে ভবিষ্যতের জন্য আবার জন্ম নিতে পারি।' আমি ওর কথা বিশ্বাস করেছিলাম। তার কথায় যুক্তি ছিল। আমার মনে আছে, তাকে আমি সুস্থ আর সুখি দেখতে চেয়েছিলাম। সেদিন সে খুবই চমৎকার ছিল : তুমি যদি তাকে সেদিন দেখতে পেতে!

"সেসব শেষ হলে আমরা বরাবরের মত ডাইনিং হলে গেলাম ডিনার করতে। তারপর গোসল করলাম আমরা। আমি ভালো একটা ওয়াইনের বোতল খুললাম যেটা আমি বিশেষ কোন মুহূর্তের জন্য জমা করে রেখেছিলাম। আমরা পান করলাম, আমি গিটার বাজালাম। সবসময়ের অবশ্যই মত বিটল্‌স। *নরওয়েজিয়ান* উড, *মিশেল*...ওর প্রিয় গানগুলো। আমাদের দু-জনেরই বেশ ভালো লাগছিল। তারপর বাতি নিভিয়ে পোশাক খুলে আমরা আমাদের বিছানায় গেলাম। অনেক গরম ছিল সে রাতে। আমাদের জানালা খোলা ছিল, কিন্তু বাতাস ছিলই না বলা চলে। বাইরে গাঢ় অন্ধকার, ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছিল।

বাতাসে ভেসে আসছিল ঘাসের গন্ধ, এতই তীব্র ছিল যে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তারপর হঠাৎ নাওকো তোমার কথা শুরু করল–যে রাতে তোমার সাথে সেক্স করেছিল। একদম বিস্তারিত বর্ণনা। কিভাবে তুমি ওর পোশাক খুললে, কিভাবে তুমি ওকে স্পর্শ করলে, কিভাবে ও নিজেকে উত্তেজিত অবস্থা আবিষ্কার করলো, কিভাবে তুমি ওর ভেতরে ঢুকলে, তার কত ভালো লেগেছিল : সবকিছু সে আমাকে বিস্তারিত বলল। আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, 'হঠাৎ আমাকে এসব শোনাচ্ছো যে?' মানে ততদিন পর্যন্তও সে কখনো আমাকে সেক্স সম্পর্কে খোলাখুলি কিছু বলেনি। অবশ্যই সেক্স নিয়ে আমাদের কথা হয়েছে এর আগে থেরাপির মত করে। কিন্তু সে এসব নিয়ে কথা বলতে বিব্রত বোধ করত সবসময়। আর সেদিন তাকে থামানোই যাচ্ছিল না। আমি একটু ধাক্কা খেয়েছিলাম।

"তো, সে বলল, 'আমি জানি না, হঠাৎ বলতে ইচ্ছে হল তাই বললাম। তুমি না শুনতে চাইলে বলবো না।' "

"আমি বললাম, 'না না, ঠিক আছে। তুমি যদি মনে করো তুমি কিছু বলতে চাও তাহলে বলে ফেলাই ভালো, আমি সবকিছু শুনতে প্রস্তুত আছি।'

"সে তার কাহিনী চালিয়ে গেল। 'সে যখন আমার ভেতর ঢুকলো, আমি ভাবতেও পারিনি এত ব্যথা করবে। হাজার হোক আমার প্রথমবার। আমারটা ভেজা ছিল, সে পিছলে ঢুকে গেল ঠিকই কিন্তু তারপরও ব্যথায় আমার মাথা গুলিয়ে গেল। আমি ভাবলাম, সে বোধহয় যতটুকু সম্ভব ততটুকু ঢুকিয়েছে, কিন্তু না, আমার পা তুলে আরো ভেতরে গেল সে। আমার সারা শরীরে শীতল কিছু বয়ে গেল। যেন আমাকে বরফ পানিতে চুবানো হয়েছে। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার কী হচ্ছে, মনে হচ্ছিল সেখানেই মারা যাবো। কিন্তু সে যখন আমার ব্যথা বুঝতে পারল তখন নড়াচড়া বন্ধ করে দিল। যদিও তখন আমার ভেতরে সে। আমাকে চুমু খেতে শুরু করল সবখানে–আমার চুলে, গলায়, বুকে–অনেকক্ষন ধরে, অনেকক্ষণ। আস্তে আস্তে আমার দেহ আবার উষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে আবারও নড়তে লাগল সে। ওহ্, রেইকো! তোমাকে বোঝাতে পারবো না কি অসাধারন অনুভূতি! মনে হচ্ছিল আমার মগজ গলে যাবে। পারলে আমি সেভাবেই থাকতে চাইছিলাম। সারাজীবনের জন্য তার বুকের মধ্যে জড়িয়ে থাকতে। এত দারুন ছিল...'

"তো আমি তাকে বললাম, 'এতই যখন দারুন ছিল তাহলে তুমি

ওয়াতানাবের সাথে কেন থাকলে না, প্রতিদিন করলে না?'

"কিন্তু সে বলল, 'না, রেইকো। আমি জানতাম এরকম আর হবে না। আমি জানতাম এরকম কিছু একবার আমার কাছে আসবে, আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, আর কখনো ফিরে আসবে না। জীবনে একবার। আমি এরকম আগে কখনো অনুভব করিনি, এরপরেও আর কখনো অনুভব করিনি। আমার আর কখনো মনে হয়নি আমি আবার করতে চাই। আমি আর ওরকম উত্তেজিত হতে পারিনি কখনও।'

"অবশ্যই আমি তাকে বোঝালাম, অনেক অল্পবয়সি মেয়েদের এমন হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বয়স হলে সমস্যা কেটে যায়। তাছাড়া একবার যখন হয়েছে আবার না হওয়ার কোন কারন নেই। আমি যখন বিয়ে করেছিলাম আমারও অনেক রকম সমস্যা হয়েছিল।'

"কিন্তু সে বলল, 'না রেইকো, সেরকম ব্যাপার না, আমি মোটেই চিন্তিত নই। আমি স্রেফ চাই না কেউ আমার ভেতর আবার ঢুকুক। আমি সেভাবে আবার ভাঙতে চাই না, কারো দ্বারাই না।'

আমি আমার বিয়ার শেষ করলাম, রেইকো ওর দ্বিতীয় সিগারেট শেষ করল। বিড়ালটা ওর কোলে আড়মোড়া ভেঙে নতুন ভঙ্গিতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। রেইকো মনে হল খেই হারিয়ে ফেলেছে বাকি অংশটা নিয়ে। তৃতীয় সিগারেট ধরিয়ে আবার শুরু করল সে।

"এরপর নাওকো ফুঁপাতে শুরু করল। আমি ওর বিছানায় বসে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম। 'চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মত সুন্দর মেয়ে অবশ্যই কাউকে পাবে যে তোমাকে সুখি করবে,' নাওকো ঘামে আর কান্নায় ভিজে গিয়েছিল। আমি একটা টাওয়েল এনে ওর মুখ আর শরীর মুছে দিলাম। এমনকি ওর প্যান্টিও ভিজে গিয়েছিল। আমি সেটাও খুলে নিলাম। এক মিনিট–অস্বাভাবিক কিছু ভেবে বোসো না, আমরা সবসময় একসাথে গোসল করতাম। ও আমার ছোট বোনের মত ছিল।"

"আমি জানি, আমি জানি," বললাম তাকে।

"যাহোক, নাওকো বলল সে চায় আমি তাকে জড়িয়ে ধরে থাকি। আমি বললাম জড়াজড়ি করার জন্য অনেক গরম, কিন্তু সে বলল শেষবারের মত আমাদের দেখা হচ্ছে। তাই আমি কিছুক্ষনের জন্য ওকে জড়িয়ে ছিলাম। আমাদের মধ্যে টাওয়েল রাখা ছিল যাতে ঘামে একজন আরেকজনের গায়ের

সাথে লেপ্টে না যাই। সে শান্ত হলে আমি ওকে আবার মুছিয়ে দিলাম, নাইটগাউন পরিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। কিংবা হয়ত ঘুমের ভান করছিল। যেটাই হোক না কেন, তাকে ওই রাতে অনেক মিষ্টি আর সুন্দর দেখাচ্ছিল। যেন তের–চৌদ্দ বছরের এক মেয়ে, যে জন্মের পর থেকে কারো কোন ক্ষতি করেনি। আমার মনে হয়েছিল আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যেতে পারি।

"ভোর ছয়টায় যখন আমি ঘুম থেকে উঠলাম সে উধাও। তার নাইট গাউন ফেলে গিয়েছিল। কিন্তু তার পোশাক, স্নিকার আর আমার বালিশের কাছে একটা টর্চ থাকতো সেসব কিছু নেই। আমি সাথে সাথে বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা ঘাপলা আছে। সে টর্চ নিয়েছে মানে সে অন্ধকারে বের হয়েছে। আমি কিছু না ভেবেই ওর ডেস্ক পরীক্ষা করলাম দেখি নোট লেখা : 'আমার সব জামা-কাপড় রেইকোকে দিয়ে দিও।' আমি সাথে সাথে সবাইকে জাগিয়ে তুললাম, ভাগ ভাগ হয়ে ওকে খুঁজতে বের হলাম। পুরো জায়গা ইঞ্চি ইঞ্চি করে খুঁজলাম, ডরমের ভেতরে, সেই সাথে বাইরের বনেও। পাঁচ ঘন্টা লাগল ওকে খুঁজে বের করতে। সে তার নিজের সাথে দড়িও নিয়ে এসেছিল।" রেইকো দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর বিড়ালের গায়ে হাত বুলাল।

"চা খাবে?" জানতে চাইলাম আমি।

"হ্যাঁ, চা হলে খুব ভালো হয়, ধন্যবাদ," বলল সে।

আমি পানি গরম করে এক পট চা বানিয়ে বারান্দায় নিয়ে গেলাম। সূর্যাস্তের সময় হয়ে গিয়েছিল, দিনের আলো দূর্বল হয়ে পড়েছে, গাছের ছায়া লম্বা হয়ে আমাদের পায়ের কাছে এসে ঠেকছিল। আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বিভিন্ন রঙের গাছ আর ফুল মিলে অদ্ভুত এক চেহারার বাগান হয়েছে।

"তো, এরপর অ্যাম্বুলেন্স এসে নাওকোকে নিয়ে গেল। পুলিশ আমাকে জেরা করল। তেমন কোন প্রশ্ন করেনি অবশ্য। সুইসাইড নোটের মত একটা জিনিস তো ছিলই, আর তারা নিশ্চিত ছিল এটা আত্মহত্যা ছাড়া অন্যকিছু নয়। সবার মত তাদেরও ধারনা, মানসিক রোগি হলে আত্মহত্যা করবেই। সুতরাং পুরো ব্যাপারটা স্রেফ নথি করার জন্য করা। ওরা চলে যাওয়ার পর পরই আমি তোমাকে টেলিগ্রাফ পাঠালাম।"

"কি দুঃখজনক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হল ওর," বললাম আমি। "ওর পরিবার

বিব্রত বোধ করছিল যে, আমি জানি ও আত্মহত্যা করেছে। আমি নিশ্চিত ওরা কাউকে আত্মহত্যার কথা বলেনি। আমার হয়তো ওখানে যাওয়াই ঠিক হয়নি। আমার খারাপ লাগা আরও বেড়ে গিয়েছিল। ফিরে আশামাত্র আমি ব্যাগে জামাকাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম রাস্তায়।"

"আচ্ছা ওয়াতানাবে, একটু হাঁটতে গেলে কেমন হয়? তারপর আমরা ডিনারের জন্য বাজার করতে পারি হয়তো। আমার খিদেও লেগেছে।"

"ঠিক আছে। তোমার কি খেতে ইচ্ছে করছে?"

"সুকিয়াকি," সে বলল, "অনেক বছর খাইনি। সুকিয়াকি নিয়ে স্বপ্ন পর্যন্ত দেখতাম–মাংস আর কাঁচা পেঁয়াজ, নুডুলস, ভাজা টোফু গলায় ঢুকাচ্ছি।"

"ঠিক আছে, কিন্তু আমার তো সুকিয়াকি রান্না করার প্যান নেই।"

"সেসব আমার উপর ছেড়ে দাও। তোমার বাড়িওয়ালার থেকে ধার নেবো।"

সে ওই বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে একটা ভালো সাইজের প্যান আর রাবারের পাইপসহ গ্যাস কুকার নিয়ে আসল।

"খারাপ না, কি বলো?"

"আসলেই খারাপ না।"

আমরা পাড়ার ছোট দোকানগুলো থেকে সমস্ত উপকরন কিনলাম–গরুর মাংস, ডিম, সবজি, টফু। একটা মোটামুটি মানের হোওাইট ওয়াইন পছন্দ করলাম আমি। টাকা দিতে চাইলাম কিন্তু রেইকো জোর করে সবকিছুর দাম দিল।

"ভেবে দেখো, আমার পরিবার কি ভাববে যদি শোনে আমি আমার ভাগ্নেকে খাবারের দাম দিতে দিয়েছি!" বলল সে। "তাছাড়া আমার সাথে বেশ ভালো পরিমাণ টাকা আছে। সুতরাং চিন্তা কোরো না। ফকির হয়ে স্যানাটোরিয়াম থেকে বের হইনি।"

রেইকো চাল ধুয়ে সিদ্ধ করতে দিলে আমি বারান্দায় রান্নার সব ব্যবস্থা করলাম। সব কিছু প্রস্তুত হয়ে গেলে রেইকো তার গিটার নিয়ে একটা ধীর লয়ের বাখ বাজিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো। কঠিন অংশগুলোতে গিয়ে সে ইচ্ছে করে ধীরে অথবা দ্রুত বাজাতে লাগল যাতে আবেগ সৃষ্টি হয়। বাদ্যযন্ত্র থেকে বের হওয়া সুরে সে নিজেও তৃপ্তি পাচ্ছিল। গিটার বাজানো অবস্থায় ওকে সতের বছরের মেয়ের মত লাগছিল যে কিনা নতুন পোশাক পরে খুব খুশি। ওর চোখ

চকচক করছিল, হাসছিল মিটিমিটি। বাজানো শেষ হলে সে আবার গিয়ে খাম্বায় হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল, যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

"তোমার সাথে কথা বললে সমস্যা আছে?" বললাম তাকে।

"একদমই না," বলল সে, "আমি স্রেফ ভাবছিলাম কত খিদে লেগেছে আমার।"

"তোমার কি এখানে তোমার স্বামী কিংবা মেয়ের সাথে দেখা করার পরিকল্পনা আছে? তারা নিশ্চয়ই টোকিওর কোথাও থাকে।"

"কাছাকাছিই থাকে...ইয়োকোহামাতে। কিন্তু না, আমার দেখা করার কোন পরিকল্পনা নেই। আগে বলছি তোমাকে, আমার থেকে দূরে থাকলেই তাদের জন্য ভালো। তারা তাদের মত নতুন জীবন শুরু করেছে। তাদের দেখে আমার খারাপ লাগবে অনেক। সুতরাং সবচেয়ে ভালো দূরে দূরে থাকা।"

সে তার খালি সেভেন স্টারের প্যাকেটটা দুমড়ে ফেলে দিয়ে সুটকেস থেকে নতুন একটা প্যাকেট বের করল। একটা সিগারেট মুখে দিলেও ধরালো না।

"একজন মানুষ হিসেবে তুমি আমার যা দেখছো তা হচ্ছে আমি এক কালে যা ছিলাম তার স্মৃতিমাত্র," সে বলল। "আমার আসল অংশ, আমার ভেতরের অংশ অনেক আগেই মরে গেছে। আমি শুধু পুরনো স্মৃতির উপর চলছি।"

"কিন্তু আমি তোমাকে পছন্দ করি, রেইকো। তুমি এখন যেরকম...পুরনো স্মৃতি হোক না হোক। আর আমি কি বললাম তাতে কোন কিছু আসে যায় না। আমার ভালো লাগছে, তুমি নাওকোর পোশাকগুলো পরেছো।"

রেইকো হেসে লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরালো। "এরকম অল্পবয়স হওয়া সত্ত্বেও তুমি ভালোভাবেই জানো একজন নারীকে কিভাবে খুশি করতে হয়।"

আমি লাল হয়ে গেলাম। "যা সত্যি মনে করি তাই বলেছি।"

"তা আমি জানি," রেইকো হেসে বলল।

ভাত তৈরি হয়ে গেলে আমি প্যান আর অন্য উপকরন সাজালাম সুকিয়াকি বানানোর জন্য।

"আমাকে বলো আমি কোন স্বপ্ন দেখছি না এখন," গন্ধ শুঁকে বলল রেইকো।

"না, এটা একদম একশ ভাগ আসল সুকিয়াকি," আশ্বস্ত করলাম তাকে, "পরীক্ষা করেই বলছি।"

কথা বাদ দিয়ে আমরা চপস্টিক নিয়ে সুকিয়াকির উপর ঝাপিয়ে পড়লাম,

সাথে প্রচুর বিয়ার। ভাত দিয়ে শেষ করলাম আমাদের ভোজ। গন্ধ পেয়ে সিগাল চলে এলে ওকে মাংস দেয়া হল খেতে। পেট ভরে গেলে আমরা বারান্দায় হেলান দিয়ে বসে চাঁদ দেখতে লাগলাম।

"সন্তুষ্ট?" জানতে চাইলাম আমি।

"পুরোপুরি," উচ্ছ্বল হয়ে বলল সে। "আমার জীবনে আমি এত খাইনি কখনো।"

"এখন কি করতে চাও।"

"ধূমপান করবো আর পাবলিক বাথে গিয়ে গোসল করবো। আমার চুল নোংরা হয়ে আছে, পরিস্কার করতে হবে।"

"সমস্যা নেই, কাছেই একটা আছে।"

"আচ্ছা ওয়াতানাবে, যদি কিছু মনে না করো তাহলে একটা প্রশ্ন করি, তুমি কি ওই মেয়েটা...মিদোরির সাথে শুয়েছো শেষ পর্যন্ত?"

"তুমি বলতে চাও সেক্স করেছি কিনা? এখনো না। আমরা ঠিক করেছি সব কিছুর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কিছু করবো না।"

"এখন তো সব সমাধান হয়ে গেছে, তাই না?"

আমি মাথা নাড়লাম, "নাওকো বেঁচে নেই সেজন্য বলতে চাইছো?"

"না, সেজন্য নয়। নাওকো মারা যাওয়ার আগেই তুমি তোমার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছো–মিদোরিকে তুমি ছাড়তে পারবে না। নাওকো জীবিত না মৃত তার সাথে এই সিদ্ধান্তের কোন সম্পর্ক নেই। তুমি মিদোরিকে বেছে নিয়েছো। নাওকো বেছে নিয়েছে মৃত্যুকে। তোমরা সবাই এখন প্রাপ্তবয়স্ক, নিজের সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব নিতে শিখতে হবে তোমাদেরকে। নইলে সব কিছু নষ্ট করে ফেলবে।"

"কিন্তু আমি ওকে ভুলতে পারছি না," বললাম তাকে। "নাওকোকে বলেছিলাম আমি ওর জন্য অপেক্ষা করবো, কিন্তু আমি পারিনি। শেষ পর্যায়ে গিয়ে মুখ সরিয়ে নিয়েছি। আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু এই সমস্যা আমি নিজেই তৈরি করেছি। আমি মনে করি আমি মুখ না ফিরিয়ে নিলে হয়ত অন্য কিছু হতে পারতো। নাওকো প্রথম থেকেই মৃত্যুকে বেছে নিয়েছ। সেটা অন্য ব্যাপার। আমি আমাকে ক্ষমা করতে পারছি না। নাওকোর সাথে আমার সম্পর্ক কোন সাধারণ সম্পর্ক ছিল না, আমি যা অনুভব করছি সে-ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই। তুমি যদি চিন্তা করো তাহলে দেখবে জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানেই

সে আর আমি একজন আরেকজনের হাত ধরেছিলাম। প্রথম থেকেই ব্যাপারটা তা-ই ছিল।”

“নাওকোর মৃত্যুর জন্য তোমার মধ্যে যদি কোন অপরাধবোধের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে আমি তোমাকে পরামর্শ দেবো, ওই কষ্টের অনুভূতিটা সারাজীবন নিজের মধ্যে বহন করতে থাকো। এ থেকে যদি কিছু শিখতে পারো তাহলে শেখো। কিন্তু অন্যদিকে তোমাকে মিদোরিকে নিয়ে সুখি হতে হবে। তোমার কষ্টের সাথে ওর সাথে সম্পর্কের কোন যোগাযোগ নেই। তুমি যদি ওকে আরো কষ্ট দাও, এরমধ্যে যথেষ্ট দিয়েছ, তাহলে ক্ষত আরও গভীরই হবে, শুকোবে না কখনো। যত কঠিনই হোক, তোমাকে শক্ত হতে হবে। তোমাকে আরো বড় হতে হতে হবে। আমি স্যানাটোরিয়াম ছেড়ে এতদূর টোকিওতে এসেছি শুধু এই কথাগুলো তোমাকে বলার জন্য। কফিনের মত একটা ট্রেনে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে।”

“আমি বুঝতে পারছি তুমি আমাকে কি বলতে চাইছো,” রেইকোকে বললাম, “কিন্তু আমি এখনো তৈরি নই। কী দুঃখজনক বাজে একটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ছিল। কারো এরকমভাবে মৃত্যু হওয়ার কথা নয়।”

রেইকো আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। “আমাদের সবাইকে এভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে হবে কখনো না কখনো। আমাকেও...তোমাকেও।”

আমরা নদীর ধার ধরে মিনিট পাঁচেক হেঁটে লোকাল পাবলিক গোসলখানায় গেলাম আর সতেজ হয়ে ফিরে এলাম। ওয়াইনের বোতল খুলে বারান্দায় বসে খেলাম আমরা।

“আচ্ছা ওয়াতানাবে, তুমি আরেকটা গ্লাস আনতে পারবে?”

“নিশ্চয়ই, কিন্তু কেন?”

“আমরা আমাদের মত করে নাওকোর জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করবো এখন। শুধু আমরা দু-জন মিলে। এবারেরটা দুঃখজনক হবে না।”

আমি একটা গ্লাস এনে ওর হাতে দিলাম, ও সেটা ভরে বাগানের পাথরের লণ্ঠনের উপর রেখে দিল। তারপর বারান্দায় বসে একহাত গিটারে রেখে সিগারেট টানতে লাগল সে।

“এখন এক বাক্স দেয়াশলাই খুঁজে আনো। যত বড় হয় তত ভালো।”

আমি ইকোনমি সাইজের এক বাক্স দেয়াশলাই এনে ওর পাশে বসলাম।

“এখন তোমাকে যা করতে হবে তা হল, প্রতিবার আমি একটা গান গাইবো

আর তুমি একটা করে দেয়াশলাই জ্বালাবে আর পাশাপাশি রাখবে। আমি যা যা গান মনে আছে সব গাইবো।"

প্রথমে সে হালকাভাবে হেনরি মানচিনির *ডিয়ার হার্ট* গাইল।

"তুমি এর একটা রেকর্ড নাওকোকে দিয়েছিলে, তাই না?" জিজ্ঞেস করল রেইকো।

"হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। গতবছরের আগের ক্রিসমাসে। সে গানটা খুব পছন্দ করত।"

"আমিও পছন্দ করি," রেইকো বলল। "অনেক সুন্দর আর মধুর..." আরেক ঢোক ওয়াইন খাওয়ার আগে আরও কিছু সুর বাজাল সে। "পুরো মাতাল হওয়ার আগে না-জানি কয়টা গান বাজাতে পারবো। চমৎকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হচ্ছে, দুঃখজনক নয়। তোমার কি মনে হয়?"

রেইকো বিটল্‌স বাজানো শুরু করল। *নরওয়েজিয়ান উড*, *ইয়েস্টারডে*, *মিশেল* আর *সামথিং।* সে বাজাতে বাজাতে গাইল *হিয়ার কামস দ্য সান*, তারপর বাজাল *দ্য ফুল অন দ্য হিল*। আমি সাতটা ম্যাচ জ্বালালাম।

"সাতটা গান," রেইকো বলল। কয়েক ঢোক ওয়াইন গিলে আরেকটা সিগারেট ধরালো সে। "এই মানুষগুলো আসলেই জীবনের দুঃখ কষ্ট ভালোভাবে জানত।"

'মানুষগুলো' বলতে রেইকো বুঝিয়েছে জন লেনন, পল ম্যাককারটনি আর জর্জ হ্যারিসনকে।

একটা ছোট বিরতি নিয়ে রেইকো তার সিগারেট ফেলে আবার গিটার ধরলো। *পেনি লেইন*, *ব্ল্যাকবার্ড*, *জুলিয়া*, *হোয়েন আই অ্যাম সিক্সটি ফোর*, *নোহয়ার ম্যান*, *অ্যান্ড আই লাভ হার* আর *হেই জুড* বাজাল।

"কতগুলো হল?"

"চৌদ্দ," আমি বললাম।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাকে প্রশ্ন করল, "তোমার কি অবস্থা? কিছু বাজাতে পারবে–অন্তত একটা গান?"

"মাথা খারাপ। আমার বাজানো ভয়াবহ।"

"তাহলে ভয়াবহই বাজাও, শুনি।"

আমি আমার গিটার এনে আমার মত করে বাজালাম *আপ অন দ্য রুফ*। রেইকো ততক্ষন বিশ্রাম নিয়ে ওয়াইন খেলো আর ধূমপান করল। আমার শেষ

হলে তালি দিল সে।

এরপর সে বাজাল র‍্যাভেলের *পাভান ফর আ ডাইয়িং কুইন* আর দাবুশির *ক্লেয়ার ডি লুন*।

"নাওকো মারা যাওয়ার পর আমি এই গানগুলো তুলেছি," বলল সে। "শেষ পর্যন্ত ওর গানের পছন্দ ভাবালুতা পার হতে পারেনি।"

এরপর বাজালো *ক্লোজ টু ইউ*, *রেইনড্রপ্‌স কিপ ফলিং অন মাই হেড*, *ওয়াক অন বাই* আর লরা নাইরোর *অয়েডিং বেল ব্লুজ*।

"বিশ," আমি বললাম।

"আমি জুকবক্স হয়ে গেছি মনে হচ্ছে," রেইকো অবাক হয়ে বলল। "আমার প্রফেসররা মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যেত যদি এখন আমাকে দেখত।"

সে বাজানো চালিয়ে গেল, সাথে ওয়াইন আর সিগারেট : কিছু বোসানোভা, রজার অ্যান্ড হার্ট, গারসউইন, বব ডিলান, রে চার্লস, ক্যারোল কিং, দ্য বিচ বয়েজ, স্টিভি ওয়ান্ডার, কিউ সাকামোতোর *সুকিয়াকি সং*, *ব্লু ভেলভেট*, *গ্রিন ফিল্ডস*। মাঝেমাঝে চোখ বন্ধ করে বাজনার সাথে তাল দিচ্ছিল বা গুনগুন করছিল।

ওয়াইন শেষ হয়ে গেলে আমরা হুইস্কি ধরলাম। পাথরের লণ্ঠনের উপর গ্লাসের ওয়াইন ঢেলে উইস্কি ভরা হল।

"গণনার কি অবস্থা?" রেইকো জানতে চাইলো।

"আটচল্লিশ," জানালাম তাকে।

উনপঞ্চাশে রেইকো বাজাল *ইলিনর রিগবি* আর পঞ্চাশে আবারো *নরওয়েজিয়ান* উড। তারপর হাতকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে হুইস্কি গিলল।

"আমার মনে হয় যথেষ্ট হয়েছে," বলল সে।

"হ্যাঁ," আমিও সায় দিলাম, "অসাধারন।"

রেইকো আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন আমার কথা শোন ওয়াতানাবে, আমি চাই তুমি যে দুঃখজনক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখেছিলে তা ভুলে যাও আর আমাদের অসাধারনটা মনে রাখো সে-জায়গায়।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"শেষ আরেকটা করা যাক," বলল সে। একান্নতমটা বাজাল তার প্রিয় বাখের একটা মিউজিক। শেষ হলে ফিসফিস করে বলল, "আচ্ছা ওয়াতানাবে, আমরা সেক্স করলে কেমন হবে ব্যাপারটা?"

"আশ্চর্য," আমি বললাম, "আমিও একই কথা ভাবছিলাম।"

আমরা ভেতরে গিয়ে পর্দা টেনে দিলাম। অন্ধকার রুমে আমরা একজন আরেকজনের শরীর স্পর্শ করতে লাগলাম যেন এরচেয়ে সাধারণ কাজ এই দুনিয়াতে আর কিছু নেই। আমি ওর ব্লাউজ আর স্লাক্স খুলে ফেললাম, খুলে নিলাম ওর অন্তর্বাস।

"আমার জীবনটা কী অদ্ভুত," রেইকো বলল, "কখনো ভাবিনি আমার চেয়ে উনিশ বছরের ছোট কোন যুবক একদিন আমার প্যান্টি খুলবে।"

"তুমি কি নিজে খুলতে চাও?"

"না না, তুমিই খোলো। চামড়ার ভাঁজ দেখে ধাক্কা খেও না কিন্তু।"

"তোমার ভাঁজ আমার ভালো লাগে।"

"তুমি আমাকে কাঁদিয়ে ছাড়বে মনে হচ্ছে," ফিসফিস করে বলল সে।

আমি ওর সারা শরীরে চুমু খেলাম। ভাঁজ পড়া অংশগুলোতে জিহ্বা দিয়ে অত্যন্ত যত্নের সাথে আদর কলাম তাকে। তার স্তন বাচ্চা মেয়েদের মত, সেগুলোতে চুমু খেয়ে আলতো করে কামড় দিলাম আমি। তার যোনির ভাঁজে আঙুল ঢুকিয়ে আলতো করে নাড়াতে লাগলাম।

"ভুল জায়গায় হাত চালাচ্ছো, ওয়াতানাবে," আমার কানে ফিসফিস করে বলল সে। "ওটা আরেকটা ভাঁজ।"

"আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এরকম সময়েও তুমি ফাজলামি করছো!"

"দুঃখিত," সে বলল, "আমি আসলে ভয় পাচ্ছি। অনেক বছর এসব করিনি তো...নিজেকে সতের বছরের যুবতি মনে হচ্ছে। একজন লোকের সাথে দেখা করতে গেলাম হঠাৎ দেখি আমি নগ্ন দাঁড়িয়ে আছি।"

"সত্যি বলতে কি, আমারো মনে হচ্ছে সতের বছরের কোন যুবতিকে নষ্ট করছি।"

তার 'ভাঁজ'-এর মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে অন্য হাত দিয়ে তার নিপল ধরে গলা আর কানের মাঝে চুমু খেতে লাগলাম। ওর নিঃশ্বাস আরো ঘন হয়ে আসল, কাঁপতে লাগল গলা। আমি ওর লম্বা সুন্দর পা-দুটো ফাঁক করে ওর ভেতরে আমার পুরুষাঙ্গ ঢোকালাম।

"তুমি নিশ্চয়ই আমাকে গর্ভবতি করে দিতে চাইছো না?" সে আমার কানে কানে বলল। "আমি খুবই লজ্জায় পড়বো যদি এই বয়সে মা হই। ব্যবস্থা নিয়েছো তো?"

"এ নিয়ে চিন্তা কোরো না," বললাম তাকে, "রিলাক্সড থাকো।"

আমি যখন পুরোপুরি ওর ভেতরে সে কাঁপতে কাঁপতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওর পিঠ আঁকড়ে ধরে আমি ওর ভেতরে ঢুকছিলাম তখন হঠাৎ আমাকে অপ্রস্তত করে অরগাজম হয়ে গেল। থামার কোন সুযোগই পেলাম না। থাবা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিলাম।

"আমি দুঃখিত," বললাম তাকে, "নিজেকে থামাতে পারিনি।"

"বোকার মত কথা বোলো না," রেইকো আলতো করে আমার নিতম্বে চাপড় দিয়ে বলল। "তোমার এ নিয়ে ভাবতে হবে না। অন্য মেয়েদের সাথে করার সময় কি তোমার এসব মনে থাকে?"

"হ্যাঁ, থাকে।"

"যাহোক, আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। ভুলে যাও। যা করেছো ভালো করেছো। ভালো লাগছে করে?"

"অসাধারন। সেজন্যই নিজেকে সামলাতে পারিনি।"

"সামলানোর কিছু ছিল না, ঠিকই আছে। আমারও অসাধারন লেগেছে।"

"তুমি কি জানো, রেইকো," বললাম আমি।

"কি?"

"আমার মনে হয়, তোমার আবার একজন প্রেমিক খুঁজে নেয়া উচিত। তুমি অসাধারন। নিজের সম্ভাবনাকে অপচয় করছো।"

"ঠিক আছে, আমি ভেবে দেখবো," বলল সে। "আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে আসাহিকাওয়া'তে লোকজন আদৌ প্রেম করে কিনা।"

কিছুক্ষণ পর আমি আবার উত্তেজিত হয়ে গেলাম। রেইকো দম বন্ধ করে আমার নিচে চাপা পড়া তার দেহটা মোচড়াতে লাগলো। তাকে জড়িয়ে আস্তে আস্তে নড়াচড়া করতে থাকলাম আর কথা বলতে লাগলাম। সে অবস্থায় কথা বলতে দারুন লাগছিল। আমি হাসির কিছু বললে সে হেসে উঠছিল, আর ওর কাঁপুনি আমার লিঙ্গতে টের পাচ্ছিলাম। আমরা সেভাবে একজন আরেকজনকে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকলাম।

"অসাধারন অনুভূতি," রেইকো বলল।

"নড়াচড়া করতেও খারাপ লাগছিল না," বললাম তাকে।

"তাহলে চালিয়ে যাও, আরেকবার করে দেখা যাক।"

আমি ওর পা তুলে যতদূর সম্ভব ভেতরে ঢুকলাম, তারপর বৃত্তের মত করে

ঘুরিয়ে নাড়ালাম, পুরোপুরি উপভোগ করে ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে।

সে রাতে আমরা মোট চারবার মিলিত হয়েছিলাম। প্রতিবার শেষে আমার বুকে শুয়ে থেকে কাঁপছিল রেইকো আর চোখ বন্ধ করে লম্বা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল।

"আমার আর এসব বাকি জীবন না করলেও হবে," রেইকো বলল। "দয়া করে আমাকে বলো ওয়াতানাবে, এসব সত্যি সত্যি ঘটছে। আমাকে বলো, এক জীবনের জন্য যথেষ্ট সেক্স করেছি আমি।"

"কেউ তা বলতে পারে না," আমি বললাম, "কারোর জানার কোন উপায় নেই এটা।"

আমি নাওকোকে বোঝালাম প্লেনে গেলে তাড়াতাড়ি হবে, সহজও হবে কিন্তু সে গো ধরে থাকল ট্রেনে করেই যাবে আসাহিকাওয়ায়।

"হোক্কাইডো যাওয়ার ফেরি আমার পছন্দ। আমার প্লেনে ওড়ার কোন ইচ্ছে নেই," সে বলল।

আমি তাকে উএনো স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। সে তার গিটার বহন করল আর আমি তার সুটকেস। আমরা প্লাটফর্মের বেঞ্চে বসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। রেইকো সেই একই টুইড জ্যাকেট আর সাদা প্যান্ট পরেছে, যেগুলো পরে সে টোকিও এসেছিল।

"তোমার কি সত্যি মনে হয় আসাহিকাওয়া কোন বাজে জায়গা নয়?" প্রশ্ন করল সে।

"চমৎকার একটা শহর। আমি শিগগিরি তোমাকে দেখতে আসবো।"

"সত্যি?"

আমি মাথা ঝাঁকালাম, "আর চিঠিও লিখবো।"

"আমি তোমার চিঠি ভালোবাসি। নাওকোকে যেগুলো লিখেছিলে সব পুড়িয়ে ফেলেছে। চমৎকার চিঠি ছিল সেসব।"

"চিঠি তো স্রেফ কাগজমাত্র," আমি বললাম, "পুড়িয়ে ফেললে সমস্যা নেই। যা থাকার তা থাকবে তোমার মনের মধ্যে। সেখানেই রাখো সেগুলোকে। তাছাড়া যা হারিয়ে যাওয়ার তা হারিয়ে যাবেই।"

"সত্যি বলতে কি ওয়াতানাবে, আমার একা একা আসাহিকাওয়া যেতে ভয় করছে। সুতরাং আমাকে অবশ্যই চিঠি লিখবে। তোমার চিঠি পড়লে আমার মনে হবে তুমি আমার পাশেই আছো।"

"সেরকম যদি তোমার মনে হয় তাহলে আমি অবশ্যই সবসময় তোমাকে চিঠি লিখবো। চিন্তা করো না, আমি তোমাকে চিনি, তোমার কোন সমস্যা হবে না।"

"আরেকটা ব্যাপার। আমার মনে হচ্ছে কি জানি আমার মধ্যে আটকে আছে। নাকি আমার কল্পনা?"

"স্রেফ দীর্ঘস্থায়ি কোন স্মৃতি," আমি হাসলাম, রেইকোও হাসলো।

"আমাকে ভুলে যেও না," বলল সে।

"আমি তোমাকে ভুলবো না...কখনো না।"

"আমাদের হয়তো আবার দেখা না-ও হতে পারে কিন্তু যেখানে আমি যাই না কেন, সবসময় তোমাকে আর নাওকোকে মনে রাখবো।"

আমি খেয়াল করলাম সে কাঁদছে। কিছু বোঝার আগেই আমি দেখলাম ওকে চুমু খাচ্ছি। প্ল্যাটফর্মের সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেও কোনকিছুই পরোয়া করলাম না। আমরা জীবন্ত মানুষ। আর আমরা শুধু একটা চিন্তাই করতে পারি, তা হল বেঁচে থাকা।

"সুখি হও," রেইকো ট্রেনে উঠতে উঠতে বলল। "তোমাকে যা যা পরামর্শ দেয়ার সব দিয়ে দিয়েছি। আর কিছু বলার বাকি নেই। শুধু বলতে চাই, সুখি হও। আমার থেকে নাও, নাওকোর থেকে নাও, আর নিজের সাথে জোড়া দাও।"

আমরা কয়েক মুহূর্তে হাত ধরে থেকে আলাদা হয়ে গেলাম।

মিদোরিকে ফোন করে বললাম, "তোমাকে আমার কিছু বলার আছে। তোমাকে আমার হাজার-হাজার কথা বলার আছে। অসংখ্য ব্যাপার নিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে। এই পৃথিবীতে আমি একমাত্র যা চাই তা হল তোমাকে। আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই, সব কথা খুলে বলতে চাই। আমি চাই আমরা দু-জন সবকিছু আবার প্রথম থেকে শুরু করবো।"

মনে হল যেন কয়েক যুগ নিরব হয়ে থেকে মিদোরি সাড়া দিল। সারা পৃথিবীর সব বাগানের নতুন কাটা ঘাসে বৃষ্টির পড়ার মত নিরবতা। আমি কাঁচে কপাল চেপে রেখে চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করলাম।

অবশেষে মিদোরির মৃদু কণ্ঠ নিরবতা ভাঙলো, "কোথায় তুমি?"

কোথায় আমি?

ফোনের রিসিভার চেপে ধরে আমি টেলিফোন বুথের ভেতর থেকে

আশেপাশে তাকালাম। আমি কোথায় আছি? জানি না। একদম কোন ধারনা নেই আমার। এই জায়গাটা কোথায়? আমার চোখের সামনে খালি ভেসে উঠল হাজার-হাজার মানুষ এদিক ওদিক চলাচল করছে। তারা কোন এক অদৃশ্য জায়গা থেকে এসে আবার কোথায় জানি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। নামহীন এই অজানা, মৃত জায়গা থেকে আমি বার বার মিদোরিকে ডেকে যেতে লাগলাম।

• • •